দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইতিহাস

(মালয়-ইন্দোনেশিয়া)

জহর সেন

রিডার, ইতিহাস বিভাগ

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

DAXIN-PURBA ASIAR ITIHAS

(Malay Indonesia)

(A History of South-East Asia

Malay-Indonesia)

Jabar Sen

প্রকাশ কাল : আগস্ট ১৯৫৯

প্রকাশক :

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা)

মুদ্রক :

প্রদীপ কুমার চট্টোপাধ্যায়

টাইপোগ্রাফার্স অফ ইণ্ডিয়া

৩৩এ, কে. জি. বোস সরণী

কলিকাতা-৭০০০৮৭

চিত্র : লাবণ্য কর্মকার

প্রচ্ছদ : দুর্গা রায়

Published by Prof. Ladlimohan Roychoudhury Chief Executive Officer, West Bengal State Book Board under the centrally sponsored scheme of production of books and literature in regional languages at the University level launched by the Government of India, Ministry of Education and Social welfare (Department of Culture) New Delhi.

উৎসর্গ

॥ পুত্রো মাতরা বিচরন্নুপাবসি পৃণক্ষি রোদসী উভে ॥

সামবেদ সংহিতা

তুমি যখন দ্যুলোক ও ভূলোক স্পর্শ কর তখন তারা দুজন মায়ের মত আর তুমি পুত্রের মত হয়ে খেলা কর।

॥ মাতেব পুত্রান্ রক্ষস্ব শ্রীশ্চ প্রজ্ঞাং চ বিধেহি ন ইতি ॥

প্রশ্ন উপনিষদ

মাতা যেমন পুত্রদের রক্ষা করেন, তেমনি তুমিও পুত্রস্থানীয় আমাদের রক্ষা কর। আমাদের শ্রী এবং প্রজ্ঞা বিধান কর।

আমাদের মা

হেমনলিনী সেনের স্মৃতির উদ্দেশে

গ্রন্থকারের নিবেদন

বৃদ্ধ নবদ্বীপ ঘোষাল বললে—এ সব হাঙ্গামা কতদিনে মিটবে ঠাকুরমশাই? শুনছি নাকি একটা পুর জারমান নিয়ে নিয়েচে ?

বিশ্বাস মশায় বললেন—সিঙ্গাপুর

নবদ্বীপ বললে—সে কোন জেলা? আমাদের এই যশোর, না খুলনে ? মামুদপুরের কাছে ?

বিশ্বাস মশায় হেসে বললেন—যশোরও না, খুলনেও না। সে হোল সমুদ্দুরের ধারে। বোধ হয় পুরীর কাছে, মেদিনীপুর জেলা। তাই না পণ্ডিত মশাই ?

গঙ্গাচরণ ভাল জানে'না, কিন্তু এদের সামনে অজ্ঞতাটা দেখানো যুক্তিযুক্ত নয়। সুতরাং সে বললে, হাঁ, একটু দূরে পশ্চিম দিকে। ঠিক কাছে নয়।

উপ'র উল্লিখিত কথোপকথন বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অশনি সংকেত' এ আমরা শুনেছি। 'অশনি সংকেত' থেকে আরও কয়েকটি লাইন আপনাদের শোনাচ্ছি।

—জাপানীরা সিঙ্গাপুর নিয়ে নিয়েচে

—শুধু সিঙ্গাপুর কেন ? ব্রহ্মদেশও নিয়ে নিয়েচে। জানো না সে খবর ?

—না-ইয়ে-শুনি নি তো ? ব্রহ্মদেশ ?

—যেখানে থেকে রেঙ্গুন চাল আসেরে ভায়া। ওই যে সস্ত', মোটা মোটা আলো চাল, সিদ্ধও আছে, তবে আমি আতপ চালটাই খাই।

অতি বাস্তব কারণে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়েই সাধারণ ভারতবাসী (এমন কি গ্রামীণ মানুষ) সিঙ্গাপুরে, রেঙ্গুন ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলের পরিচয় লাভ করেছে, 'অশনি-সংকেত' এর সাক্ষ্য থেকে তা স্পষ্ট বোঝা যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে ভারতবর্ষের কাছাকাছি টেনে এনেছে।

সুদূর অতীতের কথা গ্রন্থের মূল অংশে আলোচনা করেছি। কিন্তু অনতি অতীতে ঐ অঞ্চল আমাদের অপরিচিত ছিল, তা কিন্তু সত্য নয়। রোজ দাউদ নামে মেয়েটির কথা আপনারা কি ভুলে গেছেন ? তাঁর মা ছিলেন ইহুদী, বাবা বাঙালী। জাভায় লুকানো আফিং গাজা আমদানি রপ্তানির ব্যবসায় রোজ দাউদ জড়িত ছিলেন। এই কাজে বাটাভিয়া থেকে সুরবায়াতে তিনি রেলগাড়িতে যাতায়াত করতেন। বেঙকুলান শহরের জেটিতে তিনি একদিন পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। স্ত্রী পরিচয় দিয়ে সব্যসাচী তাঁকে বাঁচান। সুমাত্রার ঘটনা বলে

সব্যসাচী তাঁর নাম রাখলেন সুমিত্রা। কিছুদিন পরে সেলেবেস দ্বীপে ম্যাকেস্সার শহরে একটি ছোট অখ্যাত হোটেলে সুমিত্রা ডাক্তারকে বলেন, 'আমাকে তোমার কাজে ভর্তি করে নাও।' এই হল সুমিত্রার 'পথের দাবী' সংশ্রে আমার কাহিনী।

রামদাস তলওয়ারকর, অপূর্ব ও ভরতীব সঙ্গে আপনাদের বর্মাতেই দেখা হয়েছে। কিন্তু নীলকান্ত যোশীকে মনে পড়ে? সিঙ্গাপুরে তাঁর ফাঁসী হয়েছিল, একথা ডাক্তারের মুখ থেকে শুনেছি। স্বয়ং ডাক্তারও বছর তিনেক সিঙ্গাপুরে আটক ছিলেন। সেখান থেকে ব্যাঙ্ককের পথে পাহাড় ডিঙ্গিয়ে তিনি টেভয়ে এসে পেঁছান। তারপর আরাকানে এসে পাড়ি জমান। ভারতীকে ডাক্তার শুনিয়েছেন দক্ষিণ চীনে ক্যানটন অভিমুখে তাঁর যাত্রার অভিজ্ঞতা এবং প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপগুলি পরিভ্রমণেব পরিকল্পনা। হীরা সিংও আমাদেব অচেনা নন। এক সময় তিনি হংকং-এ পুলিশের চাকুরি করতেন, পবে রেঙ্গুনে টেলিগ্রাফ অফিসে পিওনের কাজ করেছেন।

'পথের দাবী'র এই চরিত্রগুলি হয়ত কাল্পনিক। কিন্তু জাভা, সুমাত্রা, বাটাভিয়া, সুরবায়া, বেঙকুলান, সেলেবেস, বর্মা, সিঙ্গাপুর, ব্যাঙ্কক, টেভয়, আরাকান, হংকং ইত্যাদি যে সব স্থানবাচক নাম পাওয়া গেল, তা থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভৌগোলিক রূপবেখার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ছিল ভারতীয় বিপ্লবীদের একটি অন্যতম প্রধান কর্মক্ষেত্র। বর্মা, মালয়, শ্যাম দেশ এবং চীনের বন্দরগুলিতে গুপ্ত সমিতির সদস্যরা বিপ্লবের বাণী প্রচাব ও অর্থসংগ্রহ করে বেড়াতেন। শিখ গুরুদ্বারাতে বসত গদর বিপ্লবীদের গুপ্ত সমিতির সভা। শ্যাম দেশে রেল দপ্তরে ও কাঠের কারখানায় অসংখ্য শিখ কাজ করত। হংকং ও সিঙ্গাপুরে শিখরা ছিল পুলিশ বাহিনীতে ও নিরাপত্তা রক্ষী দলে। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে, সুমাত্রা ও মালাক্কা অঞ্চলেও নানা কাজে শত শত শিখ নিযুক্ত ছিল। এই সব দেশে তাদের মধ্যে গদর দলের অপরিমেয় প্রভাব ছিল।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রণাঙ্গনে আজাদ হিন্দ বাহিনীর শৌর্য ও আত্মত্যাগের মহামহিম কাহিনী আমাদের স্মৃতিতে চিরভাস্বর হয়ে আছে এবং থাকবে। আজাদ হিন্দ বাহিনী ছিল যথার্থ অর্থে গদর বিপ্লবীদের উত্তরসুরী। আজাদ হিন্দ বাহিনীতে শিখ, হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যে সাম্প্রদায়িক সৌভ্রাত্র বিষয়ে আমরা গর্বে উদ্বেল হই, তা কিন্তু গদর আন্দোলন থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে অর্জিত।

1927 সালের আগস্ট, সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে রবীন্দ্রনাথ মালয় দেশ,

যবদ্বীপ, বালিদ্বীপ ও শ্যাম দেশ ভ্রমণ করেছিলেন। এই ভ্রমণের অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি তিনি গদ্যে ও কাব্যে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। কবির সহযাত্রী অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই ভ্রমণ-কাহিনীর পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর 'রবীন্দ্র-সংগমে দ্বীপময় ভারত ও শ্যাম-দেশ' শীর্ষক অবিস্মরণীয় পুস্তকে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে ভারতের প্রাচীন সাংস্কৃতিক আত্মীয়তা স্মরণ করে রবীন্দ্রনাথ 'শ্রীবিজয় লক্ষ্মী', 'বোরোবুদুর', 'বালী', 'সিয়াম' (প্রথম দর্শনে) আর 'সিয়াম' (বিদায় কালে) প্রভৃতি কবিতা রচনা করেন। 'শ্রীবিজয় লক্ষ্মী' কবিতায় 'দোঁহার প্রাণের আনাগোনা'য় আবেগ বিহ্বল কবি আমাদের শুনিয়েছেন, 'আমি তোমায় চিনেছি আজ, তুমি আমায় চেনো। নতুন পাওয়া পুরানোকে আপন বলে জেনো।'

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া আমাদের কাছে 'নতুন পাওয়া পুরানো'। তাকে আপন করে জানার তাগিদেই এই গ্রন্থ প্রণয়নের অক্ষম ও নগণ্য প্রচেষ্টা। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরের ছাত্রছাত্রীদের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখেই গ্রন্থটি রচিত হয়েছে। আগ্রহী সাধারণ পাঠকের ইতিহাস বুভুক্ষা যাতে কিঞ্চিৎ তৃপ্ত হতে পারে, সে বিষয়েও সজাগ থেকেছি। কোন কোন ক্ষেত্রে সর্বশেষ গবেষণার ফসল এবং সর্বাধুনিক তথ্য সংযোজিত হয়েছে। আশা করি অধিকাংশ মুদ্রণ প্রমাদ পাঠককে বিভ্রান্ত করবে না। তা সত্ত্বেও শুদ্ধিপত্রে কিছু মারাত্মক ভুলভ্রান্তি শুদ্ধাকারে উল্লিখিত হয়েছে। গ্রন্থের ত্রুটিবিচ্যুতি ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়ে সদাশয় পাঠকের উপদেশ নির্দেশ পেলে আমি নিজেকে কৃতার্থ মনে করব।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পঠন পাঠনে আমাকে হাতেখড়ি দিয়েছেন অধ্যাপক হিমাংশু ভূষণ সরকার এবং অধ্যাপক অরুণ কুমার দাশগুপ্ত। তাঁদের কাছে আমি চিরঋণী। এই গ্রন্থের জন্য পর্ষদ নিযুক্ত অবধায়ক ছিলেন অধ্যাপক গৌরীপদ ভট্টাচার্য। তাঁর উপদেশে ও মতামতে আমি অশেষ উপকৃত হয়েছি। তাঁদের প্রত্যেককে আমি সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাই।

পুস্তক পর্ষদের কর্ণধার শ্রীদিব্যেন্দু হোতা এবং তাঁর সহযোগী কর্মী গোষ্ঠী উদ্যম, দায়িত্ববোধ ও কর্মনিষ্ঠার জ্যোতিষ্মান আদর্শ ও অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। টাইপোগ্রাফার্স প্রেসের সহৃদয় সহযোগিতা প্রশংসনীয়। উভয় প্রতিষ্ঠানকে জানাই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

জহর সেন

সূচীপত্র

অষ্টম অধ্যায় 96—110

ইউরোপীয় শক্তিবর্গের আগমন

নবম অধ্যায় 111—147

ইন্দোনেশিয়ায় ডচ ঔপনিবেশিক শাসন

দশম অধ্যায় 148—180

মালয়ে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইতিহাস

(মালয়-ইন্দোনেশিয়া)

(1)

মুখবন্ধ

'দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া' নামকরণ

1839 সালের একটি বিবরণে সর্বপ্রথম দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া কথাটি পাওয়া গেছে। আমেরিকার ব্যাপটিসট মিশনারি সোসাইটির উদ্যোগে নানা অজানা তথ্য আহরণের উদ্দেশ্যে **Howard Malcolm** নামে একজন মার্কিন ধর্মপ্রচারক এই অঞ্চলে আসেন। **1839** সালে স্বদেশে ফিরে তিনি একটি বিবরণ প্রকাশ করেন। বিবরণটির শিরোনাম হচ্ছে ঃ 'ট্রাভেলস্‌ ইন সাউথ ইসটারণ এশিয়া এমব্রেসিং হিন্দুস্থান, মালয়, শ্যাম অ্যানড চায়না অ্যানড দি বার্মা এমপায়ার'। এই বিবরণেই প্রথম সাউথ ইসটারণ এশিয়া অর্থাৎ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া কথাটির সচেতন উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে।[1]

পরবর্তী একশ বছরে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া কথাটির ব্যবহার প্রায় অপ্রচলিত ছিল। এই অঞ্চলকে বোঝাতে এ সময় অবশ্য অন্যান্য নামের প্রচলন পাওয়া যাচ্ছে। যথা, বৃহত্তর ভারত, বহির্ভারত, ইন্দোচীন, ইসট ইনডিজ ইত্যাদি। কিন্তু ভিয়েতনামের সংস্কৃতিতে চীনের এবং ফিলিপাইনের ইতিহাসে স্পেনীয় প্রভাবের কথা মনে রাখলে, এ সব নামকরণ কতটা অসার্থক, তা বোঝা যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে অনেকে এই অঞ্চলকে 'মৌসুমী এশিয়া' নামেও অভিহিত করেছেন। কিন্তু এটাও মনে রাখা দরকার যে সিংহল, ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল এবং দক্ষিণ চীনের অনেকাংশ মৌসুমী এশিয়ার অন্তর্গত। অর্থাৎ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার চেয়ে মৌসুমী এশিয়ার পরিধি আরও ব্যাপক।[2]

জারনাল অব এশিয়ান স্টাডিজ (খণ্ড **25** নং **2**, ফেব্রুয়ারি **1938**) পত্রিকায় একটি পুস্তক সমালোচনায় **Karl J. Pelzer 1920** এর দশকে যে সব রচনায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার উল্লেখ পাওয়া গেছে, সেগুলির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। **1937** সালের নভেম্বর থেকে **1938** সালের নভেম্বর মাসের মধ্যে 'আমেরেশিয়া' পত্রিকায় এই অঞ্চলের উপর যে তিনটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল, তার মধ্যে একটিতে 'দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া' ব্যবহৃত হয়েছে। **1938** সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রকাশিত হয় **J. L.**

Christian লিখিত 'দি ক্রা ক্যানাল ফেবল'। এই প্রবন্ধে তিনি 'সাউথ ইসটারন এশিয়া' কথাটি ব্যবহার করেন। এই অঞ্চলকে বোঝাতে **J. S. Furnivall** 'ট্রপিকাল ফার ইসট' প্রয়োগ করেছেন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্তরঙ্গ পরিচয় দিয়েছেন **J. C. Van Leur** তাঁর নানা রচনায়, বিশেষ করে **De Wereld Van Zuid-Oost Azie** শীর্ষক প্রবন্ধে। প্রবন্ধটি পরে তাঁর ***Netherlanders Over de Zeen*** (ইউট্রেকট 1940) গ্রন্থে সংকলিত হয়েছিল। 1955 সালে গ্রন্থটির ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয় : 'ইন্দোনেশিয়ান ট্রেড অ্যান্ড্ সোসাইটি' শিরোনামে। 1940 সালে নিউ ইয়র্কের ইনস্টিটিউট অব প্যাসিফিক রিলেশনস্ এর উদ্যোগে প্রকাশিত হয়েছিল 'প্রোগ্রেস অ্যান্ড্ ওয়েলফেয়ার ইন সাউথ ইসট এশিয়া'। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালপর্বে এই প্রথম দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া কথাটির সচেতন উল্লেখ পাওয়া গেল। যুদ্ধের সময় এমন একটি ধারণা গড়ে উঠেছিল যে রণনীতি ও রণকৌশলের দৃষ্টিকোণে এই অঞ্চলকে ভারতবর্ষ, চীন ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অংশরূপে দেখা সঙ্গত নয়। ভৌগোলিক বিচারেও মনে হয়েছিল যে বর্মা, থাইল্যান্ড, লাওস, কাম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর এবং ইন্দোনেশিয়ার যৌথভাবে অভিন্ন পরম্পরাগত পরিচয় আছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সামরিক প্রয়োজনের তাগিদে এই অঞ্চলকে একটি সাধারণ নামে অভিহিত করার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল। 1943 সালের মে মাসে ওয়াশিংটন সম্মেলনে সাউথ ইসট এশিয়া কমান্ড্ গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এর পর থেকেই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া কথাটির ব্যাপক প্রচলন দেখা যায়।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যৌথ সত্তার পরিচয় শুধুমাত্র সামরিক ভাবনা প্রসূত নয়। বর্তমান শতকের বিশ ও ত্রিশের দশকে নৃতত্ত্ববিদ ও ঐতিহাসিকগণ এই অঞ্চলে নানা দেশের মধ্যে সাদৃশ্যের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত ছিলেন। বিভিন্ন দেশের রাজসভায় অনুষ্ঠিত রীতিনীতি নিয়ম কানুনের মধ্যে যথেষ্ট মিল তাঁরা খুঁজে পেয়েছেন। স্বভাবতই মনে আসে যে সাংস্কৃতিক পরম্পরা ও উত্তরাধিকারের একটি সাধারণ অভিন্ন উৎস নিশ্চয়ই ছিল। ব্যাপক অঞ্চল জুড়ে পরিবার-সংগঠন ছিল প্রায় একই ধরণের। বৃহৎ যৌথ পরিবার গড়ে ওঠে নি। সনাতন সমাজে নারী ছিল বিশেষ সম্মান ও মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিতা। সুদূর অতীত কাল থেকেই আন্তর্জাতিক সম্পর্ক রচনার একটি কার্যকর আঞ্চলিক কাঠামো দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বিদ্যমান ছিল, নানা সাক্ষ্য প্রমান থেকে তা স্পষ্ট হয়েছে।3

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যৌথ সত্তার পরিচয় আবহমান কাল থেকেই চীনা

ও জাপানীদের কাছে স্পষ্ট ছিল। চীনা ভাষায় Nanyang এবং জাপানী ভাষায় Nampo দক্ষিণ সাগরীয় অঞ্চল সম্পর্কে প্রয়োগ করা হত। দক্ষিণ সাগরীয় অঞ্চল বলতে সামগ্রিকভাবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া বোঝানো হত।4 ভারতবর্ষে বৈদিক যুগে এবং সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদের যুগে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া দেশবাসীর কাছে অজ্ঞাত ছিল। সুবর্ণভূমির (দক্ষিণ বর্মা) প্রথম স্পষ্ট উল্লেখ আছে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে (আনুমানিক 300 খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ)।5 সিংহলী বিবরণ থেকে জানা যায় যে সম্রাট অশোকের রাজত্বে 247 খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে মোগগালিপুত্ত তিস্স্ সোন ও উত্তরকে সুবর্ণভূমিতে পাঠিয়েছিলেন। বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ নিদ্দেশের রচনাকাল 247 খ্রীষ্ট পূর্বাব্দের পরে নয়। সুতরাং মহানিদ্দেশে যে সব স্থানবাচক নামের উল্লেখ আছে, সেগুলি খ্রীষ্ট পূর্ব তৃতীয় শতকের মাঝামাঝি প্রচলিত ছিল। নামগুলির স্থান-পরিচিতি নিয়ে নানা মতবিরোধ সত্ত্বেও, এটুকু বলা সম্ভব যে তক্কোল, জাভা ও সুবর্ণভূমি দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় অবস্থিত ছিল। 383 খ্রীষ্ট পূর্বাব্দের দ্বিতীয় বৌদ্ধ সঙ্গীতির বিবরণে বেশ কয়েকটি প্রাচীন জাতকের নাম পাওয়া যায়। একটি জাতক থেকে আমরা জেনেছি চম্পার রাজকুমার মহাজনক 350 জন লোক সঙ্গে নিয়ে সুবর্ণভূমির উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন। সঙ্খ নামে এক ব্রাহ্মণের বারাণসী থেকে সুবর্ণভূমি যাত্রার বিবরণ আছে সঙ্খ জাতকে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ও প্রাচীনতর জাতকের সাক্ষ্য প্রমাণ থেকে একথা স্পষ্ট যে আনুমাণিক 300 খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতবাসীর পরিচয় সুবর্ণভূমি বা দক্ষিণ বর্মা পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। নিদ্দেশেব যুগে (আনুমানিক 247 খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ) তক্কোল ও জাভার সঙ্গে ভারতবাসীর পরিচয় ঘটেছে।

বাল্মীকির রামায়ণের রচনাকাল ধরা হয় খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতক থেকে খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতক। রামায়ণে (কান্ড 4, সর্গ 30, শ্লোক 30–31) যবদ্বীপম ও সুবর্ণরূপ্যক দ্বীপম কথা দুটি আছে। গুপ্ত বংশের সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকাল (আনুমানিক 381—413/14 খ্রীষ্টাব্দ) মহাকবি কালিদাসের অমর লেখনীর জন্য অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। কালিদাসের 'রঘুবংশ' কাব্যে (6|57) দ্বীপান্তরের মশলার কথা আমরা পেয়েছি। মধ্য এশিয়ার ভিক্ষু লি-ইয়েন রচিত সপ্তম-অষ্টম শতকের অভিধানে দ্বীপান্তব কথাটি পাওয়া যাচ্ছে। সিলভাঁ লেভি লি-ইয়েন কথিত দ্বীপান্তরকে কুন-লুনের সমার্থক মনে করেছেন। সেই সময় কুন-লুন, এই অনির্দিষ্ট স্থান-বাচক নাম দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অনেক অঞ্চল সম্পর্কেই প্রয়োগ করা হত।

সপ্তম অষ্টম শতাব্দীতে রচিত আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প গ্রন্থে কর্মরঙ্গ, নারিকের, বারুসক, বলিদ্বীপ ও যবদ্বীপের উল্লেখ আছে। লেভির মতে কর্মরঙ্গ হচ্ছে কামলঙ্কা বা হিউয়ান সাং কথিত লঙ্কাকিয়সু, বাকী নামগুলি যথাক্রমে নারিকেল অর্থাৎ আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ, সুমাত্রার ব্যারোস, নিকোবর, বলিদ্বীপ ও জাভাকে বুঝিয়েছে। সানুদাসের সুবর্ণভূমিতে যাত্রার কথা বলা হয়েছে 'বৃহৎকথাশ্লোকসংগ্রহ' গ্রন্থে। সোমদেবের 'কথাসরিৎসাগর' গ্রন্থে সুবর্ণদ্বীপের রাজধানীতে বণিক সমুদ্র শূরের যাত্রার কথা আছে। সুমাত্রা বা সুবর্ণদ্বীপ ছিল শ্রীবিজয় সাম্রাজ্যের বাণিজ্য কেন্দ্র। তাই 'কথা' সাহিত্যের সংগ্রাহকরা (খ্রীষ্টীয় নবম থেকে একাদশ শতক) সুবর্ণদ্বীপের উল্লেখ নানা প্রসঙ্গে করেছেন। রাজা দেবপালদেবের 849 খ্রীষ্টাব্দের শিলালিপিতেই সর্বপ্রথম সুবর্ণদ্বীপের পাথুরে উল্লেখ পাওয়া গেছে। নবম শতকেব মাঝামাঝি আরব লেখকদের বিবরণে জবজ/জবগ পাওয়া গেছে। অল-বীরুণীই (আনুমানিক 1030 খ্রীষ্টাব্দ) সর্বপ্রথম লিখেছিলেন যে হিন্দুরা জবজ দ্বীপপুঞ্জকে সুবর্ণদ্বীপ নামে অভিহিত করে থাকেন। অতীতের শ্রীভোজকে আরবরা জবজ বলেছেন। শ্রীভোজ হচ্ছে শ্রীবিজয়ের বিকৃত রূপ। এটা স্পষ্ট যে নবম শতক থেকে একাদশ শতকে সুবর্ণদ্বীপ কথাটি সুপরিচিত ও বেশী জনপ্রিয় হয়েছে।

ভৌগোলিক অবস্থান

সাধারণভাবে ভারত ও চীনের দক্ষিণ ও পূর্বে অবস্থিত বিস্তীর্ণ অঞ্চল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া নামে পরিচিত। এই অঞ্চলে আছে বর্মা, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, কাম্বোডিয়া, লাওস, মালয়েশিয়া, ব্রুনি, ইন্দোনেশিয়া এবং ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ। সামগ্রিকভাবে এই সমস্ত দেশ প্রায় 1½ মিলিয়ণ বর্গমাইল জুড়ে বিস্তৃত এবং 220 মিলিয়ণের অধিক জনসংখ্যা অধ্যুষিত।[6] দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মূল ভূখণ্ডের গিরিমালার অবস্থান উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত। গিরিমালা থেকে উৎসারিত দীর্ঘ নদীগুলি, যেমন সালুয়িন, ছাও ফ্রায়া বা মেনাম, মেকং ও ইরাবতী সমান্তরাল খাতে প্রবাহিত। প্রচুর পলিমাটি ও জল বহন করে আনে এই নদীগুলি। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মূল ভূখণ্ডে কৃষিকর্মে তাই নদীগুলির অবদান অপরিসীম। কর্কটক্রান্তি রেখা ও বিষুবরেখার দক্ষিণে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির অবস্থান। এই অঞ্চলে তাই তাপমাত্রা ঊর্ধ্বমুখী, বৃষ্টিপাতও প্রচুর এবং বিস্তীর্ণ অঞ্চল ঘন নিবিড় অরণ্যে সমাচ্ছন্ন। জনবসতি গড়ে উঠেছে নদীর কূলে। নদীগুলিই হল যোগাযোগের প্রধান পথ।

জনগোষ্ঠী

প্রাগৈতিহাসিক ও ঐতিহাসিক যুগ থেকেই বিপুল জনস্রোত নদীপথে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে এসেছে। প্রথমে এসেছে আদিম অস্ট্রেলীয় ও নেগ্রিটো জনগোষ্ঠী। অস্ট্রেলিয়া, ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ার কোন কোন অঞ্চলে অতি অল্প সংখ্যায় তাদের বংশধর এখনও টিকে আছে। খ্রীষ্ট-পূর্ব দ্বিতীয় ও তৃতীয় সহস্র বছর আগে দক্ষিণ পশ্চিম চীন থেকে এসেছে অগ্রসর ইন্দোনেশীয় ও অস্ট্রোনেশীয় জনগোষ্ঠী। মালয় ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপাঞ্চলের মানুষদের মধ্যে ইন্দোনেশীয় জনগোষ্ঠীর আধিক্য স্পষ্ট। ইন্দোনেশীয় জনগোষ্ঠী দুটি শাখায় বিভক্ত : প্রোটো মালাই এবং দুতারো মালাই। প্রোটো মালাইদের মধ্যে মোঙ্গোলীয় রক্তের সংমিশ্রণ ঘটেছে। মালয়ের জাকুন, সুলায়েশী, তোরাজা, বোর্ণিওর ডায়াক এবং সুমাত্রার বাটাকদের মধ্যে প্রোটো মালাই প্রাধান্য স্পষ্ট। দুতারো মালাই জনগোষ্ঠীর বংশধরদের পাওয়া যাবে সুমাত্রা ও মালয়েশিয়ার মালাই, ইন্দোনেশিয়ার যবদ্বীপীয়, সুদানীয়, বলিদ্বীপীয়, মাদুরীয় এবং ফিলিপাইনের বিশয়ন, তাগালোগ, ইলোকনো, বিকোল এবং পম্পাংগন জনগোষ্ঠীর মধ্যে। ছাও ফ্রায়া উপত্যকা থেকে অস্ট্রো-এশীয়-মন গোষ্ঠীর মানুষরা নিম্ন ব্রহ্মদেশের সমুদ্র তীর অঞ্চলে বসতি বিস্তার করেছিল। খেমেররা এসেছিল মেকং উপত্যকায়। দক্ষিণ চীন থেকে ভিয়েতনামীরা লোহিত নদীর বদ্বীপে এসে বসতি স্থাপন করে এবং সেখান থেকে আনাম কূলের উত্তরাঞ্চলে এসে পৌঁছায়। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের শুরুতে প্যু ও বর্মীরা মধ্য ইরাবতী উপত্যকায় বসতি বিস্তার করে। শান ও থাই গোষ্ঠীর মানুষ প্রথমে মেকং ও লোহিত নদীর উত্তরাঞ্চলে আসে এবং সেখান থেকে পশ্চিমে আসাম ও টনকিঙ পর্যন্ত এবং পূর্বে কাম্বোডিয়ার সীমান্ত অবধি ছড়িয়ে পড়েছিল।

আদি সংস্কৃতি

জনগোষ্ঠীর বৈচিত্র্য সত্ত্বেও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আদি বাসিন্দাদের সাংস্কৃতিক জীবনে যথেষ্ট মিল ছিল। আদিতে সংস্কৃতি ছিল মেসো-লিথিক। টনকিনের বাক্‌সনীয় অর্ধ-মসৃণ তীক্ষ্ম প্রস্তর হাতিয়ার এবং শ্যামদেশ, মালয় ও সুমাত্রার স্থানে স্থানে অনুরূপ শিল্পোপকরণে তার পরিচয় মেলে। খ্রীষ্টপূর্ব দুই ও তিন হাজার বছর আগে ইন্দোনেশীয় নরগোষ্ঠীর মানুষ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার [illegible] [illegible] মধ্যে নব্য প্রস্তর যুগের

চতুষ্কোন বাটালির প্রচলন দেখা গেছে। তাছাড়া নব্য প্রস্তর যুগের মৃৎপাত্র বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে পাওয়া গেছে। ব্রোঞ্জ—লোহ যুগের সংস্কৃতি ডোংসন সংস্কৃতি নামে পরিচিত। বৃহৎ ব্রোঞ্জের ড্রাম ছিল এই সংস্কৃতির অন্যতম নিদর্শন। এগুলি দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার প্রায় সর্বত্র দেখা গেছে। ডোংসন সংস্কৃতির প্রেরণা এসেছিল চীন থেকে।

ভাষা

ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মনে করেন যে ইন্দোচীনের অস্ট্রিক জাতীয় মানুষের কিছু অংশ প্রথমে মালয় উপদ্বীপে এবং সেখান থেকে সুমাত্রা যবদ্বীপ প্রভৃতি ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জে যায়। ইন্দোনেশিয়াতে আগেকার নানা জাতির সঙ্গে এদের সংমিশ্রণ ঘটে। পরে ইন্দোনেশিয়া দ্বীপপুঞ্জ থেকে পূর্বে ফীজী, নিউ-হিব্রাইডিস প্রভৃতি মেলানেশীয় দ্বীপপুঞ্জে, সেখান থেকে আরও পূর্বে সামোআ, তাহিতি, মার্কেসাস, পাউমোতু প্রভৃতি পলিনেশীয় দ্বীপপুঞ্জে এবং আরও দূরে হাওআই, ইস্টর দ্বীপ এবং নিউ-জীলাণ্ডে অস্ট্রিক ভাষী মানুষরা ছড়িয়ে পড়েছিল। অস্ট্রিক ভাষা ও সংস্কৃতির বিস্তৃত প্রাঙ্গণ ছিল পশ্চিম হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত ভারতবর্ষ, মাঝে ইন্দোচীন, মালয়-উপদ্বীপ এবং ইন্দোনেশিয়া ও পূর্বে মেলানেশিয়া এবং পলিনেশিয়া। ভারত, ইন্দোচীন ও দ্বীপময় অঞ্চলে মূল অস্ট্রিক ভাষা কয়েকটি শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে পড়ে।7 এই অধ্যায়ের শেষে তফসিলে এই শাখাপ্রশাখার বংশপীঠিকা দেওয়া হয়েছে। সুনীতি কুমার লিখেছেন, "এই অস্ট্রিক জাতির অস্তিত্ব হেতু ভারত, ইন্দোচীন আর দ্বীপময় ভারত অনেকটা এক-ই সূত্রে গ্রথিত।" ইন্দোনেশীয় ভাষার সংখ্যা প্রায় 250 এই ভাষাগুলিকে ডঃ গণ্ডা 16টি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন, যথা (1) ফিলিপাইন ভাষা গোষ্ঠী, (2) সুমাত্রা ভাষা গোষ্ঠী, (3) জাভা ভাষা গোষ্ঠী (4) বোর্ণিও ভাষা গোষ্ঠী (5) বলিদ্বীপীয় এবং সংশ্লিষ্ট ভাষা গোষ্ঠী, (6) গোরোন্তলো ভাষা গোষ্ঠী (7) তোমিনি ভাষা গোষ্ঠী (8) তোরজ ভাষা গোষ্ঠী (9) লয়নাঙ্গ ভাষা গোষ্ঠী এবং বঙ্গাই ভাষারীতি, (10) বুগিনেক ভাষা গোষ্ঠী, (11) দক্ষিণ সিলিবিসের ভাষা গোষ্ঠী, (12) মুন-বুতন (বুতুঙ্গ) ভাষা গোষ্ঠী (13) বিম-সুম্ব ভাষা গোষ্ঠী, (14) অম্বোন-টিমোর ভাষা গোষ্ঠী, (15) সুল ভাষা গোষ্ঠী, (16) দক্ষিণ হালমাহারা ভাষারীতি, এবং সংশ্লিষ্ট ভাষা সমূহ। এই সব ভাষা ও উপভাষার কোন কোনটির উন্নতধরনের সাহিত্য সম্পদও আছে।

অর্থনীতি

আদি পর্বে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অর্থনীতি ছিল স্বয়ম্ভর। পশুশিকার ও মাছ ধরাই ছিল মানুষের প্রধান জীবিকা। পরে বনভূমি পরিষ্কার করে কৃষিকর্মে তারা আত্মনিয়োগ করেছিল। আবাদী জমি তারা প্রায় পালটাত। পরে অবশ্য মধ্যজাভা অঞ্চলে স্থায়ী সেচের মাধ্যমে ধানচাষ তারা শুরু করে। সেচের মাধ্যমে ধানচাষ প্রবর্তনের ফলে হাতিয়ার হিসাবে লাঙলের ব্যবহার শুরু হল, আবার মহিষ ও ষাঁড় জাতীয় গৃহপালিত পশু দৈনন্দিন জীবনে অপরিহার্য হয়ে পড়ল। উৎপাদন বৃদ্ধি পেল, স্থায়ী বসতির বিস্তার ঘটল। যে সব অঞ্চলে সেচ-নির্ভর কৃষি-ব্যবস্থার আয়োজন ছিল, সেখানে সেচ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের জন্য সামাজিক সংহতি এবং রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা গড়ে উঠেছিল।

সভ্যতার বৈশিষ্ট্য

বহিরাগত সভ্যতার সংস্পর্শে আসার অনেক আগে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নিজস্ব সভ্যতার যে পরিচয় আমরা পাই, তাতে চারটি বৈশিষ্ট্য খুব স্পষ্ট : 1. সেচ-নির্ভর ধানচাষ, 2. গৃহপালিত পশুরূপে মহিষ ও ষাঁড়ের ব্যবহার, 3. ধাতুর প্রচলন, 4. নৌবিদ্যায় দক্ষতা। আধ্যাত্মিক জগতেও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নিজস্ব ধারা স্পষ্ট। এই অঞ্চলের মানুষ পূর্বপুরুষদের পূজা করত, উঁচু স্থানে বেদী বা স্তূপ নির্মাণ করে সেখানে অর্ঘ দিত। গাছ, পাথর, পশুপক্ষী পূজারও সাক্ষ্য পাওয়া যায়। পর্বত ও সমুদ্রের মধ্যে দ্বৈত ভাবের ধ্যান ধারণা তাদের বিশ্ববীক্ষায় স্থান পেয়েছিল। যাদুবিদ্যার সঙ্গে জড়িত এক ধরণের রাশিতত্ত্ব তারা জানত। অঞ্চলভেদে এ সব বিশ্বাসের মধ্যে অনেক রদবদল ঘটেছে। হিন্দু, বৌদ্ধ, ইসলাম ও খ্রীষ্ট ধর্মের সংস্পর্শে এ সব বিশ্বাসের অনেক কিছু সংশোধিত হয়েছে। অ সত্ত্বেও একথা নিশ্চিত যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নিজস্ব সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে অদ্যাপি এসব ধ্যান-ধারণা অল্পবিস্তর সক্রিয়। নিছক ভারতবর্ষ চীন ও ইউরোপীয় ইতিহাসের সম্প্রসারিত শাখা হিসাবে নয়, আপন সাংস্কৃতিক প্রভায় দীপ্তিময় অঞ্চল হিসাবেই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইতিহাস বিশেষ মনোযোগ দাবি করে। দেশী বিদেশী কৃষ্টিধারার সম্মিলন ও সংমিশ্রণে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইতিহাসের জটিল, কিন্তু মহামহিম আত্ম পরিচয় গড়ে উঠেছে।

তফসিল

আদি অস্ট্রিক (*Austric*) জাতির ভাষা

(A) এশিয়া-খণ্ডের অস্ট্রিক (*Austro-Asiatic*) শাখা :

প্রশাখা (1) 'মোন্ ও খেমের' (বর্মা, শ্যাম, কম্বোজ); মোই, বাহ্নার, স্তিএঙ্ প্রভৃতি ইন্দোচীনের কতকগুলি ভাষা;

(2) চাম্ বা প্রাচীন চম্পা রাজ্যের ভাষা, আর তৎপর্যায়ের আরও কতকগুলি ভাষা;

(3) মালয় দেশের সাকাই আর সেমাঙ

(4) নিকোবর-দ্বীপের ভাষা;

(5) বর্মার পালোঙ, ওয়া, রিয়াঙ্ ভাষা;

(6) আসামের খাসিয়া;

(7) সাওতাল, মুণ্ডারী, হো, কোরবা, কুরকু, শবর, গদর প্রভৃতি ভারতের 'কোল' শ্রেণীর ভাষা;

(8) প্রাচীন ভারতের অধুনা-লুপ্ত অস্ট্রিক ভাষাবলী—

([illegible]), (6), (7) এই তিন প্রশাখার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত।

(B) দ্বীপপুঞ্জের অস্ট্রিক (*Austronesian*) শাখা :

প্রশাখা (1) ইন্দোনেশীয় ভাষা (মালাই, সুন্দা, যবদ্বীয়, বলিদ্বীপীয়, লম্বক, বাতাক্, সেলেবেসের ভাষা প্রভৃতি);

(2) মেলানেশীয়—ভীত বা ফীজি, নিউ-হিব্রাইডীস্, নিউ-কালিডোনিয়া প্রভৃতি ভাষা;

(3) পলিনেশীয়—সামোআ-তাহিতি তোঙ্গা, হাও-আই-ই, মাওরি প্রভৃতি ভাষা

পাদটীকা

1. Frank N Trager, *Burma From Kingdom to Republic* (New york 1938) p. 280.

2. A. L. Basham (ed.), *The Civilizations of Monsoon Asia* (1938). E. H. G. Dobby, *Monsoon Asia* (London 1938).

3. M. Osborne, *South-East Asia An Introductory History* (London 1938) p. 12.

4. John Bastin & Harry G. Benda, *A History of Modern Southeast Asia* (Prentice-Hall, Inc. N. G. 1938), p. I.

5. H. B. Sarkar, 'A Geographical Introduction to South-East Asia : The Indian Perspective' এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল গবেষণামূলক বিখ্যাত ডচ পত্রিকা *Bijdragen Tot De Taal-, Land-en VolkenKunde* 1938 এ। হিমাংশু ভূষণ সরকার, 'প্রাচীন ভারতের ভৌগোলিক জ্ঞানে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া,' ঐতিহাসিক (মাঘ-বৈশাখ 1938, জানুআরি-এপ্রিল 1938। এই বাংলা প্রবন্ধটিতে লেখক উপরে উল্লিখিত মূল ইংরেজি প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তসার লিপিবদ্ধ করেছেন। এই অধ্যায়ের অনেক তথ্য আমরা ঐ দুই প্রবন্ধ থেকে সংগ্রহ করেছি।

6. জনসংখ্যার এই হিসেব উপরে উল্লিখিত 1938 সালে প্রকাশিত Bastin & Bendaর গ্রন্থে (পৃ I) আছে। 1938 সালের হিসাবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মোট জনসংখ্যা হচ্ছে 330 মিলিয়ণ। এজন্য দেখুন, R. D. Hill (ed.), *South-East Asia : A Systematic Geography* (OUP, Kuala Lumpur 1938) p. 52. বিজ্ঞান ভিত্তিক হিসাবে অনুমান করা হয়েছে যে 1985 সালে এই লোকসংখ্যা বেড়ে দাঁড়াবে 434 মিলিয়ণ। তদেব, পৃ 60.

7. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্র সংগমে দ্বীপময় ভারত ও শ্যাম দেশ (দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা, মে 1938 পৃ, 283—287.

8. হিমাংশু ভূষণ সরকার, দ্বীপময় ভারতের প্রাচীন সাহিত্য (কলিকাতা 1938) পৃ, 2.

(2)

প্রাক্-ইউরোপীয় যুগ

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া—দুইশ বছর পূর্বে

এখন থেকে দু'শ বছর পূর্বে সিঙ্গাপুর, রেঙ্গুন, ব্যাংকক এবং সাইগন—এসব নাম ছিল অজ্ঞাত। ব্যবসা বানিজ্যের কেন্দ্র হিসাবে তখন এগুলি গড়ে ওঠে নি। এগুলি ছিল মৎস্যজীবী অধ্যুষিত নগন্য গ্রাম। অষ্টাদশ শতকে বাটাভিয়া ছিল (আধুনিক জাকার্তা) ব্যস্ত বন্দর। বাটাভিয়ার লোক সংখ্যা ছিল 20 হাজার, ম্যানিলার লোক সংখ্যা ছিল প্রায় তার অর্ধেক। সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার লোকসংখ্যা ছিল 1830 সালে প্রায় 25 মিলিয়ণ। রবার শিল্পের কথা তখনও ছিল অজানা। জাভা থেকে বাংলাদেশে পৌঁছাতে সময় লাগত চর থেকে ছয় সপ্তাহ।

দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় আধুনিক রাষ্ট্রগুলির [ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম (উত্তর এবং দক্ষিণ) ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড, বর্মা, মালয়েশিয়া কাম্বোডিয়া, লাওস এবং সিঙ্গাপুর] মধ্যে তখন মাত্র চারটি রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ছিল, যথা, বর্মা, কাম্বোডিয়া, থাইল্যান্ড (শ্যাম) এবং ভিয়েতনাম (আনাম)। ফিলিপাইন ছিল স্পেনীয় উপনিবেশ। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের দক্ষিণাঞ্চলের মিনাদানাও (Mindanao) এবং সুলু (Sulu) ছিল মুসলমান সুলতান শাসিত দুটি স্বাধীন অঞ্চল। স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসাবে ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া এবং সিঙ্গাপুরের অস্তিত্ব ছিল না। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপময় অঞ্চল ছিল নানা আকারের ছোট ছোট স্বাধীন অঞ্চলে বিভক্ত। এগুলির মধ্যে জাভা ও ইন্দোনেশিয়া দ্বীপপুঞ্জের কয়েকটি অঞ্চলে ওলন্দাজ শক্তি আধিপত্য বিস্তার করেছিল। আধুনিক দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মানচিত্র রূপ নিয়েছে গত দুইশ বছর ধরে। ঐতিহাসিক প্রাচীন রোম সাম্রাজ্যের আমলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে পাশ্চাত্যের সর্বপ্রথম যোগাযোগ ঘটেছিল। মেকং বদ্বীপ, দক্ষিণ ভিয়েতনাম এবং থাইল্যান্ডে রোমক শিল্প নিদর্শন পাওয়া গেছে।[1] ষোড়শ শতকের প্রথম কয়েক দশকে এশিয়ায় পর্তুগাল ও স্পেনের আবির্ভাব ঘটে। তাদের আগমনের একশত বছরের মধ্যে আসে ডেন, ডচ্, ইংরেজ, ফরাসী ও সুইডিস্। কিন্তু অষ্টাদশ শতকের শেষ অবধি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পশ্চিমী

অনুপ্রবেশ বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। প্রচলিত শক্তির ভারসাম্য এবং পরম্পরাগত রাজনৈতিক বিকাশের স্বাভাবিক ধারা ব্যাহত হয় নি। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অর্থনৈতিক কাঠামোর সঙ্গে পশ্চিমী শক্তি অংশীদার হিসাবে যুক্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু উনিশ শতকে ইউরোপীয় শিল্প বিপ্লবের প্রচণ্ড অভিঘাতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মৌলিক রূপান্তর সাধিত হয়। রাজনৈতিক দিক দিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে অনেকে ইউরোপের বলকান অঞ্চলের সঙ্গে তুলনা করে থাকেন। পরস্পর বিবদমান অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র দীর্ঘকাল ধরে এখানে ছিল। একারণে বলকান অঞ্চলের কথা স্বাভাবিক ভাবেই মনে আসে।

সাংস্কৃতিক ঐক্য

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় চারটি বিশ্ব ধর্মের প্রভাব ছড়িয়েছে। বালিদ্বীপে এখনও হিন্দুধর্মের প্রভাব প্রবল। বর্মা, থাইল্যাণ্ড এবং কম্বোডিয়ার 60 মিলিয়ণ জনসংখ্যা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। ভিয়েতনামেও প্রায় 30 মিলিয়ণ বৌদ্ধ আছে। মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার প্রায় I10 মিলিয়ণ মানুষ ইসলাম ধর্মের অনুগামী। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের মানুষ খ্রীষ্টান। ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া এবং ভিয়েতনামে খ্রীষ্টান সংখ্যালঘু সম্প্রদায় আছে। বহিরাগত সাংস্কৃতিক প্রভাবের কথা আমরা যতই বলি না কেন, একথা মানতেই হবে যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একান্ত নিজস্ব সাংস্কৃতিক পরিচয় অবশ্যই ছিল। এই অঞ্চলের যৌথ সত্তার পরিচয় খ্রীষ্টীয় শতকের প্রথম থেকেই স্পষ্ট। আগেই বলা হয়েছে, এই অঞ্চলকে আরবরা বলত জবজ/জবগ; চীনারা বলত 'নানিয়াং' আর ভারতীয়রা বলত সুবর্ণভূমি/সুবর্ণদ্বীপ। G. Coedes দেখিয়েছেন (Les E Tats Mindouises d' Indo et d' Indonesie) যে সেচ জমিতে ধান্য চাষ, গৃহপালিত পশু হিসাবে ষাড় ও মহিষের ব্যবহার, ধাতুর প্রচলন, নৌবিদ্যায় দক্ষতা, মাতৃতান্ত্রিক সমাজ, নারীদের উচ্চ সামাজিক মর্যাদা, সর্বপ্রাণবাদ (animism), পূর্বপুরুষ পূজা ও উচ্চস্থানে ধর্মীয় বেদী নির্মাণ ইত্যাদি ছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নিজস্ব সাংস্কৃতিক জীবনে বিচিত্র লক্ষণ সমষ্টি। R. O. Winstedt এর মতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নেগ্রিটো, ইন্দোনেশীয় ও মোঙ্গোলীয় রক্তের সংমিশ্রণে সৃষ্ট এক জাতি; এক ভাষা-গোষ্ঠী; দেব-রাজা;? রাশি সম্বন্ধে শ্রদ্ধাবোধ; মন্ত্রোচ্চারণ; ব্রোঞ্জ ও বস্ত্রের প্রচলন। D. G. E. Hall বলেছেন যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সব দেশেই নারীদের উচ্চ সামাজিক মর্যাদা স্বীকৃত। এই [illegible]

Krom এর মতে ছায়া নাটক (*Wayang Kulit*), *Gamelan* অর্কেষ্ট্রা এবং বাটিক শিল্প ছিল ইন্দোনেশিয়ার সাংস্কৃতিক পরিচয়ের প্রধান অঙ্গ। উন্নত সমাজ সংগঠন এবং প্রযুক্তি বিদ্যায় নৈপুন্য ছাড়া এই ধরণের উচ্চমানের সাংস্কৃতিক বিকাশ সম্ভব নয়।2

রাষ্ট্রব্যবস্থা

ধানচাষ ও নৌবিদ্যায় পারদর্শিতা এই অঞ্চলের রাজ্যগুলির শাসন কাঠামোর গঠন প্রকৃতি নির্ণয় করেছে। নদীবিধৌত সমতল ভূমির মানুষ চাষের জন্য জল নিয়ন্ত্রণের কাজে যৌথভাবে অংশ নিয়েছে। এই ভাবেই ভূমিভিত্তিক কৃষিনির্ভর রাজ্য গড়ে উঠেছে। কেন্দ্রীভূত শাসন কাঠামোতে আমলা বাহিনী পরিচালিত এবং স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র শাসিত ছিল এই রাজ্যগুলি। নিম্ন বর্মাতে এবং মেনাম ছাও ফ্রায়া উপত্যকায় মোন রাজ্যগুলিতে এই ধরণের শাসন কাঠামো ছিল। টংকিঙের লাল ও কালো নদীতে বর্ষার জল বাঁধের বন্ধনে আবদ্ধ করতে গিয়ে সেখানকার মানুষ সৃষ্টি করেছে ভিয়েৎ-নামের দৃঢ় সমাজব্যবস্থা। সোলো এবং ব্রাণটাস উপত্যকায় আবির্ভূত হয়েছে মতরাম, কাদিরি, জঙ্গলে, সিংহসারি ও মজপহিত সাম্রাজ্যগুলি। মেকং বদ্বীপ ও মেনাম ছাও ফ্রায়া উপত্যকায় আঙ্কোর জেলায় সাত শতক ধরে রাজত্ব করেছিল খেমের (কাম্বোডীয়) সাম্রাজ্য।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাণিজ্যভিত্তিক রাজ্যগুলির অবস্থান ছিল নাব সমুদ্রতীরে বিখ্যাত পূর্ব-পশ্চিম বাণিজ্যের পথে। এই বাণিজ্য পথ ছিল মৌসুমী বায়ু প্রভাবিত। মৌসুমী বায়ু দুটি পথে প্রবাহিত হত, দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী—জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত, উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ু—অক্টোবর থেকে মার্চ পর্যন্ত। অঞ্চল বিশেষে এই বায়ু প্রবাহে কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটত। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মূল ভূখন্ড এবং দ্বীপময় অঞ্চল পূর্ব-পশ্চিমে সোজাসুজি জাহাজ চলাচলের পথে বাধা স্বরূপ ছিল। এই কারণে বণিক নাবিকদের এখানে বিপরীতমুখী মৌসুমী বায়ুর অপেক্ষায় জাহাজ থামাতে হত। স্বাভাবিক কারণেই উভয় দিক থেকে আগত বণিকদের পণ্য বিনিময়ের মিলনক্ষেত্র ছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া। এই ধরণের প্রয়োজনে যে সব রাজ্য গড়ে উঠেছিল সেগুলি হল মালাক্কা প্রণালীর সুমাত্রার দিকে অবস্থিত পালেমবাঙের শ্রীবিজয় রাজ্য, মালাক্কা, সুন্দা প্রণালীতে অবস্থিত বানটম; উত্তর জাভার বন্দর রাজ্যগুলি, উত্তর বোর্ণিওতে ব্রুণি এবং দক্ষিণ সেলেবেসে ম্যাকাসার। রাজ্যগুলির উত্থান পতন নির্ভর করত বাণিজ্যপথ

নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার উপর। এই সব রাজ্যের শাসন ক্ষমতা ছিল সামন্ত শ্রেণীর হাতে। সামন্ত শ্রেণীর হাতেই ছিল গোলমরিচ, চাউল ও মশলার একচেটিয়া কারবার। বাণিজ্যিক আধিপত্য তারা বজায় রাখত নৌবল দিয়ে, একচেটিয়া অধিকার প্রয়োগ করে বা জলদস্যুতা করে। জলদস্যুতা ছিল এশীয় বাণিজ্যের স্বাভাবিক ধর্ম।3

এই দুই ধরণের রাষ্ট্র ব্যবস্থার মাঝামাঝি আব এক ধরণের রাজ্য ছিল। এগুলির রাষ্ট্রিক ও সামাজিক বিকাশ ছিল নানা স্তরে। এগুলি ছিল স্বয়ম্ভর কিন্তু শক্তিশালী প্রতিবেশীদের দ্বারা অল্পবিস্তর প্রভাবিত। রাজ্যগুলি হল লঙ্কাশুক, পান-পান এবং তাম্ব্রালিঙ্গ। পরে ফুনান বা শ্রীবিজয় রাজ্যের কবলিত হয়েছিল এই রাজ্যগুলি। সুমাত্রা ও মালয় উপ-দ্বীপের রাজ্যগুলিও ছিল এই শ্রেণীভুক্ত। চতুর্দশ শতকে মজপহিত, পঞ্চদশ শতকে মালাক্কা এবং ষোড়শ শতকে আচে ও বানটামের অধিকারভুক্ত হয়েছিল এই রাজ্যগুলি। তাছাড়া বোর্ণিওর উপকূলে এবং ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জেও গড়ে উঠেছিল এই ধরণের প্রান্তিক সমাজ। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দূরতম অঞ্চলে বাস করত প্রাচীন আদিবাসী। তাদের সঙ্গে বহির্জগতের সম্পর্ক ছিল ক্ষীণ ও ক্ষণস্থায়ী। তাদের নিজস্ব স্বতন্ত্র জীবন ধারায় কোন পরিবর্তন আসে নি বললেই চলে।

ভারতীয় সভ্যতার প্রভাব

সাংস্কৃতিক সাঙ্গীকরণে সামুদ্রিক বাণিজ্যের ভূমিকা ছিল অপরিমেয়। বাণিজ্য ছিল রূপান্তরের বাহন। বাণিজ্যলব্ধ মূলধন সামন্ত শ্রেণীব হাতে সঞ্চিত হয়ে অর্থনৈতিক ও সামাজিক রূপান্তরেব পথ প্রশস্ত করেছিল। বহিরাগত সংস্কৃতির প্রভাবে আঞ্চলিক সংস্কৃতি পুষ্টিলাভ করেছিল। ভারতীয় সভ্যতার সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যোগাযোগ ঘটে সর্বপ্রথম খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে এবং দ্বাদশ শতকের শেষ পর্যন্ত তা অব্যাহত ছিল। এই তের শত বছরের মধ্যে প্রথম ঐতিহাসিক রাষ্ট্রগুলি এবং প্রথম সাম্রাজ্যগুলি আবির্ভূত হয়েছিল। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে সীমিত ছিল। রাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণা, আইনানুশাসন, সাহিত্য ও পৌরাণিক কাহিনী সব কিছুই ছিল অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে আবদ্ধ। হিন্দু ও বৌদ্ধ প্রভাব উপকূলবর্তী বাণিজ্য কেন্দ্রে নয়, দেশের সুদূর অভ্যন্তরে রাজশক্তির লীলাভূমিতে প্রসারিত হয়েছিল। ভারত থেকে "দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে বিজয় অভিযান প্রেরিত হয়েছিল" এমন কোন সাক্ষ্য প্রমাণ ভারত-

বর্ষে পাওয়া যায় না। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অধিবাসীদের মধ্যে ভারতীয় রক্তের ব্যাপক সংমিশ্রণ ঘটেছে, এমন প্রমাণও পাওয়া যায় নি। সামরিক অভিযান ও বাণিজ্যিক লেনদেনের মধ্য দিয়েই ভারতীয় সভ্যতার বিস্তার ঘটেছে, তাও মনে করার কোন কারণ নেই। অনুমান করা হয়, স্থানীয় শাসক-বর্গের উদ্যোগে ভারতীয় সভ্যতার প্রসার ঘটেছিল। রাজসভায় তাঁরা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও পুরোহিতদের আমন্ত্রণ জানাতেন। সেখানে শিল্পী, কারিগর এবং ভ্যাগ্যান্বেষী সৈন্যও এসে হাজির হত। একাদশ শতকের চোল অভিযান এবং সপ্তদশ শতকে আরকান অঞ্চলে বাংলার হস্তক্ষেপের উদাহরণ বাদ দিলে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাজনীতিতে ভারতবর্ষের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের আর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

চৈনিক সভ্যতার প্রভাব

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় চীনের সাংস্কৃতিক প্রভাব শুধুমাত্র ভিয়েতনামেই সীমিত ছিল। কিন্তু চীনের রাজনৈতিক প্রভাব ছিল সুদূর বিস্তৃত। ভিয়েতনাম চীনের কুক্ষিগত হবার পর থেকেই সেখানে চৈনিক সভ্যতার প্রসার ঘটেছে। কিন্তু চীনের গ্রাস থেকে মুক্তি অর্জনের পরও চৈনিক সভ্যতার প্রভাব অক্ষুণ্ণ থেকেছে। এর সম্ভাব্য কারণ হচ্ছে যে শাসন সংগঠনে ভিয়েতনামের নিজস্ব কোন ঐতিহ্য ছিল না। তাই সেখানে ক্ষমতাসীন শাসকগোষ্ঠী রাজনৈতিক ক্ষমতা করায়ত্ত রাখার জন্য চীনের রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠন কাঠামো গ্রহণ করেছিল। সুদূর অতীতের নানা বিবরণ থেকে জানা গেছে যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে চীনের রাজদরবারে দূত প্রেরিত হয়েছিল। অনুরূপ দূত ভারতবর্ষে প্রেরিত হয়নি বললেই চলে। খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকে চীনের পরিব্রাজকরা ফু-নানের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন। সপ্তম শতকে চৈনিক তীর্থ যাত্রী শ্রীবিজয় সাম্রাজ্যের রাজধানীতে বিদ্যাচর্চা করেছেন। মোঙ্গলদের পরিচালনাধীন চৈনিক সেনাবাহিনী পাগান রাজ্য ধ্বংস করেছে এবং ত্রয়োদশ শতকে এক যবদ্বীপীয় রাজবংশকে সিংহাসনচ্যুত করেছে। রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক যোগাযোগের মধ্য দিয়ে চীন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ঘটনাপ্রবাহকে প্রভাবান্বিত করেছে। তাছাড়া গত দু'শ বছর ধরে অগণিত চীনা এই অঞ্চলের দেশগুলিতে অনুপ্রবেশ করেছে। বিভিন্ন দেশে অনুপ্রবিষ্ট চীনা জনগোষ্ঠীর ভূমিকা উপেক্ষণীয় নয়।

ইসলাম ধর্মের প্রসার

দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকে দুটি ধর্মমতের প্রভাবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইতিহাস বিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত হয়। সিংহল থেকে আসে হীনযান বৌদ্ধ ধর্মের এবং গুজরাট থেকে আসে ইসলাম ধর্মের প্রবাহ। **Tate** এর মতে ও উভয় ধর্মের আবেদন সাধারণ মানুষকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও মহাযান বৌদ্ধ ধর্মমতের চেয়ে এই দুটি ধর্মমত অধিকতর জনপ্রিয় হয়েছিল। মুসলমান বণিকরা অনেকদিন থেকেই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বাণিজ্য উপলক্ষে যাতায়াত করত। কিন্তু ইসলাম ধর্মের প্রসার শুধুমাত্র বণিকদের মাধ্যমে ঘটেনি। বিশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতির দরুণ ইসলামের ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল। ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতকে স্থানীয় শাসকগোষ্ঠীর হাতে ইসলাম ধর্ম ছিল এক বিশেষ অস্ত্র। হিন্দু বা চীনা বণিক বা হিন্দু সামন্ত প্রভুর বিরুদ্ধে এই অস্ত্র প্রয়োগ করা হত। ভারতে মুসলমান রাজবংশ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা অর্জন করার পর ইসলাম ধর্ম বিশেষ মর্যাদা ও প্রতিপত্তি অর্জন করেছিল। মালাক্কা বন্দরে আপন প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা কামনায় মালাক্কার শাসক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। উত্তর জাভার বন্দর রাজ্যগুলির শাসককুল হিন্দু মজপাহিত সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। সেলেবেস ও মালাক্কার ইউরোপের খ্রীষ্টান শক্তিগুলির বিরুদ্ধে সমর্থন লাভের আশায় স্থানীয় উচ্চ শ্রেণীর মানুষ ইসলাম ধর্মকে আঁকড়ে ধরে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সাধারণ মানুষের কাছে ইসলামের মর্মবাণী সহজবোধ্য ও সহজগ্রাহ্য মনে হয়েছিল। বণিকদের কাছে ইসলামের সহজ ও স্বাভাবিক আবেদন ছিল। হিন্দু ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রভাব ছড়িয়েছিল দেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত রাজসভায়। ইসলামী সভ্যতার কেন্দ্র ছিল বন্দর। অদ্যাপি তাই।

খ্রীষ্টীয় সপ্তম ও অষ্টম শতকে ক্যানটন বন্দরে আরব বণিকদের একটি শক্তিশালী উপনিবেশ ছিল। চীনা সূত্র থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে দ্বাদশ শতকে ভারতবর্ষ ও চীনের মধ্যে পরিবহন বাণিজ্যে (**carrying trade**) আরব বণিকদের প্রাধান্য ছিল। চম্পার একটি একাদশ শতকের শিলালিপিতে দ্বীপময় অঞ্চলে ইসলামের উল্লেখ পাওয়া যায়। **1082** সালের লেরান লিপি (**Leran Inscription**) থেকে জাভায় ইসলামের উল্লেখ জানতে পারি।[8] মালাক্কার প্রতিষ্ঠার অন্তত পঞ্চাশ বছর আগে মজমহিতে মুসলমান অধিবাসী এবং মালয় উপদ্বীপে মুসলমান শাসনের কথা জানতে পারি। ত্রয়োদশ শতকের শেষে রাষ্ট্রশক্তি হিসাবে ইসলামের আবির্ভাবের কথা লেখেন ইউরোপীয় পর্যটকরা। **1292** সালে চীন থেকে মালাক্কা প্রণালী হয়ে ফেরার

পথে উত্তর সুমাত্রার পার্লাকে মার্কো পোলোরা ইসলামের উপস্থিতির কথা বলেছেন। প্রায় একশ বছর পরে উত্তর সুমাত্রা থেকে ইসলাম মালাক্কাতে উপস্থিত হয়। মালাক্কা থেকে এই ধর্মমত সমস্ত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। মালাক্কা থেকে মালয় উপদ্বীপ, সেখান থেকে সুমাত্রার পূর্ব উপকূলে এবং সেখান থেকে বাণিজ্যপথ বরাবর দক্ষিণ দিকে এবং পূর্ব দিকে। পঞ্চদশ শতকের শেষাশেষি মালয় উপদ্বীপ, সুমাত্রা, জাভার উত্তর উপকূল, উত্তর বোর্ণিওতে ব্রুণি, মলুক্কা এবং সুলু উপদ্বীপে ইসলাম প্রতিষ্ঠা লাভ করে।5

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এই পটভূমিকায় ইউরোপীয় শক্তিবর্গের আবির্ভাব ঘটেছিল। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে ভৌগোলিক আবিষ্কারের নেশায় প্রমত্ত হয়ে এই অঞ্চলে তারা পৌঁছায়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় উন্নত, সমৃদ্ধ ও সুসংগঠিত সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল তাদের দৃষ্টিগোচব হয়। একটি প্রাচীন, জটিল ও সুপ্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যবস্থা দক্ষিণপূর্ব এশিয়াকে বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত করে রেখেছিল।

বাণিজ্যের গতিপ্রকৃতি

বাণিজ্যপথ ধরে বিদেশাগত সংস্কৃতির ধাবা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অনুপ্রবেশ করেছে। বিদেশীরা নিয়ে এসেছে তাদের প্রযুক্তিবিদ্যার নৈপুন্য, আপন আপন সমাজের মূল্যবোধ ও জীবনাচরণ। প্রাক-শিল্প বিপ্লব অর্থ-নৈতিক যুগের বাণিজ্যের কাঠামোর সঙ্গে আধুনিক শিল্প-বিপ্লবোত্তর বাণিজ্যের কোন মিলই নেই। সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া জুড়ে তখন ছিল অগণিত স্বয়ম্ভর গ্রাম। বাণিজ্যের উপকরণ ছিল স্বল্প পরিমাণ দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান জিনিস; যথা সোনার তৈরী সামগ্রী, জায়ফল, জৈত্রী, লবঙ্গ, চন্দন কাঠ, গোলমরিচ, রেশম, এবং চীনামাটির জিনিস। এক বাজার থেকে অন্য বাজারে এগুলি কেনাবেচা হত। তখন বাণিজ্যে অংশ নিত এখনকাব তুলনায় অল্প সংখ্যক বণিক। শুধুমাত্র শাসক শ্রেণীভুক্ত উচ্চকুলের অভিজাত মানুষের মধ্যে ঐসব জিনিসের সমাদর ছিল। এই বাণিজ্যে সমাজের সাধারণ মানুষ, কৃষক ও মৎসজীবী শ্রেণী অংশ নিত না, তাদের আগ্রহও ছিল না।

1930-এব দশকে **Van Leur** লিখেছিলেন যে ওলন্দাজ ঔপনিবেশিক ইতিহাসের প্রশাখারূপে ইন্দোনেশিয়ার ইতিহাসকে বিচার করা সঙ্গত নয়। **Van Leur**-এর দৃষ্টিতে এশিয়ার ইতিহাস হচ্ছে প্রাচীন ও সনাতন পৃথিবীর অন্তর্গত। ইন্দোনেশিয়ার ইতিহাস আপন স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল।

এর নিজস্ব চর্চার প্রাঙ্গন স্বাতন্ত্র্য মণ্ডিত। এশিয়ায় প্রাচীন সমাজ অষ্টাদশ শতকের শেষ পর্যন্ত অপরিবর্তিত ছিল। সপ্তদশ শতকের প্রথম দিকের ওলন্দাজ তথ্য থেকে সাক্ষ্য সংগ্রহ করে Van Leur দেখিয়েছেন যে এশীয় বাণিজ্যে ভারতীয় বণিকদের প্রাধান্য ছিল প্রতিষ্ঠিত। উনিশ শতক পর্যন্ত এশীয় বাণিজ্য তুলনামূলকভাবে ইউরোপীয়দের ভূমিকা ছিল নিষ্প্রভ, এ সত্য তিনি আমাদের গোচরীভূত করেছেন। তিনি এশীয় বাণিজ্যের গুরুত্ব সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন এবং এই বাণিজ্যে ইউরোপীয় শক্তিবর্গের ভূমিকা লঘু করে দেখিয়েছেন। অন্যদিকে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন এশীয় সামুদ্রিক বাণিজ্যে উনিশ শতকের আগে কোন লক্ষ্যণীয় পরিবর্তন আসে নি, এশিয়ার বণিকরা ছিল মূলত ফেরিওয়ালা এবং বাণিজ্যের উপকরণ ছিল মুখ্যত বিলাস সামগ্রী। এশিয়ার উপকূলবর্তী সমাজের রাজনৈতিক দিক দিয়ে ক্ষমতাশালী সামন্তপ্রভুদের নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ ছিল এশীয় বাণিজ্যে। বণিকদের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল না। তারা শুধু হাটে বাজারে পণ্য ফেরি করে বেড়াত। বাণিজ্যের পরিমাণ কখনও বেড়েছে, কখনও কমেছে। এছাড়া এশীয় বাণিজ্যের গতি প্রকৃতিতে অন্য কোন ধরণের রূপান্তর ঘটে নি। উনিশ শতকে এশীয় বাণিজ্যে ইউরোপীয় মূলধনের অনুপ্রবেশ শুরু হয়। তখন থেকেই ঔপনিবেশিকতা স্পষ্টতই এশীয় বাণিজ্য প্রবাহের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু শুধুমাত্র বিলাস সামগ্রীর মধ্যেই বাণিজ্য সীমিত ছিল, Van Leur-এর এই সিদ্ধান্ত পরবর্তী গবেষণায় ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে।

ভারতের সামুদ্রিক বাণিজ্যে বিলাস সামগ্রীর বিশেষ ভূমিকা ছিল। বাংলার সূক্ষ্ম মসলিন, বা গুজরাটের সোনার কাজ করা এমব্রয়ডারি এবং কোরোমোণ্ডল উপকূলের মহামূল্য বস্ত্র কিনতেন ভারত ও এশিয়ার রাজা, রাজকুমার ও সামন্তবর্গ। কিন্তু বস্ত্র বাণিজ্যের অধিকাংশই ছিল মোটা, সস্তা কাপড় এবং এসব কিনতেন একান্তভাবেই সাধারণ মানুষ। অধ্যাপক C. R. Boxer এবং অধ্যাপক Meilink Roelofsz-এর গবেষণা থেকে আমরা জেনেছি যে ইন্দোনেশিয়া থেকে যে সব মশলা ভারতীয় বণিকরা কিনত, সেগুলি হয়ত অন্যত্র বিলাস সামগ্রী মনে হতে পারে, কিন্তু বিনিময়ে ভারতীয় বণিকরা যে বস্ত্র বিক্রি করত, তা কিন্তু ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জের সাধারণ মানুষের ব্যবহারে লাগত। পঞ্চদশ শতক নাগাদ মশলা দ্বীপপুঞ্জের মানুষ সামুদ্রিক বাণিজ্যের উপর এত বেশী নির্ভর করতে শিখেছিল যে তারা শস্য চাষ এবং ঘরে ঘরে কাপড় বোনা প্রায় ভুলেছিল। জাভা থেকে তাদের খাদ্য আসত, ভারতবর্ষ থেকে কাপড় এবং চীন থেকে লবণ। শুধুমাত্র বিলাস সামগ্রীই এশীয় বাণিজ্যের উপকরণ ছিল, একথা মেনে নিলে এও স্বীকার

করতে হবে যে উৎপাদকরূপেই হোক, বা ক্রেতারূপেই হোক, সমাজের অতি অল্প অংশই বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত ছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক গবেষণায় আরও জানা গেছে যে অগনিত সাধারণ মানুষ পণ্য উৎপাদন, কাপড় বোনা এবং এসব কেনাকাটার সঙ্গে যুক্ত ছিল। আবার এও মনে হওয়া স্বাভাবিক যে বিলাস সামগ্রী নির্ভর বাণিজ্য নিশ্চয়ই অবিরাম ও নিরবচ্ছিন্ন ছিল না, মাঝে মাঝেই তা স্থগিত থাকত, কারণ সোনা ও সুগন্ধ দ্রব্য মানুষের নিত্য প্রয়োজনে লাগে না। কিন্তু পঞ্চদশ শতক ও তারও আগে জাহাজ যাতায়াতের যে নিখুঁত খুঁটিনাটি বিবরণ পাওয়া যায়, তা থেকে এটা স্পষ্ট এশীয় বাণিজ্যের প্রবাহ ছিল অবিরাম ও নিরবচ্ছিন্ন।6

একথা মনে করার কোন কারণ নেই যে বাণিজ্যপথ অনুসরণ করে যে বহিরাগত সাংস্কৃতিক প্রভাব প্রবাহিত হয়েছিল, তার বহক ছিল বণিক শ্রেণী। বন্দরে বন্দরে যে সব বণিকের আগমন ঘটত তারা সংখ্যায় ছিল অল্প। তাদের সমাজ ছিল আত্মনিমগ্ন। বন্দর নগরে তাদের নিজস্ব বাসগৃহ ছিল। তাদের নিয়ন্ত্রণ করত দলীয় অধিপতি। শুধুমাত্র বাজারের মধ্যেই তাদের চলাফেরা সীমিত ছিল। তাদের যোগাযোগ ছিল শুধুমাত্র বণিক ও রাজপুরুষদের সঙ্গে। অভিজাতদের রুচি ও প্রয়োজন অনুযায়ী বাণিজ্যের গতিপ্রকৃতি নির্ধারিত হত। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় সভ্যতার স্বরূপ উপলব্ধি করতে হলে এই পটভূমি স্মর্তব্য। হিন্দু ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রভাব অভিজাত শ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল! শাসন কাঠামো গঠনে এই প্রভাব ছিল কার্যকর। কিন্তু অনেকের ধারণা, সাধারণ মানুষের জীবন যাত্রায় ও সংস্কৃতি চর্চায়, ভারতীয় সভ্যতার প্রভাব ছিল না বললেই চলে।7

পাদটীকা

1. M. Wheeler, *Rome beyond the Imperial Frontiers* (London 1955)
2. V. Purcell, *South and East Asia since* 1800, (Cambridge 1965) pp 2-4.
3. 'Plundering fits completely into the historical picture of peddling trade on the one hand and on the other royal authority with personal trade, occasional trade, monopoly and naval power all for the benefit of the king's own treasury.' J. C. Van Leur, *Indonesian Trade and Society*, (The Hague 1955) p 359.
4. D. G. M. Tate, *The Making of Modern Southeast Asia* Vol I., (OUP 1971) p 33.

1951 সালে G. E. Morrison লিখেছিলেন যে ইসলাম ধর্ম ইন্দোনেশিয়ায় পৌঁছেচে ভারতবর্ষের কোরোমণ্ডল উপকূল থেকে। ('The Coming of Islam to the East Indies' *Journal of the Malayan Branch of the Royal Asiatic Society,* Vol 24. No. 154 February 1951) 1963 সালে S. Q. Fatimi এই মত প্রকাশ করেন যে বাংলা অঞ্চল থেকেই সেখানে ইসলাম ধর্ম গেছে। (*Islam Comes to Malaysia,* Singapore 1963) 1968 সালে G. W. I. Drewes কোরোমণ্ডল উপকূল তত্ত্বকে সমর্থন জানান। (New Light on the Coming of Islam to Indonesia ? *Bidrajen tot de Taal*—Vol 124. 1968) 1969 সালে Naghib Al Attas লেখেন যে সম্ভবত নবম শতকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইসলামের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। আরব বা আরবপারসিক ধর্মপ্রচারকদের দ্বারা এই অঞ্চলে ইসলাম ধর্ম প্রচারিত হয়েছে। তাঁরা হয় সরাসরি এসেছেন বা চীন ঘুরে এখানে পৌঁছেছেন। (*Preliminary Statement on a General Theory of the Islamization of the Malay-Indonesian Archipelago,* Kuala Lumpur 1969) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এবং বিশেষ করে ইন্দোনেশিয়া মালয়েশিয়া অঞ্চলে ইসলাম ধর্মের প্রসারে—বাংলা, গুজরাট, দক্ষিণ ভারত ও আরব—এগুলির মধ্যে ঠিক কোন অঞ্চলের দাবি অগ্রগণ্য, তা নিয়ে বিতর্ক আছে এবং থাকবেও। এই প্রসঙ্গে S. Q. Fatimi-র একটি উক্তি বিশেষ প্রণিধেয়। 'The privilege of being the pioneers in propagating Islam to the people in this part of the world is not the mono-

poly of any one Muslim Community.' (p. 35) আগ্রহী পাঠকের জন্য এখানে প্রসঙ্গত দু'টি প্রবন্ধ উল্লেখ করছি।

i. Uka Tjandrasasmita, 'The Sea Trade of the Moslems to the Eastern Countries and the Rise of Islam in Indonesia.'

ii. U. Ba Shin, 'Coming of Islam to Burma, down to A. D. 1700.'

এই দু'টি প্রবন্ধই স্থান পেয়েছে *Studies in Asian History* (Indian Council for Cultural Relations, Asia Publishing House 1969) সংকলন গ্রন্থে।

5. দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রধান অঞ্চলগুলিতে ইসলাম ধর্মের অনুপ্রবেশের কালপঞ্জী ঃ মালাক্কা 1404 -25, উত্তর জাভা 1415—30, ব্রুণি 1425—50, মলুক্কা আঃ 1450, সুলু 1450—75, বনজারমসিন আঃ 1550, মাকাসার আঃ 1600. D. J. M. Tate, *op. cit.*, পৃ 33.

6. Van Leur এর সমালোচনা করে যে বক্তব্য এখানে পরিবেশিত হয়েছে, সে প্রসঙ্গে কিছু মতামতের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 1974 সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের অধিবেশনে মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষ বিভাগের সভাপতি ছিলেন অধ্যাপক অশীন দাশগুপ্ত। তাঁর ভাষণের বিষয়বস্তু ছিল The Maritime Merchant, c 1500-1800. প্রাসঙ্গিক প্রশ্নে এই ভাষণ বিশেষ প্রণিধেয়। 1982 সালে প্রকাশিত ভারত মহাসাগরে ভারতীয় বণিক ও বাণিজ্য বিষয়ে একটি প্রবন্ধে তিনি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাজারে ভারতীয় রপ্তানির তিনটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন। এখানে তা উদ্ধৃত করছি।

'Of India's exports to the markets of the Indian Ocean three points are worth noting. First, as to India's major export, which was textiles throughout our period, the mass of it was of the coarser kind. In Indonesia as well as the Red Sea, it was the commoner people who were the overwhelming majority of India's customers and the more expensive varieties did not sell well.

Secondly, India exported common foods like rice and pulses, wheat and oil for which there was considerable

demand....The picture that emerges from these considerations is one which emphasizes bulk trading in goods of the cheaper kind, and also one which underlines necessities rather than luxuries.

Thirdly, the pattern of Indian exports like most other things with which we are concerned, appears to have remained stable throughout the period. Besides the items we have already considered, Bengal exported sugar and raw silk, Gujrat exported raw cotton, while Malabar sent out its pepper to the markets in the Indian Ocean. Indigo was exported from Bengal and Coromandel as well as Gujarat...An important development during our period was that of Indian merchants losing the carrying trade in the major spices in the Indian Ocean. The importance of textiles thus came to be heavily underlined in the seventeenth century. (A Dasgupta, 'Indian Merchant and Trade in Indian Ocean,' *The Cambridge Economic History of India.* Vol I, c. 1200-c. 1750 Cambridge 1982) pp. 413-416.

1981 সালে মগধ বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের অধিবেশনে মধ্যযুগীয় ভারত বিভাগে সভাপতির ভাষণ দেন অধ্যাপক ওম প্রকাশ। তাঁর ভাষণের বিষয় ছিল, 'Some Aspects of Trade in Mughal India.' এই ভাষণে তিনি মন্তব্য করেছেন, 'Both in southeast Asia as well as in the middle east, it was the coarse cotton varieties that constituted the bulk of the demand for Indian textiles. Indeed, the proportion of coarse cotton in the total textile trade seems to have been much larger in India's foreign trade than in the inter-regional trade within the sub-continent. Goods of mass consumption dominated exports rendering trade of immediate relevance and concern to a multitude of ordinary consumers in several parts of Asia. Incidentally, such a composition of the export trade from India would seem to put in grave doubt the validity of Jacob Van Leur's characterization of Asian trade as consisting largely of trade in luxury goods.'

৭. দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় প্রভাব বিষয়টি খুবই বিতর্কমূলক। দ্বীপাঞ্চলে ভারতীয় প্রভাবকে Van Leur বলেছেন, **'Thin easily flaking glaze on the massive body of indigenous civilization.'** *Indonesian Trade and Society* p. 169.

ভারতীয় প্রভাবের ব্যাপকতা নিয়ে আলোচনা করেছেন H. G. Q. Wales তাঁর *The Making of Greater India* (London 1952) এবং *The Indianization of China and Southeast Asia* (London 1967) গ্রন্থদ্বয়ে।

The Indianized States of South East Asia **(1968)** গ্রন্থে G. Coedes লিখেছেন, 'Culturally speaking Farther India to-day is characterized by more or less deep traces of Indianization that occured long ago : the importance of the Sanskrit element in the vocabulary of the languages spoken there; the Indian origin of the alphabets with which those languages have been or still are written; the influence of Indian law and administrative organisation; the persistence of certain Brahmanic traditions in the countries converted to Islam as well as those converted to Singalese Buddhism; and the presence of ancient monuments which in architecture and sculpture, are associated with the arts of India and bear inscriptions in Sanskrit. The expansion of Indian civilization...is one of the outstanding events in the history of the world, one which has determined the destiny of a good portion of mankind.'

‖ 3 ‖

মালয় ইতিহাসের উপকরণ

মালয়-ইন্দোনেশিয়ার পরিচয়

মালয় কথাটি তিন অর্থে ব্যবহৃত হয়ঃ (i) স্বতন্ত্র জাতি (race অর্থে), (ii) একই মূল জাতি (basic ethnic stock অর্থে) অধ্যুষিত অঞ্চলের মানুষ, এবং (iii) মালাই ভাষাভাষী লোক। বহু ক্ষেত্রেই মালয়েশীয় ও ইন্দোনেশীয় সমার্থক মনে করা হয়েছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভূখণ্ড ও দ্বীপপুঞ্জ অঞ্চলের সমজাতীয় (ethnically related অর্থে) মানুষকে কখনও মালয়েশীয় বলা হয়েছে, কখনও ইন্দোনেশীয় বলা হয়েছে। Emerson প্রমুখ লেখকরা মালয়েশীয় শব্দটির প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছেন। ভৌগোলিক অর্থে এক সময় ইন্দোনেশিয়া ও মালয় উপদ্বীপকে একত্রে মালয়েশিয়া রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে।

মালাইরা নিজেদের দেশকে বলে তনা মেলয়ু (Tanah Melayu) বা মালয়ভূমির অন্তর্গত। ঠিক কবে থেকে মালয় কথাটি প্রচলিত হয়েছে তা তর্কসাপেক্ষ। 1806 সালে প্রকাশিত Leyden এর *Dirge of the Departed Year* এবং 1857 সালে প্রকাশিত Captain Sherard Osborn লিখিত *Quedah* গ্রন্থে মালয় নামের উল্লেখ আছে। Sir Richard Winstedt লিখিত *Malay and its history* গ্রন্থে এই তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। 1963 সালের 16 সেপ্টেম্বর মালয়েশিয়ার ফেডারেশন [মালয় ফেডারেশন, সিঙ্গাপুর, সারাবাক এবং সাবা (উত্তর বোর্ণিও) নিয়ে গঠিত] প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকেই অবশ্য মালয়েশিয়া কথাটির ব্যাপক প্রচলন শুরু হয়েছে।

ইন্দোনেশিয়া কথাটিও মূলত একটি ভৌগোলিক পরিচয়জ্ঞাপক শব্দ। অস্ট্রেলিয়া এবং এশিয়ার মধ্যে অবস্থিত যাবতীয় দ্বীপপুঞ্জ বোঝাতে 'ইন্দোনেশিয়া' কথাটি ব্যবহার করা হত। এখন যে অঞ্চলে ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত, সেই অঞ্চল অতীতে নুশানতারা (Nusantara) নামেও পরিচিত ছিল। এর মূল অর্থ হচ্ছে অন্য দ্বীপপুঞ্জ, অর্থাৎ বালি ও জাভা থেকে দৃশ্যমান দ্বীপপুঞ্জ। [illegible] গ্রন্থে এই

অর্থেই কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে। ওলন্দাজ পুরাতত্ত্ববিদ **Brandes** কথাটির পুনঃ প্রচলন শুরু করেন। বর্তমান শতকের বিশেষ দশকে **E. F. Douwes Dekkar** ইন্দোনেশিয়ার পরিবর্তে নুশানতরা চালু করেন। ইন্দোনেশিয়া ডচ্ সরকারী দলিলপত্রে **Nederlandsch Indie** নামে পরিচিত। এই কথার অর্থ হচ্ছে ডচেদের ভারত। গত শতাব্দীর ষাটের দশকে ডচ পণ্ডিত **Douwes Dekkar** এই অঞ্চলের জন্য ইনসুলিন্দিয়া নাম প্রথম ব্যবহার করেন। **1884** সালে **A. Bastian** নামে এক জার্মান পণ্ডিত 'ইন্দোনেশিয়া' শব্দটি অনুমোদন করেন। ইন্দোনেশিয়া কথাটিতে দ্বীপ বোঝাতে লাতিন ইনসুলা **(Insula)** শব্দের পরিবর্তে গ্রীক নেসস **(nesos)** শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। এর পর থেকেই 'ইন্দোনেশিয়া'র ব্যাপক প্রয়োগ শুরু হয়। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সময় ইন্দোনেশিয়ার দেশপ্রেমিকরা স্বদেশের পরিচয় হিসাবে এই নাম বেছে নেন এবং এই নামেই তাদের স্বাধীন প্রজাতন্ত্রের নামকরণ করেন। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ইন্দোনেশিয়ার বাংলা প্রতিশব্দ-রূপে 'দ্বীপময় ভারত' ব্যবহার করেছেন।

আরবি ও চৈনিক আকরের মূল্যায়ণ

সপ্তম শতকে আরবের বণিক ও নাবিক দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সমুদ্রপথে তাদের বাণিজ্য-তরী ভাসিয়েছিল। প্রায় এক হাজার বছর ধরে তারা এখানে মশলা ও ঔষুধের সন্ধান করে বেড়িয়েছে। একারণে মালয় উপদ্বীপের ইতিহাস প্রসঙ্গে আরব সাহিত্য অন্যতম প্রধান আকর হিসাবে গণ্য হতে পারে। কিন্তু আরব উপকরণ ব্যবহার করতে হলে খুব সতর্কতা প্রয়োজন। অধিকাংশ আরব লেখক শোনা কথা ব্যবহার করেছেন। **Abu Dulaf** এবং **Ibn Battutah** তাঁদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিবরণ লিখেছেন। কিন্ত সত্যই তাঁরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ভ্রমণ করেছিলেন কিনা, তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। **Ramhurmuz** এর **Buzurg** প্রাচ্যে ভারতবর্ষ পর্যন্ত এসেছিলেন। **Biruni** ও **Sidi** ও ভারতবর্ষে এসেছিলেন। কিন্তু এই তিনজনই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া সম্বন্ধে শোনা কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। অন্যান্য আরব লেখকরা পারস্য উপসাগরের নানা বন্দরে আগত নাবিক ও বণিকদের কাছ থেকে খবরা-খবর সংগ্রহ করেছেন। কখনও কখনও তারা পূর্বসূরী লেখকদের বিবরণের উপরও নির্ভর করেছেন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া সংক্রান্ত অপর্যাপ্ত তথ্য পাওয়া যাবে **Ramhurmuz** এর **Buzurg** লিখিত **Aja'ib al-Hind** অর্থাৎ 'ভারতের যা কিছু বিস্ময়কর' গ্রন্থে। তাছাড়া **Akhbar as-Sin Wa'l-Hind** অর্থাৎ 'চীন ও ভারতের গল্প সম্ভার' অথবা 'সহস্র ও এক রজনী' গ্রন্থেও অজস্র উপ-

করণ ছড়িয়ে আছে। এসব গ্রন্থের তথ্যাদি চীন ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভ্রমণকারী পর্যটকদের বাস্তব অভিজ্ঞতার বিবরণ থেকে সংগৃহীত হয়েছে। ইবন বতুতার মধ্য চতুর্দশ শতকের বিবরণেও অনেক প্রাসঙ্গিক মূল্যবান তথ্য বিবৃত হয়েছে। প্রাচ্যে আরব অভিযাত্রীদের অনেকেই ছিলেন বণিক ও নাবিক। তাঁদের বিবরণে যাত্রাপথ ও বাণিজ্যপণ্যের বর্ণনা প্রধান্য পেয়েছে। আঞ্চলিক ভৌগোলিক বিবরণ ও মানুষের সর্বাঙ্গীন জীবনযাত্রার কথা অনুরূপ প্রাধান্য পায় নি। অজস্র অলৌকিক গল্পের অবতারণা আছে। ফলে তাদের বিবরণ বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাসের মর্যাদা অর্জন করতে পারে নি।

1500 খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে মালয় ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা মহামূল্য আকর হল চীনা ঐতিহাসিক সাহিত্যসম্ভার। দশম শতাব্দীর আগে চীনা ঐতিহাসিক সাহিত্যই একমাত্র বিশদ আকর। ভারতীয় ও পশ্চিমী সাহিত্যে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কিছু প্রয়োজনীয় উপকরণ ছড়ান আছে। কিন্তু তুলনামূলক বিচারে চৈনিক দলিলগুলি পরিমাণে বিপুল এবং নানা বিষয়ে তথ্যসমৃদ্ধ। Paul Wheatley তাঁর *The Golden Khersonese* (Kuala Lumpur 1961) গ্রন্থে চৈনিক উপকরণগুলি চারভাগে তালিকাভুক্ত করেছেন: (1) রাজবংশের ইতিহাস, (2) বিশ্বকোষ, (3) ভ্রমণকাহিনী, এবং (4) ভৌগোলিক বিবরণ। এগুলির বিশদ আলোচনা ঐ গ্রন্থে তিনি করেছেন। মালয় উপদ্বীপ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিবরণ পশ্চিমী জগতের গোচরে এসেছে Geographike Huphegesis (Guide to Geography) বা ভূগোল নির্দেশিকা গ্রন্থমারফৎ। এই গ্রন্থটি নিয়ে বিতর্কের অন্ত নেই। মালয় অংশের ব্যাপক বিশ্লেষণ করেছেন Dato Sir Roland Braddell নামে একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত।

আরবি আকরের বিবরণ

1292 খ্রীষ্টাব্দে মার্কো পোলো সুমাত্রার পারলাক অঞ্চলে দেখেছিলেন যে ইসলামধর্ম সেখানে সুপ্রতিষ্ঠিত। ইবন বতুতা 1385 খ্রীষ্টাব্দে পসেই-এ এসেছিলেন। সেখানেও তিনি দেখেন যে ইসলাম রাষ্ট্রীয় ধর্ম। আরবি লিপিতে মলাই ভাষায় খোদিত শিলালিপি পাওয়া গেছে। শিলালিপিতে উল্লিখিত তারিখ হল 1326 বা 1386 খ্রীষ্টাব্দ। আরবি ও সংস্কৃতে অর্থাৎ মিশ্রভাষায় লিখিত এই লেখমালাতে ইসলাম ধর্মমতে নানা অপরাধের শাস্তি উল্লেখ করা হয়েছে। সহজেই অনুমেয়, মালাই জাতির মানুষরা তখন সাহিত্যে ও দৈনন্দিন কথাবার্তায় অনেক আরবি শব্দ প্রয়োগ করতে শিখেছিল।

প্রাচীনতম মালাই বিবরণ হচ্ছে পসেই-এর ইতিহাস। অনুমান করা হয় যে, এই ইতিহাস রচিত হয়েছিল 1350 খ্রীষ্টাব্দের পর এবং 1524 খ্রীষ্টাব্দের আগে। পরবর্তী মালাই বিবরণে পসেই ইতিহাসের প্রভাব স্পষ্ট। পসেই এর ইতিহাসে রামায়ণ, মহাভারত ও কথাসরিৎসাগরের নানা গল্পের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে। আবার অনেক ঐতিহাসিক ব্যক্তি ও ঘটনার বিবরণও আছে। রাজকাহিনী, রাজদরবারের ষড়যন্ত্র, শাসকবৃন্দের রণ-অভিযান, এসব কথাও আছে। কিন্তু শাসনতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসের আকররূপে এই গ্রন্থটি একান্তই মূল্যহীন। দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে পসেই-এর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের ইঙ্গিতের জন্যও গ্রন্থটি স্মরণীয়।

কালানুক্রমিক বিচারে সেজর মেলয়ু (*Sejarah Melayu* বা *Malay Annals*) বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। পঞ্চদশ শতকের শেষে বা ষোড়শ শতকের প্রথমে গ্রন্থটি রচিত হয়েছিল। গ্রন্থকারের নাম অজ্ঞাত। সংস্কৃত, তামিল, পারসিক, জাভা ও আরবি সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর নিবিড় পরিচয় ছিল। তাছাড়া চীনা ও পর্তুগীজ ভাষাও তিনি জানতেন। সুফী মতবাদ সম্পর্কে তাঁর প্রখর জ্ঞান ছিল। অনেক জনশ্রুতি ও গল্পকাহিনী তাঁর বিবরণে স্থান পেয়েছে। অলৌকিক ঘটনাও বাদ যায়নি। এগুলি বিচার বিশ্লেষণ করে সে যুগে প্রচলিত ধর্মাচরণের আভাস পাওয়া যায়। হিন্দু মুসলমান ভারতীয় বণিক এবং চীন জাপান সুমাত্রা থেকে আগত আগন্তুকদের জীবনযাত্রার স্বচ্ছ চিত্র তাঁর বিবরণে নিপুণভাবে অঙ্কিত হয়েছে। তামিল তীরন্দাজ, পাঠান অশ্বারোহী, মদগর্বী ভীরু ভারতীয় ধর্মপ্রচারক ইত্যাদির নিখুঁত বর্ণনা আমাদের অভিভূত করে। Wilkinson লিখেছেন, এই সব বিবরণ থেকে আমরা সে যুগের জীবন্ত ছবি পাই। মালাই মানুষের মানস জগৎ সেখানে প্রতিবিম্বিত। মালাক্কার শাসনব্যবস্থার বিচার বিশ্লেষণ খুঁজে পাই।

সেজর মেলয়ুর অনেক পাণ্ডুলিপি আছে, কিন্তু মাত্র দুটি সংস্করণ আছে। শেষ সংস্করণ 1612 খ্রীষ্টাব্দে জোহোরে সম্পাদিত হয়েছে। প্রাচীন সংস্করণে আছে মাব্রি (Ma'abri) থেকে ইসলামধর্ম দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। মার্কোপোলো ও ইবন বতুতা মাব্রি বোঝাতে মাবার (Maabar) কথাটি ব্যবহার করেছেন। মাব্রি বা মাবার হল কোরোমণ্ডল উপকূলের আরবি প্রতিশব্দ। কিন্তু এই অর্থ মালাইদের অজ্ঞাত ছিল বলে বইটির শেষ সংস্করণে কথাটি বাদ দেওয়া হয়েছে। গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণে লেখা হয়েছিল যে সুলতান আলাউদ্দিন শাহ জাভা-নারীর সন্তান। শেষ সংস্করণে বলা হয়েছে তিনি বেনদাহারা রমণীর সন্তান। এই পরিবর্তন করা হয়েছে বেনদাহারা পরিবারের সম্মান উজ্জ্বল করে দেখাবার জন্য।

Hikayat Merang Mahawangsa শিরোনামে একটি গ্রন্থ প্রচলিত ছিল। এই গ্রন্থ কেদা কাহিনী নামে পরিচিত। এই গ্রন্থে রামায়ণ, কথাসরিৎ-সাগর ও জাতকের কাহিনীকে ঐতিহাসিক ঘটনা হিসবে উপস্থিত করা হয়েছে। বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস-সেবীর কাছে এই গ্রন্থটি একান্তই মূল্যহীন।

Misa Melayu গ্রন্থে **1742** থেকে **1778** খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পেরাক রাজ্যের সমসাময়িক বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। লেখকের নাম রাজা চুলন (**Raja Chulan**)। রাজপ্রাসাদের আদবকায়দা, বিবাহের নিয়মকানুন, শবসমাধির রীতিনীতির বিস্তারিত বর্ণনা আছে গ্রন্থটিতে। রাজকীয় শোভাযাত্রার উপকূল পরিক্রমার বর্ণনা অনন্য ছন্দবদ্ধ শ্লোকে পরিবেশিত হয়েছে। পেরাক রাজ্যের রাজনীতি এবং ব্যবসাবাণিজ্যেরও উল্লেখ আছে। কাঁচাটিনের (**Tin ore**) বিনিময়ে একজন ইংরেজ দুটি কামান বিক্রী করেছিল। ভারতের সঙ্গে রাজকীয় বাণিজ্যের উপকরণ ছিল হাতী। পেরাক নদীর মোহনায় ওলন্দাজরা একটি আবাসবাড়ি নির্মাণ করেছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল টিন ক্রয়ের ব্যাপারে ওলন্দাজদের একচেটিয়া অধিকার রক্ষা করা। পেরাক রাজ্যের সঙ্গে সেলাংগোর ও কেদা রাজ্যের পারস্পরিক সম্বন্ধের কথাও আলোচনা করা হয়েছে এই গ্রন্থে। জনশ্রুতির অবতারণা এখানে নেই। গ্রন্থটি তথ্যনিষ্ঠ। দুই শতক পূর্বে মালয় রাজ্যের পরিস্থিতির উপরে এই ইতিহাস গ্রন্থ আলোকপাত করেছে।

Tuhfatal-Nafis বা অমূল্য অবদান (**Precious gift**) আর একটি স্মরণীয় গ্রন্থ। **1865** খ্রীষ্টাব্দে রাজা আলী গ্রন্থটি সংকলন করেন। একই উপকরণ নিয়ে **Salasilah Melayu dan Bugis** নামে তিনি একটি গ্রন্থ প্রণয়ণ করেন। মধ্যযুগীয় সিঙ্গাপুর ও মালাক্কার বিবরণ তিনি দিয়েছেন। তাছাড়া জোহোর ও রিয়াউ (**Riau**) রাজ্যের প্রাচীন কাল থেকে **1865** সাল পর্যন্ত ইতিহাস রাজা আলী বিবৃত করেছেন। মালাই, বুগি ও ওলন্দাজদের পারস্পরিক সম্বন্ধের প্রধান প্রধান ঘটনা তিনি উল্লেখ করেছেন। ওলন্দাজ ও ইংরেজদের দলিলপত্রে যে সব তথ্য পাওয়া যায়, মালাই দৃষ্টিকোন থেকে সেগুলির বিচার বিশ্লেষণ তিনি করেছেন। তাঁর বিবরণ পূর্বসূরীদের মত চিত্রধর্মী নয়, কিন্তু প্রচুর সন তারিখের নির্ভুল উল্লেখ বিস্ময়কর। রিয়াউ রাজ্যের সুদিনে চাউল, রেশম ও রেশমবস্ত্রের ও গ্যামবির নামে এক ধরনের গাছের মূল্য তিনি উল্লেখ করেছেন।

উনিশ শতকে মালাই ভাষায় বিশেষ কোন ইতিহাস লিখিত হয়নি। শুধু-মাত্র আবদুল্লার আত্মজীবনীতে কিছু ঐতিহাসিক উপকরণ আকীর্ন হয়ে আছে। র‍্যাফেলস্ সম্পর্কে কিছু মজার কাহিনী তিনি শুনিয়েছেন।

সিঙ্গাপুরের পত্তন ও 1846 পর্যন্ত বিকাশ তিনি বর্ণনা করেছেন। অনেক অসত্য কথন, এবং সন তারিখের প্রচুর ভুলভ্রান্তি সত্ত্বেও এই গ্রন্থটির কিছু মূল্য আছে। সমসাময়িক মানুষদের অন্তরঙ্গ পরিচয় আবদুল্লা চিত্রিত করেছেন। জোহোর, পেরাক, কেদা, পাহাঙ, ত্রেঙ্গানু, কেলানতান, প্রভৃতি অঞ্চলের ছোট ছোট ইতিহাস উনিশ শতকে লেখা হয়েছিল। এসব গ্রন্থে অনেক মূল্যবান বিবরণ আছে। কিন্তু আলোচনার পদ্ধতি চিরাচরিত। এসব ইতিহাসে নতুন রীতিমার্গের কোন সন্ধান পাওয়া যায়না। 1918 সালে মালয়ের স্কুল পাঠ্য ইতিহাস "তাওয়ারীখ মেলয়ু" লিখেছিলেন মালয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক Richard Winstedt, এই প্রথম ইতিহাস বোঝাতে "তাওয়ারীখ' কথাটি প্রয়োগ করা হল। আগে ইতিহাসের মানে ছিল "হিকায়াৎ" অর্থাৎ কাহিনী। কাহিনী ও ইতিহাসের পার্থক্য এই প্রথম মালয় ইতিহাসে নির্দেশিত হল।

রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটির মালয় শাখার উদ্যোগ

মালয় ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহের কাজে রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটির মালয় শাখার উদ্যোগ প্রশংসনীয়। 1878 খ্রীষ্টাব্দে সিঙ্গাপুরে এই প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়। ঐ বছরেই সোসাইটির মুখপত্ররূপে পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় কয়েক বছর বাদে পত্রিকাটির ধারাবাহিক নিয়মিত প্রকাশ অব্যাহত আছে। 1923 সালে পত্রিকাটির নামকরণ হয় 'জারনাল অব দি মালয়ান ব্রাঞ্চ অব দি রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি।'

পত্রিকাটির অধিকাংশ লেখক ছিলেন ইংরেজ সরকারী কর্মচারী। মালয় রাজ্যগুলিতে এবং উত্তর বোর্ণিওতে কাজ করতে এসে অপরিচিত দেশের অনেক অজানা তথ্য তাঁরা আবিষ্কার করেছেন এবং নানা বিবরণ ও প্রবন্ধ রচনা করে সর্বসাধারণের গোচরীভূত করেছেন। দৈনন্দিন কাজকর্মে তাঁরা গ্রামে গ্রামান্তরে গেছেন, জমি জরিপ করেছেন, রাজস্ব আদায় করেছেন, শাসন পরিচালনা করেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নানা অঞ্চলের ভূসম্পদ, খনিজ সম্পদ, বনসম্পদ, পশুপাখী, সমাজের রীতিনীতি ঐতিহ্য, মানুষের আচরণ ও অভ্যাস, শিল্পকলা, মানসজীবন সবকিছু পর্যবেক্ষণ করেছেন। পত্রিকাটিতে বছরের পর বছর সেসব বিচিত্র সংবাদসম্ভার পরিবেশিত হয়েছে। ইতিহাস রচনায় যারা ব্রতী হয়েছিলেন, তারা উপকরণ সংগ্রহ করেছেন মালাই বিবরণ, বংশাবলী, ইউরোপীয় পর্যটকদের ভ্রমণবৃত্তান্ত এবং মালয় রাজ্যগুলির সঙ্গে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির সম্বন্ধ সম্পর্কিত দলিলদস্তাবেজ থেকে। পত্রিকা-টিতে প্রথম কয়েক বছরে মালাই, পর্তুগীজ ও ওলন্দাজ বিবরণগুলির

অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম লেখকের নাম **Hugh Low**; তিনি ছিলেন পেরাকে নিযুক্ত রেসিডেন্ট। পত্রিকাটির **1880** সালের সংখ্যার স্থানীয় কাহিনী ও লেখমালার উপর ভিত্তি করে তিনি ব্রুনির বংশগত ইতিহাস বিষয়ে পাঁচটি প্রবন্ধ লেখেন। **1882** সাল থেকে **W. E. Maxwell** মালাই এবং ওলন্দাজ উপকরণগুলির ইংরেজি অনুবাদ করেন। তাঁর নিম্নলিখিত নিবন্ধগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঃ (1) আঞ্চলিক আকর ভিত্তি করে লেখা পেরাকের ইতিহাস [**The History of Perak from Native Sources (1882, 1884)**] (2) পেরাকে ডচদের ভূমিকা [**The Dutch in Perak (1882)**] (3) ভ্যালেনটিন বর্ণিত মালাক্কা [**Valentiyn's Description of Malacca (1884, 1885)**] (4) রাজা হাজীর কবিতা ও মালাক্কা অবরোধ [**The Poem of Raja Haji and the Siege of Malacca 1784. (1890)**] **1886** সালে **E. Koek** লেখেন মালাক্কার পর্তুগীজ ইতিহাস (**The Portuguese History of Malacca.**)।

এসব প্রবন্ধের বিষয়বিন্যাস ছিল ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। আলোচ্য উপকরণ ও বিষয় থেকে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত সুসংবদ্ধ সুবিন্যস্ত কালানুক্রমিক ও ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা প্রায় অসম্ভব। তবে ইতিহাস গবেষণায় প্রাথমিক প্রয়োজন হল নানা ভাষা থেকে তথ্য আহরণ, এ বিষয়ে তারা সচেতন ছিলেন।

একজন তরুণ ব্রিটিশ কর্মচারীর প্রচেষ্টায় অবশ্য ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। **1882** সালে প্রকাশিত হয় **A. M. Skinner** রচিত মালয়ের সঙ্গে ব্রিটিশ যোগাযোগের ঐতিহাসিক রূপরেখা (**An Outline History of British Connection with Malay.**)। ঊনিশ শতকে মালয় রাজ্যগুলির ধারাবাহিক বিকাশের কথা এই প্রবন্ধে আছে। তাছাড়া সপ্তদশ অষ্টাদশ শতকে ওলন্দাজ ও ইংরেজ কুঠি স্থাপনের নির্ভুল তারিখসহ আনুপূর্বিক বিবরণও আছে। একথা সত্য যে নির্দিষ্ট বিষয়ে তৎকালীন জ্ঞানভাণ্ডারের সম্যক পরিচয় ঐ প্রবন্ধে পাওয়া যায়। মালয় উপদ্বীপে ব্রিটিশ কার্যাবলীকে **Skinner** তিনটি কালপর্বে ভাগ করেছেন। যথা,

1. **1602-1648** ঃ ব্যক্তিগত বাণিজ্যিক উদ্যোগের যুগ।
2. **1648-1762** ঃ ইসট ইনডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যিক উদ্যোগের যুগ।
3. উত্তর **1762** পর্ব ঃ ব্রিটিশ শক্তির প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক ও সামরিক হস্তক্ষেপের যুগ।

শেষ যুগপর্বকে তিনি চারটি ভাগে ভাগ করেছেন।

(1) *1762-1805* : ম্যানিলা অভিযান থেকে শুরু করে পেনাঙের ভারতবর্ষের

স্বতন্ত্র প্রেসিডেন্সিরূপে আত্মপ্রকাশ পর্যন্ত।

(2) 1805-1827 : স্ট্রেট্স্ সেটেলমেন্ট (Straits Settlement) নিয়ে একটি শাসনতান্ত্রিক সংস্থা গঠন।

(3) 1827-1867 : স্ট্রেটস সেটেলমেন্টের শাসনভার ভারতসরকারের নিয়ন্ত্রণ থেকে লনডনের কালোনিয়াল অফিসে হস্তান্তর পর্ব।

(4) উত্তর—1867 পর্ব।

এই কালবিভাগ ও বিষয় বিভাজন আধুনিক ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে খুবই অসম্পূর্ণ মনে হবে। কিন্তু একথা সত্য যে Skinner নিজে রাজকর্মচারী ছিলেন। তাই তাঁর দৃষ্টিতে শাসনব্যবস্থার রদবদল মালয় ইতিহাসের মূল-ধারারূপে প্রতিভাত হয়েছে।

তরুণ সরকারী কর্মচারীরা মালয় উপদ্বীপের নতুন পরিবেশকে সর্বতো-ভাবে হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করেছিলেন। পরিবেশকে বুঝতে গিয়ে তাঁরা প্রাচীন পরিচয় উদঘাটনে তৎপর হয়েছিলেন। মালয়ের যে সব অঞ্চলে তাঁদের কর্মজীবন অতিবাহিত হয়েছে, সে সব অঞ্চল থেকেই তাঁরা পুরাকাহিনী সংগ্রহ করেছেন, ইংরেজীতে সেগুলি অনুবাদ করেছেন এবং পত্র পত্রিকায় প্রকাশ করেছেন। তাঁদের ঔৎসুক্য শুধু স্থানীয় পরিধিতে আবদ্ধ ছিল। সংগৃহীত আঞ্চলিক উপকরণকে তাঁরা আঞ্চলিক পদ্ধতিতে রূপ দিয়েছেন। ইউরোপীও শিক্ষাদীক্ষায় লালিত হয়েও এবং ইউরোপীয় ইতিহাসের ব্যাপক পরিধির সঙ্গে পরিচিত হয়েও, তাঁরা বিশেষ পরিস্থিতির জন্যই মালয় ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ এবং ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে আঞ্চলিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছিলেন এবং আঞ্চলিক পদ্ধতিই অবলম্বন করেছিলেন।

এই অবস্থার জন্য বাস্তব পরিস্থিতি অনেকাংশে দায়ী। সরকারী কর্মচারীদেরকে বহুক্ষেত্রে পুরানো প্রথা, রীতিনীতি ও পুরানো সিদ্ধান্ত মেনে কাজ করতে হত। তাই তাঁদের অনুসন্ধান করতে হয়েছে আঞ্চলিকভাবে পুরানো প্রথা রীতিনীতি, সিদ্ধান্ত ঠিক কী, বা কোথায় তা পাওয়া যাবে, বা কিভাবে তা জানা যাবে। উত্তরাধিকারের প্রশ্নে তাঁরা নির্ভুল বংশতালিকা খোঁজ করেছেন এবং বিবদমান দলগুলি প্রদত্ত ঘটনা বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। এই সব প্রয়োজনীয় অনুসন্ধানকর্ম থেকেই সরকারী আমলা লিখিত মালয়ের ইতিহাস রূপ নিয়েছে। এ ইতিহাস বাস্তব প্রয়োজনের তাগিদে লিখিত ইতিহাস। তৎকালীন সাময়িক চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে এ ইতিহাস রচিত হয়েছিল। ইউরোপীয় রাজকর্মচারীদের জ্ঞানবুভুক্ষা তৃপ্ত করার জন্য এ

ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছিল। স্থান কাল পাত্র এই তিন বিচারেই এ সব ইতিহাস অতি সংকীর্ণ গন্ডীতে আবদ্ধ।

আঞ্চলিক কাহিনীগুলির প্রকাশ অন্যান্য দিকে জ্ঞানচর্চার নব নব দিগন্ত উন্মোচিত করেছে। মালাই ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চায় পণ্ডিতবর্গ আত্মনিয়োগ করেছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত তিনটি প্রবন্ধ উল্লেখ্য ঃ

1. Martin Lister, Origin and Constitution of Negri Sembilan (1887)
2. W. E. Maxwell, The Ruling Family of Selangor (1890)
3. R. N. Bland, Regulations of Traditional Organisation of Sungaai Ujong (1890)

ব্রিটিশ গবেষকদের অবদান

R. G. Wilkinson এবং R. O. Winstedt-এই দুই গবেষকের প্রচেষ্টা বিশেষভাবে স্মর্তব্য। 1906 সালের পর এই দুই ঐতিহাসিক '*Papers on Malay Subjects*' (প্রথম পর্যায় 1907-1911; দ্বিতীয় পর্ব 1912-21) প্রকাশ করেন। Wilkinson ছিলেন এই গ্রন্থমালার সম্পাদক। মালয়ে আগত ইউরোপীয় রাজকর্মচারীবৃন্দের হাতে ঐ দেশের সামগ্রিক পরিচয় সমন্বিত গ্রন্থাদি তুলে দেবার জন্য এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। এই সব গ্রন্থমালার বিষয় ছিল সমাজজীবন, রীতিনীতি, আইনকানুন, সাহিত্যসাধনা, শিল্পোদ্যোগ, আধাঐতিহাসিক পর্ব, প্রাক-ব্রিটিশ পর্ব ইত্যাদি। এই আলোচনাগুলি এশিয়াটিক সোসাইটির জারনালে প্রকাশিত হয়নি। প্রায় অনুরূপ উদ্দেশ্য নিয়ে দুটি বই লিখিত হয়েছিল ঃ

(1) Parr & Mackray : *Rembau its History, Constitution and Customs* (1910).

(2) Winstedt : *History of the Peninsula in folk-tales.*

সরকারী নির্দেশে ও সরকারী প্রয়োজনে Winstedt যে সব বই সম্পাদনা করেছিলেন, তাঁর বাইরেও সোসাইটির জার্নালের জন্য তিনি দুটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন ঃ (1) মালাক্কার সুলতানী ব্যবস্থা (Malacca Sultanate) (2) মালাক্কা দখল [The Capture of Malacca (1912)]. আরও একটি ঐতিহাসিক প্রবন্ধ সিঙ্গাপুর ও মালয়ে রক্ষিত দলিলপত্র ব্যবহার করে

লিখিত হয়েছিল। A. C. Baker লিখেছিলেন উনিশ শতকের শুরুতে প্রাচ্যে ইঙ্গ-ডচ্ সম্পর্কের ইতিহাস : **Anglo-Dutch Relations in the East at the beginning of the 19th Century. (1913).**

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় গবেষকরা ইতিহাস সেবায় আত্মনিয়োগ করতে পারেন নি। 1925 সালের পত্রিকাতে একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল :—L. A. Mills লিখিত ব্রিটিশ মালয়। [British Malay (1824-1867)]. ভূমিকা অংশে লেখক সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে ইংরেজ ও ওলন্দাজদের কার্যাবলীর রূপরেখা দিয়েছেন। প্রকাশিত তথ্যাদির ভিত্তিতে এই অংশ লিখিত। মূল বিষয় হল ইসট ইনডিয়া কোম্পানির আমলে স্ট্রেটস্ সেটেলমেন্টের ইতিহাস এবং সারাবাক ও উত্তর বোর্ণিওর উনিশ শতকের প্রথম ভাগের ইতিহাস। লনডনের ইনডিয়া অফিসে রক্ষিত অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে মূল অংশটি লিখিত হয়েছে।

সুনির্দিষ্ট কালপরিধিতে মালয়ের ইতিহাস Mills লিখতে চাননি। মালয়ের আঞ্চলিক উপকরণ সম্ভারও তিনি ব্যবহার করেননি। শুধুমাত্র তিনটি বিষয়ে তিনি দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছিলেন :

1. চীন বাণিজ্যের সমুদ্রপথে ব্রিটিশ শক্তির প্রতিষ্ঠা, 2. মালয় উপদ্বীপে ইঙ্গ-ওলন্দাজ প্রতিযোগিতা, 3. স্ট্রেটস্ সেটেলমেনট্সে শাসনব্যবস্থার সমস্যা। মালয়-ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে একটি দৃঢ় পদক্ষেপ। পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণা গ্রন্থের মডেল হিসাবে Mills এর বইটি স্বীকৃতি লাভ করেছে। এমন সব আকর নির্দেশ তিনি করেছেন, যেগুলি মালয়েও সহজলভ্য। ইনডিয়া অফিসের দপ্তরে তিনি যেসব দলিলপত্র দেখেছেন, সেগুলির প্রতিলিপি সিঙ্গাপুরের মহাফেজখানাতেও রক্ষিত আছে। কিন্তু আক্ষেপের কথা, এসব দলিলের সম্যক সদ্ব্যবহার অদ্যাপি হয় নি।

1930 সালের পর এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় সাধারণত দুই ধরণের প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। 1. সরকারী কর্মচারী লিখিত বিভিন্ন অঞ্চলের স্থানীয় ইতিহাস। 2. মালয়েশিয়ার প্রাক-ইতিহাস ও প্রাচীন ইতিহাস বিষয়ে বে-সরকারী গবেষকদের আলোচনা। প্রথম ধরণের কয়েকটি প্রবন্ধ নিচে উল্লেখ করছি।

1. **Winstedt, History of Johore (1932)**
2. **Winstedt & Wilkinson, History of Perak (1934)**
3. **Anker Rentse, History of Kalantan Part I (1934)**
4. **Winstedt, History of Selangor (1934)**

5. " History, Polity and Belief of Nine States (1934)
6. " History of Malay (1935)
7. " Notes on the History of Kedah (1936)
8. W. Linchan, History of Pahang (1936)

দ্বিতীয় ধরণের দু'টি প্রবন্ধ নিচে উল্লেখ করছি।

1. R. Brandell, An Introduction to the Study of Ancient Times in the Malay Peninsula and the Straits of Malacca (1935, 1936, 1937, 1939, 1941)
2. Quaritch Wales, Archaeological Researches on Ancient Indian Colonization in the Malay Peninsula (1940)

পাদটীকা

এই অধ্যায়ের উপকরণ সংগৃহীত হয়েছে D. G. E. Hall সম্পাদিত *The Historians of Southeast Asia* গ্রন্থে সংকলিত Richard Winstedt লিখিত Malay Chronicles from Sumatra and Malay এবং C. D. Cowan লিখিত Ideas of History in the Journal of the Malay Branch of the Royal Asiatic Society 1878-1941 শীর্ষক প্রবন্ধদ্বয় থেকে। তাছাড়া Paul Wheatley লিখিত *Golden Khersonese* গ্রন্থ থেকেও তথ্য চয়ন করা হয়েছে।

॥ 4 ॥

ইন্দোনেশীয় ইতিহাসের উপকরণ

ভাষা ও সাহিত্য

ইন্দোনেশিয়ায় কমপক্ষে 250 ভাষা ও উপভাষা প্রচলিত আছে। এসব ভাষাগুলির মধ্যে শুধুমাত্র জাভা ও বলিদ্বীপের প্রাচীন ভাষায় সৃষ্ট সাহিত্য সম্পদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পূর্বে এই ভাষাকে বলা হত কবি ভাষা। কিন্তু ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিতদের মতে এই ভাষাকে প্রাচীন যবদ্বীপীয় ভাষা নামে অভিহিত করাটাই অধিক যুক্তিসঙ্গত। প্রাচীন জাভার সাহিত্যে সংস্কৃত ভাষায় রচিত কবিতা ও কাব্যকে বলা হত কাকাবিন। কাকাবিন সাহিত্যে প্রায় শতাধিক সংস্কৃত ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে। পূর্ব জাভার ধর্মবংশ, কামেশ্বর, জয় ভয়, হয়ম ভুরুক প্রভৃতি রাজাগণ প্রাচীন যবদ্বীপীয় সাহিত্যের পৃষ্ঠ-পোষক ছিলেন।

মালয় এবং বলিদ্বীপেও সাহিত্যচর্চার কিছু নমুনা পাওয়া গেছে। প্রাচীন মালয় এবং প্রাচীন বলিদ্বীপীয় ভাষায় লিখিত শিলালিপি এই সাহিত্যচর্চার সাক্ষ্য বহন করছে। প্রাচীন মালয় ভাষায় 605 শকাব্দের (683 খ্রীষ্টাব্দের) একটি লিপির বক্তব্য এইভাবে শুরু হচ্ছে ঃ স্বস্তি শ্রী-শকবর্ষাতীত 605 একাদশী বুলন বৈশাখ ড়পুন্ত হিয়ম নায়িক দি সাম্বো মঙ্গলপ....। একই ধরণের ভাষায় লিখিত 606 শকাব্দের একটি অনুশাসন লিপি পাওয়া গেছে সুমাত্রার পালেমবাঙ অঞ্চলে। বঙ্কদ্বীপের কোটা কাপুর অঞ্চলে প্রাপ্ত 608 শকাব্দের একটি লিপি অনুরূপ ভাষায় লিখিত। লিপিগুলির সংস্কৃত শব্দের অর্থ সহজেই বোঝা যায়। অন্য শব্দগুলি দুর্বোধ্য। এই ভাষার নামকরণ কেউ করেছেন প্রাচীন মালয়, কেউ করেছেন কিউয়েন-লুয়েন। হিমাংশু ভূষণ সরকার মনে করেন যে এই ভাষাকে যদি প্রাচীন মালয় ভাষার নিদর্শনরূপে ধরা হয়, তাহলে প্রাচীন মালয় সাহিত্যের সর্বপ্রাচীন নমুনা 683 খ্রীষ্টাব্দের শিলালিপিতে পাওয়া যাবে। বলিদ্বীপের সর্বপ্রাচীন অনুশাসন লিপি উৎকীর্ণ হয়েছিল 896 খ্রীষ্টাব্দে। এর ভাষা বলিদ্বীপীয়। জাভার প্রাচীনতম অনুশাসনলিপিগুলি 732 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পল্লব-গ্রন্থ হস্তাক্ষরে উৎকীর্ণ করা হয়েছিল। উদাহরণরূপে আমরা উল্লেখ করতে পারি পূর্ণবর্মনের

শিলালিপিগুলি, তুকমাসের শিলালিপি এবং সঞ্জয়ের চঙ্গল লিপি। প্রাচীন যবদ্বীপীয় হস্তাক্ষরের সর্বপ্রথম পরিচয় আমরা পেয়েছি 760 খ্রীষ্টাব্দের দিনজ লিপিতে। এই লিপি কবি-লিপি বা কবি হস্তাক্ষর নামেও পরিচিত। পল্লব-গ্রন্থ এবং কবি-হস্তাক্ষর ছাড়া প্রাক-নাগরী হস্তাক্ষর নামে আর এক ধরণের লিপি প্রচলিত ছিল। কলসন (778 খ্রীষ্টাব্দ) এবং কেলুরক (782 খ্রীষ্টাব্দ) প্রভৃতি লেখমালায় প্রাক-নাগরী হস্তাক্ষর ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাক্-নাগরী আকস্মিক ভাবে বিলুপ্ত হয়ে যায়। পুনরায় শুরু হয় কবি-হস্তাক্ষরের প্রচলন। কবি হস্তাক্ষর থেকেই জন্ম নিয়েছে আধুনিক যবদ্বীপীয়, সুন্দনীজ, মাদুরীজ এবং বলিদ্বীপীয় হস্তাক্ষর।

পঞ্চম থেকে সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত জাভার রাজনৈতিক ভারকেন্দ্র ছিল পশ্চিম যবদ্বীপে। তারপর আমরা দেখি হো-লিঙ্গ বা মধ্যজাভার অভ্যুত্থান। মধ্য জাভার প্রাধান্যের যুগে (700-925 খ্রীষ্টাব্দ) ভারতীয় ও ইন্দোনেশীয় সভ্যতার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ প্রতিফলিত হয় ভাষা, সাহিত্য ও শিল্পসৃষ্টিতে। দশম শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে পূর্ব জাভার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। দশম শতাব্দীর শেষ দিকে ধর্মবংশের রাজত্বকাল থেকে শুরু হয় যবদ্বীপীয় সাহিত্যের সমৃদ্ধির পর্ব। 1000 খ্রীষ্টাব্দ থেকে 1400 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কাদিরি, সিঙ্গসারি এবং মজপাহিত রাজাদের আনুকূল্যে ও পৃষ্ঠপোষকতায় প্রাচীন যবদ্বীপীয় সাহিত্যের চরম উন্নতি সম্ভব হয়েছিল। 1600 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রাচীন যবদ্বীপীয় সাহিত্যের চর্চা অব্যাহত ছিল। প্রাক-মুসলিম যুগের ইন্দোনেশীয় সাহিত্যই প্রাচীন যবদ্বীপীয় সাহিত্য নামে পরিচিত। মুসলমান আক্রমণের প্রারম্ভে (1513-1528 খ্রীষ্টাব্দ) মজপাহিতের রাজা, সামন্ত, সভাসদ এবং হিন্দু বৌদ্ধ নরনারী বলিদ্বীপে আশ্রয় নেন। তাঁরা সঙ্গে করে পুঁথিপত্র নিয়ে যান। এই শরণার্থীগণের প্রচেষ্টায় প্রাচীন যবদ্বীপীয় সাহিত্য সংরক্ষিত হয়েছে। তারা নতুন সাহিত্যও সৃষ্টি করেছে। এই সাহিত্য মধ্যযুগের যবদ্বীপীয় সাহিত্য নামে পরিচিত। বলিদ্বীপ ছিল এই সাহিত্যের জন্মভূমি।

মধ্যযুগে স্বদেশী ছন্দে কাব্য সৃষ্টি হয়েছে। এই কাব্য কিদুঙ নামে পরিচিত। কিদুঙ কাব্যের বিষয় বস্তুও স্বদেশী ইতিহাস ও কিম্বদন্তী। বলিদ্বীপে কাকাবিন ও কিদুঙ ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত। অনুমান করা হয় এয়োদশ চতুর্দশ শতাব্দীতে কিদুঙ-কাব্য লেখা শুরু হয়। পররতন গ্রন্থে বুঁকির পোলমন (মৎস্য-সরোবর পর্বত) নামে একটি কিদুঙ গ্রন্থ উল্লেখ করা হয়েছে। কাদিরির শেষ রাজা হাজি জয় কৎবঙ্গ ছিলেন এই গ্রন্থের রচয়িতা।

"ইন্দোনেশিয়ার ইতিহাস সাহিত্যকে বুঝতে হলে যবদ্বীপীয় সাহিত্যের

শ্রেণী বিভাগ সম্পর্কে কিছু ধারণা থাকা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যেই আমরা যবদ্বীপীয় সাহিত্য বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা উপস্থাপিত করলাম।

এবার ইন্দোনেশিয়ার ঐতিহাসিক সাহিত্য এবং প্রাচীন ইতিহাসের উপকরণ বিষয়ে কিছু আলোচনা উপস্থিত করছি। হিমাংশু ভূষণ সরকার প্রাচীন ইন্দোনেশিয়ার ঐতিহাসিক উপকরণকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন, যথা (1) কুলপঞ্জী ও অর্ধ পৌরাণিক কাহিনী, (2) শিলালেখ-তাম্র শাসন, (3) ঐতিহাসিক সাহিত্য।

(1) কুলপঞ্জী ও অর্ধপৌরাণিক সাহিত্য

জাভার অজি-শক নামক গ্রন্থটি এই বিভাগের অন্তর্গত। ঊনিশ শতকের মাঝামাঝি **Winter** গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন। **Raffles** তাঁর জাভার ইতিহাস গ্রন্থে [*History of Java*, II (1830) pp 73 ff] 'অজি-শক' এর কিছু অংশ অনুবাদ করেছেন।

অজি-শক গ্রন্থে ভারতীয় ঔপনিবেশিকদের যবদ্বীপে যাত্রার কিম্বদন্তী যে ভাবে পরিবেশিত হয়েছে, বাংলা অনুবাদে তা এখানে উল্লেখ করছি। অনুবাদ করেছেন হিমাংশু ভূষণ সরকার।

'ক্লিঙ্গের রাজা 2000 পরিবারকে যবদ্বীপে প্রেরণ করিলেন। এই লোকগণ উন্নতি লাভ করিল এবং সংখ্যায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। তাহারা 289 অব্দ পর্যন্ত অসভ্য রহিল, এই সময় ভগবানের কৃপায় কারমা রাজা হইলেন এবং তিনি 100 বৎসর রাজত্ব করিলেন। এই সময়ের পরে তাঁহার উত্তরাধিকারী হইলেন বাসুকীতি। রাজ্যের নাম ছিল বিরত (বিরাট)।

এই সময় অস্তিন(=হস্তিনা) নামক আর একটি রাজ্য গড়িয়া উঠিল। ইহা রাজা পুলশর কর্তৃক শাসিত হইল। পুলশরের পর তাঁহার পুত্র আয়ধস রাজা হইলেন। আয়ধসের পর তাঁহার পুত্র পন্ডুদেবনত রাজা হইলেন। শেষোক্ত তিনজন রাজার রাজত্বকাল একত্রে 100 বৎসর ব্যাপী হইয়াছিল। ইহার পর জয়ভয় স্বয়ং রাজা হইলেন।........যখন অস্তিনার প্রভু জয়ভয় মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন, তখন তাঁহার পুত্র এবং বংশধরগণ, যেমন অমিজয়, জয় অমিসান, পাণ্ডান্দ্রিয়, এবং কসুম চিত্র রাজা হইলেন। শেষোক্ত রাজার রাজত্বকালে সম্ভবত রাজধানী স্থানান্তরিত হইয়াছিল, অথবা দেশের নাম পরিবর্তিত হইয়াছিল। কারণ ইহাকে তখন কুজরৎ বা গুজরত বলা হইত।'

এই রকম অজস্র উদাহরণ উল্লেখ করা সম্ভব। কিন্তু ইতিহাসের আকর হিসাবে এসব কাহিনী নির্ভরযোগ্য নয়। এসব কাহিনীর মধ্যে কতটুকু রূপ

কথা এবং কতটুকু ঐতিহাসিক তথ্য আছে, তা নির্ণয় করা অসম্ভব। কয়েকটি ঐতিহাসিক নাম ছাড়া অন্য বিষয়ে প্রকৃত তথ্য একেবারে অনুপস্থিত।

(2) শিলালেখ ও তাম্রশাসন

জাভার প্রাচীন অনুশাসনগুলিতে দক্ষিণ ও উত্তর ভারতের লিপি ব্যবহৃত হয়েছে। ভারতীয় লেখমালার মতই যবদ্বীপীয় অনুশাসনগুলি শুরু হয়েছে 'ওম স্বস্তি' বা 'সিদ্ধম্', দিয়ে। 772 শকাব্দের একটি শিলালিপিতে আছে, 'স্বস্তি শকবর্ষাতীত 772 আষাঢ় মাস তিথি দ্বিতীয় শুক্লপক্ষ তু প আর. বাব'। অপর একটি শিলালিপিতে আছে 'স্বস্থা শ্রী সঞ্জয় বর্ষা 694 পোষ্য মাস তিথি তৃতীয কৃষ্ণপক্ষ ...'। এই শিলালিপির শুরুতে আছে, 'ওম্ নমশ্ শিবায় নমো বুদ্ধায়।' জাভাতে ভূমিদান সংক্রান্ত কিছু অনুশাসন পাওয়া গেছে। এসব অনুশাসনগুলির অন্তে শপথ বাক্য লেখা আছে। কলিঙ্গ, দক্ষিণ ভারত ও উত্তরভারতে অনুরূপ শপথ বাক্য প্রচলিত ছিল। যবদ্বীপ ও বলি-দ্বীপের রাজাদের নাম সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হয়েছিল। পশ্চিম যবদ্বীপের প্রথম রাজা ছিলেন পূর্ণবর্মন। জাভার শেষ উল্লেখযোগ্য হিন্দু রাজা ছিলেন গিরীন্দ্র বর্ধন রণবিজয়। 782 শকাব্দের কাঞ্চনের তাম্রশাসন লিপিতে আছে, 'শ্রীমহারাজ শ্রীভুবনেশ্বর বিষ্ণু সকালাত্মক দিগ্বিজয় পবাক্রমোত্তুঙ্গদেব লোকপল'। পররতন গ্রন্থে আছে, 'সির রঙ্গবুনি অভিষেক বিষ্ণু বর্ধন করতুন ইব'। এর অর্থ হচ্ছে রঙ্গবুনি রাজা হয়ে বিষ্ণুবর্ধন নাম গ্রহণ করলেন। জাভার প্রাচীন রাজারা কখনও কখনও শুধুমাত্র স্বদেশী নামেই পরিচিত ছিলেন। যেমন, রাজা সিন্ডোক, ঐরলঙ্গ, কেন আংগরোক, হয়ম ভুরুক। রুকের 801 শকাব্দের তাম্র শাসনে 'শ্রীরাজ রকে কয়ুবঙ্গি' নামে এক রাজার নাম উল্লেখ করা হয়েছে। রাজমাতা, রাজমহিষী এবং রাজকন্যাগণ সংস্কৃত নামে পরিচিত ছিলেন। যথা, সুহিতা, ত্রিভুবণা, গায়ত্রী, জয়বধিনী, গুণপ্রিয়-ধর্মপত্নী, মহেন্দ্র দত্তা ঈশানতুঙ্গাবিজয়া। সংস্কৃত ও যবদ্বীপীয় ভাষায় সৃষ্ট মিশ্র নামও পাওয়া যায়। যেমন, বেকস্ ইঙ্গ সুক (সুখের পরাকাষ্ঠা), তঞ্জুঙ্গ-পুর (কমল-নগর), জয় কৎবঙ্গ (বিজয় সম্মান)। কোথাও সংস্কৃত শব্দ যবদ্বীপীয় ভাষায় বিকৃত রূপ নিয়েছে। যথা, দর্মসৈতিয়বন অর্থাৎ ধর্ম সত্যবান। রাজকর্মচারীদের সরকারী উপাধি যব-দ্বীপীয় ভাষায় লিখিত হত। যথা, পংকুর, তবন, তিরিপ, রক-রকরিয়ন-রকরয়ান, হিনো, হলু, সিরিকন, কনুরুহণ, দেমুঙ্গ, মকুদুর, জুরু। আবার সংস্কৃত উপাধিও ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, মন্ত্রী, পতি, ধর্মাধ্যক্ষ, অধিকার,

অধিরাজ, অধিপতি, পরমেশ্বরী। এই প্রসঙ্গে হিমাংশু ভূষণ সরকার লিখেছেন, 'এই যবদ্বীপীয় সরকারী উপাধির প্রাচুর্য সর্বপ্রাচীন অনুশাসন-লিপিগুলি হইতেই পরিদৃষ্ট হয়। সুতরাং ইহা হইতে এই অনুমান করাই স্বাভাবিক যে যবদ্বীপে হিন্দুগণের আগমনের পূর্ব হইতেই সেখানে এক-প্রকার স্বদেশী (সম্ভবতঃ গোষ্ঠীমূলক Tribal) শাসনতন্ত্র বিদ্যমান ছিল।'

অনুশাসনগুলির প্রারম্ভে থাকত সংস্কৃত স্বস্তিবাচন বা আশীর্বাদসূচক শ্লোক। তারপর থাকত উৎকীর্ণ-তারিখ। সাধারণত শকাব্দের উল্লেখ থাকত, কিন্তু দুটি অনুশাসনে সঞ্জয়াব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। ভারতীয় মাস, বার, গ্রহ নক্ষত্রের সংস্থান এবং কোথাও কোথাও যবদ্বীপীয় পঞ্চাহ, ষষ্ঠাহ, বুকু ইত্যাদির উল্লেখ থাকত। তারপর থাকত উদ্দেশ্য বা বিষয় বর্ণনা। প্রাপ্ত অনুশাসনগুলির অধিকাংশ ছিল ভূমিদান বা দেবোত্তর সম্পত্তি সংক্রান্ত। রাজনৈতিক অনুশাসন ছিল না বললেই চলে। ভূমিদান সংক্রান্ত অনুশাসনে ভূমির পরিমাণ ও চৌহদ্দির নির্দেশ থাকত। খেয়া নৌকার লোকদের বিশেষ অধিকার দান সংক্রান্ত কয়েকটি অনুশাসন পাওয়া গেছে। অধিকাংশ অনু-শাসন ধর্মমূলক। তাই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক তথ্যের আকর হিসাবে এগুলি মূল্যহীন। তবে রাজার নাম এবং পদমর্যাদা অনুযায়ী রাজকর্মচারী-দের নাম থাকায়, জাভার ইতিহাসের উপকরণ হিসাবে এগুলি অপরিহার্য মনে হয়েছে। গণমানসে অনুশাসনগুলির মূল্য ছিল অসীম। বংশের উত্তরাধিকার হিসাবে এগুলি সযত্নে রক্ষা করা হত। বিশেষ উৎসব অনুষ্ঠানে এগুলির পূজা করা হত। অনেক দিন পরেও কোন কোন ক্ষেত্রে জনগনের সম্পত্তি রক্ষার প্রামাণ্য দলিল হিসাবে এই অনুশাসনগুলি মর্যাদা পেয়েছে।

3 ঐতিহাসিক সাহিত্য

জাভাতে বেশ কয়েকটি ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। ভারতবর্ষের সঙ্গে জাভার এক হাজার বছর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের পর্বে সেখানে ঐতিহাসিক সাহিত্য সৃষ্ট হয় নি। চীনের সঙ্গে জাভার ঘনিষ্ঠতার পর্বে ঐতিহাসিক সাহিত্য বিকাশ লাভ করেছিল। হিমাংশু ভূষণ সরকার মনে করেন, এটা 'একান্ত আকস্মিক ঘটনা' নাও হতে পারে। তিনি আরও বলেছেন, 'অবশ্য ইহাও অসম্ভব নহে যে যবদ্বীপের অধিবাসীরা নিজেরাই এই সাহিত্যের বিকাশের জন্য দায়ী।' তিনি যবদ্বীপীয় ঐতিহাসিক সাহিত্যকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন : 1. মধ্যযুগীয় ঐতিহাসিক সাহিত্য 2. আধুনিক যুগের ঐতিহাসিক সাহিত্য।

মধ্যযুগীয় ঐতিহাসিক সাহিত্যের বিষয়বস্তু হচ্ছে প্রাচীন যুগের পূর্ব-যবদ্বীপীয় প্রাধান্যের শেষ কালপর্ব, সিঙ্গসরি ও মজপহিত রাজ্য এবং সপ্তদশ শতকেব মাঝামাঝি পর্যন্ত বলিদ্বীপের ইতিহাস। আধুনিক যুগের ঐতিহাসিক সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে জাভার মতরাম মুসলমান রাজ্যে। আগেই বলা হয়েছে যে যবদ্বীপের হিন্দুরা পুঁথিপত্র নিয়ে বলিদ্বীপে আশ্রয় নেয়। তাই মধ্য যবদ্বীপের সুলতানদের কাছে ঐতিহাসিক রচনার উপযুক্ত তথ্যাদি ছিল না। তখন ঐতিহাসিকরা ওয়েয়াং সাহিত্য, মহাকাব্য, কিম্বদন্তী এবং হিন্দু ঐতিহ্য থেকে ইতিহাস রচনার উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন। এই ইতিহাস মতবাম-বাবাদ নামে পরিচিত। মতরাম-বাবাদ পরিবর্ধন করে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে অনেক ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচিত হয়েছে।

যবদ্বীপের ঐতিহাসিক গ্রন্থগুলির মধ্যে নাগরকৃতাগম নামক কাব্যটি অশেষ গুরুত্ব সম্পন্ন। নানা ধরণের সংস্কৃত ছন্দে কাব্যটি রচিত হয়েছে। এতে 98 সর্গ আছে। কবির নাম প্রপঞ্চ। তাঁর অন্য নাম বিনাদ। এই কাব্যগ্রন্থের একজন বলিদ্বীপীয় নকলনবীশ গ্রন্থের শেষে লিখেছেন, 'ইতী নাগরকৃতাগম সমাপ্ত, সন্কথ শ্রী মহারাজ বিল্বাতিক্ত ....'। এই কারণ নাগরকৃতাগম নামে গ্রন্থটি পরিচিত হয়েছে।

1894 খ্রীষ্টাব্দে **Brandes** লম্বকদ্বীপে চক্রনেগরের বলিদ্বীপীয় বাজার প্রাসাদ অঙ্গনে গ্রন্থটি আবিষ্কার করেন। **1902** সালে বলিদ্বীপীয় হস্তাক্ষরে তিনি গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। অধ্যাপক **Kern** রোমান অক্ষরে মূল রচনা টীকাটিপ্পনি ও অনুবাদসহ সম্পাদনা করেন। **1919** সালে **Kern** এর সংস্করণ টীকা ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণসহ অধ্যাপক **Krom** প্রকাশ করেন। গ্রন্থটির 'সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ' সংস্করণ প্রকাশ করেছেন **Pigeaud. (*Java in the 14th Century, Vol. I-V,* The Hague. 1960-63)**।

বৌদ্ধ গ্রন্থকার 'ওম' দিয়ে নাগরকৃতাগম কাব্য শুরু করে শিববুদ্ধের বন্দনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে শিববুদ্ধের অবতার হলেন বিল্বাতিক্ত নাথ রাজা রাজসনগর। তাঁর জন্ম হয়েছিল **1256** শকাব্দে। তৃতীয় সর্গ থেকে ষষ্ঠ সর্গ পর্যন্ত রাজার পিতা কৃতবর্ধন ও রাজপরিবারের অন্যান্যদের গুণকীর্তন করা হয়েছে। রাজধানী মজপহিতের বর্ণনা আছে অষ্টম সর্গে। এই বর্ণনার অধ্যাপক সরকার যে বাংলা অনুবাদ করেছেন এখানে তা উদ্ধৃত করছি : 'রাজপ্রাসাদের আঙ্গিনা ছিল উচ্চ এবং প্রশস্ত প্রাচীর বেষ্টিত: উহা ছিল রক্তবর্ণ প্রস্তর নির্মিত। পশ্চিম প্রবেশ দ্বারের সম্মুখে ছিল বিস্তৃত মাঠ; চত্বরে সারিবাধা বোধিবৃক্ষ ছিল এবং তন্ডগন পুরসভার রক্ষী-গৃহ (করক্ষণ) হইতে সতর্ক প্রহরা দিত। উত্তরের দিকে ছিল প্রধান প্রবেশ-

পথ; উহার দ্বার ছিল লৌহ নির্মিত, দ্বারে নানাবিধ মূর্তি অঙ্কিত ছিল। ইহার বাহিরে ছিল মাঠ; সেখানে সভা হইত, মোরগের লড়াই হইত, বাজার ছিল। পূর্বদিকে ছিল প্রাসাদমালা ও সান্ত্রীগণের উচ্চ রক্ষীগৃহ; দক্ষিণে প্রশস্ত বীথিগুলির সঙ্গমস্থল। রাজপুরীর প্রধান আঙিনার পার্শ্বে ছিল বিতান বা সুদীর্ঘ প্রশস্ত ঘরসমন্বিত চতঙ্গন। উত্তর পার্শ্বে দর্শনার্থী ভুজঙ্গ (ধর্ম সম্পর্কিত রাজকর্মচারী) ও মন্ত্রীদের প্রতীক্ষালয়; পূর্বপার্শ্বে ছিল শৈব ও বৌদ্ধগণের স্থল; সেখানে শ্রাবণ ও ফাল্গুন মাসে বাৎসরিক শুদ্ধি উপলক্ষ্যে জগতের কল্যাণ কামনায় তাঁহারা প্রতিযোগিতা করিয়া ধর্মগ্রন্থ পাঠ করিতেন। সেইদিকে শৈবগণের একসারি হোম করিবার স্থলও ছিল। বিপ্রগণের স্থল ছিল দক্ষিণ দিকে; আর উত্তর দিকে ছিল বৌদ্ধগণের উপাসনার স্থল। রাজপ্রাসাদের প্রধান আঙিনা হইতে দক্ষিণ দিকে অবস্থিত ছিল রাজপুরীর ভৃত্যগণের স্থান। এতদ্ব্যতীত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু মণ্ডপ ছিল পোষাক পরিচ্ছদ পরিবর্তন করিবার জন্য। এই সমস্ত বিভিন্ন শ্রেণীর লোকেরা পদমর্যাদা অনুযায়ী যথাস্থানে অবস্থান করিতেন।'

দশম সর্গে প্রধান রাজকর্মচারীদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। যথা, মন্ত্রী, আর্য, সপরেক, মপতিহ্, দেমুঙ্গ, কনুরুহন, রঙ্গ, তুমেঙ্গুঙ্গ, ক্ষত্রিয়, ভুজঙ্গ, রেষি (ঋষি), বিপ্র, ধর্মাধ্যক্ষ, সপ্তোপপত্তি ইত্যাদি। এয়োদশ থেকে পঞ্চদশ সর্গে আছে মজপহিত সাম্রাজ্যের করদ রাজ্য এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির নাম। সুমাত্রা, বোর্ণিও, মালয় উপদ্বীপ এবং জাভার পূর্বদিকের দ্বীপগুলির নামোল্লেখ আছে। প্রতিবেশী রাজ্যগুলির মধ্যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কয়েকটি রাজ্যের নাম আছে। যবন (আনাম) ছাড়া অন্যান্য রাজ্যগুলিকে মজপহিতের 'রক্ষণাধীন' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই দাবির ঐতিহাসিক ভিত্তি সংশয়াচ্ছন্ন।

73 থেকে 78 সর্গে রাজ্যের বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের পবিত্র স্থানগুলির তালিকা সন্নিবেশিত হয়েছে। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাম হল : 1. ধর্ম লেপস্ প্রতিষ্ঠা শিব (শিব মন্দির সহ দেবোত্তর), 2. ধর্ম কসোগতন কবিনয় লেপস্ (বিনয়ের নিয়মাবদ্ধ বৌদ্ধগণের দেবোত্তর), 3. কসুগতন কবজ্রধরণ অক্রম (বিবাহিত বৌদ্ধগণের বজ্রধর সম্প্রদায়), 4. ধর্মস্ লেপস্ করেষ্যন (ঋষিগণের দেবোত্তর)। দেবালয় বিহীন সীম (স্বাধীন ধর্মস্থান) জাতীয় প্রতিষ্ঠানেরও উল্লেখ আছে। যথা, কশৈবাঙ্কুরাণ (শৈব সম্প্রদায় শাখার ধর্মস্থান), কবোদ্ধাংশন (বৌদ্ধাধীন ধর্মস্থান), করেষ্যাঙ্কুরান (ঋষি সম্প্রদায়ের শাখার ধর্মস্থান), ককদংঘজ্যন (রাজবংশের জ্ঞাতিগণের সীম), বংশ বিন্ধু, দেশ মেড়ঙ্গ্ হুলুন হ্যঙ্গ্ (প্রেতাত্মার উদ্দিষ্ট ধর্মস্থল)। কজগন (কারুশিল্পীবৃন্দের স্থান), কসঙ্ঘকন (বৌদ্ধ সংঘের স্থান),

কস্থাপকন (মঠাধ্যক্ষের বাসস্থান), মণ্ডল (তান্ত্রিক সম্প্রদায়), চতুর্ভস্ম, কত্যাগন, চতুরাশ্রম প্রভৃতি ছোট ছোট নানা ধরণের প্রতিষ্ঠানের তালিকা নাগরকৃতাগমে আছে। এই সব প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধান প্রসঙ্গে অধ্যাপক সরকারের অনুবাদের কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করছি। "এই সমস্ত ধর্মস্থানগুলিকে প্রাচীন দলিল পত্রানুযায়ী স্ব স্ব অধিকারে সুপ্রতিষ্ঠিত করা হইল। যাহাদের দলিল ছিল না তাহাদিগকে উপযুক্ত লোকদ্বারা দলিল পত্রাদি প্রস্তুত করাইতে নির্দেশ দেওয়া হইল। এইরূপে রাজকীয় খতিয়ান পরিশোধন করা হইল। রাজকীয় ধর্মস্থানগুলির সংখ্যা ছিল 27 এবং ইহাদেব তত্ত্বাবধান কবিবার জন্য আর্য বীরাধিকারকে ধর্মাধ্যক্ষ নিয়োগ করা হইল। শৈব অধ্যক্ষের কর্তৃত্ব পরহ্যন্দন এবং কলগ্যনের উপব প্রতিষ্ঠিত হইল। বৌদ্ধ অধ্যক্ষগণ কুটি এবং বিহাব তত্ত্বাবধানের ভার পাইলেন। আর মন্ত্রি হের মজির কর্তৃত্বাধিকার স্থাপিত হইল করেষ্যন বা তপস্বীদের উপর। প্রমাণ-পাট্টা দেখিয়া তিনি এই প্রকার বিভিন্ন ধর্মস্থলের অধিকার যথাযথভাবে স্বীকার কবিয়া লইলেন, কিন্তু যাহারা কোন প্রকাব প্রমাণ উপস্থাপিত করিতে পারিল না তাহাদিগকে "দেশভের্ত্য" বা ভূমিদাসরূপে পরিণত করা হইল।...বলিদ্বীপেও ঠিক একইরূপে প্রমাণাদি গ্রহণপূর্বক ধর্মস্থানগুলির অধিকার সংবক্ষিত হইল। বলিদ্বীপের ধর্মস্থান, গ্রাম কুবু বা খামারের প্রমাণ-পাট্টা দেখিয়া উহাদের অধিকার সংরক্ষিত হইল এবং বৌদ্ধগণের ধর্মস্থানগুলির তত্ত্বাবধান কবিবার জন্য একজন অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন। এই ধর্মস্থানগুলির মধ্যে ছয়টি ছিল বজ্রধর সম্প্রদায়েব ধর্মস্থান একমাত্র বিহারে ছিল বিনয়-নিয়মাবদ্ধ বৌদ্ধগণের একটি ধর্মস্থল।"

84 সর্গে বলা হয়েছে যে জম্বুদ্বীপ, কম্বোজ, চীন, যবন, (আনাম), চম্পা, কর্ণাটক, গোড় (গৌড়) এবং স্যন্ক (শ্যাম) দেশ থেকে অবিচ্ছিন্ন ধারায় এখানে মানুষ এসেছে। তাদের মধ্যে বহু বণিক ভিক্ষু ও ব্রাহ্মণ ছিলেন। 94 সর্গে কবি প্রপঞ্চ এই কাব্যগ্রন্থের নামকরণ করেছেন 'দেশবর্ণন'। তিনি জানিয়েছেন যে তিনি আরও গ্রন্থ রচনা করেছেন। সেগুলি হল শকাব্দ, লম্বঙ্গ, পর্বসাগর, ভিষ্মশরণ, এবং সুগতপর্ববর্ণন। 95 সর্গ থেকে জানতে পারি, তাঁর কবি-প্রতিভা স্বীকৃতি না পাওয়ায় অবহেলাপীড়িত হয়ে তিনি 'কমলসন' নামক আশ্রমে শেষ জীবন অতিবাহিত করেন।

পররতন গ্রন্থটি ষোড়শ শকাব্দের প্রথম দিকে ছিল। এই গ্রন্থে বিবৃত শেষ ঘটনা পঞ্চদশ শকাব্দের আগে ঘটে নি। অধ্যাপক সরকারের অনুমান যে গ্রন্থটি মজপহিত যুগের শেষভাগে আনুমানিক 1278-1478 খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রচিত হয়েছিল। কোন কোন অংশ হয়ত আরও পরবর্তীকালে লেখা

হয়েছে। গ্রন্থটি মধ্য যবদ্বীপীয় গদ্যে রচিত এবং অষ্টাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত। গ্রন্থের প্রথম অংশ উপকথামূলক। তাছাড়া প্রাক হিন্দুযুগের কিছু কিছু ধর্মবিশ্বাসের পরিচয় এখানে পাওয়া যায়। কেন আংগ্রোক ছিলেন সিংহ-সরির প্রথম রাজা এবং মজপহিত রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। কেন আংগ্রোক থেকে গ্রন্থটিতে আর উপকথা পাওয়া যায় না, অর্থাৎ ইতিহাস শুরু হয়েছে।

লেইডেন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে বেশ কয়েকটি গ্রন্থ পাওয়া গেছে। এসব গ্রন্থে ইতিহাস আছে, আবার রোমান্সও আছে। এই গ্রন্থগুলির রচনা-রীতি কিদুঙ্ নামে পরিচিত। পমেন্ডঙ্গ নামক গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। এই গ্রন্থে রাজা ও পুরোহিতদের কথা আছে, গেলগেলের আদিম পুঙ্গবগণের মধ্যে বালিদ্বীপের বন্টনের কথা আছে এবং তাছাড়া আছে করঙ্গ-অসেম রাজাদের বংশ তালিকা। উসন জব (জাভার প্রাচীন ইতিহাস) গ্রন্থে মজপহিত-বাসীদের দ্বারা বলি বিজয়ের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। মজপহিতের রাজা তাঁর ভ্রাতা আর্যদমর এবং তাঁর পতিহ্ গজমদকে বলিদ্বীপ অধিকার করতে পাঠিয়েছিলেন। গ্রন্থটিতে মাঝে মাঝে উপকথার অনুপ্রবেশ ঘটেছে। মধ্য-যবদ্বীপীয় ঐতিহাসিক কাব্য বঙ্গলবের কাহিনী পঞ্জি বিজয়ক্রম নামেও পরিচিত। এই কাব্যে দহ ও তুপমেলের মধ্যে যুদ্ধ, রাদেন বিজয় কর্তৃক মজপহিতের পত্তন, তাঁর কর্মচারী রঙ্গ লবের বিদ্রোহ ইত্যাদি বর্ণিত হয়েছে। কিদুঙ সুন্দ কাব্যে সুন্দ রাজপরিবারের মজপহিত যাত্রার কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। সুন্দ (পশ্চিম যবদ্বীপ) রাজকন্যার সঙ্গে মজপহিতের রাজা হয়ম ভুরুকের বিবাহ উপলক্ষে রাজপরিবার সেখানে গিয়েছিলেন। কিন্তু রাজকীয় মর্যাদার প্রশ্নে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে মতবিরোধ ঘটে, ফলে যুদ্ধ শুরু হয়।

বাবাদ এবং সজর জাতীয় আধুনিক যুগের ইতিহাস গ্রন্থে ঘটনা ও কল্পনার মিশ্রণ ঘটেছে। সপ্তদশ শতাব্দীর পরে যে সব ইতিহাস গ্রন্থ রচিত হয়েছে, সেগুলিতে অজস্র অনৈতিহাসিক ঘটনা স্থান পেয়েছে। এই বিচ্যুতির কারণ হিসাবে হিমাংশু ভূষণ সরকার নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন :

1. মজপহিতের পতন থেকে অষ্টদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা বিবাজমান ছিল।
2. ইসলামের অভ্যুদয়ের ফলে ইতিহাসের প্রাচীন গতিপথ অবরুদ্ধ হয়েছিল।
3. প্রাচীন সাহিত্য সম্পর্কে অজ্ঞতা মানুষের মননশক্তিকে পঙ্গু করে ফেলেছিল।

4. লিখিত ও মৌখিক কিম্বদন্তী পরস্পরকে প্রভাবিত করেছিল।
5. পরবর্তীকালের সংকলকরা দক্ষ ছিলেন না।
6. মজপহিত যুগের পরবর্তীকালের রাজাদের মধ্যে সূর্য ও চন্দ্র বংশের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হবার উদগ্র আকাঙ্খা ছিল।

বাবাধ শ্রেণীর গ্রন্থে নানা ধরণের উপকরণের বিচিত্র সমাবেশ ঘটেছে। বাবাদ তানা জাভিতে রাজবংশের তালিকার মধ্যে মহাভারতের অর্জুন এবং যবদ্বীপীয়দের পূর্বপুরুষরূপে শিব ও ব্রহ্মার নাম পাওয়া যাচ্ছে। এমনকি আদমকেও জাভার রাজাদের পূর্বপুরুষ বলা হয়েছে। এসব গ্রন্থে সময়েব পারম্পর্য রক্ষিত হয়নি, ভুল সন তারিখ দেওয়া হয়েছে এবং কোথাও কোথাও দেশ ও ব্যক্তির নাম সঠিক লেখা হয় নি। এসব গ্রন্থ থেকে ইতিহাসের প্রকৃত উপকরণ আহরণ একান্তই দুঃসাধ্য।

পাদটীকা

এই অধ্যায়ের উপকরণের একমাত্র আকর হল হিমাংশু ভূষণ সরকাব লিখিত 'দ্বীপময় ভারতের প্রাচীন সাহিত্য' গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায় (সাহিত্য সৃষ্টিব পূর্বাভাষ ও সাহিত্যের শ্রেণী বিন্যাস) এবং একাদশ অধ্যায় (ইতিহাস ও কিম্বদন্তী সাহিত্য)। বলা যেতে পাবে ঐ গ্রন্থের তৃতীয় ও একাদশ অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত সার এখানে সংকলিত হয়েছে।

॥ 5 ॥

প্রাচীন মালয়

বিশ্ব ইতিহাসে মালয়ের ভূমিকা

খ্রীষ্টপূর্ব ছয় হাজার বছর আগে অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসী ও পাপুয়ার পূর্বপুরুষগণ মালয় উপদ্বীপের পথ ধরেই তাদের বর্তমান বাসভূমিতে এসে পৌঁছেছিল। খ্রীষ্টপূর্ব দু'হাজার বছর নাগাদ মালাই জাতির পূর্ব পুরুষগণ মালয় উপদ্বীপের নদীপথ দিয়েই য়ুনান অঞ্চল থেকে সুমাত্রা, জাভা ও প্রতিবেশী অঞ্চলে এসেছিল। ইতিহাসখ্যাত শ্রীবিজয় রাজ্য ছিল মালয়ের বৌদ্ধ সাম্রাজ্য। সুদীর্ঘ পাঁচশত বছর ধরে এই সাম্রাজ্যের রণতরী ভারত থেকে চীন এবং চীন থেকে ভারতগামী জাহাজগুলি আটক করেছে। চতুর্দশ শতকে শ্রীবিজয় রাজ্য ও তার উপনিবেশ জাভার শেষ হিন্দু সাম্রাজ্য অর্থাৎ মজপহিত সাম্রাজ্যের কাছে পরাজিত হয়েছিল। মজপহিত সাম্রাজ্যের একজন পলাতক রাজকুমার 1403 খ্রীষ্টাব্দে মালাক্কা বন্দর রাজ্যটি পত্তন করেন। তখন থেকে আনুমানিক একশ বছর ধরে মালাক্কা ছিল বিশ্ব বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত। মালাক্কা থেকেই ভারতীয় ও আরব ধর্মপ্রচারকদের মাধ্যমে ইসলাম ধর্ম প্রতিবেশী অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। 1511 খ্রীষ্টাব্দে আলবুকের্কে মালাক্কা বন্দর দখল করেছিলেন। মশলা দ্বীপপুঞ্জ ও পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসাবে পর্তুগীজরা এই বন্দরকে বাণিজ্যিক ঘাঁটি হিসাবে গড়ে তোলে। 1641 খ্রীষ্টাব্দে ডচেরা পর্তুগালের হাত থেকে মালাক্কা ছিনিয়ে নেয়। প্রায় আড়াই শত বছর ধরে ওলন্দাজ শাসনে মালাক্কা সমৃদ্ধি অর্জন করে। উনিশ শতকে মালাক্কা ব্রিটিশ শক্তির দখলে হস্তান্তরিত হয়। ব্রিটিশ আমলে রাফেল-সের পরিচালনায় অবাধ বানিজ্যনীতির সফল কার্যকর ক্ষেত্ররূপে সিঙ্গাপুর গড়ে ওঠে। এক শতাব্দী পরে মোটরগাড়ি শিল্পের দ্রুত অগ্রগতি ঘটলে টিন ও রবারের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। এই কারণে পৃথিবীর প্রথম দশটি বন্দরের মধ্যে অন্যতম একটি প্রধান বন্দর রূপে এই অঞ্চল সমৃদ্ধি লাভ করে। 1941 সালে জাপান সিঙ্গাপুর দখল করে। জাপান কর্তৃক সিঙ্গাপুর অধিকার ছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আমলে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণ। এইভাবে

যুগ যুগ ধরে বিশ্ব ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে মালয় উপদ্বীপ স্মরণীয় ভূমিকা পালন করেছে।

ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব

সুদূর অতীতকাল থেকেই ভারত ও চীনের মধ্যে সমুদ্রপথে নিরবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ ছিল। এই যোগাযোগের পথের মধ্যখানে মালয়ের অবস্থান। চীন থেকে ভারতবর্ষে পৌঁছাতে হলে পূর্ব ও পশ্চিম মালয়েশিয়া ঘুরে আসতে হত। চীন সাগর থেকে ভারত মহাসাগরে বাণিজ্য সম্ভার লেনদেনের একটা বড় ঘাঁটি ছিল মালয় উপদ্বীপের উত্তরাঞ্চল। মালয় উপদ্বীপ ও বোর্ণিওর উত্তর-পশ্চিম উপকূল ছিল বণিকদের আশ্রয়ভূমি। মে এবং আগস্ট মাসে দক্ষিণ-পূর্ব মৌসুমী বায়ু বিষুবরেখা থেকে ভারত মহাসাগরের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়। নভেম্বর থেকে এপ্রিল মাসে উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ু চীন উপকূল দিয়ে চীন সাগরের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়। দক্ষিণ-পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব মৌসুমী প্রবাহের মিলন ক্ষেত্র হল মালয় উপদ্বীপ। চীন থেকে ভারতগামী জাহাজের যাত্রাপথে উত্তর পূর্ব মৌসুমী এবং ভারত থেকে পূর্ব-গামী জাহাজের যাত্রাপথে দক্ষিণ পশ্চিম বায়ু প্রবাহিত। মৌসুমী বায়ুর গতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জাহাজগুলিও প্রত্যাগমন করত। চীনের বণিকরা নভেম্বর থেকে মে মাসের মধ্যে দক্ষিণে পাড়ি দিত এবং কেনাবেচা শেষ করে মে থেকে আগষ্ট মাসের মধ্যে দেশে ফিরে যেত।

মালয় ভূমি বেষ্টিত নয়। মালয়ের উন্মুক্ত সীমান্ত বাইরের জগতকে নিত্যই আমন্ত্রণ জানিয়েছে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন শক্তিকে প্রলুব্ধ করেছে। নানাদিক থেকে বাণিজ্য সম্ভার এখানে এসেছে। বাণিজ্যের যোগাযোগ ভিত্তি করে নানা ধর্মের ধ্যানধারণা এখানে বিস্তার লাভ করেছে এবং নানা ধরণের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এখানে গড়ে উঠেছে। ভারতবর্ষ ও চীনের মানুষ এখানে অতীতকাল থেকে বসতি স্থাপন করেছে। উনিশ শতকে এখানে কৃষি ও খনিজ সম্পদের প্রলোভনে দলে দলে মানুষ এসে ভিড় জমিয়েছে। পূর্ব পশ্চিম গমনাগমনের পথে অবস্থান বলে, উনিশ শতকের পশ্চিমী জগতে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, শিল্প বিপ্লব ও প্রযুক্তি বিদ্যার ক্ষেত্রে যে বিস্ময়কর অগ্রগতি ঘটেছিল, তার ফলাফল দ্রুত এই অঞ্চলে পৌঁছেছিল। জীবন যাত্রার মানও তাই এখানে অপেক্ষাকৃত উন্নত। মালয়েশিয়ার ইতিহাস রচনায়, মিশ্র জনগোষ্ঠী গঠনে এবং উন্নত অর্থনীতি রূপায়ণে ভৌগোলিক পরিবেশের অবদান ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

আদি বাসিন্দা

মালয়েশিয়ার আদিম জনগোষ্ঠীর প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া গেছে বোর্ণিওতে। সারাবাকের Niah গুহাতে যে অনাবৃত মাথার খুলি পাওয়া গেছে, তার বয়স নিরূপিত হয়েছে আনুমানিক 35,000 বছর। মালয় উপদ্বীপে যে সব নিদর্শন পাওয়া গেছে, সেগুলি আনুমানিক দশ হাজার বছর পুরানো। খ্রীষ্টপূর্ব 2500 সালে উপদ্বীপের অধিবাসীরা উত্তরাঞ্চল থেকে এখানে অনুপ্রবেশ করে। এরা ছিল প্রোটো-মালাই। য়ুনান থেকে দক্ষিণে এরা ছড়িয়ে পড়েছিল। তাদের অভিযানের ফলে আদিম নিগ্রিটো অধিবাসীরা পাহাড়ে অরণ্যে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। এখন তাদের বংশধরগণ উপদ্বীপের উত্তরাঞ্চলে বসবাস করছে। প্রস্তর যুগে, বিশেষ করে খ্রীষ্টপূর্ব 8000—2000 সালের মধ্যে তারা মালয় উপদ্বীপে বন্য পশু শিকার করত এবং জিনিসপত্র কাটা ও পেষণের জন্য পাথরের হাতিয়ার ব্যবহার করত। অনুমান করা হয় তারা ছিল বরফের যুগের (খ্রীষ্ট পূর্ব 200,000) অস্ট্রেলিয়ার আদি বাসিন্দারের বংশধর। তখন ভৌগোলিক দিক দিয়ে অস্ট্রেলিয়া হয়ত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। কিন্তু মালয় উপদ্বীপের প্রোটো-মালাইদের বাসভূমি ছিল দক্ষিণ চীন। সেখান থেকে তারা খ্রীষ্টপূর্ব 2500—1500 সালের মধ্যে উপদ্বীপে প্রবেশ করে। বোর্ণিওর dyakরা প্রোটো-মালাইদের বংশধর।

মালয়েশিয়ার গুয়াছা (Guacha) ও কেলানতন (Kelantan) অঞ্চলে তাদের বসবাসের যে নিদর্শন পাওয়া গেছে, তা থেকে অনুমান করা হয়েছে যে পাত্র ও অলঙ্কার তৈরী বিদ্যায় তারা পারদর্শী ছিল। শুধুমাত্র শিকারী হিসাবেই তারা পরিচিত নয়, তারা ছিল কৃষক ও নাবিক। কাঠের ঘরবাড়ি ও নৌকা নির্মাণের বিদ্যা তারা জানত। তারা জমি চাষ করত এবং ঝুম চাষকর্ম শুরু করেছিল।

খ্রীষ্টপূর্ব 300 সালে চীনের য়ুনান অঞ্চল থেকে দুতারো-মালাই (Deutero-Malay) নরগোষ্ঠীর লোক মালয় উপদ্বীপে আসে। তাদের চাপে প্রোটো-মালাইরা দক্ষিণ মালয় অঞ্চলে সরে আসে। অধুনা তারা জাকুয়ান (Jakuan) নামে পরিচিত। দুতারো-মালাইরা মোঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীভুক্ত। কিন্তু তারা ধাতুর ব্যবহার জানত এবং লোহার তৈরী অস্ত্রশস্ত্রের হাতিয়ার ব্যবহার করত। তাদের ব্যবহৃত ব্রোঞ্জ-নির্মিত ড্রাম ও ঘণ্টা ক্লাং (Klang) ও সেলাংগোর (Selangor) অঞ্চলে আবিষ্কৃত হয়েছে। তারা যাযাবর নয়। তারা ছিল স্বনির্ভর স্বয়ং সম্পূর্ণ গ্রামের অধিবাসী। খ্রীষ্টপূর্ব

4—

প্রথম শতকে উপকূলবর্তী গ্রামগুলির মধ্যে ব্যবসাবাণিজ্য শুরু হয়েছিল। জমি ছিল গ্রামের যৌথ সম্পত্তি। উৎপন্ন দ্রব্য গ্রামের মানুষদের মধ্যে বণ্টিত হত। তারা ছিল প্রকৃতি পূজায় অভ্যস্ত। বৃক্ষ, প্রস্তর ইত্যাদির দেবদেবীর পূজা তাদের দৈনন্দিন জীবন নিয়ন্ত্রিত করত। মৃগয়ায় যাবার আগে শিকারী পূজা করত অরণ্যের দেবদেবীর, মৎস্য শিকারে যাবার আগে ধীরব পূজা করত সাগরের দেবদেবীর।

মিশ্রসংস্কৃতি

সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এবং বিশেষ করে মালয় উপদ্বীপের সবচেয়ে আদিম বাসিন্দা হল খর্বাকৃতি নেগ্রিটো। কেদা ও পেরাকে তারা সেমাঙ নামে এবং কেলানতনে তারা পঙ্গন নামে পরিচিত। জঙ্গলের ফলমূল খেয়ে তারা যাযাবরের মত জীবন ধারণ করত। তাদের অস্ত্র ছিল তীরধনুক। ঘরবাড়ি বানাতে বা নৌকা তৈরী করতে তাবা জানত না। তাদের লোভ ছিলনা, তাদের অপরাধ প্রবণতাও ছিলনা। তাদের জীবন ছিল পরিবারকেন্দ্রিক। তাদের দলীয় সংগঠন ছিলনা, শাসক ছিলনা। বজ্রের শব্দ শুনে এবং বিদ্যুতের ঝলকানি দেখে তারা ভয়ে কাঁপত এবং এগুলির পিছনে যে অদৃশ্য শক্তি সক্রিয়, তাকে তুষ্ট করার জন্য নিজেদের দেহ থেকে রক্ত বার করে তার প্রতি অর্পণ করত।

পাহাড়ে এবং পর্বতের পাদদেশে থাকত সে সব আদিবাসী তাদের বলা হত সকাই (Sakai) বা সিনোই (Senoi)। মোন-আন্নাম গোষ্ঠীর ভাষায় তারা কথা বলত। য়ুনান, ইন্দোচীন ও মালয় দ্বীপপুঞ্জের গিরিবাসী আদিবাসীদের সঙ্গে তাদের খুব মিল পাওয়া যায়। পর্বতের পাদ-দেশে যারা বাস করত তাদের সঙ্গে উত্তরের নেগ্রিটো এবং দক্ষিণের জাকুয়ান (Jakuan) বা আদিমালয় (Proto-Malay) গোষ্ঠীর বৈবাহিক সম্পর্ক ছিল। তাদের দেহে অস্ট্রেলীয়-মেলানেশীয় (Australo-Melanesoid) অর্থাৎ পাপুরা এবং অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের রক্তের সংমিশ্রণ ঘটেছে। ধান, ইক্ষু, যব, কলা, এবং তামাকের চাষ তারা জানত। মালাইদের মত তাদের ধর্ম ছিল সর্বপ্রাণবাদ (animism) এবং মালাই ও মোঙ্গলদের মত তারা Samanism মতবাদে বিশ্বাস করত।

মালয়ের দক্ষিণাংশে যে সব আদিবাসী বাস করত তাদের বলা হত জাকুয়ান (Jakuan)। তাদের প্রোটো-মালাই পূর্বপুরুষরা য়ুনান থেকে রওনা হয়ে ইন্দোচীন অতিক্রম করে এখানে এসেছে। তাদের মধ্যে ইন্দোনেশীয়,

মোঙ্গোলীয় ও আরও নানা বিদেশী রক্তের ধারা মিশেছে। তাদের অনেকের মধ্যেই অস্ট্রেলীয়-মেলানেশীয় রক্তের চিহ্ন পাওয়া গেছে। বনবাসী আদিবাসীরা ফলমূল খেয়ে আর সামুদ্রিক আদিবাসীরা মাছ ধরে জীবনযাপন করত। 1515 খ্রীষ্টাব্দে পর্তুগীজ লেখক তোমে পিরেস (Tome Pires) তাদেরকে Cellates নামে অভিহিত করেছেন। Cellates কথাটির মানে স্ট্রেটসের মানুষ। মালাক্কার প্রতিষ্ঠাতা তাদের পদ বা উপাধিতে ভূষিত করেন। যেমন, বেন-দাহারা বা প্রধানমন্ত্রী, লখসমন বা নৌবাহিনীর অধিনায়ক। এমন কি অষ্টাদশ শতকে জোহোরের সুলতানের তারা ছিল একনিষ্ঠ অনুগামী। তিনিও তাদের অনেককেই নানা উপাধিতে বিভূষিত করেছিলেন। তারাও প্রকৃতি পূজা করত। তারা বিশ্বাস করত পাহাড়ে ছড়িয়ে আছে নানা অশরীরী জীবন্ত আত্মা। সভ্য প্রতিবেশীদের কাছ থেকে তারা হিন্দু দেবদেবীর আরাধনা শিখেছিল। তাদেরও ভাষা ছিল মালাই। বিদেশী শব্দ তাদের মধ্যে চলন হয়নি বললেই চলে।

আধুনিক মালাই-এর মধ্যে আদি মালাই এবং বিবাহ সূত্রে প্রাপ্ত নানা রক্তের সংমিশ্রণ পাওয়া যায়। যাদের সঙ্গে রক্তের সংমিশ্রণ ঘটেছে, তাদের মধ্যে অন্যতম হল চৌ আমল থেকে শুরু ইসলামের আগমন পর্যন্ত চীনা, দাক্ষিণাত্য ও বাঙলা দেশের হিন্দু, ভারতীয় মুসলমান এবং শ্যামদেশ ও আরব থেকে আগত মানুষ।

মালাই জাতি অতি সুসভ্য। যুগ যুগ ধরে তাদের শাসন ব্যবস্থা, আইন সংকলন, সামুদ্রিক আইনকানুন তাদের উচ্চমার্গের জ্ঞানবিভাসিত জীবন-চর্চার পরিচয় দিচ্ছে। 1879 খ্রীষ্টাব্দে *The Golden Chersonese* এর লেখিকা Isabella Bird মুগ্ধ হয়ে লিখেছিলেন, "The Malayas undoubtedly must be numbered among civilized peoples. They have possessed for centuries systems of Government and codes of law and maritime law which in theory at least show a considerable degree of enlightenment."

বিদেশীরা বিশেষ করে ব্রিটিশ লেখকরা মালাইদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। স্বজাতীয়ত্ব সম্বন্ধে তারা গর্বিত। ইসলাম ধর্ম বিষয়ে তাদের মর্যাদাবোধ তীক্ষ্ণ। জীবনের উচ্চতর মূল্যবোধে তারা আস্থাবান। মালয় আদিবাসীদের আচার আচরণ প্রশংসনীয়। হিন্দু সংস্কৃতির ঐতিহ্য ও ইসলাম ধর্মের প্রভাবে তারা আত্মপ্রত্যয় লাভ করেছে। জাগতিক বিষয়ে তারা বুদ্ধিমান ও সতর্ক। তাদের পারিবারিক জীবন সুখী ও শান্ত।

ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ

কোরোমণ্ডল উপকূল থেকে বেরিয়ে বঙ্গোপসাগর অতিক্রম করে ভারতীয় বণিকরা আশ্রয় নিত মালয় উপদ্বীপের ত্রাং (Trang) ও কেদার (Kedah) মধ্যবর্তী কোন স্থানে। খ্রীষ্টীয় প্রথম কয়েক শতকে ভারতবর্ষের সঙ্গে মালয় উপদ্বীপের সম্বন্ধ শুধুমাত্র বণিকদের যাতায়াতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী নাগাদ উপদ্বীপের কোন কোন অঞ্চলে ভারতীয় বণিকদের স্থায়ী বসতি গড়ে উঠেছিল। বাণিজ্যিক সুযোগ সুবিধায় কেদার আকর্ষণ ছিল সবচেয়ে বেশী। নাবিকদেব আশ্রয়ের প্রথম ভূখণ্ড ছিল কেদা। কেদার পাহাড়ের চূড়া (3987 ফিট) সমুদ্রেব মধ্যে ত্রিশ মাইল দূর থেকেও দৃষ্টিগোচর ছিল। ভারতীয় বণিকদের দৃষ্টিতে কেদার চূড়া ছিল ঈশ্বরেব নিকেতন। কেদার সুঙ্গি মাববক ছিল সুগম্য পোতাশ্রয়। এর বিস্তীর্ণ সমতল ভূমিতে বণিকদের প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্যেব চাষবাস হত। এখান থেকে পূর্ব উপকূলে পাটানি (Patani) পৌঁছান ছিল সহজসাধ্য। এসব কারণে সুঙ্গি বুজাঙ (Seungi Bujang) এর উপকূলে চতুর্থ শতক থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত ভারতীয় বণিকদের বসতি গড়ে উঠেছিল। এখানে উন্নত বন্দর ছিল, উৎসব মুখর মন্দির ছিল, সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থা ছিল, সুসংগঠিত সরকার ছিল। রাজকীয় প্রথা ও রীতিনীতি ভারতীয় ধাঁচে গড়ে উঠেছিল। সাধারণ মানুষেব জীবনাচরণে ভারতীয় ও আঞ্চলিক সংস্কৃতির মিশ্র প্রভাব পড়েছিল। বিপুল সংখ্যক ভারতীয়দের বসতি স্থাপিত হয়নি। শুধুমাত্র বণিক ও ধর্ম প্রচারকরাই এখানে এসেছিল। জনসংখ্যার রদবদল ঘটেনি। কেদার স্থানীয় মানুষরা ভারতীয় জীবনাচরণ গ্রহণ করেছিল। কেদায় ভারতীয় সংস্কৃতির প্রসার ঘটেছে, একথা সত্য। স্মর্তব্য যে ভারতীয় উপনিবেশ সেখানে স্থাপিত হয়নি। ইৎ-সিঙ এর বিবরণ থেকে জানা গেছে যে সপ্তম শতকে সেখানে সহস্রাধিক বৌদ্ধ ভিক্ষুক বৌদ্ধ শাস্ত্রচর্চায় নিয়োজিত ছিল। সংস্কৃত ভাষার সমাদর ছিল। মাসের ভারতীয় নাম ও ভারতীয় হিসাব পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। খ্রীষ্টীয় 300 থেকে 550 সাল পর্যন্ত বৌদ্ধ প্রভাব প্রবল ছিল। কেদাতে অনেক বৌদ্ধমঠ ও গুপ্তযুগেব শিল্পরীতিতে সৃষ্ট মূর্তি পাওয়া গেছে। সপ্তম থেকে একাদশ শতক পর্যন্ত শ্রীবিজয় সাম্রাজ্যের প্রভাবের চিহ্ন দেখা গেছে। এই সময় কেদা ছিল কৃষি সমৃদ্ধ অঞ্চল-রূপে সমধিক পরিচিত। একাদশ থেকে চতুর্দশ শতকের মধ্যে কেদা বাণিজ্য কেন্দ্র হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। এই সময়েই বাণিজ্যপথ ইসথমাস প্রণালী থেকে মালাক্কা প্রণালীতে স্থানান্তরিত হয়েছিল।

ফুনান রাজ্য দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে ভারতীয় সভ্যতার প্রভাবে গড়ে

উঠেছিল। খ্রীষ্টীয় প্রথম থেকে সপ্তম শতক পর্যন্ত এই রাজ্য বিপুল প্রতি-পত্তি অর্জন করেছিল। ভারত মহাসাগর থেকে দক্ষিণ চীন সমুদ্র পর্যন্ত যে ইসথমাস বাণিজ্যপথ ছিল, ফুনান রাজ্য তা নিয়ন্ত্রণ করত। খ্রীষ্টীয় 568 সালে এই রাজ্য চীনে দূত প্রেরণ করে। মালয়েশিয়ার কেদা অঞ্চলেও ফুনানের প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল।

ফুনানের উত্তরসূরী ছিল শ্রীবিজয় রাজ্য। খ্রীষ্টীয় 670-73 সালে শ্রীবিজয় রাজ্য চীনে দূত পাঠিয়েছিল। সুমাত্রার পালেমবাঙ ছিল শ্রীবিজয় রাজ্যের রাজধানী। এই রাজ্যও ছিল বৌদ্ধ শাস্ত্র চর্চার পীঠভূমি। চীন থেকে ভারতবর্ষ যাবার পথে আনুমানিক 670 খ্রীষ্টাব্দে ইৎ-সিঙ এই রাজ্যে এসেছিলেন। সপ্তম শতকের শেষে মালাক্কা প্রণালীর দক্ষিণ ভাগ শ্রীবিজয় রাজ্যের কবলিত হয়। পরে উত্তরে লিগোর (Ligor) পর্যন্ত মালয়ে এর প্রভাব বিস্তৃত হয়। অষ্টম শতকের শেষে এই রাজ্য মালাক্কা প্রণালীর উভয় প্রান্ত এবং বোর্ণিওর পশ্চিম উপকূল নিয়ন্ত্রণ করেছিল। শ্রীবিজয় রাজ্যের সুশাসনে জলদস্যুদের উৎপীড়ন হ্রাস পায়। মালাক্কা প্রণালীর বাণিজ্য-পথ নিরাপদ হয়। আগামী তিনশত বছর ধরে মালয় অঞ্চলে শ্রীবিজয় রাজ্যের প্রভাব প্রতিপত্তি অক্ষুন্ন ছিল। এই সময় কিন্তু এই অঞ্চলের প্রধান বাণিজ্য বন্দর ছিল কেদা নয়, টাকুওয়াপা। টাকুওয়াপা ক্রা যোজকের পশ্চিম তীরে কিছু উত্তরে অবস্থিত।

মধ্য জাভা অঞ্চলে শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজাদের অভ্যুত্থানের পর শ্রীবিজয়ের আরও শ্রীবৃদ্ধি হয়েছিল। নবম শতকের মাঝামাঝি শৈলেন্দ্র রাজ্য ও শ্রীবিজয় রাজ্যের মধ্যে ঐক্য সাধিত হয়। একাদশ শতকে শ্রীবিজয় রাজ্য সুমাত্রার পূর্বউপকূল, পশ্চিম জাভা, মালয় উপদ্বীপ এবং বোর্ণিওর দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ এই বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে প্রসারিত হয়েছিল। মালয় উপদ্বীপে তখন কেদা একটি প্রধান বানিজ্য কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। তখন আরবের বণিকরা কেদাতে এসে চীনের সামগ্রী ক্রয় করত। মালাক্কা প্রণালী ও সুন্দা প্রণালী এই দুই বাণিজ্য পথের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা শ্রীবিজয় রাজ্যের করতলগত ছিল। তাই বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার স্থাপনে এই রাজ্যের শাসকরা ছিল বিশেষ প্রয়াসী। ফলে তাদের শত্রুসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। একাদশ শতকে দক্ষিণ ভারতের পরাক্রান্ত চোলশক্তি দ্বারা তারা আক্রান্ত হয়েছিল। দ্বাদশ শতকের মধ্যভাগে পূর্ব জাভাতে একটি প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি জেগে ওঠে। সুমাত্রার কোন কোন অঞ্চল, যেমন কামপর স্বাধীনতা ঘোষণা করে। মালয় উপদ্বীপও বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।

উত্তরে ও দক্ষিণে দুটি রাজ্যের উত্থানে শ্রীবিজয়ের পতন ত্বরান্বিত হয়েছিল।

উত্তরে সুখোতাই এবং দক্ষিণে কেদিরি রাজ্য। এখন যে অঞ্চলে শ্যাম-দেশ, সেখানে থাইরা সুখোতাই রাজ্য স্থাপন করেছিল। এয়োদশ শতকের প্রথম থেকেই জাভার কেদিরি রাজ্য প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। মালয় উপদ্বীপে শ্রীবিজয়ের বিজিত অঞ্চলগুলি সুখোতাই এর শাসকদেব হস্তগত হয়। 1292 সালে সুখোতাই লিগোব (Ligor) দখল করে দক্ষিণের দিকে অগ্রসর হয়। ভেনিসের বণিক ও পর্যটক মার্কোপোলো চীনে সতেরো বছর অতিবাহিত করে দেশে ফেরার পথে 1292 সালে সুমাত্রায় এসে পৌছান। তাঁর বিবরণে শ্রীবিজয় সাম্রাজ্যের উল্লেখ আমরা পাইনা। এই অঞ্চলে আটটি ছোট ছোট বাজ্যের কথা তিনি বলেছেন। অনুমান করা হয় যে শ্রীবিজয় সাম্রাজ্য এই আটটি ক্ষুদ্র রাজ্যে ছিন্নবিছিন্ন হয়ে পড়ে।

খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতকে মালয় উপদ্বীপের অধিকাংশ অঞ্চল শ্যাম বা থাইদের প্রভাবাধীন হয়ে পড়ে। বোর্ণিওর শক্তিশালী রাজ্য ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জের জাভার মজপহিত রাজ্যেব অন্তর্গত হয়। সমগ্র মালয় উপদ্বীপ যে থাইদের অধীন হয়, তা ঠিক নয়। সিঙ্গাপুব দ্বীপেব তুমাসিক (Tumasik) রাজ্য 1299 সালে প্রতিষ্ঠিত হযেছিল। এই বাজ্য সাফল্যের সঙ্গে থাই আক্রমণ প্রতিহত করে। এতদিন ধাবণা ছিল যে মজপহিত সাম্রাজ্য শ্রীবিজয় সাম্রাজ্যের চেয়ে অনেক বেশী বিস্তৃত ছিল। এ ধারণা এখন অতি-বঞ্জিত মনে করা হয়। শুধুমাত্র পূর্ব-জাভা, মাদুরা ও বলিদ্বীপ ছিল মজপহিত সাম্রাজ্যের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন। দক্ষিণ-পূর্ব সুমাত্রা ও পশ্চিম বোর্ণিওতে অবস্থিত কয়েকটি অধস্তন রাজ্যে এই সাম্রাজ্যেব প্রভাব ছিল প্রসাবিত। অনেকের ধারণা সম্ভবত মালয় উপদ্বীপ মজপহিত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিলনা। কিন্তু Winstedt তা মনে করেন না। তাঁব মতে, 'at some time between 1338 and 1365 her last Hindu empire Majapahit conquered Sumatra and Malay Peninsula leaving to this day Javanese words in the kedah dialect, and the Majapahit Shadow-play in kelantan.' এই সময় অবশ্য ব্রুনি ছিল মজপহিতের করদ-রাজ্য। মজপহিত সাম্রাজ্যের শেষ সম্রাট ব্রুনিকে তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। চতুর্দশ শতকে একদিকে যেমন মালয় উপদ্বীপে মজপহিত সাম্রাজ্যের প্রভাব ছিল ক্ষীণ ও নগন্য, ঠিক তেমনি থাই প্রভাব দিনের পর দিন প্রবল হতে থাকে। চতুর্দশ শতকের শেষ দিকে তুমাসিক আয়ুথিয়ার থাই রাজ্যের অধীনতা স্বীকার করে নেয়। মালয় উপদ্বীপে রাজনৈতিক দিক দিয়ে থাইরা প্রাধান্য পেয়েছে, কিন্তু সংস্কৃতি ক্ষেত্রে সেখানে তুলনামূলক ভাবে থাই বৌদ্ধধর্মের চেয়ে মজপহিত সাম্রাজ্যের হিন্দু প্রভাবই ছিল অধিক সক্রিয়।

সহস্রাধিক বৎসর যাবৎ মালয়ের সঙ্গে ভারতবর্ষের সম্বন্ধ বিদ্যমান। ভারতীয়দের মালয়ে আগমনের ধারা সুদূর অতীত থেকেই অব্যাহত ছিল। ভারতে ইসলামের আগমনের পর এই ধারা প্রবলতর হয়েছে। তোমে পিরেসের মতে পর্তুগীজদের মালয়ে অনুপ্রবেশের কালে সেখানে প্রায় একহাজার গুজরাটি বণিক বসবাস করত। তাছাড়া ছিল অনেক ক্লিং (Kling) বণিক। তামিল, তেলেগু, মালয়ালাম ভাষাভাষী সব দক্ষিণ ভারতীয় ক্লিং নামে পরিচিত ছিল। সম্ভবত কলিঙ্গের নামানুসারে ক্লিং কথাটি এসেছে।[1] আধুনিক যুগে মালয়ের ভারতীয়দের অধিকাংশ মাদ্রাজবাসী তামিল শ্রমিক। রবার বাগিচা, রেল লাইন ও পূর্তবিভাগে তারা কাজ করত এবং তিন বছর পরে কাজের শেষে স্বদেশে ফিরত। পরে অবশ্য তামিল কেরানী, ওভারসিয়ার, শিক্ষক, চিকিৎসক, আইনজীবী ও বণিক দলে দলে এসেছে।

চীনের সঙ্গে যোগাযোগ

চীনের সঙ্গে মালয়ের যোগাযোগ প্রাক-ইতিহাস পর্ব থেকে বিদ্যমান। চীনা ইতিহাস লিয়াঙ ইতিবৃত্তে [*History of the Liang Dynasty* (A. D. 502-556)] লংকাসুক কেদা-র উল্লেখ আছে। এই গ্রন্থে বলা হয়েছে যে খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে অন্তত চারবার লংকাসুকের রাজারা চীনে দূত পাঠিয়েছিলেন। এটাই হল চীনা ইতিহাসে মালয়ের প্রথম উল্লেখ। পঞ্চদশ শতকের মালাক্কার মালয় কাহিনীতে (*Malay Annals*) মালয় উপদ্বীপের চীনাদের প্রসঙ্গে প্রথম উল্লেখ পাওয়া গেছে। জনশ্রুতি ও ঐতিহাসিক তথ্য মিশিয়ে এই কাহিনীতে বলা হয়েছে যে আনুমানিক 1456 খ্রীষ্টাব্দে চীন সম্রাট মালাক্কার সুলতান মনসুর শাহের সঙ্গে বাণিজ্যিক যোগাযোগ গড়ে তুলেছিলেন। উনিশ শতকের শুরু থেকেই টিন ও রবারের সন্ধানে অগণিত চীনা এখানে এসেছে। তারা এসেছে কোয়াংটুং (Kwang-tung) এবং ফুকিয়েন (Fukien) থেকে। মালয়ের পেনাঙ, সিঙ্গাপুর এবং ব্রিটিশ শাসনাধীন মালয় রাজ্যগুলিতে তারা ছড়িয়ে পড়েছিল। প্রবাসী চীনাদের মধ্যে অনেকেই ছিল হাক্কাস (Hakkas) ও তিওচুস্ (Teochus)। তিওচুসদের অনেকেই ছিল ধীবর। হাইনান দ্বীপ থেকে যে সব চীনা এসেছিল, তাদের অনেকেই ছিল শিক্ষিত ভৃত্য, দোকানদার ও ছোটখাটো আবাদী-জমির মালিক। মালয়ের ব্যবসাবাণিজ্যের প্রায় সবটুকুই ছিল চীনাদের করায়ত্ত। খেতখামার, খনি, ব্যাঙ্ক, রবার বাগিচা কুক্কুটাদি পালন (Poultry), শূকর পালন সবক্ষেত্রেই তাদের দেখা যেত। চিকিৎসক, আইনজীবী, হিসাবনবীশ, আমলাতন্ত্র, শিক্ষক, ঠিকাদার, গ্রন্থবিক্রেতা. হোটেল চালক, ছুতোর, ধীবর, সব পেশাতেই তাদের অবাধ আনাগোনা ছিল।

Winstedt এর ভাষায়, **'Without the Chinese, Malay, having no** surplus population of unemployed Malayas, could never have **developed.'**

পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত মালয়েশিয়ার ইতিহাসে দু'টি প্রবণতা খুব স্পষ্ট। প্রথমত, ভারত ও চীনের মত দু'টি বিরাট সভ্যতার কেন্দ্রভূমি থেকে সমদূরে মালয়ের ভৌগোলিক অবস্থান। তাই এই দুই সভ্যতার নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ এখানে অনুভূত হয়েছে। শুধুমাত্র এই দুই দেশের বণিক সম্প্রদায় নয়, এমনকি সুদূর আরবদেশের বণিকরাও এখানে আশ্রয় নিয়েছে এবং বসতি গড়েছে। দ্বিতীয়ত, একথা স্মর্তব্য যে মূলত চীনের প্রভাব ছিল রাজনৈতিক, ভারতের সাংস্কৃতিক। চীন ছিল ঐক্যবদ্ধ পরাক্রান্ত শক্তি। চীনের পরাক্রমকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলি সমীহ করেছে। তারা কোন না কোন সময়ে চীনকে রক্ষাকর্তা ভেবেছে। তাই চীনের কাছে তারা মাঝে মাঝে দূত পাঠিয়েছে, সওগাত দান করেছে। কিন্তু চীনের কনফুসীয় রাষ্ট্রদর্শন ও জীবনবীক্ষা এবং তাও মতবাদ মালয় গ্রহণ করেনি। ভারতবর্ষ থেকে বৌদ্ধধর্ম চীনে পৌঁছেছে ঠিক তেমনি বৌদ্ধধর্ম ও হিন্দুধর্ম মালাইদের মানসলোক ও সমাজ জীবনকে প্রভাবিত করেছে। **Winstedt** এর মতে মালয়ে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব ছিল স্থায়ী, গভীর ও সুদূর প্রসারী। সে তুলনায় চৈনিক সভ্যতার প্রভাব ক্ষীণ ও নিষ্প্রভ।[2]

পাদটীকা

1. ক্লিং বলতে সাধারণত কলিঙ্গবাসীকে বোঝান হয়। অনেকের ধারণা কলিঙ্গ মানেই উড়িষ্যা। দীনেশ চন্দ্র সরকার মনে করেন যে প্রাচীন যুগে কলিঙ্গ বলতে শুধুমাত্র উড়িষ্যা বোঝাত না। দক্ষিণ-পশ্চিমে কৃষ্ণা এবং উত্তর-পূর্বে মহানদীর মধ্যবর্তী উপকূলভূমিকে কলিঙ্গ নামে চিহ্নিত করা হত। কিন্তু খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে অন্ধ্রপ্রদেশে শ্রীকাকুলামের সন্নিকটে অবস্থিত কলিঙ্গনগরের একটি রাজ্য কলিঙ্গ নামে পরিচিত ছিল। তাঁর মতে উপকূল অঞ্চলের ওড়িয়া ভাষাভাষী এবং তেলেগু ভাষাভাষী মানুষ ছিল কলিঙ্গের অধিবাসী। এই প্রসঙ্গে তিনি আরও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে যদিও ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলের মানুষ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পাড়ি দিয়েছিল, কিন্তু দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমাঞ্চল এবং পূর্ব ভারতের মানুষ ছিল এ ব্যাপারে অগ্রগামী এবং ভারতীয় সংস্কৃতির প্রসারে তাদের ভূমিকা ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

D. C. Sirkar, 'Karnata Contribution to the Spread of Indianism in South-East Asia.' *Studies in Asian History* (Asia Publishing House, 1969) pp. 286-288.

2. প্রাচীন ইন্দোনেশিয়ার ক্ষেত্রে চীনা ও ভারতীয় প্রভাবের তুলনামূলক বিচার করে হিমাংশু ভূষণ সরকার দেখিয়েছেন যে দীর্ঘকাল ইন্দোনেশিয়ায় বসবাস করেও চীনাগোষ্ঠী সেখানকার ভাষা, সাহিত্য, শিল্প, ধর্ম, সমাজ ও শাসন ব্যবস্থায় কোন গভীর ছাপ রাখতে পারে নি। কারণ চীনের লক্ষ্য ছিল রাজনৈতিক—হান সাম্রাজ্যবাদের প্রতিষ্ঠা। উপনিবিষ্ট ভারতীয়রা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত ছিল না। আঞ্চলিক সংস্কৃতির প্রতি তারা ছিল শ্রদ্ধাশীল। এই উদারতার জন্যই ভারতীয় সংস্কৃতি সেখানে সহজেই প্রসার লাভ করেছে।

H. B. Sarkar, *Some Contributions of India to the ancient civilisation of Indonesia and Malaysia* (Calcutta 1970) p. 1-2.

॥ 6 ॥

প্রাচীন ইন্দোনেশিয়া

উপক্রমণিকা

যুগ যুগ ধরে চীন, ভারতবর্ষ, পশ্চিম এশিয়া ও ইউরোপ বাণিজ্যিক যোগাযোগের দৃঢ় বন্ধনে পরস্পর অঙ্গাঙ্গি জড়িত। বাণিজ্যিক লেনদেনের জলপথে ইন্দোনেশিয়ার ভৌগোলিক অবস্থান। এখানে তাই গড়ে উঠেছে বাণিজ্য-নির্ভর সাম্রাজ্য। দক্ষিণ এশিয়া ও পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে ইন্দোনেশিয়ার আত্মীয়তা চিরকালই ছিল নিবিড় ও অন্তরঙ্গ। বহিরাগত সংস্কৃতির ধারা এখানে আঞ্চলিক সংস্কৃতির সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে জৈব সমন্বয় সাধন করেছে। ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জের আশেপাশের সমুদ্র অপেক্ষাকৃত শান্ত, সুগম ও নাব্য। একারণে বিভিন্ন দ্বীপের মানুষের মধ্যে নিরন্তর ভাব বিনিময় ঘটেছে। কিন্তু সমগ্র দ্বীপপুঞ্জ জুড়ে রাজনৈতিক ঐক্য ও অখন্ড জাতীয় চেতনা সৃষ্টির পথে সমুদ্র অন্তরায় হয়েছে। খ্রীষ্টপূর্ব দু'হাজার বছর জুড়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মূল ভূ-খন্ড ও দক্ষিণ চীন থেকে অবিরাম জন-স্রোতধারা এখানে প্রবহমান ছিল। ধানচাষ ও নৌবিদ্যায় ইন্দোনেশিয়ার মানুষ ছিল পারদর্শী। এশীয় বাণিজ্যে তারা ছিল অগ্রণী। ছোট ছোট অনেকগুলি বিখ্যাত ও অকীর্তিত রাজতন্ত্র শাসিত রাজ্যে ইন্দোনেশিয়া বিভক্ত ছিল। মুখোশ নাট্য, **Gamelan** অর্কেস্ট্রা ও বাটিক শিল্পে তাদের সাংস্কৃতিক কর্মকৃতি প্রতিফলিত হয়েছিল। অন্যান্য অস্ট্রিকভাষী জনগোষ্ঠীর মত ইন্দোনেশিয়ার মানুষও গাছ, পাথর, পাহাড়, ফলমূল, ফুল, পশুপক্ষী ও বিশেষ স্থানের উপর দেবত্ব আরোপ করে পূজো অর্চনা করত। তাদের ধর্মীয় আচার আচরণে সর্বপ্রাণবাদ (animism) ও ভৌতিক ক্রিয়াকলাপ প্রাধান্য পেয়েছিল।

খ্রীষ্টীয় প্রথম তিন শতকে ভারতীয় (হিন্দু ও বৌদ্ধ) সভ্যতার প্রভাব ছিল অপরিমেয়। ইন্দোনেশিয়ার বন্দরে বন্দরে যে সব ব্যাপারী বণিক ব্যবসায়ী, রাজপাদোপজীবী এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বসবাস করত, তাঁদের মাধ্যমে ভারতীয় সভ্যতা সেখানে ছড়িয়ে পড়েছিল। ধর্মীয় আচার আচরণ, সাহিত্য,

স্থাপত্য এবং শাসন সংগঠনের রীতিনীতির মধ্যে ভারতীয় প্রভাব ছিল প্রবল ও গভীর। সপ্তম, অষ্টম ও নবম শতকে চার পাঁচটি বড় বড় সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় হয়েছিল। সপ্তম শতকের শেষে সুমাত্রায় শ্রীবিজয় সাম্রাজ্যের আবির্ভাব ঘটে। শ্রীবিজয় সাম্রাজ্য ছিল বৌদ্ধশাস্ত্রচর্চার পীঠস্থান। ভারত ও চীনের মধ্যে শ্রীবিজয়ের অর্ণবপোত নিত্য যাতায়াত করত। একদিকে চীন এবং অন্যদিকে ভারত ও আরব সাগরের মধ্যে মালাক্কা ও সুন্দার পথে বাণিজ্য চলত। এই বাণিজ্যের উপর শ্রীবিজয় সাম্রাজ্যের অবাধ আধিপত্য ছিল। মধ্যজাভার কলিঙ্গ সাম্রাজ্যের খ্যাতি ছিল বিশ্বজোড়া। অষ্টম শতকের বৌদ্ধ বরো বুদুর এবং নবম শতকের হিন্দু প্রাম্বানান মন্দিরের ভাস্কর্য অদ্যাপি বিশ্বের বিস্ময়। শুধুমাত্র শিল্প কুশলতা দিয়ে নয়, সুস্থিত আর্থিক বনিয়াদ এবং নিপুন রাষ্ট্রীয় শাসন সংগঠন ছাড়া, এত বিরাট কীর্তি সম্ভব নয়, তাও সহজেই অনুমেয়। খ্রীস্টীয় 900 থেকে 1500 সাল পর্যন্ত, অর্থাৎ ছ'শ বছর ধরে যবদ্বীপ বা জাভার ইতিহাস পর্ব জাভার কয়েকটি হিন্দু সাম্রাজ্যকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। রাজ্যগুলি হচ্ছে (i) কেদিরি, অন্য নাম পঞ্জলু বা দহ (1000 থেকে 1220), (ii) জঙ্গলে বা সিংসারি (1220 থেকে 1292), এবং (iii) বিল্বতিক্ত বা মজপহিত (1292 থেকে 1478 পর্যন্ত, মতান্তরে 1520 পর্যন্ত)। চতুর্দশ শতকে মজপহিত সাম্রাজ্য নৌবাহিনী ও রণশক্তিতে বলীয়ান ছিল। জাভা, বলিদ্বীপ, মাদুরা এবং সম্ভবত সুমাত্রা, বোর্ণিও, সেলেবেস এবং মালাক্কার বিশেষ বিশেষ অঞ্চল ছিল এই সাম্রাজ্যের অন্তর্গত। মজপহিত সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে জাভাতে হিন্দুযুগের অবসান হয়।

খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকে উত্তর ভারতে তুর্কী শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সে সময় গুজরাটের বণিক সম্প্রদায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। পারস্য ও গুজরাটের মুসলমান বণিকরা ইন্দোনেশিয়ায় মালাই জাতির মধ্যে ইসলাম ধর্ম প্রচার করে। ত্রয়োদশ শতকের শেষের দিকে মালয় উপদ্বীপ ও সুমাত্রার বেশ কিছু সংখ্যক লোক ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতকে দক্ষিণ আরবের ধনবান বণিক ও ধর্মপ্রচারক ইসলাম ধর্ম প্রচারের কাজে মেতে ওঠে। একে একে মালাক্কা, সুমাত্রা, বোর্ণিও, সেলেবেস ও নানা অঞ্চলে ইসলাম ধর্ম ছড়িয়ে পড়ে এবং আরব, পারসিক ও ভারতীয় মুসলমানদের প্রভাব প্রতিপত্তিও বেড়ে যায়। জাভাতে মজপহিত সাম্রাজ্যের স্থান দখল করেছে চারটি মুসলমান রাজ্য—দেমাক, হাজাং, বাণতাম এবং মধ্য জাভায় মতরাম। ইউরোপীয় শক্তিবর্গের আগমনের পূর্ব লগন পর্যন্ত এই হল ইন্দোনেশিয়ার ইতিহাসের একটি অতি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা। এবার এই ইতিহাসের কিঞ্চিৎ বিশদ পরিচয় আলোচনা করছি।

যবদ্বীপে হিন্দুসাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা

যত্নোবন্তো যবদ্বীপং সপ্তরাজ্যোপশোভিতম্।
সুবর্ণরূপ্যক দ্বীপং সুবর্ণাকর মণ্ডিতম্।।
যবদ্বীপং অতিক্রম্য শিশিরো নাম পর্বত।
দিবং স্পৃশতি শৃঙ্গেণ দেবদানব সেবিতঃ।।
(রামায়ণ কাণ্ড 4, সর্গ 30, শ্লোক 30—31)

বক্ষ্যমান বিষয়ের আলোচনায় শ্লোকটির তাৎপর্য হচ্ছে যে সীতার অন্বেষণে সুগ্রীব চারিদিকে চর পাঠিয়েছিলেন। যে সব দেশের উল্লেখ আছে সুগ্রীবের নির্দেশ তালিকায় সেগুলির মধ্যে যবদ্বীপ অন্যতম। সিলভাঁ লেভির মতে রামায়ণের এই অংশটি খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের মধ্যেই রচিত হয়েছে। লিখিত ইতিহাসে ইন্দোনেশিয়ার একটি অঞ্চলের নামোল্লেখ সর্বপ্রথম এই শ্লোকেই পাওয়া গেছে। হিমাংশু ভূষণ সরকার অবশ্য মনে করেন যে শ্লোকদ্বয় বোধ হয় প্রক্ষিপ্ত।[1] তাঁর যুক্তি হচ্ছে যে শ্লোক দুটি পাওয়া গেছে রামায়ণের শুধু-মাত্র বোম্বাই এর একটি সংস্করণে এবং বোম্বাই এর অন্য সংস্করণে শ্লোকটি পাওয়া যায় নি। আলেকজান্দ্রিয়ার জ্যোতির্বিদ টলেমি তাঁর ভুবন বন্দিত ভূগোল লিখেছিলেন খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের মধ্যভাগে। তিনি জাভা বোঝাতে **Jabadieu** কথাটি ব্যবহার করেছেন এবং বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে সেই দ্বীপে যব উৎপন্ন হয়। জাভার সংস্কৃত নাম যবদ্বীপ যে ইতিপূর্বেই বিদেশীদের কাছে সুপরিচিত ছিল, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। চীনা বিবরণেও বলা হয়েছে যে খ্রীষ্টীয় **132** সালে **Tiao-Pien** ছিলেন **Ye-Tiao** এর রাজা। তিনি চীন সম্রাটের কাছে দূত পাঠিয়েছিলেন। **Pelliot** এর মতে **Ye-Tiao** হল যবদ্বীপ। **Ferrand** মনে করেন **Tiao-Pien** হলেন দেববর্মন। এসব সাক্ষ্যের ভিত্তিতে রমেশ চন্দ্র মজুমদার সিদ্ধান্ত করেছেন যে জাভায় হিন্দুরাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল হয় খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের শেষ দিকে, না হয় খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের প্রথম দিকে।[2]

খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতকে অমরাবতী শৈলীতে গ্রানাইট প্রস্তর নির্মিত বৌদ্ধ মূর্তি পাওয়া গেছে পূর্ব জাভায়, সুমাত্রায় (পালেমবাঙের কাছে), সেলেবেসে (সেম্পায়াতে), শ্যামদেশে এবং আনামে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এগুলি হল বৌদ্ধ ধর্মের প্রাচীনতম নিদর্শন। প্রাচীনতম তারিখ বিহীন শিলালিপি পাওয়া গেছে পূর্ব বোর্ণিওতে। বিশেষজ্ঞদের মতে এই শিলালিপি খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকের প্রথম দিকে লিখিত। দক্ষিণ ভারতের

পল্লব শিলালিপি এবং চম্পা ও কম্বোজের প্রাচীনতম শিলালিপির সঙ্গে বোর্ণিও শিলালিপির লিপিগত সাদৃশ্য আছে। কিন্তু বোর্ণিও শিলালিপি পল্লব শিলালিপির চেয়ে প্রাচীনতর। এর ভাষা সংস্কৃত। **Wolters** এর মতে সুমাত্রার দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতক থেকে **Ko-Ying** প্রভৃতি অঞ্চলের সঙ্গে ভারতবর্ষের বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল। ষষ্ঠ শতকে **Kan-To-Li** চীন ও ভারতবর্ষের সঙ্গে ব্যবসা চালাত। পশ্চিম জাভাতে চারটি তারিখ বিহীন শিলালিপি পাওয়া গেছে। বিশেষজ্ঞদের অনুমান যে এগুলিও খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকের প্রথম দিকে লিখিত। জাভা শিলালিপির লিপিও বোর্ণিও শিলালিপির অনুরূপ। চারটি জাভা শিলালিপিতে রাজা পূর্ণবর্মণের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। রমেশ চন্দ্র মজুমদারের মতে জাভায় হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রথম সুনির্দিষ্ট সাক্ষ্য এই চারটি শিলালিপি থেকে স্পষ্ট পাওয়া যাচ্ছে।3 পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতক ছিল তাঁর রাজত্ব কাল। পূর্ণ বর্মণের রাজধানী ছিল তারুম নগরে। তাঁর পিতামহকে বলা হত রাজর্ষি এবং তাঁর একজন পূর্বপুরুষের (সম্ভবত পিতা) উপাধি ছিল রাজাধিরাজ। রাজাধিরাজ চন্দ্রভাগা খাল নির্মাণ করছিলেন। পূর্ণবর্মনও তাঁর রাজত্বের 22 বছরে গোমতী নামে আর একটি খাল নির্মান করেছিলেন। এটা সুবিদিত যে পশ্চিম পঞ্জাবে চন্দ্রভাগা এবং লক্ষ্ণৌর কাছে গোমতী নামে নদী প্রবাহিত।

413 খ্রীষ্টাব্দে ফা-হিয়ান সিংহল থেকে পশ্চিম জাভা এসেছিলেন।4 জাভাতে তিনি প্রচুর ব্রাহ্মণ দেখেছিলেন, কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মের কোন উল্লেখযোগ্য নিদর্শন তিনি খুঁজে পান নি। কিছুদিন এখানে বসবাস করে তিনি সমুদ্র-পথে ক্যানটন যাত্রা করেন। জাহাজে তাঁর সঙ্গী ছিল 200 জন হিন্দু বণিক।

জাভায় বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার শুরু হয় সম্ভবত 423 খ্রীষ্টাব্দে। ঐ সময় কাশ্মীরের রাজকুমার গুণবর্মন সিংহল হয়ে জাভাতে এসেছিলেন এবং সেখানকার রাজপরিবারকে তিনি বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত করেন। তারপর অতি দ্রুত বৌদ্ধ ধর্ম জাভায় ছড়িয়ে পড়ে। ষষ্ঠ শতকের শেষের দিকে পশ্চিম জাভা শক্তিহীন হয়ে পড়েছিল। তখন মধ্যজাভা ছিল উদয়ের পথে। ত্যাঙ্গ বংশের (খ্রীঃ 618-906) চীনা ইতিহাসে মধ্য জাভার হোলিঙ্গ (Ho-Ling) রাজ্যের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। পণ্ডিতদের মতে কলিঙ্গের সঙ্গে হোলিঙ্গ-এর ধ্বনি সাদৃশ্য অর্থবহ। কিছুদিন পর মধ্যজাভায় ওয়ালেং (Walaing) নামে একটি সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় হয়েছিল। এই ওয়ালেং-এর চীনা নাম হোলিঙ্গ হওয়া অসম্ভব নয়। এ বিষয়ে অবশ্য যথেষ্ট মতভেদ আছে।

পূর্বজাভার একটি শৈব লিপিতে (শকাব্দ 682, খ্রীষ্টাব্দ 760) অগস্ত্য

ঋষির একটি কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর মূর্তি উল্লেখ করা হয়েছে। প্রায় একশ বছর পরের একটি শিলালিপিতেও (শকাব্দ 785, খ্রীষ্টাব্দ 863) অগস্ত্যের উল্লেখ আছে। এই শিলালিপি পাওয়া গেছে মধ্যজাভার জোগজাকার্তা অঞ্চলে প্রাম্বানান মন্দিরের কাছে। অষ্টম শতকের মধ্যভাগ থেকে শুরু করে নবম শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত মধ্যজাভায় বিস্তর পরিবর্তন ঘটেছিল। এই কাল-পর্বে শৈব শাসকদের রাজত্বের অবসান হয়েছে এবং মহাযান বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী শৈলেন্দ্র বংশের আর্বিভাব ঘটেছে।

শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্য

চীনা ঐতিহাসিক সাহিত্যে উল্লিখিত Che-Li-Fo-Che যে শ্রীবিজয় রাজ্য, অধ্যাপক Coedes 1918 সালে তা আবিষ্কার করেন। 1937 সালে রমেশ চন্দ্র মজুমদার লেখেন যে দক্ষিণ-পূর্ব মালয়ে লিগোরে (Ligor) প্রাপ্ত সংস্কৃত শিলালিপিতে একজন শৈলেন্দ্র রাজার উল্লেখ পাওয়া গেছে। ঐ প্রস্তর খন্ডের (Stele) উল্টোদিকে আর একটি প্রাচীনতর সংস্কৃত লিপি উৎকীর্ণ করা আছে। এই লিপিতে একজন শ্রীবিজয় রাজ্যের রাজার রাজত্বে তারিখ খ্রীষ্টীয় 775 সাল উল্লেখ করা হয়েছে। এই রাজার বংশের নামোল্লেখ সদ্যোক্ত শিলালিপিতে নেই। তবে এটুকু বলা আছে যে প্রতিবেশী রাজ্যের রাজারা তাঁর প্রভুত্ব স্বীকার করেছিলেন। 775 সালের লিগোরের লিপি থেকে এটা স্পষ্ট যে সপ্তম শতকের শেষ চতুর্থাংশে শ্রীবিজয় রাজ্যের সাম্রাজিক বিজয় অভিযান শুরু হয়েছিল। পরবর্তী একশত বছর ধরে শ্রীবিজয় সাম্রাজ্য মালয় উপদ্বীপে ব্যানডন উপসাগর পর্যন্ত প্রায় এক হাজার মাইল বিস্তার লাভ করেছিল। এসব সাক্ষ্য থেকে পন্ডিতরা অনুমান করেছেন যে 775 খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে শৈলেন্দ্র বংশ শ্রীবিজয় রাজ্যে রাজত্ব করত না। মধ্যজাভায় প্রাপ্ত অন্যান্য শিলালিপি থেকে এটুকু প্রমাণিত যে 778 খ্রীষ্টাব্দ থেকে নবম শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত শৈলেন্দ্র বংশ ছিল শ্রীবিজয় রাজ্যের সার্বভৌম শক্তি। বঙ্গোপ-সাগর থেকে চীন সমুদ্রের পথে শ্রীবিজয় ছিল হ্রস্বতম স্থলপথ। ভারতবর্ষ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যে এই অঞ্চল ছিল অতি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য-সরণি। মালাক্কা প্রণালী ও সুন্দা প্রণালী অতিক্রম করে যে দুটি জলপথে বাণিজ্য চলত, তার উপর শ্রীবিজয়ের নিয়ন্ত্রণ ছিল অবাধ ও নিরবচ্ছিন্ন। লিগোর হস্তগত হলে পশ্চিমী জগৎ ও প্রাচ্য দুনিয়ার মধ্যে যাবতীয় বাণিজ্যপথের উপর শ্রীবিজয়ের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। 686 সালে শ্রীবিজয় জাভাতে সামরিক অভিযান পাঠিয়েছিল এবং 775 সাল নাগাদ ক্রা যোজককে রাজনৈতিক প্রভুত্ব বিস্তার করেছিল। স্থাপত্যে ভাস্কর্যে শ্রীবিজয় সাম্রাজ্যে শৈলেন্দ্র যুগ ছিল স্বর্ণযুগ। বোরো-বুদুরের অনির্বচণীয় শিল্পকীর্তি

প্রস্তরায়িত মহাকাব্য। মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের বার্তা অসংখ্য উদাহরণ সহ চিত্রিত হয়েছে বোরোবুদুরের স্তূপে স্তূপে। 1964 সালে Coedes বলেছেন যে জাভায় শৈলেন্দ্র যুগের শেষপর্বে অর্থাৎ নবম শতকের মাঝামাঝি বোরো-বুদুর সৌধ নির্মিত হয়েছিল। মধ্যজাভায় শৈলেন্দ্র বংশের শিলা-লিপিগুলিতে উত্তর ভারতে প্রচলিত লিপি ব্যবহৃত হয়েছে। নবম শতকের নালন্দা ফলকও এই ধরণের লিপিতে লেখা হয়েছিল। বাংলা লিপির সঙ্গে এই লিপির খুবই সাদৃশ্য আছে। পালযুগেই নালন্দা থেকে মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম ও উত্তর ভারতীয় লিপি কাম্বোডিয়া, জাভা, সুমাত্রা, এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। দেবপালের নালন্দা তাম্র ফলকের সাক্ষ্যেও এই মত সমর্থিত। নালন্দার একটি সংঘের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পাঁচটি গ্রামদানের কথা বলা হয়েছে এই ফলকে। আরও বলা হয়েছে সেই সংঘ বা মঠ নির্মাণ করা হয়েছিল সুবর্ণদ্বীপের (সুমাত্রার) শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজা বালপুত্রদেবের আনুকূল্যে।

ইৎসিঙের বিবরণে শ্রীবিজয়ের সপ্রশংস উল্লেখ আছে। 689 এবং 692 খ্রীষ্টাব্দে সুমাত্রার দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে তিনি অবস্থান করেছিলেন। চীন থেকে ভারতবর্ষে যাবার এবং ভারতবর্ষ থেকে চীনে প্রত্যাবর্তনের পথে তিনি দু'বার এখানে এসেছিলেন। ইৎসিঙের বিবরণ থেকে আমরা জেনেছি যে শ্রীবিজয় ও প্রতিবেশী রাজ্যের রাজারা ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষক। তাদের ভারতগামী জাহাজ ছিল। চীন ও শ্রীবিজয়ের মধ্যে তাদের অর্ণব-পোতের নিত্য যাতায়াত ছিল। প্রসঙ্গত ইৎসিঙের একটি মন্তব্য বিশেষ প্রণিধেয়। মূল বৌদ্ধ গ্রন্থ অধ্যয়নের জন্য কোন চীনা ভিক্ষু যদি ভারতবর্ষে যেতে ইচ্ছুক হন, তাহলে তাঁর পক্ষে সঙ্গত হবে Che-Li-Fo-Che বা শ্রীবিজয় রাজ্যে দু'এক বছর কাটিয়ে যাওয়া। তাহলে ভারতবর্ষে উচ্চমানের শিক্ষা গ্রহণ করার মত যোগ্যতা সে অর্জন করতে পারবে। বিজনরাজ চট্টোপাধ্যায় মনে করেন যে 683 খ্রীষ্টাব্দের একটি প্রাচীন মালয় শিলালিপিতেই শ্রীবিজয়ের সর্বপ্রথম পাথুরে উল্লেখ পাওয়া গেছে।5 এই লেখমালা আবিষ্কৃত হয়েছে পালেমবাঙের কাছে। 670 থেকে 741 সালের মধ্যে শ্রীবিজয়ের সম্রাট চীনে বেশ কয়েকজন দূত পাঠিয়েছিলেন। একজন রাজদূতের বিবরণ থেকে জানা যায় যে চীন সম্রাট শ্রীবিজয়ের অধিপতিকে খুবই পরাক্রান্ত ভাবতেন। 782 খ্রীষ্টাব্দের মধ্যজাভার কেলুরক (Kelurak) শিলালিপিতে পাচ্ছি যে ধরণীন্দ্র নামে এক রাজা তাঁর গৌড়ীগুরুর নির্দেশে মঞ্জুশ্রীর জন্য একটি মন্দির নির্মাণের আদেশ দিয়েছিলেন। এই লিপিতে মঞ্জুশ্রীকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

De Caspiris মনে করেন যে সপ্তম শতকের মধ্যভাগে শৈলেন্দ্ররা জাভায় এসেছিলেন। এই কালপর্বেই ফুনান সাম্রাজ্যের পতন হয়েছিল। Coedes এর সিদ্ধান্ত হল ফুনানের যে দেশত্যাগী রাজকুমারবৃন্দ জাভাতে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন, শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজারা তাঁদেরই বংশধর। বিজনরাজ চট্টোপাধ্যায়ও এই মতের সমর্থক। তিনি আরও মনে করেন যে দেশত্যাগীদের মধ্যে কেউ কেউ দক্ষিণ-পূর্ব সুমাত্রায় আশ্রয় নেন এবং সেখানকার রাজ-কুমারীদের বিবাহ করেন।6 খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকের শেষের দিকে শৈলেন্দ্ররা শ্রীবিজয় ও জাভার শাসক ছিলেন। মালয় ছিল শ্রীবিজয় সাম্রাজ্যের প্রভাবাধীন। দক্ষিণ মালয় ছিল এই সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত অঞ্চল। রমেশ চন্দ্র মজুমদার মনে করেন যে শৈলেন্দ্ররা ছিলেন ভারতবর্ষ থেকে নবাগত।7 স্বমতের পক্ষে তিনি দুটি যুক্তি দেখিয়েছেন। প্রথমত, শৈলেন্দ্র রাজাদের লেখ উৎকীর্ণ হয়েছিল উত্তর ভারতের প্রচলিত লিপিতে। তৎকালীন জাভায় প্রচলিত লিপি থেকে উত্তর ভারতীয় লিপি ছিল ভিন্ন ধরণের। দ্বিতীয়ত, আরব লেখকরা জানিয়েছেন যে শৈলেন্দ্র রাজারা শুধুমাত্র ভারতীয় নাম বা উপাধি 'মহারাজ' গ্রহণ করেই ক্ষান্ত হননি, ভারতবর্ষের সঙ্গে তাঁরা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগও বজায় রাখতেন। রমেশ চন্দ্র মজুমদার নিজেই স্বীকার করেছেন যে শুধুমাত্র এসব সাক্ষ্য প্রমাণ থেকে এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পেঁাছানো সম্ভব নয়।

একথা সত্য শৈলেন্দ্র বংশেব রাজারা প্রায় পাঁচশ বছর ধরে রাজত্ব করে-ছিলেন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইতিহাসে তাদের প্রভাব ছিল ব্যাপক ও গভীর। ভারতবর্ষ জাভা ও মালয় উপদ্বীপে তাঁদের রাজত্ব বিষয়ে বেশ কিছু মূল্যবান প্রত্নতাত্ত্বিক উপকরণ ছড়িয়ে আছে। আরব ও চীনা লেখকদের বিবরণেও অনেক প্রাসঙ্গিক তথ্য পাওয়া গেছে। প্রাপ্ত উপকরণগুলির বিচার-বিশ্লেষণ মূল্যায়ন নিয়ে অবশ্য অনেক তর্কবিতর্ক আছে। এসব তর্কবিতর্ক এখানে আলোচনা করছি না। শুধুমাত্র দু'একটি সমস্যা এখানে উত্থাপন করছি।

লিগোর শিলালিপির কথা আমরা এর আগে উল্লেখ করেছি। এই লেখ-মালার সাক্ষ্য বিচার করে অনেকে এই মত পোষণ করেছেন যে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে সুমাত্রায় শৈলেন্দ্র রাজারা শ্রীবিজয় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই রাজ্যকে ভিত্তি করেই শৈলেন্দ্র রাজারা মালয় উপদ্বীপ, জাভা এবং ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জের অধিকাংশ দ্বীপে প্রভুত্ব বিস্তার করেছিলেন। 1937 সালে রমেশ চন্দ্র মজুমদার সর্বপ্রথম এই মতের বিরোধিতা করেন।8 তিনি বলেন যে শ্রীবিজয় রাজ্যের সঙ্গে শৈলেন্দ্র বংশের নাম যুক্ত করার কোন সঙ্গত

কারণ নেই। লিগোর লেখদ্বয় থেকে শুধুমাত্র এটুকু সিদ্ধান্ত সম্ভব যে লিগোর অঞ্চলের প্রভুত্ব শ্রীবিজয় রাজ্যের রাজাদের কাছ থেকে শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজাদের কাছে হস্তান্তরিত হয়েছে। শ্রীবিজয় রাজ্যের রাজা এবং শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজা একই ব্যক্তি নন, তারা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি। এ বিষয়ে নানা বিরোধী মতামতের আলোচনা করে ব্রিগ্‌স্ (Briggs) জানিয়েছেন, 1937 সালের আগে পণ্ডিতবর্গের মধ্যে কোন সংশয় ছিল না যে সুমাত্রার শ্রীবিজয় রাজ্যের অন্তর্গত ছিল শৈলেন্দ্র বংশ। 1937 সালের পর শ্রীবিজয় রাজ্যকে বাসভূমি-রূপে শৈলেন্দ্র বংশের সঙ্গে কেউ এখন যুক্ত করেন না।9 প্রশ্ন হল, জাভা না মালয় উপদ্বীপ, কোন অঞ্চল শৈলেন্দ্র বংশের আদি বাসভূমি ? শুধুমাত্র এই এই প্রশ্নেই এখন তর্ক সীমাবদ্ধ।

775 খ্রীষ্টাব্দের লিগোর শিলালিপির সাক্ষ্য থেকে একথা স্পষ্ট যে ঐ সময় মালয় উপদ্বীপে শৈলেন্দ্র বংশের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রায় একই সময়ে জাভাতেও শৈলেন্দ্র শাসনের উল্লেখ আমরা পাচ্ছি। জাভাতে প্রাপ্ত দুটি শিলালিপি এ বিষয়ে আমাদের নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্য জুগিয়েছে। প্রথম লিপি 778 খ্রীষ্টাব্দের। ঐ সালে শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজা মহারাজ পণংকরণ দেবী তারার উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত একটি বৌদ্ধ মন্দির কলসনে নির্মাণ করেছিলেন। দ্বিতীয় লিপি 782 খ্রীষ্টাব্দের। এই লিপিতে বলা হয়েছে যে কুমারঘোষ ঐ সালে মঞ্জুশ্রীর একটি মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কুমার ঘোষ হলেন গৌড়ের অধিবাসী এবং শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজা ধরণীন্দ্রের গুরু। এই লিপি কেলুরক লিপি নামে পরিচিত। এই লিপির কথা আমরা পূর্বেও উল্লেখ করেছি। মধ্যজাভায় প্রাপ্ত এই দুই লিপি এবং লিগোরে প্রাপ্ত লিপি থেকে একথা প্রমাণিত যে অষ্টম শতকের শেষ চতুর্থাংশে জাভা ও মালয় উপদ্বীপে শৈলেন্দ্র বংশের শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জের অন্যান্য দ্বীপেও শৈলেন্দ্র বংশের আধিপত্য বিস্তার লাভ করেছিল। নালন্দায় প্রাপ্ত বাংলার পালবংশের রাজা দেবপালের তম্র-ফলক থেকে এ তথ্যের সাক্ষ্য পাওয়া গেছে। তাম্র-ফলকটির আনুমানিক তারিখ হবে 850 খ্রীষ্টাব্দ। এই তাম্রফলকে বলা হয়েছে যে সুবর্ণদ্বীপের রাজা বালপুত্রদেবের অনুরোধে দেবপাল নালন্দায় বালপুত্রদেব নির্মিত বৌদ্ধ সঙ্ঘের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পাঁচটি গ্রাম দান করেছিলেন। তাম্র-ফলকটির কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এই তাম্রফলকে উল্লিখিত প্রথম রাজার নাম হল শ্রীবীরবৈরিমথনানুগতাভিধান। তাঁর পুত্রের নাম ছিল সমরাগ্রবীর। এটি নাম হতে পারে, আবার সম্মানজনক উপাধিও হতে পারে। তাঁর স্ত্রী ছিলেন রাজা বর্মসেতুর কন্যা তারা। তাঁর পুত্রের নাম ছিল শ্রীবালপুত্র।

প্রথম রাজার পরিচয়ে বলা হয়েছে তিনি ছিলেন যবভূমির রাজা এবং বালপুত্রদের ছিলেন সুবর্ণদ্বীপের রাজা। অনেকের ধারণা যবভূমি হল জাভা এবং সুবর্ণদ্বীপ হল সুমাত্রা। Coedes মনে করেন যে জাভার শৈলেন্দ্র বংশ শ্রীবিজয় রাজ্য জয় করেছিলেন এবং পিতার প্রতিনিধি হয়ে বালপুত্র সুমাত্রায় রাজত্ব করেছিলেন। কে. এ. এন. শাস্ত্রীর ধারণা হল যে বালপুত্র ছিলেন সুমাত্রার স্বাধীন শাসক। তাঁর মতে, দুই শৈলেন্দ্র বংশ ছিল। একটি শৈলেন্দ্র বংশ রাজত্ব করত জাভায়, অপরটি রাজত্ব করত সুমাত্রার শ্রীবিজয় রাজ্যে।

রমেশ চন্দ্র মজুমদার কিন্তু ভিন্ন মত পোষণ করেন।10 নালন্দা তাম্র-ফলকের যবভূমি ও সুবর্ণদ্বীপকে তিনি দুটি স্বতন্ত্র অঞ্চল বা রাজ্য মনে করেন নি। তিনি দেখিয়েছেন যে সুবর্ণদ্বীপ কথাটির দ্বারা একদিকে যেমন বর্মা ও সুমাত্রার মত নির্দিষ্ট অঞ্চল বোঝানো হয়েছে, তেমনি অনেক সময় সমগ্র মালয় দ্বীপপুঞ্জকে সাধারণভাবে সুবর্ণদ্বীপ রূপে অভিহিত করা হয়েছে। তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে রমেশ চন্দ্র অল্-বীরুনী ও ইবন সৈয়দ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। অল্-বীরুনী বলেছেন যে জবজ দ্বীপপুঞ্জকে হিন্দুরা সুবর্ণ-দ্বীপ বলে। ইবন সৈয়দ বলেছেন অনেকগুলি বড় দ্বীপ নিয়ে জবগ দ্বীপ-পুঞ্জ গঠিত। এখানে চমৎকার সোনা পাওয়া যায়। জবজ দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে শ্রীভোজ (অর্থাৎ শ্রীবিজয়) বৃহত্তম। রমেশচন্দ্র মজুমদার মনে করেন যে বালপুত্রকে সুবর্ণদ্বীপের অধিপতি এবং তাঁর পিতামহকে জাভার রাজা হিসাবে গ্রহণ করার পক্ষে কোন অসঙ্গতি নেই। জাভাকে কেন্দ্র করে শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্য খ্রীষ্টীয় নবম শতকের মাঝামাঝি মালয় দ্বীপপুঞ্জের বিরাট অংশ জুড়ে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল।

নালন্দা সনদে উল্লিখিত শৈলেন্দ্র রাজাদের ঐতিহাসিক পরিচয় নিয়েও তর্কবিতর্কের অন্ত নেই। এ বিষয়ে আমরা রমেশ চন্দ্র মজুমদারের সিদ্ধান্ত এখানে লিপিবদ্ধ করছি। নালন্দা সনদে প্রথম শৈলেন্দ্র রাজা যবভূমিপাল বা জাভার শাসক নামে বর্ণিত হয়েছেন। তাঁর আসল নাম বলা হয় নি, শুধুমাত্র সংস্কৃত ভাষায় পরিচয় দেওয়া হয়েছে, তিনি ছিলেন 'বীরবৈরি মথন'। প্রসঙ্গত স্মরণে আসে 782 খ্রীষ্টাব্দের কেলুরক লিপিতে শৈলেন্দ্র রাজা ধরণীন্দ্র সম্বন্ধে উচ্চারিত বিশেষণ, 'বৈরিবরবীরবিমর্দন।' শৈলেন্দ্র বংশীয় মহারাজ পণংকরণ প্রচারিত কলসন লিপির 778 সঙ্গে পূর্বোক্ত লিপির সময়ের ব্যবধান তিন বছর। এ থেকে রমেশ চন্দ্র মজুমদার সিদ্ধান্ত করেছেন যে মহারাজ পণংকরণ এবং ধরণীন্দ্র একই ব্যক্তি। আগেরটি তাঁর আসল নাম, পরেরটি অভিষেকান্তে গৃহীত নাম। শৈলেন্দ্র বংশীয় পণংকরণ

ধরণীন্দ্র 778 থেকে 782 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জাভার রাজা ছিলেন। তাঁর রাজত্বে জাভা ছিল রাজপ্রতাপের কেন্দ্রভূমি। রোরোবুদুর এবং চণ্ডী মেনদুত তাঁর গৌরব কীর্তন করছে। মধ্যজাভায় সঞ্জয়ের (তাঁর সম্পর্কে জ্ঞাত তারিখ হচ্ছে 732 খ্রীষ্টাব্দ) পরে যে সব রাজা রাজত্ব করেছিলেন, জাভার লিপিগুলিতে তাঁরা 'মহারাজ' নামে অভিহিত হয়েছেন। 'মহারাজ' তালিকার শীর্ষে পণংকরণের নাম শোভিত। পণংকরণ ধরণীন্দ্রের পুত্রের নাম সমরাগ্রবীর। মধ্য জাভার কেদুতে প্রাপ্ত 847 খ্রীষ্টাব্দ তারিখের একটি দলিলে রাজা সমরোত্তুঙ্গের নাম পাওয়া গেছে। রমেশ চন্দ্র মজুমদারের মতে সমরাগ্রবীর এবং সমরোত্তুঙ্গ একই ব্যক্তি। সমরাগ্রবীরের সঙ্গে রাজকন্যা তারার বিবাহ হয়েছিল। নালন্দা সনদে তারার পিতৃনাম কেউ পড়েছেন বর্মসেতু, কেউ কেউ বলেন তিনি ছিলেন ধর্মসেতু।

সমরাগ্রবীর ও তারার পুত্রের নাম বালপুত্রদেব। পাল বাংলার রাজা দেবপালের অনুরোধে নালন্দায় বৌদ্ধ মঠ সংরক্ষণের জন্য বালপুত্রদেব পাঁচটি গ্রামদান করেছিলেন। তাঁকে সুবর্ণদ্বীপের অধিপতি বলা হয়েছে। এ থেকে প্রমাণ হয় সমগ্র মালয় দ্বীপপুঞ্জে তাঁর প্রভুত্ব প্রসারিত হয়েছিল। সুদূর বাংলা দেশের রাজার সঙ্গে তাঁর কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিল। এ থেকে বোঝা যায় তাঁর খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ছিল সুদূর বিস্তৃত।

আরব লেখকদের বিববণে শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ধ্বনিত হয়েছে। 844-848 খ্রীষ্টাব্দে Ibn Khordadzbez লিখেছিলেন জবগের রাজার নাম মহারাজ। তাঁর দৈনিক রাজস্বের আয় দু'শ মন সোনা। সুলেমান (851 খ্রীষ্টাব্দ) বলেছেন যে মালয় উপদ্বীপে ক্রা যোজক অঞ্চলে Kalah-bar জবগ সাম্রাজ্যের অংশ। Ibn Rosteh 903 খ্রীষ্টাব্দে লিখেছিলেন যে মহারাজের চেয়ে পরাক্রান্ত রাজা কোথাও নেই, তাঁর মত রাজস্ব আয় কেউ করেন না। আবু জায়েদ হাসান 916 খ্রীষ্টাব্দে লিখেছিলেন যে জবগ রাজ্যের আয়তন 900 বর্গ পর্সং। এক হাজার পর্সং ব্যাপ্ত বহু দ্বীপের উপর জবগের রাজা প্রভুত্ব বিস্তার করেছেন। এই রাজ্যের অন্তর্গত হচ্ছে শ্রীভোজ অর্থাৎ শ্রীবিজয়। শ্রীবিজয়ের আয়তন হচ্ছে প্রায় 400 পর্সং। মাসুদি (943 খ্রীষ্টাব্দ) জানিয়েছেন যে মহারাজের রাজ্যের কোন সীমানা নেই, তাঁর সেনাসংখ্যা অগণিত। অতি দ্রুতগামী জাহাজ এমন কি দু'বছর ধরে পরিক্রমা করেও তাঁর অধিকৃত অঞ্চলের সীমা শেষ করতে পারত না। আরব লেখকদের বিবরণ থেকে আমরা আরও জেনেছি যে চীন ও পশ্চিমী দেশগুলির মধ্যে যে বাণিজ্য চলত, তার উপর তাদের অবাধ নিয়ন্ত্রণ ছিল বলেই তারা বিপুল সম্পদের

অধিকারী হয়েছিল। শুধুমাত্র সমুদ্রপথেই মহারাজের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল তা নয়, ক্রা যোজক অতিক্রম করে মালয় উপদ্বীপে স্থলপথেও তার নিরঙ্কুশ আধিপত্য ছিল।

শুধুমাত্র মালয় উপদ্বীপ ও মালয় দ্বীপপুঞ্জে শৈলেন্দ্র রাজাদের আধিপত্য ও প্রতাপ সীমাবদ্ধ ছিল না, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মূল ভূ-খণ্ডে অর্থাৎ কম্বুজ ও চম্পাতেও তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি অনুভূত হয়েছিল। আনুমানিক 750 থেকে 850 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় জলে স্থলে শৈলেন্দ্র বংশ ছিল সবচেয়ে পরাক্রান্ত রাজশক্তি। মালয় দ্বীপপুঞ্জ ও মালয় উপদ্বীপকে তাঁরা অভূতপূর্ব রাজনৈতিক ঐক্য ও সংহতি দান করেছিলেন। নবম শতকে শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের পতন শুরু হয়। 802 খ্রীষ্টাব্দে কম্বুজের উপর তাঁদের কর্তৃত্বের অবসান হয়। চম্পা অভিযানের কথাও আর শোনা যায় নি। এই শতকেই জাভাও তাঁদের হাতছাড়া হয়ে পড়ে। এসব ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও দশম শতক জুড়ে বৃহৎ শক্তি হিসাবে তাঁদের প্রভাব প্রতিপত্তি যে অম্লান ছিল, আরব বিবরণে তার অজস্র প্রমাণ ছড়িয়ে আছে।

দশম শতকের শুরু থেকে প্রায় তিনশ বছর ধরে San-Fo-Tsi নামে একটি রাজ্যের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ চীনা বিবরণে পাওয়া যাচ্ছে। San-Fo-Tsi হল শ্রীবিজয় রাজ্য। 904 খ্রীষ্টাব্দ থেকে এই রাজ্য অসংখ্যবার চীন সম্রাটের রাজদরবারে দূত পাঠিয়েছিল। 1005 খ্রীষ্টাব্দে শ্রীবিজয়ের শৈলেন্দ্র রাজা চূড়ামণিবর্মন দক্ষিণ ভারতের নাগপট্টন (মাদ্রাজের নেগাপটমে) একটি বিহার নির্মাণ করেছিলেন। বিহারটির নির্মাণ কার্য শেষ করেন তাঁর পুত্র ও উত্তরাধিকারী মারবিজয়োত্তুঙ্গবর্মন। এই বিহার সংরক্ষণের জন্য চোলরাজ প্রথম রাজারাজ 1005 সালে একটি গ্রামের রাজস্ব দান করেছিলেন। চীন-সম্রাট ও চোলরাজ, তৎকালীন এই দুটি বৃহৎ শক্তির সঙ্গে শ্রীবিজয় রাজ্য সুসম্বন্ধ স্থাপন করেছিল। প্রাচীন তামিল সাহিত্য থেকে আমরা জেনেছি যে চোল রাজ্য ও শ্রীবিজয় রাজ্যের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্বন্ধ ছিল সুদৃঢ়।

রাজেন্দ্র চোলের অভিযান

1017-18 এবং 1022-23 খ্রীষ্টাব্দের রাজেন্দ্র চোলের দুটি শিলালিপিতে তাঁর সাগরপারে কটাহ (কেদা) বিজয়ের উল্লেখ আছে। 1024-25 খ্রীষ্টাব্দ থেকে শুরু করে পরবর্তী কালের কয়েকটি লিপিতে সাগরপারে যে সব দেশ রাজেন্দ্র চোল জয় করেছিলেন, সেগুলির বিশদ বিবরণ আছে। সম্ভবত উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয় 1018 খ্রীষ্টাব্দে বা তার কিছু আগে এবং

চোল রাজের সঙ্গে বিরোধের ফলে শৈলেন্দ্র রাজার পরাজয় ঘটে 1025 খ্রীষ্টাব্দে বা তার কিছু আগে। উৎকীর্ণ লেখের সাক্ষ্য থেকে আমরা জেনেছি যে রাজেন্দ্র চোল একটি বিরাট নৌ-অভিযান পাঠিয়েছিলেন এবং কড়ারমের রাজা সংগ্রামবিজয়োত্তুঙ্গবর্মনকে পরাজিত করেছিলেন। চোল সেনা-বাহিনীর হাতে পর্যুদস্ত হয়েছিল, এমন 13টি দেশের তালিকা আছে। তালিকার প্রথমে আছে শ্রীবিজয় রাজ্যের উল্লেখ এবং সব শেষে আছে কড়ারম রাজ্য। তালিকাভুক্ত অঞ্চলের সুনির্দিষ্ট পরিচয় লাভ সম্ভব নয়। সম্ভবত একটি অঞ্চলের অবস্থান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে, অবশিষ্ট দেশগুলির কোনটি সুমাত্রায় কোনটি মালয় উপদ্বীপে অবস্থিত। পরবর্তী চীনা লেখকদের বিবরণেও ঐ সব দেশের উল্লেখ আছে। তাই আমরা নিঃসন্দেহ হতে পারি যে চোল বিজয় কাহিনী চোল রাজার বৃথা আস্ফালন নয়; এটি ছিল একটি অতি বাস্তব ঐতিহাসিক ঘটনা।

চোলদের সঙ্গে শৈলেন্দ্র রাজার বিরোধের কোন নির্দিষ্ট কারণ আমাদের জানা নেই। পূর্ব-পশ্চিম বাণিজ্যের উপর শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ ছিল। নৌবলে বলীয়ান হয়ে চোলরা এই বাণিজ্যের দিকে লোলুপ দৃষ্টি দেয়। শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের অবক্ষয় দেখে তারা আরও উৎসাহী হয়ে ওঠে। রমেশ চন্দ্র মজুমদার মনে করেন উভয় শক্তির মধ্যে বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বিতাই ছিল বিরোধের মুখ্য কারণ।

1090 খ্রীষ্টাব্দের একটি তামিল লেখ থেকে আমরা জেনেছি যে কড়ারমের রাজা কুলোত্তুঙ্গের রাজদরবারে দু'জন রাজদূত পাঠিয়েছিলেন। তাঁদের নাম ছিল রাজবিদ্যাধর এবং অভিমানোত্তুঙ্গ। এই দু'জন রাজদূতের অনুরোধে চোলরাজা বৌদ্ধ বিহার সংরক্ষণের জন্য প্রথম রাজারাজ প্রদত্ত সাহায্য নতুন করে শুরু করেছিলেন; শুধু তাই নয়, নতুন সংযোজনও করেছিলেন। উভয়পক্ষের মধ্যে সখ্যতার এই ইঙ্গিতের পর একদিকে চোল-শক্তি এবং অপরদিকে San-Fo-Tsi, কড়রম অথবা শ্রীবিজয়ের মধ্যে সংঘর্ষের কথা শোনা যায় নি। এরপরেও শ্রীবিজয় রাজ্য আরও তিনশ' বছর টিকে ছিল। চতুর্দশ শতকে জাভার আক্রমনে শ্রীবিজয়ের বিলুপ্তি ঘটে। এই দীর্ঘ সময় জুড়ে শ্রীবিজয়ের গৌরবকাহিনী চীনা বিবরণে এবং আরব লেখকদের রচনায় পরিকীর্তিত হয়েছে। 1225 সালে চীনা বিদেশ বাণিজ্যের পরিদর্শক Chau-Ju-Kua লিখেছিলেন যে San-Fo-Tsi তখনও মালাক্কা প্রণালীর উপর প্রভুত্ব করেছে এবং চীন ও পশ্চিমী দেশগুলির মধ্যে সামুদ্রিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করেছে। San-Fo-Tsiর উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল 15টি দেশের তালিকা লেখক ঐ গ্রন্থে সংযোজন করেছেন। ত্রয়োদশ শতকের মাঝামাঝি

San-Fo-Tsiর প্রভাব প্রতিপত্তি অম্লান ছিল, এ বিষয়ে আরব লেখক ও চীনাদের সাক্ষ্য অবিশ্বাস করার কোন সঙ্গত কারণ নেই। কিন্তু শৈলেন্দ্র বংশ যে তখনও শ্রীবিজয়ে রাজত্ব করত এ বিষয়ে কোন প্রামাণিক সাক্ষ্য পাওয়া যায় নি। 1025 সাল নাগাদ শৈলেন্দ্র বংশের রাজা শ্রীসংগ্রাম বিজয়োত্তুঙ্গবর্মন রাজেন্দ্র চোলের সেনাবাহিনীর হাতে পরাভূত হয়েছিলেন। শৈলেন্দ্র বংশ সম্পর্কে এটাই আমাদের জানা শেষ সংবাদ। এরপর শ্রীসংগ্রাম বিজয়োত্তুঙ্গবর্মনের কী দশা হয়েছিল, কে বা কারা ছিলেন তাঁর উত্তরাধিকারী, এ বিষয়ে কোন তথ্যই আমাদের গোচরে আসে নি।

জাভা

পশ্চিম জাভায় পূর্ণবর্মণের শাসনাধীন রাজ্যের কথা ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি। অষ্টম শতকের প্রথম অর্ধাংশে মধ্য জাভায় রাজত্ব করতেন রাজা সন্নাহ ও তাঁর পুত্র সঞ্জয়। সঞ্জয়ের মৃত্যুর অনতিকাল পরে মধ্য জাভা শৈলেন্দ্র বংশের কবলিত হয়। পরবর্তী যুগে মধ্য জাভায় মতরাম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

পূর্ব জাভার দিকে এবার দৃষ্টিপাত কবা যাক্। 929 থেকে 947 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সিণ্ডোক ছিলেন সেখানকার রাজা। তাঁর রাজকীয় নাম ছিল ঈশান বিক্রমধর্মোত্তুঙ্গ। ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত তাঁকেই পূর্বজাভা সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা রূপে স্মরণ করা হয়েছে। সিণ্ডোকের রাজত্বকাল থেকেই পূর্ব-জাভা রাজনৈতিক প্রাধান্য অর্জন করে। মধ্য জাভার রাজনৈতিক গুরুত্ব ও সাংস্কৃতিক গৌরব হ্রাস পায়। বোরো-বুদুর শোভিত মধ্য জাভা একেকালে ছিল শৈলেন্দ্র বংশের সাংস্কৃতিক পীঠস্থান। কিন্তু নানা কারণে এই সাম্রাজ্যের বিলয় ঘটে। কারণ হিসাবে কেউ বলেন আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাত, কেউ বলেন মহামারী, আবার কেউ বলেন শৈলেন্দ্র রাজাদের নৌ-অভিযান। রমেশ চন্দ্র মজুমদার শেষোক্ত মতের সমর্থক।11 যাহোক, সিণ্ডোকের রাজত্বকালেই প্রাচীন জাভার ভাষায় রামায়ণ রচিত হয়েছিল। বৌদ্ধতন্ত্রের বিখ্যাত গ্রন্থ সঙ্গ্ হ্যঙ্গ কমহাযানিকনও নাকি তাঁর রাজত্বকালেই লিখিত হয়েছিল। জাভায় বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার বিষয়ে এটি একটি অতি মূল্যবান আকর গ্রন্থ।

বলিদ্বীপ

বলি যথার্থই বলি অংক নামে পরিচিত। বলি অংক মানে বলবানের দোলনা। চীনা বিবরণ থেকে জানা গেছে যে খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের প্রথম দিকে

বলিদ্বীপের কৌণ্ডিন্য পরিবারভুক্ত রাজা চীনদেশে দূত পাঠিয়েছিলেন। অষ্টম বা নবম শতকে বলিতে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারিত হয়। বৌদ্ধ ধর্ম এখানে এসেছিল হয় জাভা থেকে, না হয় শ্রীবিজয় থেকে। 896 থেকে 911 খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্রথম সতারিখ লেখ গুলিতে কোন রাজার নাম পাওয়া যায় না। 914 সালের একটি উৎকীর্ণ লিপিতে রাজা হিসাবে শ্রীকেশরীবর্মন নামের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। রাজা উগ্রসেনের (খ্রী, 915-942) নামও পাওয়া গেছে। 955 থেকে 983 খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বর্মদেব উপাধিধারী তিনজন রাজার নাম পাওয়া গেছে। একজন রাণীর নাম ছিল সুভদ্রিকাবর্মদেবী। 989 থেকে 1022 সালের মধ্যে রাজা ধর্মোদয়ণ বর্মদেব ও তাঁর রাণী 'গুণপ্রিয়াধর্মপত্নী' মহেন্দ্রদত্তার লিপি পাওয়া গেছে। মহেন্দ্রদত্তা ছিলেন মকুটবংশের কন্যা। মকুটবংশ ছিলেন পূর্ব-জাভার রাজা সিণ্ডোকের পৌত্র। এই বৈবাহিক সম্বন্ধকে কেন্দ্র করে বলিতে হিন্দুধর্ম ও যবদ্বীপীয় সংস্কৃতি বিস্তার লাভ করেছিল। বলিদ্বীপে তান্ত্রিক মতবাদেরও সন্ধান পাওয়া গেছে।

ঐরলঙ্গ

মধ্য জাভার পতন ঘটলে, ঐরলঙ্গের (1019-49) নেতৃত্বে পূর্ব জাভায় নতুন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। ঐরলঙ্গ ছিলেন ধর্মোদয়ণ ও মহেন্দ্রদত্তার পুত্র। জাভার প্রধান সামন্ত ও ব্রাহ্মণকুলের অনুরোধে তিনি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। 1019 সালে অভিষেক কালে তিনি উপাধি গ্রহণ করেন শ্রীলোকেশ্বর ধর্মবংশ ঐরলঙ্গ অনন্তবিক্রমোত্তুঙ্গদেব। পূর্ব ও পশ্চিমের শত্রু নিধন করে তিনি জাভার সমৃদ্ধি পুনরায় ফিরিয়ে আনেন। হয় বাণিজ্য মৃগয়ায়, না হয় শান্তির অন্বেষণে বহু বিদেশী তাঁর রাজত্বকালে জাভায় এসেছিলেন। যে সব দেশ থেকে অতিথিরা এসেছিলেন, সেগুলি হল ক্লিঙ (কলিঙ্গ), সিংহল, দ্রাবিড়, কর্ণাটক, চম্পা এবং কম্বুজ। তাঁর রাজত্বকালে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসাবে জাভা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাচীন জাভা ভাষায় 'অর্জুন-বিবাহ' মহাকাব্য তাঁর রাজত্বেই লিখিত হয়েছিল। ঐরলঙ্গের সঙ্গে শ্রীবিজয় রাজ্যের রাজকুমারীর বিবাহ উপলক্ষে, জাভা-সুমাত্রার দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের পর, এই শান্তি পর্বকে স্মরণ করে কবি কন্ব 'অর্জুন-বিবাহ' মহাকাব্য রচনা করেছিলেন। শেষ জীবনে রাজা ঐরলঙ্গ দুই সন্তানের মধ্যে রাজ্য ভাগ করে দিয়ে সন্ন্যাস জীবন গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর গৌরবময় পবিত্র স্মৃতি জাভার গণমানসে আজিও অম্লান এবং বিষ্ণুর [illegible]পে তিনি পূজিত হয়েছেন।

জঙ্গলে ও কেদিরি

বিভক্ত রাজ্য দুটি জঙ্গলে ও কেদিরি নামে পরিচিত। শতাব্দী ব্যাপী জঙ্গলের নাম ছিল প্রায় অবলুপ্ত। তারপর অবশ্য এই রাজ্য তুমপেল বা সিংহসারি নামে আত্মপ্রকাশ করে। কেদিরি বা দহ রাজ্য সেখানকার কবিকুলের জন্য বিখ্যাত। আনুমানিক 1104 খ্রীষ্টাব্দে কেদিরির রাজা জয়বর্ষের সভা অলংকৃত করেছিলেন 'কৃষ্ণায়ণ' এর লেখক ত্রিগুণ। 1115 থেকে 1130 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন রাজা কামেশ্বর (Coedes-এর মতে বামেশ্বর)। বলা হয়, তিনি ছিলেন জাভার সুবিখ্যাত বীর জননায়ক রাদেন পঞ্জী। তাঁর সভা কবি ছিলেন 'স্মরদহণ' প্রণেতা ধর্মজ।

1135-57 সালে কেদিরির সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন বিখ্যাত রাজা জয়ভয়। 1157 সালে কবি সেদহ্ 'ভারত যুদ্ধ' লেখা শুরু করেন। 'হরি-বংশ' এর লেখক পনুলুহ্ তা সমাপ্ত করেন। 'ভারত যুদ্ধ' এ মহাভারতের কাহিনীগুলি জাভার ঐতিহাসিক পরিমণ্ডলের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পরি-বেশিত হয়েছে। কুরুক্ষেত্র হল জাভা। উভয় পক্ষের নায়করা হলেন জাভার রাজপুরুষকুল। জয়ভয় হলেন একজন বীর অধিনায়ক। জাভাতে অদ্যাপি জনশ্রুতি প্রচলিত আছে যে জয়ভয়ের পুনরাবির্ভাব ঘটবে এবং তিনি জাভার স্বর্ণযুগ ফিরিয়ে আনবেন। জয়ভয় নাকি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে সুদূর ভবিষ্যতে পীতবর্ণের মানুষ কয়েক শতাব্দীর বন্দীদশা থেকে জাভাকে মুক্ত করবে। প্রচলিত বিশ্বাস এই যে সেই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়েছে। জাপানীরা ওলন্দাজ গ্রাস থেকে জাভাকে মুক্ত করেছে।

কেদিরির শাসকবর্গ বৈদেশিক সম্বন্ধ রচনাতেও সজাগ ছিলেন। 1129 খ্রীষ্টাব্দে কামেশ্বর (বা বামেশ্বর) চীন সম্রাটের কাছ থেকে 'রাজা' উপাধি পেয়েছিলেন। আরব বিবরণ থেকে জানা গেছে যে মাদাগাসকারের বিপরীত দিকে আফ্রিকার দক্ষিণ উপকূলে সোফালা পর্যন্ত জাভার বণিকরা বাণিজ্য করতে যেত। জাভার রাজদরবারে অসংখ্য নিগ্রো ক্রীতদাস ছিল। জয়ভয়ের পর আমরা সর্বেশ্বর (1160), আর্যেশ্বর (1171), ক্রোঞ্চাচার্য্যাদীপ (1181), দ্বিতীয় কামেশ্বর বা বামেশ্বর (1185) এবং দ্বিতীয় সর্বেশ্বরের (1190-1200) নাম পাই। আনুমানিক 1200 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সর্বশেষ রাজার আমল বিস্তৃত ছিল। চীনা বিবরণে বলা হয়েছে এ যুগে কেদিরির সমৃদ্ধি আরব ঐশ্বর্যের সমতুল্য ছিল।

সিংহসারি

উত্তর-ত্রয়োদশ শতক পর্বের জাভার ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে প্রাচীন জাভা ভাষায় লিখিত নাগরকৃতাগম এবং পররতন নামক দুটি গ্রন্থে। নাগরকৃতাগম গ্রন্থের রচনা কাল 1365 খ্রীষ্টাব্দ। এই গ্রন্থে বর্ণিত ইতিহাস শুরু হয়েছে কেন আংগ্রোক নামক রাজার রাজত্বকাল থেকে এবং শেষ হয়েছে 1365 খ্রীষ্টাব্দের সীমারেখায় অর্থাৎ হয়ম ভুরুকের রাজত্ব পর্যন্ত। পররতন গ্রন্থ রচিত হয়েছিল 1613 খ্রীষ্টাব্দে। এই গ্রন্থে রাজা কেন আংগ্রোক থেকে শুরু করে মজপাহিত সাম্রাজ্যের পতন (1478 খ্রীষ্টাব্দ) পর্যন্ত জাভার ইতিহাস বিবৃত হয়েছে।

কেন আংগ্রোক ছিলেন কৃষক বংশোদ্ভূত। প্রথম যৌবনে তিনি ছিলেন দস্যু। কেদিরির রাজা কৃতজয়ের (1216-22) সঙ্গে পুরোহিত তন্ত্রের বিরোধ বাঁধে। পুরোহিতরা দস্যু কেন আংগ্রোককে ঈশ্বরপুত্র রূপে ঘোষণা করেন এবং তাঁর সাহায্যে রাজা কৃতজয়কে বিতাড়িত করেন। এই প্রসঙ্গে বিজন রাজ চট্টোপাধ্যায় একটি গল্প শুনিয়েছেন। জুয়ার আড্ডায় কেন আংগ্রোক মত্ত ছিলেন। ইতিমধ্যে ভারতবর্ষ থেকে আগত এক ব্রাহ্মণ তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। অলৌকিক ক্ষমতা বলে সেই ব্রাহ্মণ জানতে পারেন যে কেন আংগ্রোক হচ্ছেন বিষ্ণুর অবতার। ব্রাহ্মণের সাহায্যে তিনি তুমপেল (সিংহসারি) রাজ্যের রাজদরবারে চাকুরি গ্রহণ করেন। সেখানে তিনি মহারাণী দেদেসের প্রণয়াসক্ত হয়ে পড়েন। তুমপেলের রাজাকে হত্যা করে তিনি সিংহাসন দখল করেন, মহারাণী দেদেসকে বিবাহ করেন এবং জঙ্গলে ও কেদিরি পদানত করেন। 1227 সালে তিনি নিহত হন। সিংহসারির সিংহাসনে তাঁর তিনজন উত্তরাধিকারীও পর পর নিহত হন। কেন আংগ্রোকের রাজত্বে নির্মিত প্রজ্ঞাপারমিতার মূর্তি জাভার ভাস্কর্যের এক অতুলনীয় নিদর্শন।

সিংহসারির চতুর্থ রাজা ছিলেন কৃতনগর। তাঁর ঘটনাবহুল রাজত্বকাল (খ্রী 1268-1292) জাভার ইতিহাসে যুগ সন্ধি রূপে বিবেচিত। তাঁর জীবদ্দশাতেই তিনি শিব বুদ্ধ নামে পূজিত হয়েছিলেন। জাভার ইতিবৃত্তে তাঁর সম্বন্ধে পরস্পর বিরোধী মন্তব্য আছে। নাগরকৃতাগম গ্রন্থে তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করে বলা হয়েছে যে তিনি ছিলেন সাম্রাজ্যবাদ নীতির সফল রূপকার। কিন্তু পররতন গ্রন্থে তাঁর বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করা হয়েছে। মলায়ু (সুমাত্রা), বালি ও বকুলপুরে (দক্ষিণ-পশ্চিম বোর্ণিও) অভিযান পাঠিয়ে তিনি অযথা শক্তিক্ষয় করেছেন, অথচ স্বদেশে তিনি শক্তি সংহত করেন নি। তাঁর অধীন রাজ্য কেদিরির জয়কাতোং বিদ্রোহ ঘোষণা করে সিংহসারি পর্যন্ত এগিয়ে এসেছিলেন। বৈরী সেনার হাতে কৃতনগর নিহত হন।

মজপহিত

কৃতনগরের মৃত্যুর পর তাঁর জামাতা রাদেন বিজয় মাদুরায় পালিয়ে এলেন। মাদুরা জাভার উত্তরাঞ্চলের একটি দ্বীপ। মাদুরার প্রধান শাসকের পরামর্শমত রাদেন বিজয় কেদিরির জয়কাতোংএর প্রতি আনুগত্যের ভান করে তাঁর সেনাবাহিনীতে যোগ দিলেন। জয়কাতোং-এর অনুমতিক্রমে একটি পতিত জমিতে তিনি বসতি গড়ে তুললেন। মজ মানে বেল গাছ আর পহিত মানে তিক্ত ফল। এই গাছ ও তার তিক্ত ফলের জন্যই অঞ্চলটির নাম হয়েছে বিল্ব-তিক্ত বা মজপহিত। এখানে রাদেন বিজয় সৈন্য সংগ্রহ করলেন। 1293 খ্রীষ্টাব্দে কুবলাই খাঁর নেতৃত্বে চীনা সৈন্য বাহিনী এখানে হাজির হয়েছিল। রাদেন বিজয়ের প্ররোচনায় চীনা সেনাপতি জয়কাতোং-এর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন এবং তাঁকে হত্যা করেন। 1294 সালে রাদেন বিজয় চীনা সৈন্য-বাহিনীকে দেশ থেকে বিতাড়িত করে মজপহিত রাজ্যের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তিনি কৃতরাজস জয়বর্ধন উপাধি গ্রহণ করে পূর্বজাভার অধীশ্বর হন। মজপহিত রাজা হল প্রকৃত অর্থে সিংহসারি রাজ্যের উত্তরসূরী। অতি সাফল্যের সঙ্গে কৃতনগরের সাম্রাজ্য বিস্তারনীতি কৃতরাজস জয়বর্ধন অনুসরণ করেছিলেন। তাঁর সমাধি ক্ষেত্রে স্থাপিত একটি মন্দিরে কৃত-রাজসের একটি অনন্যসুন্দর মূর্তি অদ্যাপি বিষ্ণুরূপে পূজিত হচ্ছেন। মৃত রাজা যে দেবতার উপাসক ছিলেন, সেই দেবতার মূর্তিতে তাঁদের স্মৃতি সংরক্ষিত করার প্রথা সে যুগে জাভা ও কাম্বোডিয়াতেও প্রচলিত ছিল।

কৃতরাজসের পুত্র জয়নগর সুন্দর পাণ্ড্যদেব উপাধি গ্রহণ করে 1309 সালে মজপহিতের সিংহাসনে আসীন হন। এই উপাধি দক্ষিণ ভারতের পাণ্ড্য রাজ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তাঁর রাজত্বকালে 1326 খ্রীষ্টাব্দে ইতালীয় ধর্মযাজক Odoric Pordenone জাভাতে এসেছিলেন। ধর্মযাজক মজপহিতের বিশাল ও চমৎকার রাজপ্রাসাদ দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। তাঁর মতে মজপহিত ছিল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দ্বীপগুলির মধ্যে দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী।

1329 সালে মজপহিত রাজ্যের তৃতীয় অধিশ্বরী কৃতরাজসের প্রথম কন্যা ত্রিভুবনোত্তুঙ্গ দেবী জয়বিষ্ণুবর্ধনী সিংহাসনে বসেন। কিন্তু তাঁর রাজত্বে সর্বশক্তিমান ছিলেন প্রধান মন্ত্রী গজমদ। গজমদের নেতৃত্বে জাভার পূর্বাঞ্চলের দ্বীপপুঞ্জ, মাদুরা ও সেলেবেসের কিয়দংশ মজপহিত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। 1350 খ্রীষ্টাব্দে জয়বিষ্ণুবর্ধণীর পুত্র হয়ম ভুরুক

বয়ঃপ্রাপ্ত হলে মহারাণী অবসর গ্রহণ করেন। হয়ম ভুরুক রাজসনগর উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর রাজত্বকালেও গজমদের নেতৃত্বে মজপহিত সাম্রাজ্যের বিরাট বিস্তার ঘটেছিল।

নাগরকৃতাগম এবং পররতন, দুটি গ্রন্থেই মজপহিত সাম্রাজ্যের অন্তর্গত রাজ্যগুলির তালিকা আছে। সেই তালিকায় জাভা এবং ইরিয়াণের (নিউ গিনি) মধ্যবর্তী দ্বীপ সমষ্টির নাম উল্লেখ করা হয়েছে। নিউ গিনির দক্ষিণ ও পশ্চিমাঞ্চল মজপহিতের আধিপত্য স্বীকার করেছিল। আধুনিক যুগে প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ যে পশ্চিম ইরিয়াণের সংযুক্তির দাবী জানিয়েছিলেন, তার ঐতিহাসিক ভিত্তি হল মজপহিত সাম্রাজ্যের এই বিস্তৃতি। বোর্ণিও, দক্ষিণ ও পশ্চিম সেলেবেস, বুটোন, বুরু, আমবন, বান্দা, বঙ্গাই, পশ্চিম মলুক্কা দ্বীপপুঞ্জ, তালাউত ইত্যাদির নাম এই তালিকায় স্থান পেয়েছে। মালয় উপদ্বীপে কেদা, কেলানতান, পাহাঙ, সিঙ্গাপুর এবং অন্যান্য অনেক স্থান মজপহিত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত ছিল। সুমাত্রা (শ্রীবিজয়ের রাজধানী পালেমবাঙ সহ) মজপহিতের বশ্যতা স্বীকার করে। নাগরকৃতাগমে মজপহিতের মিত্র রাজ্যগুলিরও উল্লেখ আছে। সেগুলি হল অযোধ্যা ও রাজপুরী (উভয় অঞ্চলই শ্যামদেশে), মারুতমা (বর্মার মার্তাবান), কম্বোজ, চম্পা, যবন (য়ুনান)। ভারতের কর্ণাট ও গৌড় অঞ্চল থেকে এখানে মালবাহী জাহাজ আসত। জাহাজে করে আসতেন সাধুসন্ত, পণ্ডিত ব্রাহ্মণ ও অগণিত মানুষ। নানা দ্বীপের (উপরে সেগুলি উল্লেখ করেছি) শাসনকর্তারা উপঢৌকন পাঠাতেন মজপহিতের রাজসভায়। সাম্রাজ্যের দূরতম অঞ্চলে তত্ত্বাবধানের জন্য মন্ত্রী ও ভুজঙ্গ পাঠান হত। ভুজঙ্গরা হলেন প্রাজ্ঞ পুরোহিত। শৈব ভুজঙ্গরা শৈব ধর্মপ্রচারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। পূর্বজাভা ও পশ্চিমাঞ্চলের দ্বীপগুলিতে বৌদ্ধ ভুজঙ্গদের যাতায়াতে কোন বাধা নিষেধ ছিল না। কিন্তু জাভার পশ্চিমাঞ্চলে তাঁদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। নাগরকৃতাগম গ্রন্থ থেকে আরও জানা যায় যে রাজধানীর পূর্ব প্রান্ত ছিল শৈব-ব্রাহ্মণদের বাসভূমি, দক্ষিণ-প্রান্ত বৌদ্ধদের এবং পশ্চিম প্রান্ত ক্ষত্রিয়, মন্ত্রীমণ্ডলী ও অন্যান্যদের। সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর মধ্যে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার ঘটেছিল। কিন্তু সাধারণ মানুষের ধর্মজীবনকে তা আদৌ স্পর্শ করে নি। জাভার সাহিত্যে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতাপ অতি প্রবল। মজপহিত যুগের বৌদ্ধ কবিকুল হিন্দু-মহাকাব্যের কাহিনী অবলম্বনে কাব্য রচনা করেছেন।

হয়ম ভুরুক রাজসনগর 1389 খ্রীষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেছিলেন। তারপরই মজপহিত সাম্রাজ্য গৃহবিবাদে দীর্ণবিদীর্ণ হয়ে পড়েছিল। পতনের প্রাক্কালে কেদিরি বা দহ স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করে। 1403 থেকে 1406 খ্রীষ্টাব্দের

মধ্যে পরস্পর বিবদমান দুটি অংশে মজপাহিত রাজ্য বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। উত্তর বোর্ণিও, সুমাত্রার ইন্দ্রগিরি এবং মালাক্কা এই সুযোগে জাভার আধিপত্য অস্বীকার করে। রাজ্যে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ শুরু হয়।

সার্বভৌম শক্তি হিসাবে মজপাহিতের বিলয় ঘটলে পশ্চিম বোর্ণিও, San-Fo-Tsi এবং সুমাত্রা ও মালয়ের অন্যান্য রাজ্য চীন সম্রাটের রাজদরবারে উপঢৌকন ও দূত পাঠাতে সুরু করেছিল। খ্রীষ্টীয় 1405 থেকে 1433 সালের মধ্যে চৈনিক মহানাবিক চেং-হো'র নৌ-অভিযান একথাই প্রমাণ করে যে সামুদ্রিক শক্তি হিসাবে মজপাহিতের প্রাধান্য অবলুপ্ত।12 Krom একটি লেখ মালার সাক্ষ্যের ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে কেদিরি রাজ্যের রণবিজয় নামে রাজকুরার 1478 খ্রীষ্টাব্দে মজপাহিতের বিরুদ্ধে অন্তিম অভিযান চালান। মজপাহিত রাজ্যের প্রধান প্রধান পরিবার বলিদ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করেন। যবদ্বীপীয় পরম্পরা থেকে আমরা জেনেছি যে 1478 সালে সম্মিলিত ভাবে কয়েকটি মুসলমান রাষ্ট্র মজপাহিত জয় করে। D. G. E. Hall বলেছেন এটা মেনে নেওয়া অসম্ভব এই কারণে যে 1486 সালেও রণবিজয় নামে একজন হিন্দু রাজার রাজত্বের স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে।13 রমেশ চন্দ্র মজুমদারও দেখিয়েছেন যে 1504 সালেও মালাক্কার সুলতান জাভা অভিযানের ভয়ে শঙ্কিত ছিলেন। ভারত মহাসাগরে মজপাহিত সাম্রাজ্যের আধিপত্য তখনও প্রতিষ্ঠিত ছিল।14 Brian Harrison বলেছেন যে 1478 সালে দেমকের শক্তিশালী মুসলমান রাজ্যের নেতৃত্বে মজপাহিতের বিরুদ্ধে একটি অভিযান পরিচালিত হয়েছিল। তাঁর মতে পঞ্চদশ শতকের শেষে মজপাহিত সাম্রাজ্য একটি হৃতগৌরব পূর্ব যবদ্বীপীয় রাজ্যে পরিণত হয়।15 জাভা মুসলমান শক্তির কবলিত হলে হিন্দু রাজপরিবার, রাজপাদোপজীবী, সামন্তকুল ও অন্যান্য ধনপতি শ্রেণী বলিদ্বীপে আশ্রয় নেয়। এর ফলে অদ্যাপি বলিদ্বীপে জাভার হিন্দু সংস্কৃতির ঐতিহ্য অম্লান ও সজীব।

পাদটিকা :

1. H. B. Sarkar, 'A Geographical Introduction to South-East Asia : The Indian Perspective' *Bijdragen Tot De Taal*, 1981 pp 304-305.
2. R. C. Majumdar, *Ancient Indian Colonization in South-East Asia* (Baroda 1971) p 11.
3. *Ibid.*, p 32.
4. B. R. Chattrjee, *History of Indonesia* (Meerut 1967) p 7. রমেশচন্দ্র মজুমদার মনে করেন এই তারিখ হবে 414-15 খ্রীষ্টাব্দ। R. C. Majumdar, *op. cit.* p 32.
5. B. R. Chatterjee, *op. cit.* p 15.
6. *Ibid.*, p 17.
7. R. C. Majumdar, *op. cit.*, p 45.
8. *Ibid.*, p 38.
9. *Journal of American Oriental Society*, Vol. 70 p 76; Vol 72, p 37.
10. R. C. Majumdar, *op. cit.*, p 41.
11. *Ibid.*, p 50.
12. কালক্রম ও গন্তব্য স্থল অনুসারে চীনের মহানাবিক চেংহোর সামুদ্রিক অভিযান নিচে উল্লেখ করা হল।

(1) 1405-07 চম্পা, জাভা, মালাক্কা, সমুদ্র (উত্তর-পূর্ব সুমাত্রা), লামুরি (উত্তর সুমাত্রা), সিংহল, কালিকট।

(2) 1407-09 }
(3) 1409-11 } চম্পা, জাভা, শ্যামদেশ, মালাক্কা, সমুদ্র, সিংহল ও ভারত।

(4) 1413-15 চম্পা, জাভা, মালাক্কা, সমুদ্র, বাংলাদেশ, হোরমুজ বন্দর, এডেন।

(5) 1417-19 চম্পা, জাভা, মালাক্কা, সমুদ্র, হোরমুজ বন্দর, এডেন ও মালিন্দী (পূর্ব আফ্রিকা)।

(6) 1421-22 জাভা, মালাক্কা, সমুদ্র, ব্রাভা ও মোগাদিশু (পূর্ব আফ্রিকা)।

(7) 1431-33, হোরমুজ ও আফ্রিকার পূর্ব উপকূল।

এই অভিযানগুলির সম্যক বিবরণের জন্য দেখুন ঃ অরুণ দাশগুপ্ত, 'মহানাবিক চেং হো', ঐতিহাসিক—4, প্রবন্ধ সংকলন, জানুআরি 1977, p. 38.

13. D. G. E. Hall, *A History of South-East Asia* (London 1960), p 84.

14. R. C. Majumdar, *op. cit.*, p 52.

|| 7 ||

মালাক্কা

মালাক্কা বন্দরের প্রতিষ্ঠা

মালাক্কা ছিল মূলত ধীবরদের গ্রাম। মাত্র বিশ ত্রিশটি পরিবার এখানে বসবাস করত। গ্রামটি ছিল নিঃসন্দেহে খুবই ছোট। চীন থেকে স্বদেশে ফেরার পথে খ্রীষ্টীয় 1292 সালে মার্কো পোলো মালাক্কা প্রণালী অতিক্রম করেন। কিন্তু তাঁর বিবরণে এই গ্রামের উল্লেখ নেই। আরব পর্যটক ইবন্ বতুতার বিবরণেও কোন উল্লেখ নেই। 1345-46 সালে চীন যাতায়াতের পথে তিনি দু'বার সমুদ্র অর্থাৎ উত্তর-পূর্ব সুমাত্রায় অবস্থান করেছিলেন। চতুর্দশ শতকে নিশ্চয়ই মালাক্কা বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে। কারণ 1324 সালের শ্যামদেশের অধীন অঞ্চলগুলির তালিকাতেও মালাক্কা গ্রামের নাম স্থান পেয়েছিল। ওলন্দাজ পণ্ডিত G. P. Rouffaer-এর মতে 1400 সালের পূর্বে মালাক্কার অস্তিত্ব ছিল না। তোমে পিরেস ও আলবুকের্কের বিবরণ থেকে জানা যায় আনুমানিক 1400 সালে মালাক্কার বন্দর রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। Hall প্রমুখ বিশিষ্ট পণ্ডিতবর্গ এই বন্দর রাজ্যের প্রতিষ্ঠার বছর 1403 খ্রীষ্টাব্দ ধার্য করেছেন।

পরমেশ্বর নামে একজন শৈলেন্দ্র রাজকুমারের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামটি ইতিহাসের শিরোনামে স্থান পেল। 1391-92 সালে সুমাত্রার রাজকুমার পরমেশ্বর পালেমবাঙ থেকে পালিয়ে তুমাসিকে (সিঙ্গাপুর) আশ্রয় গ্রহণ করেন। অনুচরদের সাহায্যে তিনি সিঙ্গাপুরের শাসককে হত্যা করে ক্ষমতা দখল করেন এবং তুমাসিককে জলদস্যুতার ঘাঁটি হিসাবে গড়ে তোলেন। সিঙ্গাপুরে তিনি 1391-92 থেকে 1396-97 সাল পর্যন্ত ছিলেন। হয় 1398 সালে বা 1400 সালে শ্যাম অঞ্চল থেকে তাদের বিরুদ্ধে একটি সেনাবাহিনী পাঠান হয়। এখান থেকে পালিয়ে তখন পরমেশ্বর ও তাঁর অনুচরবর্গ মালাক্কা গ্রামে আশ্রয় নেন। তাঁরই শাসনে এই ধীবর গ্রামটি একটি সমৃদ্ধ বন্দর রাজ্যে পরিণত হয়। পঞ্চদশ শতকে এই আগন্তুকদের প্রচেষ্টায় মালাক্কার রূপান্তর ঘটে। ইক্ষু, মশলা ও কদলীর চাষ তাঁরা এখানে প্রবর্তন করেন। এখানে তাঁরা অপরিমেয় ধাতব সম্পদ অর্থাৎ টিনও আবিষ্কার করেন।

জনসংখ্যা দশ বছরের মধ্যে দু'হাজারে দাঁড়ায়। ধানচাষে তারা পারদর্শী ছিল না। তাই সুমাত্রা থেকে এখানে চাউল আমদানি করা হত। এভাবেই মালাক্কার ক্রমবর্ধমান সমৃদ্ধি শুরু হয়েছে।

পরমেশ্বরের বিদেশ-নীতি

শ্যামদেশ সম্পর্কে মালাক্কা আতঙ্কিত বোধ করেছিল। তাই চীনের সঙ্গে সৌহার্দ্য গড়ে তোলাই ছিল পরমেশ্বরের রাজনীতির মূল লক্ষ্য। এই উদ্দেশ্যে তিনি চীনে দূত প্রেরণ করেছিলেন। চীনে তখন মিং বংশের রাজত্বকাল (1368-1644)। মিং বংশের তৃতীয় সম্রাট ইয়ংলো (1402-24) বহির্বিশ্বে চীনের প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তারে আগ্রহান্বিত ছিলেন। 1403 খ্রীষ্টাব্দে চীনের নৌ সেনাধিনায়ক ইন-চিং এর নেতৃত্বে একটি নৌবাহিনী অনেক উপঢৌকন নিয়ে চীন থেকে মালাক্কাতে এসে উপস্থিত হয়। চীন সম্রাট মালাক্কার শাসক হিসাবে পরমেশ্বরকে স্বীকৃতি দান করেন। কৃতজ্ঞতার নিদর্শন রূপে পরমেশ্বর 1405 ও 1407 সালে চীনে দূত প্রেরণ করেন। 1405 ও 1433 সালের মধ্যে চীনের মহানাবিক চেং হো সাতটি নৌ অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। এই অভিযানগুলির কথা আমরা আগের অধ্যায়ে উল্লেখ করেছি। প্রথম অভিযানে তাঁর অনুগামী ছিল 63টি জাহাজ। 1411 সালে চেং হো পরমেশ্বরকে চীনের রাজদরবারে নিয়ে আসেন। তখন পরমেশ্বরের সঙ্গে ছিলেন 540 জন অনুচর। চীনের অনুগত কিন্তু স্বাধীন স্বতন্ত্র শাসক হিসাবে পরমেশ্বর স্বীকৃতি লাভ করেন। 1413 খ্রীষ্টাব্দ চেং হো পুনরায় মালাক্কা আসেন। তখন তাঁর সহচর ছিলেন মা হুয়ান (Ma Huan) নামে একজন চৈনিক মুসলমান। এই সমুদ্র যাত্রার বিবরণ ও মালাক্কার পরিচয় দিয়ে মা হুয়ান একটি গ্রন্থ রচনা করেন। মা হুয়ানের গ্রন্থ থেকে আমরা জেনেছি যে মালাক্কা ছিল একান্তভাবেই বাণিজ্য-নির্ভর রাজ্য। পরমেশ্বরের আমলে এখানে ছিল পর্যাপ্ত খাদ্য, নিরাপদ আশ্রয় ও সুশৃঙ্খল শাসন। বিদেশী বণিকরা তাই মালাক্কা সম্পর্কে আকর্ষণ বোধ করত। মালাক্কার বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল সুমাত্রা এবং উত্তরের পসেই (Pasai) ও পারলাক (Perlak) রাজ্যের সঙ্গে। এই রাজ্যগুলির সঙ্গে ত্রেংগানুতে (Trengganu) প্রাপ্ত একটি প্রস্তর লেখ থেকে অনুমান করা হয়েছে যে চতুর্দশ শতকে পূর্ব উপকূলে ইসলামের প্রসার ঘটেছিল। মালাই ভাষায় ও আরবি লিপিতে লিখিত এই শিলালিপিতে ইসলাম ধর্মের মূল বাণী প্রচারিত হয়েছে। লেখমালার তারিখ 1303 বা 1386 খ্রীষ্টাব্দ। অনেক ঐতিহাসিকের মতে প্রথম তারিখই বোধ হয় গ্রাহ্য। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ

ঘটনা হল যে স্বয়ং পরমেশ্বর ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন। 1414 সালে তিনি পসেই-এর মুসলমান শাসকের কন্যাকে বিবাহ করেন এবং মহম্মদ ইসকানদার শাহ নাম গ্রহণ করেন। 1414-15 এবং 1419 সালে ইসকানদার শাহ পুনরায় চীন ভ্রমণ করেন। চীনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের ফলে শ্যাম আক্রমণের আতঙ্ক দূরীভূত হয়েছিল। 1424 খ্রীষ্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন। মালাক্কা বন্দর রাজ্যের তিনি স্রষ্টা ছিলেন। চীনের সঙ্গে মালাক্কার বন্ধুত্ব স্থাপন তাঁর রাজত্বের অন্যতম প্রধান কীর্তি।

শ্রী মহারাজা

মালাক্কার পরবর্তী শাসক শ্রী মহারাজা কুড়ি বছর (1424-44) রাজত্ব করেছিলেন। পরমেশ্বর স্বয়ং ব্যক্তিগতভাবে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। কিন্তু তখনও হিন্দু ধর্ম ছিল রাষ্ট্রীয় ধর্ম। মালাক্কার অধিবাসী সকলেই হিন্দু ছিল, তা মনে করার কোন সঙ্গত কারণ নেই। পসেই থেকে আগত মুসলমান তামিল বণিক গোষ্ঠী যথেষ্ট প্রভাবশালী ছিল। 1424 ও 1433 সালে শ্রী মহারাজা চীন সম্রাটের স্বীকৃতি আদায়ের জন্য চীন ভ্রমণ করেছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে চেং হো পুনরায় মালাক্কা এসেছিলেন। চেং হোর মৃত্যুর পর মালাক্কার সঙ্গে চীনের সম্বন্ধ শিথিল হয়ে পড়ে। বহির্বিশ্বে সম্বন্ধ রচনায় চীনের আগ্রহ তখন স্তিমিত হয়ে পড়েছে। মালাক্কাও ইতিমধ্যে প্রতিপত্তি ও পরাক্রম অর্জন করেছিল এবং স্বনির্ভর হয়েছিল। তাই চীন সম্পর্কে মালাক্কার শাসকগোষ্ঠী তখন ছিল নিরুৎসাহী। কিন্তু চীন-মালাক্কা সম্পর্কে ভাটা পড়ল সম্পূর্ণ অন্য এক কারণে। সে কারণ হল মালাক্কাতে ইসলামের অনুপ্রবেশ।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইসলামী সভ্যতার প্রসার ঘটেছে ভারতবর্ষের মাধ্যমে। ত্রয়োদশ শতকের শেষদিকে উত্তর সুমাত্রায় ইসলাম ধর্মের প্রতিষ্ঠা লক্ষ্য করা যায়। তখনও কিন্তু ভারতবর্ষে ইসলাম সুপ্রতিষ্ঠিত নয়। ভারতবর্ষে মাত্র কয়েকটি অঞ্চলে ইসলাম ধর্মের প্রসার ঘটেছে। কিন্তু উত্তর সুমাত্রার সঙ্গে গুজরাট ও কোরোমণ্ডল উপকূলের মুসলমান বণিকদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। একথা নিশ্চিত যে আরবদেশের বণিকদের কাছ থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ইসলামের বাণী শোনে নি। সাধারণ মত হচ্ছে যে গুজরাটের মুসলমান বণিকরা সেখানে সর্বপ্রথম ইসলামের বাণী প্রচার করেছিল।

মীরসন অবশ্য বলেছেন যে কোরোমণ্ডল উপকূলের মুসলমান বণিকরাই

ইসলাম ধর্ম প্রচারের অগ্রদূত। এই সিদ্ধান্তের পক্ষে তিনি কয়েকটি যুক্তি দেখিয়েছেন। 1297 খ্রীষ্টাব্দের আগে গুজরাটে ইসলাম ধর্ম বিস্তার লাভ করে নি। কিন্তু পূর্ব সুমাত্রার মেলয়ু (Mclayu) রাজ্য 1281 সালে দূত হিসাবে মুসলমান বণিকদের চীনে পাঠিয়েছিল।' 1292 খ্রীষ্টাব্দে মার্কো পোলো মালাক্কা প্রণালী অতিক্রম করেছিলেন। তখন তিনি পসেই ও পারলাকে মুসলমান শাসক দেখেছিলেন। পসেই-এর একজন শাসকের সমাধিক্ষেত্রে লেখা ছিল যে সমাধিস্থ ব্যক্তির নাম মালেক-আল-সাল্লে এবং তিনি 1297 খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করেছেন। হিকায়াত রাজাজ পসেই-গ্রন্থেও উল্লেখ করা হয়েছে যে দক্ষিণ ভারত থেকে ইসলাম ধর্ম ঐ অঞ্চলে এসেছে।

আরবদেশ থেকে নয়, ভারতবর্ষ থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইসলামের অনুপ্রবেশ ঘটেছে, এ ঘটনার ঐতিহাসিক তাৎপর্য অপরিমেয়। ইসলামের অনুচররা অনেক ক্ষেত্রে হিন্দু মূর্তি ও মন্দির ধ্বংস করেছে। কিন্তু ঐতিহ্যপুষ্ট সামাজিক প্রথা ও রীতিনীতিকে তারা পালটাতে চায় নি এবং পারে নি। ফলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া জুড়ে ভারতীয় সংস্কৃতির মূল ধারা অব্যাহত থেকেছে। প্রসঙ্গত আর একটি বিষয় মনে রাখা দরকার। ভারতীয় বণিকদের সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পরিচয় দীর্ঘস্থায়ী। নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগের ফলে ভারতীয় বণিকদের তারা কখনই বিদেশী বলে অবজ্ঞা করতে পারে নি। এই ভারতীয় বণিকরা যখন নিজেরা ধর্মান্তরিত হয়ে, ইসলামের বার্তা বহন করে এনেছে, তখনও তারা ভারতীয় বণিকদের বিদেশী ও বিধর্মী বলে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করতে পারে নি। ভারতীয় বণিকদের মাধ্যমে এসেছে বলেই ইসলাম ধর্ম দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় খুব সহজে গ্রহণযোগ্য হয়েছে। উত্তর সুমাত্রার রাজ্যগুলি এয়োদশ শতকেব শেষদিকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। চতুর্দশ শতকে অন্যত্র এই ধর্মের বিশেষ কোন প্রসার ঘটে নি। পঞ্চদশ শতকে মালাক্কাতে ইসলাম ধর্ম প্রচারিত হয়েছিল।

সুলতান মুজাফফর শাহ

শ্রীমহারাজা 1444 সালে পরলোক গমন করেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি রাজা কাশিম নামে পরিচিত ছিলেন। শ্রীমহারাজার কনিষ্ঠ পুত্রের নাম ছিল শ্রীপরমেশ্বর দেব শাহ। মালাই সম্প্রদায় ছিল তাঁর সমর্থক। শ্রীমহারাজার মৃত্যুর পর প্রথমে রাজা হন শ্রীপরমেশ্বর দেব শাহ। 1445 সালে তিনিও চীনে একটি মিশন পাঠান। তুন আলীর নেতৃত্বাধীন বিদ্রোহী গোষ্ঠী তাঁকে হত্যা করে রাজা কাশিমকে সিংহাসনে বসান। রাজা কাশিম সুলতান মুজাফফর শাহ নাম গ্রহণ করেন। 1446 থেকে

1459 সাল পর্যন্ত ব্যাপ্ত ছিল তাঁর রাজত্বকাল। তাঁর রাজত্বকালে মালাক্কা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইসলামী সভ্যতার প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। এতদিন পর্যন্ত মুসলমান তামিল বণিক সম্প্রদায় উত্তর সুমাত্রাকে বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্ররূপে গণ্য করত। এখন থেকে মালাক্কা হল তাদের প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র।

নানা কারণে সুলতান মুজাফফরের রাজত্বকাল গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, ইসলাম রাষ্ট্রীয় ধর্মরূপে স্বীকৃতি পেয়েছিল। রাজার ধর্ম প্রজাপুঞ্জ গ্রহণ করেছিল। রাজা ছিলেন ধর্মগুরু ও রাষ্ট্রপ্রধান। রাজদরবারে মুসলমান তামিল গোষ্ঠী ছিল প্রভাবশালী। ইসলাম ধর্ম প্রচারে বল প্রয়োগ করা হয় নি। সনাতন সমাজের রীতিনীতিকে আক্রমণ করা হয় নি। এসব কারণেই ইসলাম ধর্মের বিস্তার ছিল সহজ ও স্বাভাবিক। দ্বিতীয়ত, সুলতান মুজাফফরের রাজত্বের প্রথম দিকে মুসলমান তামিল গোষ্ঠীর নেতা তুন আলীকে বেনদাহারা বা প্রধানমন্ত্রীর পদ দেওয়া হয়েছিল। তিনি জনপ্রিয় হতে পারেন নি। সুলতান তাঁকে অপসারিত করে মালাই সম্প্রদায়ের একজন নেতা তুন পেরাককে বেনদাহারার পদে বসালেন। সুলতানের এই সিদ্ধান্তের ফলে দেশে ঐক্য ও সংহতি সাধনের পথ প্রশস্ত হয়েছিল। তৃতীয়ত, মালাক্কার কাছে শ্যাম দেশের পরাজয়ও বিশেষ অর্থবহ। 1445 ও 1456 খ্রীষ্টাব্দে শ্যাম দেশ মালাক্কার বিরুদ্ধে অভিযান পাঠিয়েছিল। 1445 সালের অভিযান ব্যর্থ হয়েছিল। দ্বিতীয় অভিযানের প্রাক্কালে সুলতান চীনে দূত প্রেরণ করেছিলেন। তুন পেরাকের নেতৃত্বে মালাক্কার রণতরী দ্বিতীয় শ্যাম অভিযানকেও পরাস্ত করেছিল। 1456 ও 1458 খ্রীষ্টাব্দে মালাক্কার সুলতান কূটনৈতিক প্রতিনিধি পাঠিয়ে শ্যাম রাজার সঙ্গে মিত্রতার চেষ্টা করেছিলেন। ফলে কিছুদিনের জন্য অবশ্য শ্যাম দেশের বৈরিতা স্থগিত ছিল। 1456 খ্রীষ্টাব্দে তিনি চীনের সঙ্গে মালাক্কার সম্বন্ধ পুনস্থাপিত করেন। 1459 সালে সুলতান পরলোক গমন করেন। বেনদাহারা তুন পেরাকের সুযোগ্য নেতৃত্বে মালাক্কা রাজ্য তখন সুসংহত ও সুশাসিত।

সুলতান মনশুর শাহ

পরবর্তী সুলতান মনশুর শাহ (1459-77) চীনে দূত পাঠিয়ে রাজ্য-শাসনের স্বীকৃতি চীন সম্রাটের কাছ থেকে আদায় করেছিলেন। তখন শ্যাম আক্রমণের আতঙ্ক দূরীভূত। এরপর থেকে মালাক্কা রাজ্য বিস্তারে মনোনিবেশ করে। শ্যামের করদ (Vassal) রাজ্য পাহাঙ (Pahang) প্রথমে আক্রান্ত হয়েছিল। পাহাঙ এর বিরুদ্ধে মালাক্কার সাফল্য ছিল চমকপ্রদ। তারপর সুমাত্রারপূর্ব

উপকূলের রাজ্যগুলির দিকে মালাক্কা দৃষ্টি দেয়। কামপার (Kampar) এবং শিয়াক (Siak) বিজিত হল। জামবি (Jambi) ও ইন্দ্রগিরি মালাক্কার প্রভুত্ব মেনে নিল। জোহোর ও দক্ষিণাঞ্চলের দ্বীপপুঞ্জও মালাক্কার নিয়ন্ত্রণ স্বীকার করে নিল। কিন্তু উত্তর সুমাত্রার আচে (Acheh) ও পসেই-এর বিরুদ্ধে মালাক্কার অভিযান সফল হয় নি। 1470 সাল নাগাদ মালাক্কা ছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সবচেয়ে পরাক্রান্ত রাজ্য এবং ইসলামী সভ্যতার পরম তীর্থ। মালাক্কার এই সমৃদ্ধির নায়ক ছিলেন তুন পেরাক। 1456 থেকে 1498 সাল পর্যন্ত তিনি বেনদাহারা বা প্রধানমন্ত্রীর পদে আসীন ছিলেন। এই সময় ইসলাম ধর্মের প্রচাব ঘটেছে মূলত সুফী সম্প্রদায়ের ধর্মগুরুর দ্বারা। সুফীরা গোঁড়া ধার্মিক নন, তারা হলেন মরমী মানব প্রেমিক। মালয় উপদ্বীপ ও অন্যান্য দ্বীপাঞ্চলে ইসলামের দ্রুত প্রসার ঘটেছে, কারণ সুফীরা ছিলেন ইসলামের উদারনৈতিক ভাবধাবার প্রবক্তা।

আলাউদ্দিন রিয়াইয়াৎ শাহ

মালাক্কার তৃতীয় সুলতান আলাউদ্দিন রিয়াইয়াৎ শাহ 1477 সাল থেকে 1488 সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। 1481 খ্রীষ্টাব্দে চীনে পুনরায় তিনি দূত পাঠিয়েছিলেন। এবার আশঙ্কা ছিল আনামের দিক থেকে। চীনের প্রচেষ্টায় আক্রমণের সম্ভাবনা বিদূরিত হয়। মালাক্কার সেনাবাহিনীতে জাভার অনেক ভাড়াটে সৈন্য ছিল। তারাও ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল। তাদের মাধ্যমে জাভাতেও ইসলাম ধর্ম ছড়িয়ে পড়ে। ভাড়াটে সৈন্য ছাড়াও বণিকদের মাধ্যমেও জাভাতে ইসলাম ধর্ম প্রচারিত হয়েছিল। শুধু তাই নয়, বণিকদের মাধ্যমেই এই ধর্ম বান্দা, মশলা দ্বীপপুঞ্জ, ব্রুনি এবং সুমাত্রার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বিস্তার লাভ করে। আলাউদ্দিন ছিলেন কর্মঠ ও দক্ষ শাসক। 1488 খ্রীষ্টাব্দে মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

মামুদ শাহ

মালাক্কার চতুর্থ সুলতান ছিলেন মামুদ শাহ (1488-1511)। তাঁর রাজত্বে একটি অভিনব সমস্যার উদ্ভব হয়। তুন পেরাক ছিলেন মালাই সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি। শাসক গোষ্ঠীও ছিল মালাই সম্প্রদায়ভুক্ত কিন্তু সংখ্যালঘু। সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল প্রতিদ্বন্দ্বী ধনাঢ্য তামিল বণিককুল। অন্যান্য বণিকরা ছিল হয় বিদেশী, না হয় বর্ণসংকর। সেনাবাহিনীর অধিকাংশ লোক ছিল জাভা থেকে আগত ভাড়াটে সৈন্য। শাসক শ্রেণীর প্রতি দেশের

প্রভাবশালী গোষ্ঠীর কোন সমর্থন ছিল না এবং আনুগত্য বোধও ছিল না। মালাক্কার প্রতি ছিল না মমতাবোধ। কোন অর্থেই তারা নির্ভরযোগ্য ছিল না।

তুন পেরাক মারা যান 1498 খ্রীষ্টাব্দে। এই সময় তুন মুতাহির (Tun Mutahir) ছিলেন মুসলমান তামিল সম্প্রদায়ের নেতা। মুতাহিরকে বেনদাহারা পদে নিযুক্ত করা হল। তাঁকে কেন্দ্র করে তামিল মুসলমান সম্প্রদায় শাসনবিভাগে প্রাধান্য অর্জন করেছিল। তুন মুতাহির বেনদাহারা পদে আসীন ছিলেন 1500 সাল থেকে 1510 সাল পর্যন্ত। সুলতান মামুদের আমলেই 1508 খ্রীষ্টাব্দে চীনে পুনরায় দূত প্রেরিত হয়েছিল। তুন মুতাহির ছিলেন দুর্নীতিগ্রস্ত ও উদ্ধত। তিনি সুলতানের বিরাগ-ভাজন হয়েছিলেন। নিজের দোষত্রুটির জন্য তিনি বিরোধী গোষ্ঠীর উত্থানের পথ প্রশস্ত করেছিলেন। ইতিমধ্যে 1509 সালে পর্তুগীজ জাহাজ অকস্মাৎ মালাক্কাতে এসে হাজির হলে, মালাক্কার শাসকগোষ্ঠী তাদের স্বাগত জানিয়েছিল। কিন্তু মালাক্কার ভারতীয় মুসলমান বণিককুল পর্তুগীজদের আগমনে আতঙ্কিত বোধ করেছিল। তাদের প্ররোচনায় তুন মুতাহির পর্তুগীজ শক্তির বিরুদ্ধে বৈরী মনোভাব গ্রহণ করে। এই বৈরিতা মালাই শাসক গোষ্ঠীর মনঃপূত হয় নি। 1511 সালে পর্তুগীজ জাহাজ পুনরায় মালাক্কাতে এসে হাজির হয়। এবার তারা এসেছিল বাণিজ্য মৃগয়ায় নয়, এসেছিল মালাক্কা দখল করতে।

ব্রুনি

মালাক্কার গৌরব লগ্নে ব্রুনিতেও মুসলমান সুলতানী শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ক্রমশ ব্রুনির প্রভাব এখন সাবা ও সাবাবাক যে অঞ্চলে অবস্থিত অতদূর বিস্তৃত হয়েছিল। ব্রুনির বর্তমান শাসক বংশের রাজত্ব সুরু হয় পঞ্চদশ শতকের প্রথম দিকে। আনুমানিক 1440 খ্রীষ্টাব্দে মালাক্কার সংস্পর্শে এসে ব্রুনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। প্রথম মুসলমান শাসকের নাম ছিল আওয়াং অলক বার তাবার (Awang Alak bur Tabar)। তিনি মহম্মদ নাম গ্রহণ করেন এবং জোহোরের মুসলমান রাজকুমারীকে বিবাহ করেন। মালাক্কার সঙ্গে ব্রুনির বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল। ব্রুনি রপ্তানি করত মোম, সাগু, চাউল, সোনা ও কর্পূর আর পরিবর্তে পেত ভারতীয় ছিটকাপড়। পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত মালাক্কার দাপটের সামনে ব্রুনি ছিল নিষ্প্রভ। কিন্তু 1511 সালে মালাক্কাতে পর্তুগীজ আক্রমণ ঘটলে, সেখানকার ধনী মুসলমান বণিকরা ব্রুনিতে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। তখন থেকেই ব্রুনির সমৃদ্ধি ও সুশাসনের শুরু।

চীনের সমুদ্রনীতি ও মালাক্কা 1

পঞ্চদশ শতকের শুরুতেই চীন ও মালাক্কার মধ্যে কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছিল। 1403 খ্রীষ্টাব্দের 28 অকটোবর চীন সম্রাট ইয়ংলো তাঁর দূত ইনচিংকে কোচিন যাবার পথে মালাক্কায় নেমে যাবার নির্দেশ দেন। মালাক্কা থেকে কোন সরকারী দূত চীনে আসার আগেই স্বয়ং চীন সম্রাট উদ্যোগী হয়ে সেখানে প্রতিনিধি পাঠিয়েছিলেন। এই ঘটনা বিশেষ তাৎপর্যবহ। এই সময় চীনের সমুদ্র নীতির অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ভারত মহাসাগর অঞ্চলের রাজ্যগুলির সঙ্গে বাণিজ্যিক ও কূটনৈতিক সম্বন্ধ গড়ে তোলা। মালাক্কা প্রণালী ছিল ভারত মহাসাগরে প্রবেশের প্রধান সরণি। মালাক্কা প্রণালীকে সাম্রাজ্যিক ও বাণিজ্যিক নিয়ন্ত্রণে আনার জন্যও চীন তৎপর হয়েছিল। তাছাড়া, এই পথকে চীন জলদস্যু মুক্ত করতেও চেয়েছিল। হয়ত এই সব কারণের জন্যই ভারত মহাসাগরে যাতায়াতের পথে চীনের মহানাবিক চেংহো ছ'বার মালাক্কা গিয়েছিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে এটাও মনে রাখা দরকার যে শ্যাম দেশের আক্রমণ থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য মালাক্কাও বিদেশী মিত্রের জন্য ব্যাকুল হয়েছিল। চীনের স্বীকৃতি ও সাহায্য মালাক্কার পক্ষে ছিল নিরাপত্তার রক্ষা কবচ। এ জন্য পরমেশ্বর ও শ্রীমহারাজা স্বয়ং চীনের রাজদরবারে উপস্থিত হয়েছিলেন। সম্রাট ইয়ংলোর রাজত্বকালে মালাক্কা অন্তত চোদ্দবার সেখানে দূত পাঠিয়েছে। মালাবারের গোলমরিচ ব্যবসায়ী মুসলমান বণিকরা মালাক্কা বন্দরের বাণিজ্যিক সম্ভাবনা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। তাদেরই উৎসাহে ও অনুরোধে চীন সম্রাট ইয়ংলো মালাক্কা বন্দরে ইনচিংকে পাঠিয়েছিলেন। এই বণিকরা চীনেব বাজার সম্পর্কে প্রলুব্ধ বোধ করছিল। চীনের সঙ্গে বাণিজ্য পরিচালনার পক্ষে মালাক্কা বন্দর ছিল ভারতীয় বণিকদের কাছে উপযোগী আশ্রয়ভূমি। ঠিক এই কারণেই তারা মালাক্কা সম্পর্কে চীন সম্রাটকে আগ্রহী করে তোলে।

Wang Ganguর আলোচনা থেকে আমরা জেনেছি যে ভারত মহাসাগরের গোলমরিচ বাণিজ্যে চীনের আগ্রহ ছিল অপরিসীম। প্রাক-ইউরোপীয় পর্বে চীনই ছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় গোলমরিচ ও মশলার প্রধান ক্রেতা। এই সময়ে চীন যুগপৎ মালাক্কা, সমুদ্র (উত্তর সুমাত্রা), ও মালাবার অঞ্চলের সঙ্গে সম্পর্ক রচনায় আগ্রহী হয়েছিল। কারণ এই তিন অঞ্চলেই গোলমরিচ পাওয়া যেত অপর্যাপ্ত। চীন সম্রাট ইয়ংলো গোলমরিচ ব্যবসায়ীদের করভারও কমিয়েছিলেন।

পর্তুগীজ বিবরণ থেকে জানা যায় যে এই সময় ভারত মহাসাগরের

বাণিজ্যে গুজরাটিদের অগ্রচারী ভূমিকা ছিল। চতুর্দশ শতকের শেষ দিকে তারা সুমাত্রার পশ্চিম উপকূল ও সুন্দা প্রণালী অতিক্রম করে উত্তর জাভার বন্দরগুলির সঙ্গে কারবার করত। মালাক্কা বন্দর প্রতিষ্ঠিত হবার পর, তারা উত্তর জাভার বন্দর এড়িয়ে মালাক্কা প্রণালী দিয়ে মালাক্কা বন্দরে যাতায়াত শুরু করে। পঞ্চদশ শতকেই ক্যামবে-মালাক্কা বাণিজ্য গড়ে ওঠে এবং মালাক্কায় গুজরাটিরা প্রাধান্য অর্জন করে। চীন ভারত বাণিজ্যিক লেনদেনের মিলনক্ষেত্র ছিল মালাক্কা। নতুন পরিস্থিতিতে পূর্ণ সুযোগ নিয়েছিল ক্যামবের জাহাজী ও বণিকরা। মালাবারের গোলমরিচ ব্যবসায়ী আরব বণিকরা এই সুযোগ আশানুরূপ কাজে লাগাতে পারে নি।

ভারত মহাসাগরীয় বাণিজ্যের দুটি পৃথক ধারা ছিল। এক, পশ্চিম থেকে পূর্বে, এডেন ও হোরমুজ থেকে মলুক্কা দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত প্রসারিত ছিল মুসলমান বণিকদের বাণিজ্য। দুই, পূর্ব থেকে পশ্চিমে দক্ষিণ চীন থেকে দক্ষিণ ভারত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল চীনের বাণিজ্য। পূর্বমুখী বাণিজ্যের ও বণিকদের স্বার্থে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রবেশ দ্বারে একটি বাণিজ্য কেন্দ্রের প্রয়োজন ছিল। কালিকটের পাশাপাশি তাই মালাক্কা বন্দরের উত্থান ছিল অবশ্যম্ভাবী। কালিকট বন্দরে ছিল আরবদের প্রাধান্য। পশ্চিম এশিয়ার মধ্য দিয়ে ভূমধ্যসাগরের সঙ্গে ছিল তাদের বাণিজ্যিক যোগাযোগ। চীনা বণিক ও গুজরাটি সওদাগর উত্তর জাভার আকর্ষণ অগ্রাহ্য করে মালাক্কা বন্দরে এসে সমাগত হয়। একথা সত্য চীন সাম্রাজ্যের সমর্থন ও সাহায্য ছাড়া মালাক্কার অভ্যুত্থান সম্ভব ছিল না। কিন্তু, তা সত্ত্বেও, ভারত মহাসাগরের বৃহত্তর বাণিজ্যিক প্রবাহ থেকেই মালাক্কা বন্দর প্রাণ শক্তি আহরণ করেছে।

মালাক্কার বিদেশ বাণিজ্য

পূর্ব ও পশ্চিম থেকে বাণিজ্য পথ মালাক্কাতে এসে মিলেছিল। লোহিত সাগর ও পারস্য উপসাগর থেকে জাহাজ এসে পৌঁছাত ভারতীয় বন্দর ক্যামবেতে। ক্যামবে ছিল গুজরাট রাজ্যে অবস্থিত। লোহিত সাগর থেকে মালাক্কা পৌঁছাতে মধ্য প্রাচ্যের বণিকদের প্রায় আঠার মাস সময় লাগত। ক্যামবেতে তারা নিয়ে আসত পশম বস্ত্র, প্রবাল, তামার জিনিস, ছোটখাটো গহনা, আফিম, গোলাপ জল, কিসমিস, মনাক্কা, ভেনেসীয় কাঁচ, নানা ধাতব দ্রব্য, সুগন্ধি, মণিমুক্তা, রঙ এবং নানা টুকিটাকি জিনিস। ক্যামবেতে তারা কিনত বস্ত্র, ঢাকনা বা পর্দার জন্য কারুকার্যময় কাপড় এবং ধূপ। কায়রো, মক্কা, এডেন, হোরমুজ, লেভানট, এশিয়া মাইনর ও পূর্ব আফ্রিকার

বণিকরা ক্যামবে ছেড়ে মালাক্কা যাত্রার প্রাক্কালে সংঘবদ্ধ সমিতি গঠন করত। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর আহ্বানে গুজরাটি জাহাজে তারা সরাসরি মালাক্কা এসে পেঁছাত। সঙ্গে করে যা কিছু তারা আনত, সবই মালাক্কায় তারা বিক্রি করত। তাদের বাণিজ্য সম্ভার ছিল নানা ধরণের, যথা, ত্রিশ রকমের কাপড়, খয়ের, গোলাপ জল, আফিম, শস্যবীজ, ছোলা, কারুকার্যময় বস্ত্র এবং সুগন্ধি। মালাক্কা থেকে ফেরার পথে তারা সংগ্রহ করত সুগন্ধ কাষ্ঠ, মশলা, চীনা মাটির জিনিস, বুটিদার বস্ত্র, রেশম, স্বর্ণ ও টিন। বান্দা দ্বীপপুঞ্জের পাখীও তারা কিনত। আরব ও তুরস্কের মানুষ সেখানকার পাখীর পালক উপযুক্ত মূল্য দিয়ে কিনে নিত। তোমে পিরেস বলেছেন ক্যামবে ছাড়া মালাক্কা এবং মালাক্কা ছাড়া ক্যামবে বাঁচতেই পারে না

কোরোমণ্ডল উপকূল থেকে প্রতি বছর তিন চারটি এবং পুলিকট বন্দর থেকে একটি দুটি জাহাজ মালাক্কা গেছে। গুজরাটের উৎপন্ন দ্রব্য ও আঞ্চলিক বস্ত্র সম্ভারের বিকল্প সংগ্রহ শালা ও রপ্তানি কেন্দ্র রূপে পুলিকট বন্দর বিখ্যাত ছিল। এই জাহাজগুলি বহন করেছে বিপুল বস্ত্র সম্ভার। কোরোমণ্ডল উপকূলের বণিকরা বস্ত্রের বিনিময়ে মালাক্কায় সংগ্রহ করেছে শ্বেত চন্দন, কর্পূর, ফটকিরি, সাদা রেশম, মশলা, বুটিদার বস্ত্র, চীনা জরি বা কিংখাব এবং স্বর্ণ। মোটকথা, গুজরাট, মাদ্রাজ ও বাংলা দেশ থেকে মালাক্কায় বাণিজ্য জাহাজের নিত্য যাতায়াত ছিল। মালাক্কা ছিল বান্দা ও মলুক্কার মশলার সংগ্রহ কেন্দ্র এবং গুজরাট কোরোমণ্ডল, মালাবার ও বাংলা দেশের বিপুল বস্ত্র সরবরাহের বন্টন কেন্দ্র।

উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ুর আহ্বানে চীন, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ ও মলুক্কা দ্বীপপুঞ্জ থেকে বাণিজ্যতরী ভিড় জমাত মালাক্কায়। তোমে পিরেসের বিবরণ থেকে আমরা জেনেছি চীন থেকে প্রতি বছর দশ বারটি জাঙ্ক জাহাজ আসত। চীনের বণিকরা মালাক্কায় নিয়ে আসত প্রচুর পরিমাণে কাঁচা রেশম এবং রেশমী বস্ত্র, সাটিন, তাফেতা ও অন্যান্য বস্ত্র, কস্তুরী, কর্পূর, ফটকিরি, সোরা, গন্ধক, তামা ও লোহার জিনিস, ছোটখাটো গহনা, দুর্লভ মজার টুকিটাকি জিনিস এবং রেউ চিনি জাতীয় লতা। এখানে বিনিময়ে চীনা বণিকরা সংগ্রহ করত গোলমরিচ ও অন্যান্য মশলা, সুগন্ধ ধূপ, ঔষধ, হাতীর দাঁত, টিন, লাল পুঁতি, মহামূল্যে লাল পাথর, রঙিন পশমী বস্ত্র এবং সিঙ্গাপুরের কালো কাঠ। Duarte Barbosar বিবরণ থেকে জানা গেছে যে চার মাস্তুল ওয়ালা চীনা জাঙ্ক জাহাজে মালাক্কায় এসেছে চিনি, সূক্ষ্ম কাঁচা রেশম, চীনামাটির জিনিস, বুটি, জরি, কিংখাব, মণিমুক্তা, অলঙ্কৃত পেটিকা এবং অনেক ঝকমকে ছোটখাটো জিনিস। বিনিময়ে

মালাক্কা থেকে তারা নিয়েছে গোলমরিচ, ধূপ, জাফরাণ, প্রবাল, সিন্দূর, পারদ, আফিম এবং ঔষধ।

শ্যাম দেশ থেকে বছরে ত্রিশটি জাহাজ মালাক্কায় আসত। এসব জাহাজে থাকত লাক্ষা, জাভা বৃক্ষের সুগন্ধ নির্যাস, হাতীর দাঁত, তামার জিনিস, দামী পাথর, দামী ধাতব দ্রব্য এবং শ্যাম দেশের মোটা কাপড়। ফেরার পথে শ্যাম দেশের বণিকরা মালাক্কা থেকে সংগ্রহ করত ক্রীতদাস, শ্বেত চন্দন কাষ্ঠ, মশলা, পারদ, সিন্দূর, আফিম, মসলিন, ক্লিঙ বস্ত্র, উটলোমের বস্ত্র, কার্পেট, ক্যামবের জরি বা কিংখাব, গোলাপ জল, মোম, সাদা কৌড়ি ও বাদাম।

ছোট ছোট নানা ধরণের জাহাজ আসত সুমাত্রা, জাভা, বোর্ণিও, সেলেবেস, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ ও মালয় উপদ্বীপের উপকূল থেকে। এইসব জাহাজে বণিকরা মালাক্কায় নিয়ে আসত টিন, অরণ্যজাত দ্রব্য, গোলমরিচ, স্বর্ণ, ক্রীতদাস এবং প্রয়োজনীয় খাদ্যসম্ভার। বিনিময়ে তারা সংগ্রহ করত মোটা ভারতীয় বস্ত্র। Barbosaর বিবরণে আছে জাভার বণিকরা আনত চমৎকার ছোরা, বর্শা, স্বর্ণ ও খাদ্য দ্রব্য। বিনিময়ে তারা নিয়ে যেত পুলিকট ও ক্যামবের কাপড়, আফিম, গোলাপ জল, সিন্দূর, সোরা, লোহা ও ঔষধ। উত্তর সুমাত্রার বন্দরগুলি থেকে পরোক্ষভাবে শ্যাম দেশের চাউলও মালাক্কায় এসেছে।

প্রতি বছর ফেব্রুআরি ও মারচ মাসে পনেরোটি জাহাজে দক্ষিণ বর্মার পেগু থেকে আসত টিক গাছ, রুবি, রৌপ্য, চাউল ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য এবং সুগন্ধি। প্রতি বছর জুলাই মাসে জাহাজগুলি পসেই-এ এসে গোলমরিচ সংগ্রহ করত এবং আগস্ট মাসে মারতাবান হয়ে দেশে ফিরত। মালাক্কার জাহাজ মলুক্কা দ্বীপপুঞ্জে যেত লবঙ্গের সন্ধানে এবং টিমোরে চন্দন কাষ্ঠ ও ব্যানডানে জায়ফল ও জৈত্রীর অন্বেষণে। ঐ দ্বীপপুঞ্জের সর্বত্র মালাক্কা বন্টন করেছে ভারতীয় বস্ত্র, চীনামাটির জিনিস এবং চীনের ছুরি ও ঔষধ।

ভূমধ্যসাগর, ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য, পূর্ব আফ্রিকা, ভারতবর্ষ, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অধিকাংশ অঞ্চল এবং চীন বাণিজ্য সূত্রে মালাক্কার সঙ্গে নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ ছিল। এক প্রান্তে ভেনিস এবং অন্য প্রান্তে মলুক্কা দ্বীপপুঞ্জ —এই সুদীর্ঘ 8,000 মাইল বাণিজ্য পথে একমাত্র মালাক্কা বন্দরই মশলা বন্টনের একচেটিয়া অধিকার ভোগ করত। তোমে পিরেস বলেছেন যে মালাক্কার যিনি অধিপতি, ভেনিসের কণ্ঠে তাঁর হস্ত প্রসারিত।

প্রতি বছর এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল ও পূর্ব আফ্রিকা থেকে অসংখ্য বণিক

মালাক্কায় এসেছে। তোমে পিরেস লিখেছেন যে 1509 সালে সেখানে চার হাজার বিদেশী বসবাস করত, তাদের মধ্যে এক হাজার হল গুজরাটি। সেখানে 84টি ভাষাভাষী মানুষ বসবাস করত। Van Leur লিখেছেন যে চরম সমৃদ্ধির সময় দশ থেকে পনেরো হাজার বিদেশী বণিক প্রতি বছর মালাক্কায় আসত। এদের মধ্যে প্রায় আট হাজার বণিক আসত ভারতবর্ষ ও পশ্চিম এশিয়া থেকে। প্রায় এক হাজার গুজরাটি বণিক মালাক্কায় বসবাস করত এবং প্রায় তিন থেকে চার হাজার বণিক ভারতবর্ষ ও মালাক্কার মধ্যে যাতায়াত করত।

অসংখ্য বণিক মালাক্কায় নানা বাণিজ্যিক উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত ছিল। ভারতবর্ষ ও চীনের বড় বড় জাহাজগুলি নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে বণিক বা বণিক গোষ্ঠীকে ভাড়া দেওয়া হত। ভ্রাম্যমান বণিক ও তাদের প্রতিনিধিরা মালাক্কায় গমনাগমনের পথে মালপত্তরের সঙ্গে জাহাজে আশ্রয় নিত। তাছাড়া বহু বণিক ও তাদের প্রতিনিধি মালাক্কা বন্দরেই স্থায়ীভাবে বসবাস করত। ফলে বহু ভাষাভাষী মানুষের সম্মিলিত জীবনযাত্রায় মালাক্কাতে বর্ণাঢ্য উদার মিশ্র সংস্কৃতির উদ্ভব ঘটেছিল। এদের মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী ছিল গুজরাটের বণিককুল। তারা প্রায় সবাই ছিল মুসলমান। তারা মালাক্কা এসেছিল ক্যাম্বে বন্দর থেকে।

পশ্চিম দিক থেকে যে সব জাহাজ আসত সেগুলি জাহাজে আনীত পণ্যমূল্যের শতকরা 6 হারে শুল্ক দিত। সুমাত্রা, জাভা, মালয়ের পূর্ব উপকূল, মলুক্কার দিকে আরও পূর্বাঞ্চল, ফিলিপাইন এবং চীন থেকে যে সব জাহাজ আসত, সেগুলি শতকরা হিসাবে শুল্ক না দিয়ে প্রচুর পরিমাণে উপহার দিত। সব চেয়ে বেশী উপহার দিত চীনা জাঙ্ক জাহাজগুলি। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের জন্য শুল্কের হার ছিল শতকরা তিন।

মালাক্কাতে স্বর্ণ, রৌপ্য ও টিনের মুদ্রা প্রচলিত ছিল। গুণানুসারে স্বর্ণ ও রৌপ্যের মূল্য নির্ণয় করা হত। ছোট খুচরা মুদ্রা ছিল টিনের। তৎকালীন রাজাদের নাম অঙ্কিত থাকত ঐসব মুদ্রায়। ওজন ও পরিমাপের জন্য বিস্তৃত আয়োজন ছিল। বিভিন্ন ধরণের দ্রব্যের জন্য বিভিন্ন ধরণের ওজন ও পরিমাপ থাকত। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের আঙ্কিক জটিলতার সঙ্গে পরিচিত ছিল মালাক্কার বণিকরা।

রাজকর্মচারীদের দুর্নীতি ও পক্ষপাতিত্বের বিরুদ্ধে যথেষ্ট সতর্কতা নেওয়া হয়েছিল সে যুগের মালাক্কায়। শতকরা 6 ভাগ শুল্ক নির্ণয় করত একটি স্বাধীন স্বতন্ত্র সমিতি। ব্যবসায় ও বণিকদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য তত্ত্বাবধান করার জন্য চারজন বন্দর কর্মী নিযুক্ত করা হয়েছিল। তাদের বলা হত

শাহবন্দর (Shahbandar)। চারজন বন্দর কর্মী চার দল বণিকের দেখা-শোনার দায়িত্ব পেয়েছিল। গুজরাটিরা একদল। বাঙ্গালী এবং পেগু ও পশেই (উত্তর সুমাত্রা)-এর বণিকরা দ্বিতীয় দল। দক্ষিণ সুমাত্রা, জাভা ও মলুক্কার বণিকরা তৃতীয় দল। চতুর্থ দলে ছিল ইন্দোচীন ও চীনের বণিকরা। বিদেশাগত বণিকদের বাসস্থান, যাতায়াতের বন্দোবস্ত, সুখস্বাচ্ছন্দ্য ইত্যাদি নানা ব্যক্তিগত সমস্যার দিকে দৃষ্টি রাখতেন শাহবন্দররা।

বাণিজ্যের লভ্যাংশের সিংহভাগ ভোগ করত বণিকবা। কিন্তু রাজা ও তার সামন্তরাও ব্যবসায় থেকে প্রচুর আয় করতেন। সামন্তরা ছিলেন উচ্চ-পদেব রাজকর্মচারী। তাই বিদেশাগত জাহাজ থেকে তারা নিশ্চযই মোটা উপহার পেতেন। রাজাব নিজস্ব আয়ও যথেষ্ট ছিল। বন্দর শুল্ক ও উপহার থেকে তিনি ভাল আয করতেন। আমদানি ও রপ্তানি দ্রব্যের ওজন বাবদ তিনি মূল্যেব শতকরা একভাগ পেতেন। এ সব তত্ত্বাবধান করা এবং সংগ্রহ কবাব জন্য তিনি কর্মচাবী নিয়োগ কবেছিলেন। রাজকর্মচারীদের মাবফৎ তার আয়েব বেশ কিছু অংশ ব্যক্তিগত বাণিজ্যে তিনি বিনিয়োগ কবতেন। তাছাড়া জমি বা সম্পত্তি বিক্রির সময লাইসেন্স্ ফি নেওয়া হত। পথেব দোকানদারদের কাছ থেকে দোকান ভাড়া পাওয়া যেত। বিচার বিভাগের শাস্তিমূলক অর্থদণ্ড ও বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি থেকেও আয় হত।

বাংলা-মালাক্কা বাণিজ্য

তোমে পিরেস (Tome Pires) তাঁব *Suma Oriental* গ্রন্থে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে এবং বিশেষ কবে মালাক্কার সঙ্গে বাংলা দেশের বাণিজ্যিক যোগাযোগের একটি বিস্ময়কর বিবরণ পরিবেশন করেছেন। বাঙালীদের পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে তাদের মধ্যে বেশ বড় বড় বণিক আছে। তারা খুব স্বাধীনচেতা। কিন্তু সব বাঙালী বণিকই অসৎ। বাঙ্গালী বণিকরা ধনী।

প্রতি বছর অন্তত একবার একটি জাঙ্ক জাহাজ বাংলা দেশ থেকে মালাক্কায় যায়। কোন কোন বছর দু'বারও জাঙ্ক গেছে। এক একটা জাঙ্ক জাহাজে আশি থেকে নব্বই হাজাব ক্রুজেগে (পর্তুগীজ মুদ্রা) মূল্যের পণ্য বাংলা থেকে মালাক্কায় আসে। এগুলিব মধ্যে আছে সূক্ষ্ম সাদা কাপড়, সাত রকমের সিনাবাফো, তিন ধবণের চাদর, মসলিন, দামী রঙীন মশারি, কাটা কাপড়ের কাজ করা পর্দা, দেওয়ালে ঝোলাবার নানা জিনিস। খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে আছে চিনি জমিয়ে তৈরি প্রচুর নানা ধরণের সন্দেশ, হরিতকী, আদা, কমলালেবু, শশা, গাজর, সর্ষে, ডুমুর, কুমড়ো, লাউ, এবং নানা ধরণের ফল।

কোন কোন ফল ভিনিগারে ডুবিয়ে আনা হত। বাংলা থেকে আনা কালো পাথরের সুগন্ধ যুক্ত ও সস্তা পাত্র মালাক্কায় সমাদৃত ছিল। বাংলাদেশ থেকে এখানে ইস্পাতও এসেছে। বাংলাদেশের কাপড় চড়া দামে মালাক্কায় বিক্রি হত। বাঙ্গালী বণিকদের সেখানে শতকরা ছ'ভাগ কর দিতে হত। বাংলাদেশে ফেরার সময় বাঙ্গালী বণিকরা অনেক জিনিস কিনে নিয়ে যেত। এভাবে তারা অনেক লাভ করত। পসেই (সুমাত্রা) থেকে তারা মরিচ ও রেশম নিয়ে যেত। তাছাড়া মালাক্কা থেকে তারা সংগ্রহ করত জাভার ক্রস (এক ধরণের ছুড়ি) ও তলোয়ার; বোর্নিও'র কর্পুর, মরিচ, লবঙ্গ, জৈত্রী, জায়ফল, চন্দন, রেশম, মুক্তা, সাদা চীনামাটির জিনিস, তামা, টিন, সীসা, পারা; লিউকিউ অঞ্চলের সবুজ চীনামাটির সূক্ষ্ম কারুকার্য শোভিত জিনিস; এডেনের আফিং, সাদা ও সবুজ রঙের মূর্তি, ফুল প্রভৃতি আঁকা বুটিদার কাপড়, এবং চীনের গায়ের কাপড় (enrolado), লাল রঙের টুপি ও গালিচা।

আগস্ট মাসের শুরুতে মালাক্কার বণিকরা মালাকা থেকে বাংলা অভিমুখে রওনা হত। বাংলাদেশে পৌঁছাতে তাদের ত্রিশ দিন লাগত। আগস্ট থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তারা বাংলাদেশে থাকত। ফেব্রুআরি মাসের প্রথম দিকে তারা বাংলা থেকে মালাক্কা অভিমুখে রওনা হত। মালাক্কায় প্রচুর বাঙ্গালী নারী ও পুরুষ ছিল। পুরুষদের অধিকাংশ ছিল দর্জি ও জেলে।

বাংলাদেশে মালাক্কার তুলনায় সোনার দাম ছিল এক ষষ্ঠাংশ বেশী কিন্তু রূপার দাম ছিল এক চতুর্থাংশ থেকে এক পঞ্চমাংশ কম। বাংলার রৌপ্য-মুদ্রার নাম ছিল টঙ্কৎ বা টঙ্কা। টঙ্কার ওজন ছিল পর্তুগীজ ওজন এক টোএলের অর্ধেক অর্থাৎ ছয় ড্রামের মতন।

বাংলাদেশ, উড়িষ্যা, আরাকান এবং পেগু রাজ্যের মারতাবান বন্দরে মুদ্রা হিসাবে কৌড়ি প্রচলিত ছিল। বাংলাদেশ ও উড়িষ্যায় বড় কৌড়ি ব্যবহৃত হত। এগুলির মধ্যে হলদে ডোরা দাগ আছে। প্রচুর পরিমাণে এসব কৌড়ি মালদ্বীপ থেকে আসত। তোমে পিরেসের এই বিবরণ থেকে আমরা যেন মনে না করি যে কড়ির ব্যবহার বাংলাদেশের আর্থিক দুর্গতির সাক্ষ্য বহন করছে। কারণ তখনও বাংলাদেশ থেকে সোনা রপ্তানি হয়েছে, বাণিজ্যে রৌপ্য মুদ্রা ব্যবহৃত হয়েছে, শুধুমাত্র সাধারণ কেনাকাটা হয়েছে কড়ির মাধ্যমে। বাংলা ও উড়িষ্যার সমুদ্রতীরে এই কড়ি পাওয়া যেত না। খাদ্যের বিনিময়ে বিদেশ থেকে এই সুদৃশ্য হলদে ডোরাঙ্কিত কড়ি কেনা হত এবং মুদ্রার বিকল্প হিসাবে এগুলি প্রচলিত ছিল।

Suma Oriental-এ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কিছু মন্তব্য আছে, যেগুলি আলোচ্য বিষয়ে প্রাসঙ্গিক। ওর্মুজ ও সিংহলের বণিকরা বাংলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্য চালাত। আরাকান ও পেগু থেকে বাংলাদেশে পদ্মরাগমণি এসেছে। টেনাসেরিম বন্দর মাধ্যমে শ্যাম দেশের সঙ্গে বাংলার বাণিজ্যিক লেনদেন চলেছে। জাভার সঙ্গে বাংলার বাণিজ্য ছিল উভয়মুখী। অনেক বাঙালী মুসলমান জাভায় বসবাস করেছে। জাভার গ্রিসী বন্দরের মানুষরা বাংলার পণ্য প্রচুর পরিমাণে কিনত। বাংলার সিনাবাফ এবং সূক্ষ্ম সাদা কাপড় বান্দা দ্বীপপুঞ্জে সমাদর পেয়েছে। মালাক্কার মানুষ বাংলার সাদা ষাড় ও গরুর লেজ খুব পছন্দ করত এবং পরম উৎসাহে তা কিনত। চৌল, গভোল ও গোয়ার বণিকরা বাংলায় আসত এবং বাংলা থেকে মালাক্কা যেত।

পাদটিকা

1 এই বিষয়ে অধ্যাপক অরুণ কুমার দাশগুপ্ত বিশদ আলোচনা করেছেন নিম্নলিখিত দু'টি প্রবন্ধে ঃ

(i) মহানাবিক চেংহো, ঐতিহাসিক 4, মাঘ 1383, জানুআরি 1977

(ii) 1400 সাল, মালাক্কার প্রতিষ্ঠা ও চীনের সমুদ্রনীতি, ঐতিহাসিক, শ্রাবণ-কার্তিক 1387, জুলাই-অকটোবর 1980

।। ৪ ।।

ইউরোপীয় শক্তি বর্গের আগমন

এশীয় বাণিজ্যে অংশ গ্রহণে আগ্রহ

বিশ্বসভ্যতার ইতিহাসে পর্তুগীজদের অবদান চিরস্মরণীয়। আধুনিক বিশ্বে পর্তুগীজ শক্তিই সর্বপ্রথম ইউরোপ ও এশিয়ার মধ্যে সেতুবন্ধন করেছিল। পঞ্চম থেকে একাদশ শতক পর্যন্ত মধ্যপ্রাচ্যই ছিল পূর্ব পশ্চিমের মধ্যে বাণিজ্যিক যোগাযোগের মিলন ক্ষেত্র। বোগদাদ, আলেকজান্দ্রিয়া, আলেপ্পো ও কনসটানটিনোপল ইত্যাদি নগরগুলি পণ্য বিনিময় ও বাণিজ্যিক লেনদেনের জন্য সদাসর্বদা কর্মমুখর হয়ে থাকত। অষ্টম থেকে পঞ্চদশ শতকের মধ্যে আরবের মুসলমান শক্তি উত্তর আফ্রিকার উপকূল, স্পেন এবং পরে দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে আধিপত্য বিস্তার করেছিল। ভূমধ্যসাগরীয় বাণিজ্যের বিপুল অংশ তাদের করায়ত্ত ছিল। 1453 সালে কনসটানটিনোপল দখলের পর ইউরোপ ও এশিয়ার মধ্যে বাণিজ্যের উপর তারা একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণের সুযোগ পেল। ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে শুধুমাত্র ভেনিস ও জেনোয়া এই লাভজনক কারবারের অংশীদার ছিল। কিন্তু বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করত অটোমান তুর্কীরা। রেশম, দামী পাথর ও হাতীর দাঁত প্রভৃতি বিলাস সামগ্রী ছিল বাণিজ্যের উপকরণ। কিন্তু সর্বসাধারণের ব্যবহার্য নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তুর মধ্যে ইউরোপে মশলার চাহিদা ছিল সর্বাধিক। মাংস ও অন্যান্য খাদ্য সংরক্ষণ এবং নানা ঔষধের জন্য ইউরোপে মশলার চাহিদা বেড়েছিল। এই মশলার একচেটিয়া কারবার ছিল অটোমান তুর্কীদের হাতে। তারাই মশলার দামের ওঠানামা নিয়ন্ত্রণ করত। মশলা পাওয়া যেত শুধুমাত্র এশিয়ায়। ভারতবর্ষ ও ইসট ইনডিজে পাওয়া যেত গোলমরিচ, সিংহলে দারুচিনি, এবং মলুক্কাতে লবঙ্গ। ইসট ইনডিজের মশলা মালাক্কাতে সংগ্রহ করা হত। সেখান থেকে মুসলমান বণিকরা তা পেঁৗছে দিত মালাবার ও গুজরাটের বন্দরে। লোহিত সাগর এবং পারস্য উপসাগর অতিক্রম করে আরবের বণিকরা সেগুলি জাহাজে করে পেঁৗছে দিত আলেকজান্দ্রিয়া ও বোগদাদে। ভেনিসের বণিকদের মাধ্যমে এই মশলা সম্ভার পেঁৗছে যেত ইউরোপের শহর বাজারে গ্রাম গঞ্জে।

মশলার মূল্যের ওঠানামায় ইউরোপীয় বণিকদের কোন নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ছিল না। এই বাণিজ্যের লভ্যাংশ ভোগে তারা বঞ্চিত ছিল। তাই তারা অসহিষ্ণু বোধ করছিল। ইতিমধ্যে ইউরোপে ধর্মযুদ্ধের ফলে ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে খ্রীষ্টান শক্তিগুলির অসন্তোষ ও আক্রোশ পুঞ্জীভূত হয়েছিল। আইবেরীয় উপদ্বীপের খ্রীষ্টান রাজ্যগুলিব মধ্যে ইসলাম ধর্ম ও মুসলমান বণিকদের বিরুদ্ধে বৈরী মনোভাব, নানা ঐতিহাসিক কারণে, কিছু বেশী মাত্রায় ছিল। বিশেষ করে মুসলমান বণিকদের হাত থেকে একচেটিয়া বাণিজ্যিক অধিকার ছিনিয়ে নেবার ব্যাপারে এবং খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারে পর্তুগাল ছিল সক্রিয়।

বিকল্প পথের অন্বেষণ

স্পেন ও পর্তুগালের সামুদ্রিক অভিযানগুলি সাধারণভাবে ভৌগোলিক আবিষ্কারের লক্ষ্যে নিয়োজিত হয়েছিল বলে মনে করা হয়। এই অভিযান-গুলির নিঃসন্দেহে অন্য লক্ষ্যও ছিল। চীনে ও প্রাচ্যে যাবার একটি বিকল্প পথের অন্বেষণ (যে পথ অটোমান তুর্কীদের নিয়ন্ত্রণাধীন নয়) তাদের অভিযান স্পৃহা ও প্রচেষ্টাকে সদাজাগ্রত রেখেছিল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইতিহাসে এই প্রসঙ্গে স্পেনের নয়, পর্তুগালের ভূমিকাই অধিকতর প্রাসঙ্গিক। 1487 খ্রীষ্টাব্দে বার্তোলোমিয়াস ডিয়াজ উত্তমাশা অন্তরীপ পরিক্রমণ করেন। দশ বছর পর ভাসকো দা গামা ভারতবর্ষে পেঁাছালেন। পর্তুগীজ নাবিকদের সফল অভিযান ষোড়শ শতকে পর্তুগীজ সাম্রাজ্য বিস্তারের পথ প্রশস্ত করেছিল। 1500 খ্রীষ্টাব্দে কালিকটের দক্ষিণে কোচিন শহরে পর্তুগীজরা একটি বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করেছিল। এশিয়ায় এটাই হল সর্বপ্রথম ইউরোপীয় কুঠি। 1509 খ্রীষ্টাব্দে দিউ বন্দরের সন্নিকটে মিশর ও গুজ-রাটের সম্মিলিত নৌবাহিনী পর্তুগীজ ভাইসরয় Almeida-র হাতে পরাজিত হয়। এই সামরিক সাফল্যে পর্তুগীজ শক্তির সাম্রাজ্য বিস্তারের উচ্চাশা বহুগুণ বেড়ে গিয়েছিল। এই সময় থেকে প্রায় শতবর্ষ ধরে ভারত মহা-সাগরে তাদের আধিপত্য অব্যাহত ছিল। ঐ সালে ডি আলবুকের্কে ভাইসরয় হলেন। লিসবন থেকে মাঝে মাঝে রণতরী পাঠিয়ে সাম্রাজ্য বিস্তার সম্ভব বলে তিনি মনে করতেন না। স্থায়ী কুঠি ও ঘাঁটি স্থাপন ছাড়া সাম্রাজ্য বিস্তার সম্ভব নয়। 1507 সালে সোকোত্রাতে (এডেন) প্রথম কেল্লা নির্মিত হয়েছিল, এবং 1515 সালে ওরমুজে দ্বিতীয় কেল্লা। এই দুই কেল্লা নির্মাণের ফলে লোহিত সাগর এবং পারস্য সাগরের প্রবেশ পথ পর্তুগীজ শক্তির নিয়ন্ত্রণে এসে গেল।

1510 সালে তারা গোয়া দখল করে। গোয়া হল তাদের সদর দপ্তর এবং নৌবাহিনীর ঘাঁটি। ইতিমধ্যে মালাক্কা সম্পর্কে তাদের ঔৎসুক্য ও আগ্রহ জাগ্রত হয়েছিল। বাণিজ্যিক উপকরণ আহরণের জন্য একটি নিরাপদ আশ্রয়ভূমি প্রয়োজন। মালাক্কা ছিল বাণিজ্য-কুঠি নির্মাণের পক্ষে আদর্শ বন্দর। চীন অভিমুখে সমুদ্রপথের উপর মালাক্কা হল বড় রকমের আশ্রয়ভূমি। তাই ডি. সিকুয়েরার নেতৃত্বে 1509 খ্রীষ্টাব্দে পর্তুগীজ জাহাজ পাঠান হয়েছিল মালাক্কা বন্দরে। এশিয়ার জলপথে পর্তুগীজ নৌঅভিযানের তিনটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল। প্রথমত, ইউরোপের বাজারে মশলা আমদানির স্বার্থে তার প্রাচ্যে যাবার জন্য বিকল্প জলপথের অন্বেষণ করছিল। দ্বিতীয়ত, মুসলমান বণিকদের হাত থেকে মশলা-বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণাধিকার ছিনিয়ে নিয়ে তারা নিজেদের একচেটিয়া অধিকার প্রয়োগ করতে চেয়েছিল। তৃতীয়, ইসলাম ধর্মের প্রভাব প্রতিপত্তি হ্রাস করার এবং খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচারের কাজে তারা ব্রতী হয়েছিল। পর্তুগীজরা ছিল একাধারে বণিক ও ধর্মপ্রচারক। ভৌগোলিক আবিষ্কার ও কুঠি-কেল্লা নির্মাণেরও দ্বিমুখী উদ্দেশ্য হল বাণিজ্য-বিস্তার ও খ্রীস্টধর্ম প্রচার। বাণিজ্যিক লেনদেন ও সাংস্কৃতিক আদান প্রদান ছিল পরস্পর অঙ্গাবদ্ধ।

পর্তুগীজদের মালাক্কা দখল

1511 খ্রীষ্টাব্দের 11 এপ্রিল আলবুকের্কে গোয়া থেকে মালাক্কার পথে রওনা হয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিল 18টি জাহাজ এবং আনুমানিক 1400 জন অনুচর। অনুচরদের অর্ধেক পর্তুগীজ এবং অর্ধেক ভারতীয়। এই সেনা-বাহিনীর সাহায্যে তিনি মালাক্কা অধিকার করেন। মুসলমান বণিককুল এই দুর্দিনে মালাক্কার সুলতানকে সাহায্য করেছিল, কিন্তু অন্যান্য বণিকরা করে নি। অ-মুসলমান চৈনিক ও ভারতীয় বণিকরা মুসলমান বণিকদের বিশেষ সুযোগ সুবিধা ভোগে ঈর্ষান্বিত ছিল। সুলতানী শাসনের প্রতি তাদের বিরাগ ছিল। মালাক্কার সুলতান গণসমর্থনও পান নি। মালাক্কার সেনাবাহিনীতে জাভার ভাড়াটে সৈন্য ছিল। তাদের দেশপ্রেম ছিলনা, শুধু ছিল অর্থের লালসা। পর্তুগীজদের বিজয় সম্ভাবনা দেখে তারা যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পলায়ন করেছিল। আলবুকের্কের সেনাবাহিনী সংখ্যায় বেশী ছিল না। তারা সুশিক্ষিতও ছিলনা। কিন্তু তাদের উন্নত ধরণের বন্দুক ছিল। তুলনায় মালাক্কার গোলন্দাজ রসদ ছিল অপ্রতুল ও অকেজো। মালাক্কা হস্তগত করতে পর্তুগীজদের প্রায় একমাস সময় লেগেছিল। জাভা ও ভারতের বণিককুল তাদের স্বাগত জানিয়েছিল। মালাক্কার সুলতান আত্ম-

রক্ষামূলক রণকৌশল অবলম্বন করেছিলেন। আক্রমণাত্মক কৌশল গ্রহণ করলে হয়ত তিনি জয়ী হতেন।

শুধুমাত্র মালাক্কা নগর পর্তুগীজরা দখল করেছিল। আয়তনের দিক দিয়ে বিজিত এলাকা খুব বেশী নয়। বাণিজ্যের সুযোগ সুবিধা তারা গ্রাস করেছিল। কিন্তু মালয়ের বিপুল জনসমাজের উপর তাদের বিশেষ প্রভাব অনুভূত হয়নি বলা চলে। মালাই সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ঈর্ষার বিষে জর্জরিত ছিল। বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার ও খ্রীষ্টধর্মের প্রচার, এই দুই লক্ষ্যের মধ্যে কোনটি অগ্রাধিকার পাবে, সে সম্পর্কে তারা দৃঢ়চিত্ত বা স্থিরলক্ষ্য হতে পারেনি। ফলে মালাক্কার মুসলমান বণিকরাও তাদের এতটুকু বিশ্বাস করতে পারেনি। মালয় উপদ্বীপের অধিবাসীরা খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়নি। পর্তুগীজদের সঙ্গে বাণিজ্যেও তারা আগ্রহ বোধ করেনি। ভূমিজয়ে নয়, সাগর বিজয়ের উপর পর্তুগীজদের আধিপত্য নির্ভর করেছিল। তাই শুধুমাত্র গোয়া, মালাক্কা ও ম্যাকাও এর কুঠি ও কেল্লাই ছিল তাদের শক্তি সামর্থ্যের প্রতীক।

কিন্তু ব্রুণির সঙ্গে পর্তুগীজদের মিত্রতার সম্বন্ধ গড়ে ওঠে। 1526 খ্রীষ্টাব্দে উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল। ইতালীয় পর্যটক Pigaffeta বিবরণে ব্রুণির আভ্যন্তরীণ অবস্থার একটা সুস্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন ম্যাগেল্লানের স্পেনীয় অভিযাত্রী দলের বিশ্ব-পরিক্রমার সঙ্গী। 1521 খ্রীষ্টাব্দে তিনি ব্রুণিতে আসেন। তখন সুলতান Bulkeiah-র রাজত্বকাল। তিনি Nakoda Ragam নামেও পরিচিত ছিলেন। তাঁর রাজত্বে সমগ্র বোর্নিও, সুলু দ্বীপপুঞ্জ এবং ফিলিপাইনের দক্ষিণাঞ্চল অবধি ব্রুণির রাজ্য প্রসারিত হয়েছিল। রাজপ্রাসাদ ছিল ইস্টক প্রাচীর পরিবেষ্টিত। প্রাচীরের উপর 56 কামান সাজান থাকত। স্বর্ণ রৌপ্য খচিত রেশমী আবরণে রাজপ্রাসাদ ছিল অলঙ্কৃত। প্রায় 25,000 অট্টালিকা ছিল। এখানে শাসক শ্রেণী ছিল ধনবান এবং শাসন ব্যবস্থা ছিল সুশৃঙ্খল।

ব্রুণির বন্দর ছিল মালাক্কা ও মলুক্কার মধ্যে এবং মালাক্কা ও ম্যাকাও এর মধ্যে একমাত্র নির্ভরযোগ্য ও অপরিহার্য আশ্রয়ভূমি। 1530 খ্রীষ্টাব্দে ব্রুণিতে পর্তুগীজ বাণিজ্য কুঠি স্থাপিত হয়েছিল। ব্রুণি ও পর্তুগালের মধ্যে তখন বাণিজ্যিক সম্বন্ধ সুপ্রতিষ্ঠিত। ব্রুণিতে বসবাসকারী চীনা বণিকদের কাছে চীনা মুদ্রা ছিল সহজলভ্য। এই চীনা বণিকরা ব্রুণি ও দক্ষিণ চীন এবং ব্রুণি ও পাটানির মধ্যে বাণিজ্য চালাত। মালয়ের অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে

পর্তুগীজদের পারস্পরিক আচরণে ও মনোভাবে যে তিক্ততা সঞ্চারিত হয়েছিল, ব্রুণিকে তা এতটুকুও স্পর্শ করেনি। ষোড়শ শতক জুড়ে ব্রুণির স্বাধীনতা অক্ষুন্ন ছিল।

পর্তুগীজদের অধীনে মালাক্কা

ষোড়শ শতকের পশ্চিম মালয়ের ইতিহাস ত্রিশক্তির দ্বন্দ্বে মুখর। এই তিন শক্তি হ'ল জোহোর, আচে এবং মালাক্কার পর্তুগীজ শক্তি। দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছিল বাণিজ্যের স্বার্থে এবং মালাক্কা দখলের প্রশ্ন নিয়ে। ষোড়শ শতক জুড়ে মালাক্কায় পর্তুগীজ শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল দু'টি কারণে। প্রথমত, পর্তুগীজরা সেখানে খুব শক্তিশালী দুর্গ নির্মাণ করেছিল। দ্বিতীয়ত, জোহোর এবং আচে পারস্পরিক দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয়ে পড়েছিল। মালাক্কা নদীর দক্ষিণ তীরে সমুদ্রের সন্নিকটে পর্তুগীজ কেল্লা অবস্থিত ছিল। কেল্লাটি A Famosa নামে পরিচিত। শহরের এইটিই প্রথম প্রস্তর নির্মিত দুর্গ। এই দুর্গকে কেন্দ্র করে একটি বর্ধিষ্ণু শহর গড়ে উঠেছিল। দুর্গের অভ্যন্তরে একটি ক্যাথীডরল, তিনটি গির্জা, দু'টি হাসপাতাল এবং একটি বিদ্যালয় পর্তুগীজরা স্থাপন করেছিল। বাণিজ্যিক লেনদেনের স্বার্থে আলবুকের্কে পলাতক বা গৃহত্যাগী হিন্দু ও চীনা বণিকদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। মালাক্কার প্রাক্তন করদ রাজ্য যেমন কামপার, জাভা এবং তাছাড়া ব্রুণির সঙ্গেও পর্তুগীজরা মিত্রতা গড়ে তুলেছিল। মলুক্কা বা মশলা দ্বীপপুঞ্জের সঙ্গেও একটি চুক্তির বলে পর্তুগীজরা মশলা বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার লাভ করেছিল।

মালাক্কায় পর্তুগীজ শাসন কাঠামোর সর্বোচ্চ পদ হোল ক্যাপটেন বা গভর্ণর। পর্তুগালের রাজা তিন বছরের জন্য তাকে নিয়োগ করতেন। তিনি রাজকোষ থেকে বেতন পেতেন। তবে তাঁর বেশী আয় হত ব্যবসায়ের লভ্যাংশ থেকে। গভর্ণরকে শাসন কাজে সাহায্য করার জন্য একটি পরামর্শদাতা সমিতি ছিল। এই সমিতির সভ্য ছিলেন প্রধান বিচারপতি, মেয়র এবং বিশপ। শহরের সেনাবাহিনীর অধিনায়কের পদের নাম ছিল ক্যাপটেন-জেনারেল। ক্যাপটেন জেনারেল এবং প্রধান বিচারপতিকে নিয়োগ করতেন গোয়ার ভাইসরয়। বেনদাহারা, তামেংগং ও শাহবন্দর মালয়ের এই তিনটি পুরাতন পদ বহাল রাখা হল এবং তিনটি পদেই মালাক্কার অধিবাসীকে চাকুরি দেওয়া হয়েছিল। মালাক্কায় আগত বিদেশীদের দেখাশোনা করতেন বেনদাহারা। দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার দায়িত্ব তারই উপর ন্যস্ত ছিল। যে সমস্ত মালাই লোক মালাক্কাতে ব্যবসাসূত্রে আসত, তাদের তত্ত্বাবধান

করতো তামেংগং। দূত ও পর্যটকদের পরিচর্যার দায়িত্ব শাহবন্দরের উপর ন্যস্ত ছিল। মালাক্কার পর্তুগীজরা ছিল পর্তুগালের রাজার আমলা শ্রেণী। তারা কোন বণিক প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী নয়। তারা অবশ্য ব্যবসাবাণিজ্যে অংশ নিত এবং বাণিজ্যের লভ্যাংশ থেকে প্রচুর আয় করত। সংখ্যায় তারা খুব বেশী ছিলনা। তাদের সর্বাধিক সংখ্যা ছিল ছয় শত।

মশলার ব্যবসায় পর্তুগীজদের লাভ হত খুব বেশী। গোয়া থেকে মালাক্কায় তারা কার্পাস বস্ত্র নিয়ে যেত। মালাক্কায় এগুলি বিনিময় করা হত মশলার সঙ্গে। মালাক্কা থেকে তাদের বাণিজ্য জাহাজ চলে যেত চীনে রেশম ও স্বর্ণের সন্ধানে। আবার কখনও জাহাজ মালাক্কা থেকে গোয়াতে ফিরে আসত ইউরোপের বন্দরে পাড়ি দেবার জন্য। এশিয়া থেকে পর্তুগীজরা ইউরোপে রপ্তানি করত মশলা, রেশম ও চীনামাটির জিনিসপত্র। এগুলির প্রত্যেকটি থেকে প্রচুব আয় হত। যে গোলমবিচের দর প্রাচ্যের বাজারে 45 ডলাব সমমূল্যের, পর্তুগালের বাজারে তা বিক্রি করা হত 1800 ডলার সম-মূল্যে। মালাক্কাতেও একটি আঞ্চলিক বাজার গড়ে উঠেছিল। এখানে সুমাত্রা থেকে আসত গোলমরিচ, স্বর্ণ, হাতীর দাঁত এবং চাউল। জাভা থেকে আসত অন্যান্য খাদ্য শস্য, চাউল, বস্ত্র এবং কর্পূর। পেরাক থেকে আসত টিন এবং কখনও শ্যাম থেকে স্বর্ণ।

একচেটিয়া বাণিজ্য ছিল সামুদ্রিক কর্তৃত্বের উপর নির্ভশীল। মালাক্কায় কর্তৃত্বের উপর নির্ভরশীল ছিল সামুদ্রিক কর্তৃত্ব। পূর্ব-পশ্চিম বাণিজ্যের প্রধান জলপথ মালাক্কা প্রণালী দিয়ে প্রবাহিত ছিল। এই জলপথের নিয়ন্ত্রণে পর্তুগীজ শক্তি সর্তক ও সচেষ্ট ছিল। মালাক্কা প্রণালী অতিক্রম কবতে হলে প্রত্যেকটি জাহাজকে পর্তুগীজদের কাছ থেকে অনুমতি পত্র নিতে হত। তাছাড়া প্রতি জাহাজ পিছু শুল্ক দিতে হত। শুল্কের হার নির্ভব করত গভর্নরদের ব্যক্তিগত খেয়াল খুশীর উপব। এই কাবণে অনেক জাহাজ মালাক্কার বন্দরে না গিয়ে জোহোর ও আচের বন্দরে আশ্রয় নিত। ফলে মালাক্কার শুল্ক থেকে আয় কমতে শুরু করে। 1544 খ্রীষ্টাব্দ থেকে জিনিসের উপর 6./. শুল্কের হার ধার্য করা হয়। ষোড়শ শতকের শেষ অবধি এই বন্দরের সমৃদ্ধি বজায় থেকেছে। 1543 খ্রীষ্টাব্দে জাপানের সঙ্গে বাণিজ্য সম্বন্ধ গড়ে উঠলে এবং 1557 সালে ম্যাকাও দখলে এলে দূরপ্রাচ্যের সমুদ্র পথে প্রতিরক্ষার দায়িত্ব আরও বেড়ে গেল। ফলে মালাক্কার সামরিক গুরুত্বও যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়।

অনেক সময় মালাক্কাতে পর্তুগীজদের বাণিজ্যিক স্বার্থ এবং যাজক শ্রেণীর ধর্মপ্রচার প্রচেষ্টার মধ্যে সংঘাত বেঁধেছিল। পর্তুগাল থেকে অনেক খ্রীষ্টান ধর্মযাজক মালাক্কাতে এসেছিলেন। তাদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন সেন্ট

ফ্রানসিস্ জেভিয়ার। 1547 সালে তিনি মালাক্কায় ছিলেন। 1549 সালে তিনি জাপানে ক্যাথলিক ধর্ম প্রচার করেন। জাপান ভ্রমণ শেষ করে চীন প্রবেশ করার প্রাক্কালে 1552 তিনি দেহত্যাগ করেন। তাঁর মৃতদেহ কিছুদিন মালাক্কায় ছিল, পরে তা গোয়াতে এনে কবরস্থ করা হয়েছে। অনেক যাজকের মতন, সেন্ট ফ্রানসিসের সঙ্গে মালাক্কার পর্তুগীজ শাসকগোষ্ঠীর নিত্যই বিরোধ লেগে থাকত।

1511 সালে মালাক্কা পর্তুগীজ কবলিত হলে মালাক্কায় ভারতীয় বাণিজ্য শোচনীয়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মুসলমান বণিকরা মালাক্কা ত্যাগ করে। তাদের একটি প্রভাবশালী গোষ্ঠী উত্তর সুমাত্রার আচেতে আশ্রয় নেয়। ফলে আচে ভারতীয় বাণিজ্যের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্ররূপে গড়ে ওঠে। অনেকে পশ্চিম জাভার বাণতামে চলে আসে এবং কেউ কেউ ব্রুনি ও মাকাসারে। এই স্থানগুলির মধ্যে আচে ও মাকাসার প্রচুর সংখ্যায় ভারতীয় বণিকদের আকৃষ্ট করেছিল।

গুজরাটি বণিকদের বাণিজ্যপথও পরিবর্তিত হয়। মালাক্কা প্রণালীর জলপথ তারা বর্জন করে। সুমাত্রার পশ্চিম উপকূল দিয়ে প্রাচীন পথটি এবং কখনও বা মারগুই ও টেনাসেরিম দিয়ে শ্যাম অঞ্চল পেরিয়ে আর একটি বাণিজ্যপথ তারা খুঁজে নিয়েছে।

পর্তুগীজরা Pass প্রথা চালু করার ফলে গুজরাটি পরিবহন বাণিজ্যও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ষোড়শ শতকের ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে উপকূল বন্দরে পর্তুগীজরা লুঠতরাজ চালাত, অগ্নিসংযোগ করত। তাই শুধু মাত্র মালাক্কা বাণিজ্যে নয়, সামগ্রিকভাবে ভারত মহাসাগরীয় বাণিজ্যেই গুজরাটিদের বিপুল ক্ষতি হয়েছিল।

কিন্তু ষোল শতকের দ্বিতীয়ার্ধে গুজরাটিরা তাদের হৃত সমৃদ্ধি পুনরুদ্ধার করে। 1540-এর দশক থেকে তারা লোহিত সাগর ও আচের মধ্যে একটি বিকল্প বাণিজ্য পথ খুঁজে নেয়। পর্তুগীজ জাহাজের সতর্ক প্রহরা অগ্রাহ্য করে গুজরাটি বা আচিনীজ জাহাজে তারা লোহিত সাগর অঞ্চলে গোলমরিচ সরবরাহ করেছে। গুজরাটিরা মালাক্কা থেকে গোলমরিচ কিনত না। তোমে পিরেসের প্রাসঙ্গিক তালিকায় গোলমরিচের কোন উল্লেখ নেই। কেদা ও আচে থেকে তারা গোলমরিচ কিনত এবং লোহিত সাগর অঞ্চলে পাঠাত। ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এই বাণিজ্য বৃদ্ধি পায়। ভারত মহাসাগর অঞ্চলে পর্তুগীজদের বাণিজ্যিক আধিপত্য এইভাবে গুজরাটিরা প্রতিহত করতে পেরেছিল। যদিও বিকল্প বাণিজ্য পথ তারা খুঁজে নিয়েছে, কিন্তু এটা সত্য যে মালাক্কা বাণিজ্যে গুজরাটিদের প্রাধান্য আর ফিরে

আসে নি। মালাক্কা সম্পর্কে তাদের আগ্রহ ও উদ্দীপনা স্তিমিত হয়ে পড়ে। তারা মালাক্কা বর্জন করে। ষোড়শ শতকের শেষের দিকে এশীয় বাণিজ্যে চীনা বণিক গোষ্ঠী প্রভাবশালী হয়ে ওঠে।

পর্তুগীজ আক্রমণ এটা প্রমাণ করে যে ভারত-মালাক্কা বাণিজ্য সমুদ্র পথে বিদেশী আক্রমণের মুখে সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থায় ছিল। ভারতীয় বণিকদের নিজস্ব নৌবল ছিল না। মালয় রাজ্যের সরকার বা সংশ্লিষ্ট ভারতীয় রাজ্যের সরকার ভারতীয় বণিকদের নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষার কোন বন্দোবস্ত করতে পারে নি।

পর্তুগীজরা মালাক্কাকে সম্পূর্ণ ইউরোপীয় ধাঁচে গড়ে তোলার চেষ্টা করে। সেখানে একটি বড় চার্চ নির্মাণ করা হয়। সপ্তদশ শতকের প্রথম দুই দশকে খ্রীষ্টান নাগরিকের সংখ্যা 20 হাজারে পেঁছায়। শহরে বিশিষ্ট এলাকায় প্রশাসনিক প্রয়োজনে নতুন নতুন বাড়ী নির্মিত হয়। কয়েক বছরের মধ্যেই আরও 5টি চার্চ, 2টি হাসপাতাল এবং জেসুইট খ্রীষ্টানদের জন্য একটি কলেজ স্থাপন করা হয়। প্রতিরক্ষার জন্য সমগ্র শহরটিকে 240 ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট প্রাচীর দিয়ে পরিবেষ্টিত করা হয়।

পর্তুগীজরা অত্যন্ত দূরদর্শী ছিল। এই বন্দরে তারা একটি দ্বিভাষী (পর্তুগীজ ও মালাক্কায় প্রচলিত ভাষা) মধ্যবিত্ত শ্রেণী সৃষ্টি করে। ইউরোপীয় ভাবধারায় সৃষ্ট মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় পর্তুগীজদের নানা বিষয়ে সর্বতোভাবে সহায়তা করে। এটা অনস্বীকার্য যে প্রায় দুই শতকেরও বেশী পর্তুগীজ ভাষা ছিল এশীয় সামুদ্রিক বাণিজ্যে আলাপ আলোচনা ও যোগাযোগের মাধ্যম।

পর্তুগীজ প্রভাবের মূল্যায়ন

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পর্তুগীজ প্রভাব ছিল খুবই ক্ষীণ। মালাক্কায় পর্তুগীজরা বার বার করে জোহর, আচিনিজ এবং জাভানীজদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। (আচের আক্রমণ 1537, 1539, 1547, 1568, 1573, 1575, 1616 ও 1639 সালে; জাভানিজদের আক্রমণ, 1513, 1535, 1551, 1574 সালে, জোহোর মালয়ের আক্রমণ 1551, 1586, 1606 এবং 1616 সালে)। 1574 সালে তারা টারনেট থেকে বিতাড়িত হয়েছিল। টিডোরে অবশ্য তারা কিছু স্থান করে নিতে সক্ষম হয়েছিল। এ সব চাপ সত্ত্বেও বাণিজ্য কেন্দ্র হিসাবে মালাক্কার প্রাধান্য তারা বজায় রাখতে পেরেছিল। কিন্তু দ্বীপময় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সনাতন ও

প্রচলিত রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক ক্ষমতাসম্বন্ধে, তারা ছিল এক নবাগত প্রতিযোগী, তার বেশী কিছু নয়। এতে অবাক হবার কিছু নেই। বলা হয়, ঈশ্বর পর্তুগীজদের জন্ম দেবার জন্য একটি ছোট দেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু মরবার জন্য দিয়েছিলেন সমগ্র বিশ্ব। (God gave the Portuguese a small country to be born in, but all the world to die in) মশলা বাণিজ্য চালাতে বা ভারত মহাসাগরে পরিবহন বাণিজ্যে প্রাধান্য বিস্তার করতে প্রয়োজনীয় উপকরণ, সংগঠন ও কলাকৌশল তাদের ছিল না। ধর্ম-প্রচার করতে গিয়ে দুর্বার আঞ্চলিক বিরোধের তারা সম্মুখীন হয়েছিল। তাদের একচেটিয়া বাণিজ্যনীতির ফলে মশলার চাষ প্রসারিত হয়েছিল বিস্তৃত অঞ্চলে, যার অনেকটাই ছিল তাদের নাগালের বাইরে। ফলে টারনেট ও টিডোরের উত্থান ঘটেছে এবং সমস্ত অঞ্চল জুড়ে জাভার প্রভাব প্রতিপত্তি ছড়িয়ে পড়েছে। ইউরোপীয় শক্তির আগমন ঘটেছে, কিন্তু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পশ্চিমী প্রভুত্বের যুগ শুরু হয় নি। ইতিহাসের চলতি ধারাকে তারা পালটাতে পারে নি, বরঞ্চ, চলতি ধারার পথকে তারা মেনে নিয়েছে এবং সেই পথকে প্রশস্ত করেছে।

ডচ্‌দের আগমন

ষোড়শ শতকের শেষে পর্তুগীজ শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে এসেছিল ডচ্ ও ইংরেজ। প্রথম থেকেই তারা মালয়-ইন্দোনেশীয় অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অধিকার বিস্তার করতে পেরেছিল। কারণ তারা এসেছিল পর্তুগীজ-দের প্রতিদ্বন্দ্বী ও শত্রু হিসাবে। জাভাতে তারা অভিনন্দিত হয়েছিল। মলুক্কার মালাই শাসনকর্তারাও তাদের স্বাগত জানিয়েছিলেন।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপাঞ্চলে, পর্তুগালের স্থান নিয়েছিল হল্যাণ্ড। হল্যাণ্ডের দুর্বার প্রতিরোধের সামনে ইংল্যণ্ডকে পিছু হটতে হয়েছিল। ওলন্দাজরাও পর্তুগীজদের মত বাণিজ্য মৃগয়ায় এখানে এসেছিল। পর্তু-গীজদের সঙ্গে তাদের পার্থক্য একটি ক্ষেত্রে যে তারা খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করতে চায় নি। 1580 সালে স্পেনের সম্রাট দ্বিতীয় ফিলিপের অধীনে স্পেন ও পর্তুগালের সম্মিলন ঘটলে এবং লিসবনের বন্দর ওলন্দাজদের কাছে রুদ্ধ হলে, ডচেরা নিজেদের উদ্যোগেই প্রাচ্যের বাণিজ্যে অংশ নিতে প্রয়াসী হয়েছিল। প্রথম ডচ্ অভিযান দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পৌঁছায় 1596 সালে। Cornelius Van Houtman ছিলেন এই অভিযানের নেতা। তারপরে আরও কয়েকটি অভিযান পাঠান হয়। 1600 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোমপানি। ইংরেজরা ছিল স্পেনের শত্রু। ড্রেক,

ক্যাভেনডিজ ও হকিন্সের মত ইংরেজ জলদস্যুরা আমেরিকা অঞ্চলে স্পেনকে উত্যক্ত করে তুলেছিল। এই অঞ্চলে সর্বপ্রথমে যে ইংরেজ আসেন, তার নাম হল জেমস্ ল্যাংকাসটার (James Lancaster)। মালাক্কা প্রণালীতে তিনি কয়েকটি পর্তুগীজ জাহাজ লুণ্ঠন করেন। 1592 সালে তিনি জনহীন পেনাঙ দ্বীপে আশ্রয় নেন।

কয়েকটি প্রতিদ্বন্দ্বী বণিক প্রতিষ্ঠানের সভ্য হিসাবে ডচরা প্রথমে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পদার্পণ করে। 1602 সালের 20 মার্চ প্রতিষ্ঠিত হয় ডচ্ ইসট ইনডিয়া কোম্পানি (Vereenigde Oostindische Compagnie)। ডচ্ স্টেটস্ জেনাবেলের একটি আইন বলে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। একুশ বছর মেয়াদের এই সনদে বলা হয়েছিল যে বাণিজ্য, জাহাজ চালনা ও রাজনৈতিক ক্ষমতা বিস্তারের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা থাকবে এই কোমপানির হাতে। ডচ্ সংযুক্ত কোমপানি পরিচালনার দায়িত্ব ছিল 17 জন ডিরেকটরের হাতে ন্যস্ত। তাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন আমস্টারডামের। 76টি কোমপানি সংযুক্ত করে ডচ্ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোমপানি গঠিত হয়েছিল। এই কোমপানি গঠনের মূল উদ্দেশ্য ছিল বাণিজ্যিক নয়, রাজনৈতিক। স্পেনের বিরুদ্ধে ওলন্দাজ স্বার্থে প্রাচ্যে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য উপযুক্ত রাজনৈতিক ও সামরিক ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়েছিল ডচ্ কোমপানির হাতে। এই কোমপানি গঠিত হবার পর প্রাচ্যে ওলন্দাজ বাণিজ্য একটি বৃহৎ জাতীয় উদ্যোগের রূপ নিয়েছিল। 1610 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত অবশ্য স্বতন্ত্র পরিচালনায় নানা ওলন্দাজ জাহাজ বাণিজ্যে অংশ নিয়েছিল। ঐ সালে পিটার বোথকে (Picter Both) প্রথম গভর্ণর জেনারেল নিয়োগ করা হয়। এরপর থেকে ব্যক্তিগত বিচ্ছিন্ন বাণিজ্যিক উদ্যোগের অবসান হয়।

ওলন্দাজ বণিকদের জন্য প্রথমে একটি স্বতন্ত্র ঘাঁটি তারপর একটি সদর দপ্তর প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলে। বানটাম, মালাক্কা ও জোহোরের কথা ভাবা হয়েছিল। পরে অবশ্য বানটামের সুলতানের অধীন জাকার্তাকে সদর দপ্তর হিসাবে নির্বাচিত করা হয়। 1619 সালে জে. পি. (J. P. Coen) জাকার্তাকে ওলন্দাজ অধিকারে নিয়ে আসেন। তিনি এর নামকরণ করেন বাটাভিয়া। যে অঞ্চলকে হলাণ্ড বলা হয়, সেই অঞ্চলে যে জার্মান উপজাতি বসবাস করত, তাদের লাতিন ভাষায় বলা হত বাটাভিয়া। বাটাভিয়াতে প্রাচ্যে ওলন্দাজ শাসনের সদর দপ্তর স্থাপিত হবার পর থেকেই মশলা বাণিজ্যে নিরঙ্কুশ একচেটিয়া অধিকার লাভে তারা অগ্রণী হয়। 1620 থেকে 1650 সালের মধ্যে তারা মশলা দ্বীপের অধিবাসীদের সম্পূর্ণভাবে পরাভূত করে। পারস্পরিক সহযোগিতার জন্য ইংলণ্ড ও হলাণ্ড 1619 সালে লনডনে

একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ডচ্‌দের পরাক্রমের কাছে ইংলন্ড পিছু হঠতে বাধ্য হয়, এবং ভারতবর্ষে ক্ষমতা বিস্তারে ইংরেজরা অধিকতর মনোযোগী হয়। একমাত্র টিমোর ছাড়া প্রায় সমস্ত অঞ্চল থেকে পর্তুগীজরা বহিষ্কৃত হয়। 1641 সালে মালাক্কার দুর্গ ওলন্দাজ অধিকারভুক্ত হয়। 1644 সালে গোয়াতে স্বাক্ষরিত একটি চুক্তিমতে সিংহলের যাবতীয় পর্তুগীজ অধিকৃত অঞ্চল ওলন্দাজ অধিকারভুক্ত হয়। 1610 সালে পুলিকটে এবং কোরোমন্ডল উপকূলের অন্যান্য স্থানে, 1634 সালে হুগলীতে এবং 1616 সালে সুরাটে ওলন্দাজ শক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। পারস্য, হাদ্রামাউত, এডেন ও লোহিত সাগরে মোচাতে ডচ্‌ বাণিজ্য প্রসারিত হয়। সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে মশলা বাণিজ্য থেকে ডচ্‌ কোমপানি বিপুল মুনাফা লাভ করেছিল। অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি কফি ও চিনি থেকে তাদের বিপুল লাভ হত।

জাভা দ্বীপের বাইরে প্রত্যক্ষ ডচ্‌ নিয়ন্ত্রণের অধীনে ছিল মলুক্কা, মাকাসার, সেলেবেস অঞ্চলে মেনাদো, পশ্চিম সুমাত্রার পদং এবং মালাক্কা। বোর্ণিও দ্বীপে, উত্তর সেলেবেসে, সুমাত্রার অধিকাংশ অঞ্চলে এবং উপদ্বীপে আঞ্চলিক রাজনৈতিক ক্ষমতার চাপের উপর নির্ভর করত ডচ্‌ শক্তির ক্ষতি-বৃদ্ধি। অন্যান্য দ্বীপে ছোটখাটো রাজ্য গড়ে উঠেছিল। সেগুলি ছিল সম্পূর্ণভাবে কোমপানির নিয়ন্ত্রণমুক্ত।

ডচ্‌ প্রভাবের মূল্যায়ন

ডচ্‌ বাণিজ্য-সংগঠন পর্তুগীজ বাণিজ্য-সংগঠনের চেয়ে অনেক বেশী সুসংগঠিত ছিল। সংগঠন শক্তি দিয়েই তারা মলুক্কাতে দৃঢ় আসন পেয়েছে, জাভাতে শক্তি বজায় রেখেছে এবং অন্যত্র বিচ্ছিন্ন অঞ্চলগুলি দখলে রেখেছে। কিন্তু জাভা ও মলুক্কার বাইরে পুরাতন বাণিজ্য কাঠামোর মধ্যেই প্রতিযোগী হিসাবে ডচ্‌ শক্তি টিকে থাকল। মালাই, চীনা, ভারতীয়, আরব এবং এশিয়ার অন্যত্র থেকে বণিকরা আগের মতই যেমন খুশী বাণিজ্য চালাতে লাগল। অনিচ্ছুক শাসকের সঙ্গে ডচ্‌দের একচেটিয়া বাণিজ্যের চুক্তি সত্ত্বেও প্রচলিত বাণিজ্য কাঠামোতে খুব বেশী রদবদল দেখা যায় নি। তাছাড়া দ্বীপপুঞ্জ থেকে প্রতিদ্বন্দ্বী ইউরোপীয় শক্তিবর্গ একেবারে উৎখাত হয় নি। পর্তুগীজরা টিমোরে অধিষ্ঠিত ছিল, ইংরেজরা ছিল বেনকুলেনে।

ডচ্‌ আবির্ভাবের ফলে ঐতিহাসিক বাণিজ্য-কাঠামো এবং শক্তি বিন্যাসের মধ্যে কোন মৌলিক পরিবর্তন আসে নি। কিন্তু প্রচলিত ব্যবস্থার মধ্যে

কিছু সংশোধন ঘটেছিল। ডচ্ শক্তি ছিল শ্রীবিজয়, মজপাহিত ও মালাক্কার উত্তরসূরী। তাদের আবির্ভাবের ফলে মালয় দ্বীপপুঞ্জের রাজ্যগুলি খণ্ড, ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। আঞ্চলিক বাণিজ্যে মালাই ও যবদ্বীপীয়দের আধিপত্য বিলুপ্ত হয়ে গেল। মালাইরা ছোটখাটো ব্যবসায় আত্মনিয়োগ করল এবং জলদস্যুতার সঙ্গে যুক্ত হল। ডচ্ একচেটিয়া কারবারের প্রসারের ফলে যবদ্বীপীয়দের সমুদ্র বাণিজ্যে প্রতিপত্তি অকস্মাৎ বিলুপ্ত হয়ে গেল। জাভাতে তারা ডচ্‌দের ক্ষেত-মজুরে পরিণত হল।দক্ষিণ সেলেবেস ও মলুক্কাতে ডচ্ একচেটিয়া কারবারের নিষ্ঠুর পরিণতি হল স্থানীয় অধিবাসী ধ্বংসের মুখোমুখি এসে দাঁড়াল।

ইউরোপীয় শক্তির আবির্ভাব সত্ত্বেও, পশ্চিমী উপনিবেশিক প্রভুত্বের যুগ তখনও শুরু হয় নি। প্রাক-শিল্প বিপ্লব অর্থনৈতিক কাঠামো তখনও বিদ্যমান। অগণিত স্বয়ম্ভর গ্রাম তখনও অর্থনৈতিক জীবনের মূল ভিত্তি। দুষ্প্রাপ্য মূল্যবান জিনিস তখনও বাজারে বাজারে কেনাবেচা হচ্ছে। জাভা ও মলুক্কার বাইরে মুক্ত বাজারে সাধারণ বণিক হিসাবেই ডচ্ কোমপানির অস্তিত্ব লক্ষ্যণীয়। উদীয়মান ইন্দোনেশিয়া বা উদীয়মান মালয়েশিয়ার কোন লক্ষণ তখনও দৃষ্টিগোচর নয়। শিল্প বিপ্লব আধুনিক ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ার জন্মদাতৃ। 1786 সালে পেনাঙ দ্বীপে ব্রিটিশ বসতি ছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় শিল্প-বিপ্লবের অকল্পণীয় ভগীরথ।

ইউরোপীয় অভিঘাতের মূল্যায়ন

ইন্দোনেশিয়ায় ইউরোপীয় অভিঘাতের প্রকৃতি নিয়ে মতবিরোধ আছে। হিন্দু, বৌদ্ধ ও ইসলামী সংস্কৃতি ইন্দোনেশিয়া আত্মসাৎ করেছিল। ইউরোপীয়দের আগমনের ফলে এক নতুন সাংস্কৃতিক পরম্পরার সঙ্গে তাদের যোগাযোগ ঘটে। ইন্দোনেশীয় সমাজ ও সংস্কৃতিতে ইউরোপীয় সংস্কৃতির সাঙ্গীকরণ ঘটে নি বললেই চলে। তা ছাড়া, শুধুমাত্র বণিক এবং ধর্মপ্রচারক রূপে ইউরোপীয়দের আগমন ঘটেছিল, তা নয়। সামরিক পরাক্রমে তারা প্রমত্ত ছিল। বিপুল রাষ্ট্রিক শক্তির সাহায্য ও সমর্থনে তারা ছিল বলীয়ান। ইন্দোনেশিয়া ও ইউরোপের মধ্যে যোগাযোগের প্রকৃতি বিচার করতে হলে এই সত্য স্মরণে রাখা প্রয়োজন।

Van Leur প্রশ্ন তুলেছেন, ইউরোপীয়দের আগমন কি ইন্দোনেশিয়ার ইতিহাসে যুগসন্ধিক্ষণ রূপে চিহ্নিত হতে পারে ? তাদেরকে কি ইন্দোনেশিয়ার ইতিহাসের নিয়ন্ত্রী শক্তি বলা যেতে পারে ? উভয় প্রশ্নেই Van Leur এর উত্তর নেতিবাচক। তিনি বলে থাকেন যে [illegible]

কোমপানির বাণিজ্য মৃগয়ার ফলে এশীয় বাণিজ্যে নতুন কিছু রদবদল ঘটে নি। প্রচলিত বাণিজ্য কাঠামোর মধ্যে তারা দিব্যি মানিয়ে গেছে। ডচ্ কোমপানি ধনতান্ত্রিক বাণিজ্য ব্যবস্থার প্রতিনিধি ছিল না। অতীতে যেমন সামন্তশ্রেণী ফেরিওয়ালা বণিকের অর্থ জুগিয়েছে ঠিক তেমনি ডচ্ কোমপানির দায়িত্ব ছিল বণিক রাজপুরুষের মত অর্থ জোগান দেওয়া। ইন্দোনেশীয় সমাজে কোমপানির প্রভাব ছিল প্রান্তিক। ইন্দোনেশীয় সমাজের ভারকেন্দ্র ছিল ইন্দোনেশিয়াতেই, ইন্দোনেশিয়ার বাইরে অন্য কোথাও নয়।1

J. D. Legge এর মতে Van Leur এর বক্তব্য অতিশয়োক্তি দোষে দুষ্ট। প্রতিপক্ষের অতিশয়োক্তি খণ্ডন করতে গিয়ে তিনি নিজেও একই ভুল করেছেন। একথা সত্য যে এশীয় বাণিজ্যের প্রচলিত বহমান ধারা ইউরোপীয়-দের আগমনে বিনষ্ট হয় নি। কিন্তু তাদের আগমনের ফলে কোন পবিবর্তন ঘটে নি, একথা মনে করা সঙ্গত নয়। ডচ্ কোমপানির আকার, জটিলতা, প্রতিপত্তি এবং একচেটিয়া কারবারের অধিকার এই অঞ্চলে একান্তই অভিনব ছিল। তাছাড়া ডচ্ মূলধন বিনিয়োগ করা হয়েছে। বড় বড় খেতখামার গড়ে উঠেছে। সেখানে ইন্দোনেশীয় শ্রমিক কাজ পেয়েছে। জাভা থেকে সুমাত্রায় অর্থনীতির প্রাঙ্গন স্থানান্তরিত হয়েছে। বাইরের দ্বীপাঞ্চলে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ও প্রভুত্ব প্রসারিত হয়েছে। এই ভাবে উনিশ শতকে ইন্দোনেশিয়ায় নতুন অর্থনীতি, নতুন রাজনৈতিক সংহতি এবং নতুন সমাজরূপান্তর ঘটেছে। একথা সত্য এই অঞ্চলে 1511 সালে পর্তুগীজদের মালাক্কা বিজয় এবং সপ্তদশ শতকের প্রথম দিকে ইঙ্গ-ডচ্ সংঘর্ষে ডচ কোমপানির সাফল্য তুলনামূলক বিচারে যুগান্তকারী নয়। Legge বলেছেন ষোড়শ বা সপ্তদশ শতকে নয়, উনিশ শতকেই ইন্দোনেশিয়ায় সনাতন সমাজ ভাঙ্গনের মুখোমুখি হয়েছে এবং সেখানে ইতিহাসের অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা প্রতিহত হয়েছে।2 ইউরোপীয় অভিঘাতে ইন্দোনেশীয় ইতিহাসের রূপান্তরে যুগসন্ধিক্ষণরূপে 1870 সালকে এবং আরও স্পষ্ট করে 1900 সালকে Legge চিহ্নিত করেছেন।

Van Leur এব মতে ইন্দোনেশীয় ইতিহাস হিন্দু-যবদ্বীপীয়, ইসলামী ও ঔপনিবেশিক, এই তিন পর্বে বিভক্ত করা সঙ্গত নয়। তাঁর মতে ইন্দোনেশীয় ইতিহাস আপন স্বাতন্ত্র্যে সমুজ্জ্বল। ইতিহাসের গতি শক্তি ইন্দোনেশিয়ার অভ্যন্তর থেকেই উৎসারিত হয়েছে। সেখানে প্রাচ্য চরিত্রই ছিল সুস্পষ্ট, প্রতীচ্য লক্ষণ প্রাধান্য পায় নি। মাত্র কয়েকটি স্থানে অতি সীমিত আকারে ইউরোপীয় শক্তির ভারকেন্দ্র সংহত রূপ পেয়েছে। সামরিক,

অর্থনীতিক ও রাজনৈতিক অর্থে প্রাচ্য প্রবাহ অধ্যুষিত বিপুল অঞ্চল সক্রিয়ভাবে ইতিহাসের গতি নির্ণয় করেছে। উনিশ শতক পর্যন্ত সেখানে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সভ্যতা পরস্পর বিচ্ছিন্ন ধারায় বিকশিত হয়েছে। পরিমাণগত বিচারে প্রাচ্যধারাই ছিল সর্বাংশে অগ্রগণ্য।

স্বাতন্ত্র্যের একটি বড় মাপকাঠি হল রাজনৈতিক ক্ষমতা। সেই রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল প্রাচ্য শক্তির হাতে। বলা হয়ে থাকে ইন্দোনেশিয়া ছিল সুদীর্ঘ তিনশ বছর ধরে ওলন্দাজ উপনিবেশ। এই কথাটি আংশিক সত্য। ইন্দোনেশিয়ার ব্যাপক অঞ্চল এমন কি উনিশ শতকের শেষপর্ব পর্যন্ত ডচ্ শাসনাধীন ছিল না। অষ্টাদশ শতকের অন্তিম পর্বে বলা যায় যে প্রায় দুইশ বছর ধরে ডচেরা জাকার্তায় (বাটাভিয়াতে) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাণিজ্য চুক্তির মাধ্যমে এবং দেশী বিদেশী উর্ধ্বতন কর্মচারীদের সহযোগিতায় ডচদের সংগে ইন্দোনেশিয়ার যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল। তা সত্ত্বেও, রাজনীতি ও অর্থনীতির বিচারে জাভা পুরোপুরি ওলন্দাজ অঞ্চলে পরিণত হয়েছিল, তা মনে করার কোন কারণ নেই। রাজনৈতিক আত্মনিয়ন্ত্রণ যেমন স্বাতন্ত্র্য বিচারের একটি মাপকাঠি, ঠিক তেমনি সাংস্কৃতিক আত্মশক্তিও স্বাতন্ত্র্য বিচারের আর একটি মানদণ্ড। John R. W. Smail দেখিয়েছেন যে ইন্দোনেশিয়ার এলিট বা উচ্চবর্গ শ্রেণী ছিল খুব দুর্বল। বিদেশী সভ্যতার প্রবল দাপট এই শ্রেণী প্রতিহত করতে পারে নি। কিন্তু সেখানে বৃহত্তর সমাজের নিজস্ব প্রাণশক্তি ছিল অপরিমেয়। তাঁর মতে ইন্দোনেশিয়ার সুবৃহৎ সুসংগঠিত অনড় সমাজের উপর ভাগে পশ্চিমী প্রভাব ছিল একটি পাতলা স্তর মাত্র। Smail এর মতে সেখানে পরিবর্তনের গতি ছিল মন্থর এবং ঐতিহ্য ছিল দৃঢ়মূল।3

পাদটীকা

1. Van Leur, *Indonesian Trade and Society*, pp 249 ff.
2. J. D. Legge, *Indonesia* (1980) pp 75, 78.
3. John R. W. Smail, 'On the Possibility of an Autonomous History of Modern Southeast Asia,' *Journal of Southeast Asian History*, Vol. 2, No. 2, July 1961
   পরবর্তীকালে একটি লেখায় [Steinberg (ed.), *In Search of Southeast Asia* (New york, 1971)]

Smail তাঁর আগের মতামত কিছু সংশোধন করেছেন। এই রচনার তিনি যুগ্মলেখক। এখানে তিনি বলেছেন যে ঔপনিবেশিক কালপর্বে খুব বড় রকমের পরিবর্তন ঘটেছে এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার জাতিসমূহের জন্য এই পরিবর্তন নতুন রাজনৈতিক কাঠামো সৃষ্টি করেছে। কিন্তু ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে এই পরিবর্তনকে যুক্ত করা সঙ্গত হবে না। ঔপনিবেশিক শাসন ছিল একটি বৃহত্তর বিশ্বব্যাপী প্রক্রিয়ার অংশ। এই প্রক্রিয়া হচ্ছে আধুনিক যুগের বৈজ্ঞানিক ও শিল্পবিপ্লব, যা সমগ্র বিশ্বে রূপান্তর ঘটিয়েছে। পশ্চিমী জগতেও এই কারণে রূপান্তর এসেছে। স্বল্পদিন স্থায়ী ঔপনিবেশিক শাসনকে বেশী প্রাধান্য না দিয়ে, বিশ্বব্যাপী আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়া, যা ইউরোপেও পরিবর্তন এনেছে, তার উপরই তুলনামূলক বিচারে অধিক গুরুত্ব আরোপ করা উচিত।

॥ 9 ॥

ইন্দোনেশিয়ায় ডচ ঔপনিবেশিক শাসন

ডচ্ ইসট ইনডিয়া কোমপানি

ষোড়শ শতকের শেষ দিকে স্পেনীয়, ইংরেজ ও ডচ্ শক্তিবর্গ ইন্দোনেশিয়ায় আধিপত্যের জন্যে লোলুপ হয়ে ওঠে। এদের মধ্যে ডচ্‌রা অগ্রণী ছিল। মশলার গন্ধে প্রলুব্ধ হয়ে বণিকদের মানদণ্ড নিয়েই তারা এসেছিল।1602 সালে ডচ্ সরকার মশলার একচেটিয়া কারবার লাভের প্রত্যাশায় নেদারল্যাণ্ড ইউনাইটেড ইসট ইনডিয়া কোমপানি প্রতিষ্ঠা করে। প্রায় দু'শ বছর ধরে এই কোমপানি টিকে ছিল। বানতামে এশীয় ও ইউরোপীয়রা সমান সমান সুযোগ সুবিধা ও মর্যাদা নিয়েই ব্যবসা করত। তাদের এই অবাধ প্রতি-যোগিতার জন্য মশলার দামও চড়তে শুরু করে। মলুকার সঙ্গে সরাসরি বাণিজ্য এবং সেখানকার মশলা উৎপাদনে একচেটিয়া অধিকার লাভ ডচ্‌দের মূল লক্ষ্য ছিল। তাই তারা মতরাম ও বানতামের মধ্যবর্তী একটি অঞ্চল বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে বেছে নিল। এর নাম তারা দিল বাটাভিয়া। সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, "বাতাবিয়ার পত্তন হয়েছিল ভারতবর্ষে যে ভাবে মাদ্রাজ বোম্বাই আর কলকাতার পত্তন হয়; 1619 সালে ডচে্‌রা এখানে প্রথম একটি গড় তৈরী করে, আর গড়ের নাম দেয় 'বাতাবিয়া'—হল্যাণ্ড দেশের লাটিন নাম হচ্ছে Batavia—বাতাবি লেবুর সঙ্গে সঙ্গে এই দেশ বা নগরবাচক নামটি বাঙ্গলা ভাষাতেও প্রবেশ করেছে।"

বাতাবিয়ার সমৃদ্ধি গড়ে উঠল নেদারল্যাণ্ড ইউনাইটেড ইসট ইনডিয়া কোমপানির গভর্নর Jan Pieterszoon Coen এর নেতৃত্বে। মলুকার মশলা বাণিজ্যে একচেটিয়া অধিকার লাভের নীতি তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে অনুসরণ করেন এবং ইন্দোনেশিয়ার উৎপন্ন জিনিস সংগ্রহের কাজে মন দিলেন। কোমপানির প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চল থেকে তিনি জোর করে উৎপন্ন শস্য আদায় করলেন। নতুন ফসল হিসাবে কফির চাষ সুরু করলেন। 1668 সালে মাকাসারের পরাজয়ের পর ডচ্ একচেটিয়া বাণিজ্য ছিল নিরঙ্কুশ।1650 থেকে 1680 সালের মধ্যে কোমপানির প্রভাব প্রতিপত্তি খুব ছড়িয়ে পড়ল। বিপুল এশীয় বাণিজ্যের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়াল বাটাভিয়া।1684 সাল নাগাদ

সিংহাসনে উত্তরাধিকারের প্রশ্নে বানতাম ক্ষতবিক্ষত হয়ে পড়ে। ফলে তার বাণিজ্যিক সমৃদ্ধিও লুপ্ত হয়ে গেল। অনুরূপ কারণে 1674 সালে মতরামেও ডচ হস্তক্ষেপ অনিবার্য হয়ে পড়ে। সপ্তদশ শতকের শেষ দিকে এশীয় বাণিজ্যের লভ্যাংশ কমে আসছিল। ইউরোপের বাজারে এশিয়ার জিনিসপত্রের দাম বেড়েই চলেছিল। তাই ডচ্ বাণিজ্যিক নীতিতেও কিছু রদবদল প্রয়োজন হয়ে পড়ল। ইউরোপের বাজারে প্রয়োজন এমন জিনিস উৎপাদনের দিকে তারা নজর দিল। 1700 সালের পর ইউরোপের বাজারে রপ্তানির জন্য কফির উৎপাদন খুবই লাভজনক হতে পারে বলে তারা মনে করল। জাভার সামন্ত শ্রেণীর কাছ থেকে কর (tribute) হিসাবে তারা কফি দাবি করল। কফির উৎপাদন ও বন্টন দেখাশোনার জন্য তারা ইউরোপীয় কর্মচারী নিয়োগ করল। ইন্দোনেশিয়ায় ইউরোপীয় শাসন কাঠামো সৃষ্টির এই হল প্রথম পদক্ষেপ।

জাভার শাসন কাঠামো

জাভার শাসন ব্যবস্থার নিম্নতম স্তর ছিল গ্রাম। গ্রামের শাসক ছিলেন নির্বাচিত গ্রামণী। শাসন কাঠামোর সর্বোচ্চ স্তরে ছিলেন ওলন্দাজ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত ডচ্ গভরণর জেনারেল। Residency নিয়ে গঠিত কয়েকটি প্রদেশে জাভা বিভক্ত ছিল। Residency-র প্রধান শাসক Resident নামে পরিচিত ছিলেন। ইনি ছিলেন ডচ্ রাজকর্মচারী। তাঁর অধীনে ছিলেন Regent ও Assistant Resident পদবীধারী দু'জন কর্মচারী। Regent পদটি ছিল দেশীয় এবং বংশানুক্রমিক। Assistant Resident ছিলেন ডচ্-জাতীয়। Assistant Resident এর অধীনে ছিলেন Controleur নামে ডচ্ রাজকর্মচারী। Controleur ছিলেন ডচ্ ও দেশীয় আমলাতন্ত্রের যোগাযোগের সেতু। Resident, Assistant Resident এবং Controleur ছিলেন শাসন কাঠামোর ডচ্ অঙ্গ এবং Regent ছিলেন দেশী অঙ্গ। এই দুটি অঙ্গের মধ্যে সম্বন্ধ ছিল হৃদ্যতাপূর্ণ। Furnivall বলেছেন যে তৎকালীন জাভার মানুষের দৃষ্টিতে Resident ছিলেন বড় ভাই এবং Regent ছোট ভাই। অভ্যন্তরীন দেশীয় বিষয়ের দায়িত্ব দেশী কর্মচারীদের উপর ন্যস্ত ছিল। ইউরোপীয় প্রতিনিধি শুধু বাণিজ্যিক স্বার্থ তত্ত্বাবধান করতেন। এই শাসন ব্যবস্থা সাধারণভাবে দ্বৈতশাসন (Dyarchy) নামে পরিচিত। Furnivall এই শাসন কাঠামোকে পরোক্ষ শাসন (Indirect Rule) নামে অভিহিত করেছেন।1

সরাসরি ডচ্ শাসন

গোটা অষ্টাদশ শতক জুড়ে ডচ কোমপানির অবস্থা খারাপের দিকেই

গেল। তখন কোমপানির স্বল্প বেতনের কর্মচারীরা নিজেরাই ফাটকা বাজারে অংশ নিয়েছে। সুলভ অর্থের লোভে চীনাদের হাতে জমি বা গ্রাম লিজ্ হিসাবে বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তা দিয়ে প্রচুর অর্থের জোগান সম্ভব হয়নি। তাই অংশীদারদের লভ্যাংশ দেবার জন্য কোমপানিকে টাকা ধার করতে হয়েছে। জাভাতে যদিও কোমপানির আধিপত্য ছিল, বোর্ণিও ও সুমাত্রা পুরোপুরি কোমপানির এক্তিয়ারের বাইরে ছিল। সমুদ্রে জলদস্যুদের উপদ্রবও কম ছিল না। এমনকি ইন্দোনেশিয়ার বণিককুলও তাদের ন্যায্য বাণিজ্যে অশান্তি ভোগ করেছে। জাহাজ চলাচল ও উৎপাদন ব্যবস্থার উপর ডচদের কর্তৃত্ব প্রসারিত হলে অশান্তি আরও বেড়ে গেল। 1780 সাল নাগাদ নেদারল্যানড ইউনাইটেড ইসট ইনডিয়া কোমপানি দেউলিয়া হয়ে পড়ল। 1798 সালে ডচ সরকার কোমপানির পুরো দায়দায়িত্ব নিয়ে নিল। এরপর থেকে শুরু হল ইন্দোনেশিয়াতে সরাসরি ডচ সরকারের শাসন।

এদিকে ইউরোপে তখন বইছে অবাধ বাণিজ্য নীতির উদার হাওয়া। হল্যাণ্ডে বিতর্ক চলছিল, রাষ্ট্র বাণিজ্য ক্ষেত্রে ও সমাজ ব্যবস্থা রূপান্তরের কাজে হাত দেবে কি ? ইন্দোনেশিয়ার প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখা সঙ্গত হবে কি ? ইন্দোনেশিয়ায় ডচ নীতি কী হওয়া উচিত ? H. W. Daendals (গভরণর জেনারেল 1808) আইন ও শাসন কাঠামোতে কিছু সংস্কার সাধন করেছিলেন। সার্বভৌমত্ব বলতে তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন জাভার যাবতীয় ভূ-সম্পত্তির উপর ডচ শাসকের মালিকানা বা স্বত্বের অধিকার। সার্বভৌমত্বের এই ধ্যানধারণা ইন্দোনেশিয়ার রাজন্যবর্গের বোধগম্য ছিল কিনা, তা অবশ্য বলা মুসকিল। ভূমির অধিকার হস্তান্তর করার অর্থ ভূমিস্বত্ব ত্যাগ, এই পশ্চিমী ধারণার সঙ্গে হয়ত তারা পরিচিত ছিলেন না।

জাভাতে স্বল্পকালীন ইংরেজ শাসন

1811 থেকে 1816 সাল পর্যন্ত জাভা ইংরেজদের অধীনে ছিল। তখন T. S. Raffles ছিলেন গভরণর। শাসনের ক্ষেত্রে তিনিও অনেক পরিবর্তন এনেছিলেন। এগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল জমির খাজনা প্রবর্তন। শাসকই আসল ভূস্বামী। তাই জমির উৎপাদিকা শক্তি অনুযায়ী খাজনা আদায় করার পূর্ণ অধিকার তার আছে। এই নীতিকে মেনে নেওয়া হল। 1816 সালে ইন্দোনেশিয়া পুনরায় ডচদের হাতে ফিরে আসে। তারাও এই খাজনা আদায়ের অধিকার চালিয়ে যায়। জমির খাজনা তাদের কাছে খুবই লাভজনক হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তারা জমি জরিপের কোন বন্দোবস্ত করেনি। জমির মূল্য নির্ধারণেও কোন মাপকাঠি ছিল না। তাই খাজনা আদায় প্রথায় কিছু খামখেয়ালিত্ব, কিছু বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে ছিল।

কালচার সিসটেম

1825 সালে ডচ্ সরকার ও জাভার শাসকদের মধ্যে যুদ্ধ বাধে। যুদ্ধ চলেছিল 1830 সাল পর্যন্ত। বিস্তীর্ণ অঞ্চল ধ্বংসস্তূপে পরিণত হল। আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি ঔপনিবেশিক সম্পর্ককে দুর্বল করে দিল। ডচ্ সরকার ইন্দোনেশিয়ায় গভরণর জেনারেল রূপে J. van den Boschকে পাঠাল। তাঁর ঔপনিবেশিক নীতি কালচার সিস্টেম বা কালটিভেশন সিস্টেম নামে পরিচিত। ইউরোপের বাজারে চাহিদা আছে এমন জিনিসপত্র চাষ করতে তিনি জাভার অধিবাসীদের নির্দেশ দিলেন। বলা হল, এর জন্যে অবশ্য তারা ক্ষতিপূরণ পাবে। 1824 সালে ডচ্ সরকার নেদারল্যান্ড ট্রেডিং সোসাইটি পত্তন করেছিল। এই সোসাইটিকে নির্দেশ দেওয়া হল, জাহাজে করে জাভার মালপত্তর তারা জাভার বাজারে এবং সেখান থেকে ইউরোপের বাজারে পাঠিয়ে দেবে।

মূল ডচ্ শব্দ হল Cultuur stelsel, এই কথাটিকে Culture System নামে Clive Day এবং J. S. Furnivall অভিহিত করেছেন। Kahin তাঁর *Nationalism and Revolution in Indonesia* গ্রন্থে Cultivation System রূপে ডচ্ কথাটির ইংরেজি অনুবাদ করেছেন। Vlekke মনে করেন Cultivation System কথাটি Culture System এর চেয়ে অধিক অর্থবহ এবং যুক্তিসঙ্গত। তার মতে এই ব্যবস্থার প্রকৃত অর্থ হচ্ছে সরকার নিয়ন্ত্রিত কৃষি প্রথা। ইন্দোনেশিয়ায় চাষীদের ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থায় Bosch নির্দেশিত যে সব নীতি প্রযোজ্য হবে, Hall সেগুলির নয়টি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন।2

(i) ইন্দোনেশীয়দের সঙ্গে ডচ্‌রা এমন চুক্তি করবে যার প্রধান শর্ত হচ্ছে যে ধান-বোনা জমির কিছু অংশ আলাদা করে সরিয়ে রাখা হবে। সেখানে ইউরোপীয় বাজারের পক্ষে উপযোগী এবং প্রয়োজনীয় শস্য চাষ করা হবে।)

(ii) (এই ধরণের আলাদা করে সরিয়ে রাখা জমির পরিমাণ হবে প্রত্যেক দেশ অঞ্চলের মোট আবাদী জমির এক-পঞ্চমাংশ।)

(iii) ধান চাষের জন্য যত শ্রমিকের প্রয়োজন, ইউরোপীয় বাজারের উপযোগী কৃষি পণ্য চাষ করতে তার চেয়ে বেশী সংখ্যক শ্রমিকের প্রয়োজন হবে না।

(iv) (আলাদা করে সরিয়ে রাখা জমি হবে কৃষিকর মুক্ত।)

(v) উৎপন্ন ফসল জেলায় প্রেরিত হবে। (উৎপন্ন ফসলের নিরূপিত

মূল্য, যে পরিমাণ ভূমিকর মকুব করা হল তার বেশী হলে, উভয়ের পার্থক্যের আর্থিক পরিমাণ জনগণের প্রাপ্য হবে।)

(vi) (সরকারের পক্ষ থেকে সতর্কতা, তৎপরতা এবং শ্রমের অভাব হেতু ফসল বিনষ্ট হলে, সরকার তার জন্য দায়ী হবে।)

(vii) (দেশীয় শ্রমিকরা কাজ করবে তাদের মোড়ল বা গ্রাম প্রধানদের নির্দেশে।) ফসল কাটা এবং তোলা, সময়মত পরিবহনের আয়োজন করা এবং ভাল জায়গা বেছে নেওয়া—এসব কাজ তত্ত্বাবধান করবে ইউরোপীয় সরকারী কর্মচারীরা।)

(viii) (শ্রমিকদের মধ্যে বিভিন্ন কাজ ভাগ করে দেওয়া হবে।) একদল শ্রমিক ফসল পাকা পর্যন্ত দেখাশুনা করবে। আর এক দলের দায়িত্ব ফসল কাটা ও তোলা। তৃতীয় দলের কাজ হবে শস্য পরিবহন। চতুর্থ দল থাকবে কারখানায় কাজ করার জন্য। মুক্ত শ্রমিক অপ্রতুল হলেই চতুর্থ শ্রেণীর প্রয়োজন হবে।

(ix) (বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে অসুবিধা দেখা দিলে, কৃষকদের ভূমিকর না দেবার স্বাধীনতা থাকবে।) তখন ধরে নেওয়া হবে যে ফসল পাকলেই তাদের দায়দায়িত্ব শেষ হয়েছে। ফসল তোলা এবং আনুষঙ্গিক শেষ কাজগুলির জন্য স্বতন্ত্র চুক্তির প্রয়োজন হবে।

কালচার সিস্টেম ও ভূমিকর নীতি3

(1811 থেকে 1816 সাল পর্যন্ত স্বল্পকালীন ব্রিটিশ শাসনের আমলে জাভাতে ভূমিকর প্রবর্তিত হয়েছিল। ভূমিকর প্রবর্তনে প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন স্যার টমাস স্ট্যাম্পফোরড রাফেলস।) ভারতবর্ষে প্রচলিত ভূমি-রাজস্ব প্রথার সঙ্গে তিনি পরিচিত ছিলেন। এই প্রথার মূল সূত্রটি হল রাজাই দেশের যাবতীয় জমির মালিক। তাই জমি সম্পর্কে রাজার অধিকার সর্বাগ্রগণ্য। সমস্ত জাভাব্যাপী জমি গ্রামপ্রধানদের কাছে বন্টন করা হয়েছিল। গ্রামপ্রধানরা সেই জমি অন্যদের পুনর্বন্টন করে দিতেন এবং তা থেকে খাজনা আদায় করতেন। অর্থ বা জিনিস খাজনা হিসাবে দেওয়া হত। কিন্তু অর্থকেই বেশী প্রাধান্য দেওয়া হত। 1827 সালে ওলন্দাজ সরকার স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রায় অধিকাংশ পরিমাণ এবং অবশিষ্টাংশে তাম্র মুদ্রায় খাজনা দেবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। জমির প্রকৃতি অনুযায়ী (অর্থাৎ জমি সেচ এলাকায় না অসেচ এলাকায়) এবং জমির উৎপাদিকা শক্তির উপর নির্ভর করত খাজনার পরিমাণ। (সবচেয়ে ভাল সেচ জমিতে ধার্য করের

পরিমাণ ছিল উৎপন্ন দ্রব্যের অর্ধাংশ এবং শুখা অসেচ জমিতে এক-চতুর্থাংশ। সাধারণভাবে উৎপন্ন দ্রব্যের দুই-তৃতীয়াংশ ছিল ধার্য করের গড়পড়তা হিসাব। ভূমিকর প্রথা প্রবর্তিত হবার অল্পকাল পরেই রাফেলস্, গ্রাম-ভিত্তিক হিসাবের পরিবর্তে প্রতি কৃষকের উপর ব্যক্তি-ভিত্তিক কর ধার্য করতে চেয়েছিলেন।)

1816 সালে জাভা ওলন্দাজ শক্তির হাতে ফিরে আসে। ওলন্দাজ শাসক জমির খাজনা প্রথা বজায় রেখেছিল। তারা গ্রামভিত্তিক খাজনার হিসাব ও আদায় পুনঃপ্রবর্তন করেছিলেন। এ ছাড়া কোন উপায় ছিল না। কারণ, নিখুঁত জমি জরিপ এবং জমির উৎপাদিকা শক্তির মূল্যায়ন তখনও সম্ভব হয়নি। বস্তুত, 1870 সালের আগে, জমি জরিপের কাজ আদৌ সম্পন্ন হয় নি। খাজনা ধার্যের ব্যাপারে নির্দিষ্ট কোন মানদণ্ড ছিল না। ফলে মোটা-মুটিভাবে একটা বার্ষিক হিসাব স্থির করা হয়েছিল। গ্রাম প্রধানের চেষ্টা ছিল ধার্য করের পরিমাণ কমানো, এবং ওলন্দাজ সরকারী কর্মচারীদের চেষ্টা ছিল, তা বাড়ানো। এ জন্য খাজনার পরিমাণ নির্ণয়ে কোন নির্দিষ্ট সমতা রক্ষা আদৌ সম্ভব হয় নি। তাছাড়া গ্রামপ্রধানরা প্রায়ই গ্রামের জমির পরিমাণ গোপন রাখতেন। খাজনার পরিমাণ ছিল অধিকাংশ ক্ষেত্রে গড়পড়তা দুই-পঞ্চমাংশের নিচে। বাস্তব অবস্থায় এই খাজনার পরিমাণ ছিল নিঃসন্দেহে নিপীড়ন মূলক। 1820এর দশকে ডচ্ গভরণর জেনারেল Van der Capellen জাভার মানুষদেরকে জমি ও জমির উৎপন্ন জিনিস ভোগদখলের অবাধ অধিকার দিয়েছিলেন। বিনিময়ে তাদের খাজনা দিতে হত। খাজনার পরিমাণ, উপরে যা আমরা আলোচনা করেছি, সে মতই ছিল। Capellenএর আশা ছিল যে উদার অর্থনীতির প্রেরণায় জাভার মানুষ বিক্রয় যোগ্য জিনিস উৎপাদনে আগ্রহ বোধ করবে।) বিক্রয়লব্ধ অর্থ দিয়ে খাজনা পরিশোধ করতে তাদের কোন অসুবিধা হবে না। এই নীতির ফলে অবশ্য জাভায় বসবাসকারী ইউরোপীয়দের প্রভাব প্রতিপত্তি অনেক ক্ষুন্ন করা হয়েছিল।

1825 সালের পর Capellen অনুসৃত নীতি ফলপ্রসূ হয় নি। কারণ, জাভা যুদ্ধের দরুণ ওলন্দাজ সরকারকে অতিরিক্ত ব্যয় বহন করতে হয়েছিল। তাছাড়া, বিশ্বের বাজারে তখন Tropical কৃষিপণ্যের বাজার দর হ্রাস পেয়েছিল। 1826 সালে হল্যাণ্ডের রাজা প্রথম উইলিয়ম Du Bus de Ghisignesকে কমিশনার জেনারেলের পদে জাভা পাঠালেন। শাসনের ব্যয়ভার কমান এবং জাভাকে লাভজনক উপনিবেশরূপে গড়ে তোলার নির্দেশ দিয়ে Du Busকে জাভা পাঠান হয়েছিল। 1827 সালের 1 মে তারিখের কলোনাইজেশন রিপোর্টে তিনি কয়েকটি প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন। প্রস্তাবগুলির সারমর্ম হচ্ছে যে জাভার অব্যবহৃত পতিত জমিগুলি ইউরোপীয়দের কাছে বিক্রয় করা

হোক বা লিজ দেওয়া হোক। জাভার কৃষকদের সাহায্যে ইউরোপীয়রা জমি চাষ করবে। এজন্য জাভার কৃষকরা চুক্তিমত মজুরি পাবে। উদার অর্থনীতির সূত্রের উপর নির্ভর করে এই প্রস্তাবগুলি রচিত হয়েছিল। কিন্তু আর্থিক উদ্যোগের দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছিল জাভাবাসীব হাতে নয়, ইউরোপীয়দের হাতে। Du Bus আশা করেছিলেন যে জাভার মানুষ ইউরোপীয়দের সঙ্গে চুক্তির শর্তানুসারে উৎপাদনের কাজে আগ্রহী হবে।

জমির উৎপন্ন ফসলের উপর জাভাবাসীর অবাধ ভোগ দখলের অধিকার এবং অব্যবহৃত পতিত জমি ইউরোপীয়দের কাছে বিক্রয়, Johannes van den Bosch এই দুই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিলেন। 1829 সালের 6 মার্চ তারিখে তাঁর বক্তব্য তিনি ওলন্দাজ রাজদরবারে পেশ করেন। ইউরোপীয় বাজারে বিক্রয়ের উপযোগী পণ্য ইন্দোনেশিয়ায় উৎপাদনের কথা তিনি ভেবেছিলেন। জাভাকে তিনি হলাণ্ডের পক্ষে লাভজনক-উপনিবেশ হিসাবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তিনি প্রস্তাব করেছিলেন যে কফি, চিনি, নীল ইত্যাদি কৃষিজাত পণ্য স্বল্প ব্যয়ে ইন্দোনেশিয়াতে উৎপাদন কবা হবে অর্থাৎ ইন্দোনেশিয়ার কৃষকদের নির্দিষ্ট পণ্য উৎপাদনে বাধ্য করা হবে এবং উৎপন্ন জিনিস সরকারের হাতে জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক গণ্য করা হবে। ডচ্ সরকারের এই নীতি কালচার সিস্টেম নামে পরিচিত। তাঁর পরিকল্পনাকে কার্যকরী করার নির্দেশ তিনি হলাণ্ডের রাজার কাছ থেকে পেয়েছিলেন। এই উদ্দেশ্যে 1830 সালের জানুয়ারি মাসে Bosch জাভাতে পৌঁছান। কালচার সিস্টেমের বিশদ বিবরণ নানা দলিল ও বিবরণে ছড়িয়ে আছে। এগুলির মধ্যে তিনটি প্রধান ঃ—(i) 1829 সালের 6 মার্চের এডভাইস, (ii) 1830 সালের 10 অক্টোবরের মিনিস্টার অব কলোনিজের কাছে প্রেরিত রিপোর্ট ; ক্যাবিনেট পত্র নং 628/26, (iii) 1834 সালে প্রস্তুত Bosch এর সমীক্ষমূলক প্রতিবেদন।

ইংরেজি ভাষায় লিখিত বিবরণগুলি বিষয়ে তিনজনের গ্রন্থ বিশেষভাবে নির্ভরযোগ্য ঃ

(i) Clive Day, *The Policy and Administration of The Dutch in Java* (New York 1904),

(ii) J. S. Furnivall, *Netherlands India* (Cambridge 1939),

(iii) D. G. E. Hall, *A History of South East Asia* (London 1955)

Clive Dayর বিবরণ অনেকটা বাস্তবানুগ। কালচার সিসটেমের তাত্ত্বিক দিক এবং বাস্তব অবস্থার মধ্যে যে বৈষম্য ছিল, সে বিষয়ে তিনি সজাগ ছিলেন। তাত্ত্বিক দিকটা হচ্ছে (বশ বলেছিলেন) যে ডচ্ সরকারের হাতে জমি ও আবাদী ফসল সমর্পণ করার ফলে এটা ধারণা হওয়া স্বাভাবিক যে জাভার কৃষকরা ভূমিকর দেবার দায়দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেয়েছিল। কিন্তু Day বাস্তব অবস্থার পরিচয় দিয়ে বলেছেন যে বহু ক্ষেত্রেই সরকারের হাতে জমি ও আবাদী ফসল সমর্পণ করা সত্ত্বেও জাভাবাসীদের অতিরিক্ত ভূমিকর দিতে হত। 1834 সালের আইন সত্ত্বেও কালচার সিসটেম অনুযায়ী তাদের জন্য ভূমিকর বলবৎ ছিল।

(ভূমিকর প্রসঙ্গে Furnivall এর বিবরণে কিছু পরস্পর বিরোধী কথা আছে, যদিও সাধারণভাবে কালচার সিসটেম সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য মোটামুটি স্বচ্ছ। উৎপন্ন পণ্যের দুই-তৃতীয়াংশ অর্থের পরিমাপে না নিয়ে, সরকার শুধুমাত্র এক পঞ্চমাংশ জিনিসের পরিমাপে গ্রহণ করতেন। ধান চাষ হচ্ছে এমন জমির এক পঞ্চমাংশ যদি কোন গ্রাম (দেশ) রপ্তানিযোগ্য পণ্য চাষের জন্য আলাদা করে সরিয়ে রাখতো, তাহলে সেই গ্রামকে ভূমিকর দিতে হত না। রপ্তানিযোগ্য পণ্য বিক্রয় থেকে যে অর্থ পাওয়া যেত, তা থেকে নির্ধারিত ভূমিকরের অতিরিক্ত যা (অর্থ) বাঁচতো, তা সেই গ্রামের সম্পদ বলে পরিগণিত হত। শস্য পাকলে গ্রামকে আর ভূমিকর দিতে হত না। তখন ধরে নেওয়া হত যে গ্রাম তার দায়দায়িত্ব পালন করেছে। এ সব উক্তি যে কতদূর পরস্পর বিরোধী, তা বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই। ভূমিরাজস্ব সমস্যাটি দেখে Furnivall তাঁর বিরক্তি ও উষ্মা চেপে রাখতে পারেন নি।

Bosch নির্দেশিত কালচার সিসটেমের নয়টি বৈশিষ্ট্য Hall উল্লেখ করেছেন। ভূমিকর বিষয়ে তাঁর বক্তব্য হল যে প্রতিটি গ্রামের (দেশ) আবাদী জমির এক পঞ্চমাংশ সরিয়ে রাখতে হবে। এর জন্য ভূমিকর মকুব করা হবে। যদি সরকারকে প্রদত্ত শস্যের নিরূপিত মূল্য মকুব করা ভূমিকরের চেয়ে বেশী হয়, তাহলে বেশী অংশটুকু জনসাধারণের দখলে আসবে। (Hall-এর মনে হয়েছিল যে এ ধরণের স্বাধীনতা সত্ত্বেও বরাবরই ভূমিকর আদায় করা হয়েছে। কালচার সিসটেমের এটি ছিল একটি বড় ধরণের ত্রুটি।)

ইংরেজি ভাষায় লিখিত তিনজন লেখকের বিবরণে শুধুমাত্র যে দৃষ্টি-ভঙ্গির তারতম্য ঘটেছে, তা নয়। তাঁদের বিবরণে তথ্যগত বিচ্যুতিও আছে। কারণ এই তিনজনেই ভিন্ন ভিন্ন ডচ লেখককে অনুসরণ করেছিলেন। Hall তাঁর বিবরণের জন্য তথ্য সংগ্রহ করেছেন এই দু'টি গ্রন্থ থেকে :

(i) H. T. Colenbrander, *Koloniale Geschiedenis* 3 vols.,

(Gravenhage, 1925-26) এবং (ii) F. W. Stapel, (ed.), *Geschiedenis van Netherlandsch Iudie*, 5 vols. (Amsterdam, 1938-40)। কালচার সিসটেমের নয়টি বৈশিষ্ট্য Hall সংগ্রহ করেছেন Colenbrander এর গ্রন্থ থেকে। Colenbrander দাবি করেছেন, তিনি তা পেয়েছেন রাষ্ট্রীয় মহাফেজ খানায় রক্ষিত Bosch এর 1834 সালের বিবরণ থেকে। Colenbrander সেই দলিলের সঠিক মর্ম উদ্ধার করতে পারেন নি। জমির যে এক-পঞ্চমাংশ সরিয়ে রাখা হবে, তা ভূমিকর থেকে অব্যাহতি পাবে, রাষ্ট্রীয় মহাফেজখানার দলিলে সে কথা বলা হয় নি। রাষ্ট্রীয় মহাফেজখানার দলিলে বলা হয়েছে, যে দেশ বা গ্রাম, ধানচাষের জমির এক-পঞ্চমাংশ রপ্তানিযোগ্য শস্য চাষের জন্য সরিয়ে রাখবে, সেই দেশ বা গ্রাম সমগ্রভাবে ভূমিকব থেকে অব্যাহতি পাবে। প্রদেয় ভূমিকর থেকে যদি নিরূপিত শস্য মূল্য বেশী হয়, তা হলে বাড়তি মূল্য পাবে সেই গ্রাম।

Furnivallও তাঁর বিবরণের তথ্য সংগ্রহ করেছেন রাষ্ট্রীয় মহাফেজখানায় সংরক্ষিত সরকারী দলিল থেকে। Bosch এর 1834 সালের বিবরণের উপর তিনি সবচেয়য়ে বেশী নির্ভর করেছেন। তাছাড়া বেশ কিছু ডচ ভাষায় লিখিত দলিল তিনি অনুধাবন করেছেন। তিনি প্রচুর তথ্য সংগ্রহ কবেছেন J. J. W. Boerma, *Johannes Van den Bosch* (Amsterdam, 1927) গ্রন্থ থেকে। Furnivall এর দৃষ্টিভঙ্গীকে বুঝতে হলে N. G. Pierson, *Koloniale Politick*, (Amsterdam, 1877) গ্রন্থটি অবশ্য পাঠ্য। Boschকে একজন উদারনৈতিক হৃদয়বান রাজনীতিবিদ রূপে Pierson চিত্রিত করেছেন। Bosch এর নীতি বিশ্লেষণ করে তিনি বলেছেন যে ভূমিকর প্রথার পিছনে জোরজবরদস্তির নীতি কাজ করেছে। কারণ জোর করে অর্থ আদায় করা হত। কিন্তু কালচার সিসটেম-এ অর্থের বিনিময়ে উৎপন্ন দ্রব্য সরকারের হাতে সমর্পণ করা ছিল বাধ্যতামূলক। ভূমিকরের পরিবর্তে নির্দিষ্ট শস্য সমর্পণ করা যে বাধ্যতামূলক ছিল, বাস্তবে তা কার্যকর করা হয় নি। Bosch এর চিন্তাধারাকে বাস্তব রূপ দেওয়া হয় নি। যে সব ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক চাষ ছিল উৎপীড়ন, শুধুমাত্র সে সব ক্ষেত্রেই ভূমিকর থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল। বহু ক্ষেত্রেই বাধ্যতামূলক চাষ প্রথা ছিল, অধিকন্তু. ভূমিকরও ছিল। Pierson এর এই বিশ্লেষণ, Furnivall প্রমুখ অনেককেই গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল।

ডচ্ ভাষায় লিখিত যে সমস্ত সূত্র Furnivall ও Hall ব্যবহার করেন নি বা অল্প স্বল্প ব্যবহার করেছেন সেগুলি Clive Day কাজে লাগিয়েছেন। S. van Deventer, *Bijdrajen tot de Kennis* . 3 vols. (Zalt-

Bommel 1865-66) এবং G. H. van Soest, *Geschiedenis van het Kultuurstelsel* 3 vols. (Rotterdam, 1869-71), এই দুই বিশাল গ্রন্থ থেকে Day তথ্য এবং বিশ্লেষণ আহরণ করেছেন। Deventer প্রণীত গ্রন্থে অসংখ্য তথ্য ও তথ্যের আকর সংগৃহীত হয়েছে। কালচার সিসটেমের মধ্যে যে নিষ্ঠুরতা, অন্যায় ও অসাম্য ছিল, Deventer তা নিখুঁতভাবে উদ্ঘাটিত করেছেন। Van Soestএর ইতিহাসে কালচার সিসটেমের নীতি ও নীতির বাস্তব রূপায়ণ সমালোচিত হয়েছে। Boschকে তিনি মূর্তিমান শয়তানরূপে অঙ্কিত করেছেন। Deventer এবং Soest, Clive Dayকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছেন।

কালচার সিসটেমের বাস্তব চিত্রটি অনেকেই সঠিক বুঝতে পারেন নি। ভূমিকর আদায়ের বিরুদ্ধে Bosch যা কিছুই বলুন না কেন জাভার অধিকাংশ অঞ্চলে ভূমিকর ছিল কালচার সিসটেমের ভিত্তি। হয় চুক্তিমত, না হয় উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের চাপে জাভার গ্রামে গ্রামে ইউরোপীয় বাজারের উপযোগী রপ্তানিযোগ্য শস্য চাষ করা হত। চিনি ও নীল চাষ ছিল বেশী প্রচলিত। এই সব জিনিস চাষের জন্য হয়ত এক পঞ্চমাংশ জমি বরাদ্দ রাখার নির্দেশ ছিল। কিন্তু কোথাও কোথাও এক তৃতীয়াংশ জমি বরাদ্দ রাখা হত, Bosch তা জানিয়েছেন। 1834 সালে Bosch জানিয়েছিলেন যে ইউরোপীয় বাজারের উপযোগী জিনিস চাষ করে তা যদি সরকারের হাতে অর্পণ করা হত (ভূমিকরের বদলে), তাহলে সেই গ্রামকে আর ভূমিকর দিতে হত না। ভূমিকর থেকে অব্যাহতির প্রশ্নটা এই সূত্র থেকেই Furnivall ও Hall গ্রহণ করেছেন। ব্যাপারটা কিন্তু মোটেই তা নয়। জাভায় সাধারণ নিয়ম ছিল যে ধানের মূল্য দিয়ে ভূমিকরের পরিমাণ নিরূপিত হত। গ্রামের এক পঞ্চমাংশ জমিতে উৎপন্ন শস্যাদি সরকারকে দিলে, সেই জিনিসের মূল্য ভূমিকর দানের পক্ষে যথেষ্ট বলে বিবেচিত হত। সরকারকে প্রদেয় রপ্তানিযোগ্য ফসলের মূল্য নির্ণীত হত নির্ধারিত ভূমিরাজস্বের পরিমাপে। নির্ধারিত ভূমিকরের চেয়ে যদি উৎপন্ন রপ্তানিযোগ্য শস্যের মূল্য বেশী হত, তাহলে সেই বাড়তি মূল্য পেত গ্রাম। কিন্তু নির্ধারিত ভূমিকরের চেয়ে যদি উৎপন্ন রপ্তানিযোগ্য শস্যের দাম কম হত, তাহলে সরকারকে হয় অর্থ দিয়ে, না হয় জিনিস দিয়ে সেই কমতি অংশটা গ্রাম পূরণ করে দিত। উৎপন্ন রপ্তানিযোগ্য জিনিসের মূল্যের পরিমাণ হল আসল কথা। জমির এক-পঞ্চমাংশে রপ্তানিযোগ্য ফসল চাষ করে, তা সরকারের হাতে সমর্পণ করলে ভূমিকর থেকে অব্যাহতি পাওয়া যেত, এটা কিন্তু বাস্তব চিত্র নয়।

ভূমিকর প্রথা সর্বত্র সমানভাবে চালু করা হয় নি। Preanger Regencyতে

Madium, Kediri, Bagelan ও Banjumas জেলাতে এই প্রথা প্রচলিত হয় নি। 1830 সালের আগে থেকেই কফির চাষ বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল। তাছাড়া যে সব জমিতে ধান চাষ হত, সেখানে কফির চাষ করা হত না। একারণে কফিকে ঠিক কালচার সিসটেমের আওতায় নিয়ে আসা বোধ হয় সঙ্গত নয়। 1830 সাল থেকে কয়েকটি কারণে জাভাতে ভূমিকরের পরিমাণ ছিল ক্রমবর্ধমান। প্রথমত, কর নির্ধারণ সঠিক রীতি-নীতি মেনে করা হত না। আঞ্চলিক সরকারী কর্মচারী গ্রামের জমিজমার তত্ত্বাবধান করতেন। জমি ও উৎপাদনের পরিমাণ কমিয়ে বলা গ্রামণীর পক্ষে আর সম্ভব হচ্ছিল না। দ্বিতীয়ত, 1830 সালের পর অনেক নতুন জমি চাষের আওতায় আনা হয়েছিল। প্রথম পাঁচ বছর এগুলির জন্য কোন ভূমিকর দিতে হত না। কিন্তু পাঁচ বছর পরে বর্ধিত হারে ভূমিকর ধার্য করা হয়েছিল। তৃতীয়ত, রপ্তানিযোগ্য পণ্যের চাষ বেড়ে গেলে, জমির মূল্যও বেড়ে গিয়েছিল। ফলে পূর্বে যে সব জমির উৎপন্ন ধানের এক পঞ্চমাংশ ছিল ভূমিকর মূল্য, তা এখন বেড়ে দাঁড়াল অর্ধাংশে। এই বর্ধিত পুনর্মূল্যায়ন থেকে ডচ্ কর্মচারীরা কিছু আত্মসাৎ করতেন এবং কৃষককুলকে বাড়তি বোঝার যন্ত্রনা সহ্য করতে হত। চতুর্থত, 1830 সালের পর ধানের বাজার দর বেড়েছিল। রপ্তানিযোগ্য পণ্য চাষ বেড়ে গেলে, ধান চাষের ক্ষেত্র সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছিল। ফলে ধানের বাজার মূল্য বেড়ে গেল। পণ্যের মূল্য দেবার জন্য সরকার প্রচুর পরিমাণে তাম্র মুদ্রা বাজারে ছেড়েছিল। ফলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। ধানের মূল্যে যেহেতু ভূমিকরের পরিমাণ নির্ধারিত হত, তাই পরিবর্তিত অবস্থায় ভূমিকরের পরিমাণও অনেক বেড়ে গেল।

1834 সালে Van den Bosch লিখিত প্রতিবেদন থেকে এটা স্পষ্ট নয় যে ভূমিকর প্রথার বাস্তব প্রয়োগ সম্বন্ধে তিনি সম্যক অবহিত ছিলেন কি না। 1850 এর দশকে জাভার ডচ শাসকরাও জানতেন না যে কালচার সিসটেম প্রথম দিকে কতটা কার্যকর ছিল। তাঁরা ভেবেছিলেন যে 1829, 1830 এবং 1834 সালের Bosch এর সরকারী বিবৃতিগুলিতে এই ব্যবস্থার প্রকৃত চিত্র খুঁজে পাওয়া সম্ভব। এসব দলিলপত্র থেকে তাঁরা যা অনুমান করতে পেরেছেন, তা তাঁদের 1850 এর দশকের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না। তাঁদের মনে হয়েছিল নানা বিকৃতি, দুর্নীতি ও অসঙ্গতিতে কালচার সিসটেম পরিপূর্ণ।

সুতরাং প্রশ্ন তোলা যেতে পারে Van den Bosch এর লিখিত বিবৃতি এবং এই ব্যবস্থার বাস্তব প্রয়োগের মধ্যে অসঙ্গতির কারণ কি ? অসঙ্গতি ছিল, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। Pierson ও Furnivall প্রমুখ

লেখকরা মনে করেন যে Bosch হল্যাণ্ডে ফিরে যাবার পর এই ব্যবস্থায় নানা ত্রুটি বিচ্যুতি দেখা দিয়েছিল। এগুলি ছিল একান্তই মানবিক ভুলভ্রান্তি। এর জন্য Bosch দায়ী নন। Day, Van Deventer এবং Van Soest প্রমুখ লেখকরা মনে করেন যে এই ব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রথম থেকেই অগ্রাহ্য করা হয়েছিল। Bosch এই বিষয়ে অবহিত ছিলেন। তাঁদের মতে Bosch ছিলেন সর্বপ্রকার উদারনীতির পরম শত্রু।

Robert van Neil এর মতে ঘোষিত নীতি ও তার বাস্তব রূপায়ণের মধ্যে অসঙ্গতির কারণ হল কিছুটা Bosch এর ব্যক্তিত্ব এবং কিছুটা নেদারল্যাণ্ড ও জাভার তৎকালীন পরিস্থিতি। Bosch এর মস্তিষ্ক ছিল নানা ধরণের ভাবনা চিন্তায় পরিপূর্ণ। তিনি অবাধ বাণিজ্য নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। হল্যাণ্ড রাজের প্রজাপুঞ্জের মধ্যে তিনি উদারনৈতিক উদ্যোগ সঞ্চার করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। কিছু সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণার প্রতিও তাঁর আসক্তি ছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন যে উন্নত পরিবেশের মাধ্যমে দারিদ্র ও দুর্নীতি দূর করা সম্ভব। ব্যক্তিগত ধন সঞ্চয়কে তিনি সমাজের অন্যতম একটা বড় বিপর্যয় বলে মনে করতেন।

অনেক সময় তিনি সাধারণ নীতি ঘোষণা করতেন এবং তা রূপায়ণের জন্য বহুক্ষেত্রে নির্দিষ্ট আদেশ, বিধি ও নিয়মাবলী জারী করতেন। প্রতি ক্ষেত্রেই বাস্তব অবস্থার তাগিদে নির্দিষ্ট বিধি ও নিয়মাবলী জারী করা হত। তাঁর তাত্ত্বিক নীতি নির্দেশের সঙ্গে বাস্তব কার্যাবলীর সঙ্গতি না থাকলে, তিনি বিচলিত হতেন না, এ নিয়ে এতটুকু মাথা ঘামাতেন না। পরিসাংখ্যিক সাক্ষ্যের উপর তিনি অতি মাত্রায় নির্ভরশীল ছিলেন। পরস্পর বিরোধী পরিসংখ্যান সংক্রান্ত হিসাব অনেক ক্ষেত্রে তাঁকে ভুল পথে চালিত করেছে।

1835 সালে কালচার সিসটেমের অধিকর্তা B. J. Elias এই ব্যবস্থা রূপায়ণের পথে নানা বাধা বিপত্তির কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে এগুলি হল : ইউরোপীয় ও দেশীয় আমলাতন্ত্রের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অভাব, রোপণ কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিদের দক্ষতার অভাব, বিশেষ আঞ্চলিক পরিবেশে সাধারণ নীতিগুলিকে সযত্নে প্রয়োগ করায় ব্যর্থতা এবং নতুন কিছুকে স্বাগত জানাতে জাভার মানুষের অনীহা। Bosch এর সাফল্যের পথে প্রকৃত তথ্যের অভাব ছিল খুব বড় অন্তরায়।

ইউরোপীয় বাজারে বিক্রয়ের উপযোগী পণ্য জাভাতে তিনি উৎপাদন করতে চেয়েছিলেন। তিনি আরও চেয়েছিলেন যে এর মূল্য হবে বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের সংগৃহীত পণ্য মূল্য থেকে অনেক কম। এই বিষয়ে তিনি

অবাধ উদ্যোগ (Free Enterprise) কাঠামো গ্রহণীয় মনে করেছিলেন। ডচ কোমপানির আমলের প্রচলিত পণ্যের স্বেচ্ছাতান্ত্রিক বলপূর্বক সমর্পণ (Forced Delivery) নীতি গ্রহণে তিনি অনিচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু অবাধ উদ্যোগ নীতির প্রয়োগ সম্ভব হয় নি। পণ্য উৎপাদন এবং খুব কম দামে তা সমর্পণের ব্যাপারে ভূমিকর নীতি মনে হয়েছিল সব চেয়ে বেশী কার্যকর। 1834 সালে নেদারল্যান্ডে ফিরে যাবার আগে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের উন্নয়নমুখী ভূমিকা সম্পর্কে Bosch এর দৃঢ় প্রত্যয় স্পষ্ট রূপ নেয় নি।

1830-34 সালে জাভার গভরণর জেনারেল এবং কমিশনার জেনারেল রূপে Bosch এর সরকারী বিবৃতিগুলি ছিল বিশেষ মতবাদের অনুকূলে রাজনৈতিক বিবৃতি। কালচার সিসটেম কি ভাবে কার্যকর হয়েছে, তার বিশদ বাস্তব বিবরণ এসব বিবৃতির মধ্যে নেই। একারণে ভূমিকর সম্বন্ধে নানা বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে।

পশ্চিমী জগতে তৎকালীন প্রচলিত উদারনৈতিক মতবাদ কালচার সিসটেমের অনুকূলে ছিল না। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে সুশিক্ষিত ডচ আমলাতন্ত্র সরকারী আইন কানুন ও নির্দেশ সর্বদা মেনে চলা কাম্য মনে করত। এগুলি থেকে বিচ্যুতিকে তারা ভাবত স্বেচ্ছাচারিতা। তাই উনিশ শতকের শেষার্ধে কালচার সিসটেমের মূল তত্ত্বকে তাঁরা অনুদার বলেছেন। এর বাস্তব প্রয়োগ তাদের কাছে নিষ্ঠুর ও স্বেচ্ছাচারী মনে হয়েছে। স্পষ্টতই ঘোষিত নীতি অনুযায়ী এই ব্যবস্থা কার্যকর হয় নি। Boschও হয়ত তা কাম্য মনে করেন নি এবং তাঁর প্রধান দায়িত্ব বলেও ভাবেন নি।

অর্থনৈতিক অগ্রগতি

বাধ্যতামূলক কর্ষণ প্রথায় চিনি, কফি ও নীল ছিল প্রধান উৎপাদন। কফি চাষ করা হত মূলত Preanger জেলাতে। জনসাধারণের ধানী জমিতে নয়, সরকারী খাস মহলে কফির চাষ হত। উৎপাদিত কফি কর হিসাবে গণ্য হত না। B. H. M. Vlekke এর মতে, এসব কারণে কফি চাষকে বাধ্যতামূলক কর্ষণ প্রথার অঙ্গ হিসাবে পরিগণিত করা সঙ্গত নয়। Bosch অবশ্য কফির একচেটিয়া কারবার পুনঃ প্রবর্তন করেন। বাধ্যতা মূলক চাষ ব্যবস্থায় রাজস্বের অধিকাংশ ভাগ সংগৃহীত হয়েছে কফি থেকে। অন্যান্য জিনিষের উৎপাদন ছিল ব্যয়সাপেক্ষ। অবাধ শ্রমনীতিতে (Free Labour) যে পরিমাণ উৎপাদন পাওয়া যেত, তার মাত্র এক তৃতীয়াংশ পাওয়া গেছে এই ব্যবস্থার বাধ্যতামূলক (Forced Labour) শ্রমের মারফৎ। এই বাধ্যতামূলক

কারণ Controleurদের কৃষি বিষয়ে অনভিজ্ঞতা। আমলা বাহিনীকে উৎসাহিত করার জন্য সরকার Controleur ও Regentদের শতকরা হিসাবে কিছু লভ্যাংশ দেবার বন্দোবস্ত করেছিল। কিন্তু তাতে কোন সুফল হয় নি। তাদের লোভ বেড়েছে, এবং জনসাধারণের উপর তাদের নিপীড়ন মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। অন্যান্য ক্ষেত্রে চাষের এই ব্যর্থতা ঢাকা পড়েছে কফির সন্তোষজনক উৎপাদনে।

বাধ্যতামূলক কর্ষণ প্রথা নেদারল্যানডের পক্ষে খুবই লাভজনক হয়েছিল। 1831 থেকে 1877 সালের মধ্যে নেদারল্যানডের রাজকোষে ইন্দোনেশিয়া থেকে 823,000,000 Guilder অর্থ সংগৃহীত হয়েছিল। এই অর্থ দিয়ে নেদারল্যানড সরকার ঋণ শোধ করেছে, বেলজিয়ামের সঙ্গে যুদ্ধের ব্যয়ভার বহন করেছে এবং রেলপথ নির্মাণ ও অন্যান্য জনহিতকর কাজ সম্পন্ন করেছে। ঐ সময় নেদারল্যানডের বাৎসরিক বাজেটের বরাদ্দ 60 মিলিয়ণ Guilder এর বেশী ছিল না। এর মধ্যে গড়ে প্রতি বছর ইন্দোনেশিয়া থেকে 18 মিলিয়ণ Guilder সংগৃহীত হয়েছে। এই অর্থের পরিমাণ সামগ্রিক বিচারে উপেক্ষণীয় নয়।

বাধ্যতামূলক কর্ষণপ্রথার প্রভাবে ওলন্দাজ বাণিজ্য ও জাহাজ শিল্পেও অগ্রগতি সূচিত হয়। 1830 সাল পর্যন্ত এশীয় বাণিজ্যের মাল পরিবহনের ক্ষেত্রে ওলন্দাজ শক্তি ব্রিটিশদের সঙ্গে পাল্লা দিতে চেয়েছিল, কিন্তু তাতে বিশেষ সফল হয় নি। সংরক্ষণ শুল্কের (Protective Tariff) ফলে ইন্দোনেশিয়ার বাজারে নেদারল্যানডের পণ্যের জন্য কিছু সুযোগ সুবিধা মেলে, কিন্তু ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জের পণ্য ইউরোপের বাজারে পৌঁছে দিত বিদেশী জাহাজ। বাধ্যতামূলক চাষনীতি প্রবর্তিত হলে ডচ সরকারের সঙ্গে 'দি নেদারল্যানড ট্রেডিং কোমপানি'র একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তির শর্তানুযায়ী বাধ্যতামূলক কর্ষণপ্রথায় উৎপাদিত যাবতীয় পণ্য আর্মসটারডামে পৌঁছে দিত 'দি নেদারল্যানড ট্রেডিং কোমপানি'র জাহাজ। কয়েক বছরের মধ্যেই আর্মসটারডাম শহরের বাজারে ইন্দোনেশীয় পণ্যের চাহিদা ও জোগান দ্রুত বেড়ে যায়। 'দি নেদারল্যানড ট্রেডিং কোমপানি'র প্রচেষ্টায় ওলন্দাজ পরিবহন শিল্পের দ্রুত উন্নতি ঘটে। অল্পদিনের মধ্যেই ব্রিটেন ও ফ্রান্সের পরেই ওলন্দাজ বাণিজ্য জাহাজ বিশ্বের তৃতীয় শ্রেষ্ঠ আসন লাভে সক্ষম হয়।

এই প্রথার একটি অন্যতম প্রধান সুফল হল যে 1830 থেকে 1860 সালের মধ্যে কয়েকটি বিদেশী অর্থকর শস্যের চাষ ইন্দোনেশিয়ায় প্রথম শুরু করা

হয়।)এসব চাষের তাৎক্ষণিক ফল আশাপ্রদ ছিল না। কিন্তু পরে উদার নৈতিক ঔপনিবেশিক অর্থনীতির কাঠামো প্রতিষ্ঠিত হলে এই সব নতুন অর্থকর ফসল সেখানে সমৃদ্ধির সূচনা করে।

নতুন অর্থকর ফসলের মধ্যে চা ছিল একটি অন্যতম প্রধান পণ্য। সপ্তদশ শতকের শেষভাগ থেকে চা একটি লাভজনক বাণিজ্য হয়ে উঠেছিল। সরাসরি চীন থেকে ইন্দোনেশিয়ায় চা আমদানি করা হত। 1826 খ্রীষ্টাব্দে জাপান থেকে জাভাতে চা-বীজ আমদানি করা হয়েছিল। এই বীজ Buitenzorg এর বোটানিকাল গার্ডেনে রোপিত হয়েছিল। এতে বিশেষ সুফল পাওয়া যায় নি। নেদারল্যানড ট্রেডিং কোমপানির একজন চা-বিশেষজ্ঞ, J. Jacobseu চা চাষ ও প্রস্তুতি শেখার জন্য চীনে ছয় বছর অবস্থান করেন। 1832 সালে কয়েক জন দক্ষ চীনা শ্রমিককে সঙ্গে করে তিনি জাভায় ফিরে আসেন। জাভার 13টি জেলায় চা উৎপাদনের পরীক্ষা চালান হয়। কিন্তু পরীক্ষাতে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় নি। ফলে চা বাগানগুলিকে ব্যক্তিগত উদ্যোগের হাতে ন্যস্ত করা হয়েছিল।

1860 সালে ওলন্দাজ সরকার চা-শিল্পে যাবতীয় সাহায্য ও সহযোগিতা বর্জনের সিদ্ধান্ত নেয়। চা উৎপাদনের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উদ্যোগও ব্যর্থ হয়। 1874 সালে আসামের চা চারা ইন্দোনেশিয়ায় রোপণ করা হয়।এতে আশাতীত সুফল পাওয়া যায়। প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধের পূর্বে জাভা ও সুমাত্রায় প্রতি বছরে প্রায় সত্তর হাজার টন চা উৎপাদিত হয়েছে। এই পরিমাণ হচ্ছে বিশ্বে মোট যে পরিমাণ চা রপ্তানি হত, তার শতকরা 18 ভাগ।

(বাধ্যতা মূলক কর্ষণ প্রথায় তামাকের চাষও লাভজনক হয়েছিল। ইন্দোনেশিয়ার ক্ষেত্রে তামাক নতুন শস্য নয়। স্পেনীয়রা ফিলিপাইনের মাধ্যমে এশিয়াতে তামাকের প্রচলন শুরু করে। ষোড়শ শতকের শেষের দিকে ইন্দোনেশিয়াতে তামাক চাষ শুরু হয়। ডচ ইসট ইনডিয়া কোমপানি তামাক চাষে বিশেষ উৎসাহ দেখায় নি। ইন্দোনেশিয়ার মানুষ তামাকের নেশায় আসক্ত হয়ে পড়লে শুধুমাত্র নিজেদের প্রয়োজনের জন্য কিছু কিছু তামাক চাষ শুরু করে। কিন্তু ইন্দোনেশিয়ার তামাক ইউরোপীয়দের পছন্দসই ছিল না। এ কারণে সরকারের পক্ষ থেকে উন্নত মানের তামাক চারা আমদানির জন্য কিউবাতে বিশেষজ্ঞ পাঠান হয়। কিন্তু এ পরীক্ষা ব্যর্থ হয়। 1854 সালে দ্বিতীয় বিশেষজ্ঞ দল কিউবাতে যায়। তাঁদের প্রচেষ্টাও সফল হয় নি। 1864 সালে ইন্দোনেশীয় সরকার তামাক উৎপাদন থেকে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত নেয়। তখন ব্যক্তিগত উদ্যোগে তামাক চাষ শুরু হয়। উত্তর সুমাত্রায় Deli অঞ্চলে অভাবনীয় ফসল উৎপন্ন হয়। বাধ্যতামূলক কর্ষণ-

প্রথার যুগ যখন সমাপ্তপ্রায়, নেদারল্যান্ড ট্রেডিং কোমপানি তখন তামাক চাষে ব্যাপকভাবে মূলধন বিনিয়োগ শুরু করেছে। তারপর থেকেই Deli অঞ্চল একটি বনময় গ্রাম থেকে সমৃদ্ধ শহরে পরিণত হয়েছে।

ডচ সরকার ইন্দোনেশিয়াতে সিনকোনা চাষ ও কুইনাইন উৎপাদনে মনো-যোগী হয়েছিল। গত দুই শতক ধরে সিনকোনার ঔষধি মূল্য সম্পর্কে বিশ্ববাসী সচেতন ছিল। কিন্তু শুধুমাত্র দক্ষিণ আমেরিকাতেই সিনকোনার চাষ হত। এর মূল্য ছিল আকাশস্পর্শী এবং এর মানও সব সময় উন্নত ধরণের ছিল না। 1852 সালে প্যারিস থেকে Leyden এর বোটানিকাল গার্ডেন সিনকোনার চারা গাছ জাভাতে পাঠায়। কিন্তু এই চারা থেকে সম্পূর্ণ গাছ বেরোতে প্রায় 13 বছর সময় লাগে। 1854 সালে Buitenjorg এর বোটানিকাল ইনসটিটিউটের পক্ষ থেকে H. J. Hasskarl নামে একজন রাজকর্মচারীকে দক্ষিণ আমেরিকায় পাঠান হয়। তিনি ছিলেন জাতিতে জারমান এবং ডচ সরকারের অধীনে কর্মরত। 75টি সিনকোনা গাছ নিয়ে তিনি জাভায় ফিরে আসেন। তারপর জাভায় সিনকোনা চাষের দায়িত্ব F. W. Junghun এর উপর অর্পিত হয়। বিশ্বের বাজারে জাভার কুইনা-ইনকে স্থান করে নিতে আরও বিশ বছর সময় লেগেছিল। 1875 সালে উৎপাদনের পরিমাণ ছিল 22 টন, 1885 সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় 500 টন এবং 1895 সালে 1000 টন। বিংশ শতাব্দীতে বিশ্বের মোট উৎপাদনের শতকরা 90 ভাগ সিনকোনা পাওয়া গেছে জাভা থেকে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় কুইনাইনের বিকল্প আবিষ্কৃত হলে সিনকোনা চাষে ভাটা পড়ে।

1848 সালে আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল থেকে পাম তেল জাভায় আমদানি করা হয়। কিন্তু শুধুমাত্র অলঙ্করণের কাজে তা ব্যবহৃত হয়েছে। পরে পাম তেল থেকে উৎপন্ন জিনিসের শিল্প সেখানে গড়ে উঠেছে। বর্তমান শতকের ত্রিশের দশকে পাম তেল থেকে উৎপন্ন জিনিসের রপ্তানির পরিমাণ ছিল প্রায় 1 মিলিয়ন টন।

(বাধ্যতামূলক কর্ষণপ্রথায় গোলমরিচের উৎপাদন খুব বেশী বাড়ে নি। সিংহল থেকে দারুচিনির চাষ গ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু আশাপ্রদ ফল পাওয়া যায় নি। রেশম চাষের পরীক্ষাও সফল হয় নি।) অতীতকাল থেকেই ইন্দোনেশিয়াতে কার্পাসের প্রচলন ছিল। শুধুমাত্র পালেমবাঙ জেলাতেই কার্পাস চাষ হত। (জাভার লোকসংখ্যা বেড়ে গেলে শুধুমাত্র উৎপন্ন ধান থেকে খাদ্যের সংস্থান সম্ভব হচ্ছিল না। এ কারণে সরকার Cassava শুরু উৎপাদনের সিদ্ধান্ত নেয়। ধানের খেতে Cassava রোপণ করা হত। আমেরিকা থেকে স্পেনীয়রা বা পর্তুগীজরা জাভাতে Cassavaর চারা আম-

দানি করে। সরকারী উদ্যোগে ধানের পরিপূরক হিসাবে জাভার মানুষেরা বাধ্যতামূলক কর্ষণ প্রথার কালপর্বে Cassavaর চাষ শুরু করে। এই চাষ বিশেষ গুরুত্ব পায় নি

আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে বাধ্যতামূলক কর্ষণ প্রথায় বেশ কয়েকটি নতুন অর্থকর ফসলের চাষ শুরু করা হয়। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন যে জাভার বাইরে ইন্দোনেশিয়ার যে বিস্তীর্ণ অঞ্চল পড়ে আছে, সেখানে ডচ সরকারের দৃষ্টি পড়ে নি বললেই চলে। 1830 সালের এক শতাব্দী পূর্বে ডচ ঔপনিবেশিক নীতি ছিল জাভা কেন্দ্রিক, 1830 সালের পর চল্লিশ বছর পর্যন্ত জাভা কেন্দ্রিক ঔপনিবেশিক নীতি অব্যাহত থেকেছে। এর ফলাফল শুভ হয় নি। অসম অর্থনৈতিক বিকাশ ইন্দোনেশিয়ার পক্ষে অভিশাপ হয়েছে। প্রাচীন কাল থেকেই জাভার প্রতি শাসকগোষ্ঠী পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছে। জাভার বাইরে সুমাত্রার কয়েকটি জেলাতেও সরকারের দৃষ্টি পড়েছিল। কিন্তু ইন্দোনেশিয়ার ব্যাপক অঞ্চল ছিল সরকারী অনুগ্রহ বঞ্চিত। অষ্টাদশ শতকের শেষে জাভার লোকসংখ্যা ছিল সুমাত্রার লোকসংখ্যার দ্বিগুণ। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে তা বেড়ে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের প্রতিবেশী অঞ্চলের লোকসংখ্যার চেয়ে পাঁচগুণ দাঁড়িয়েছে। জাভায় শান্তি ও সুশাসন রক্ষা করা ছিল ডচ সরকারের দায়িত্ব। কিন্তু অন্যান্য অঞ্চল সম্পর্কে সরকার দায়িত্ব বোধ করেনি বলে জলদস্যুতার মত গুরুতর সমস্যার কোন সমাধান মেলে নি।

সামাজিক ফলাফল

এই বাধ্যতামূলক কর্ষণ প্রথা চালু করতে ডচ সরকারকে জাভার নেতৃস্থানীয় লোকজনের উপর নির্ভর করতে হয়েছিল। সুদীর্ঘকাল ধরে জাভাতে যে সামাজিক শ্রেণীর হাতে নেতৃত্ব ছিল, তাকে Priyayi বলা হত। Daendels ও রাফেলসের আমলে এই শ্রেণীর সুযোগ সুবিধা ও প্রতিপ্রত্তি যথেষ্ট হ্রাস পেয়েছিল। কিন্তু Bosch তাদের সব কিছু ফিরিয়ে দিলেন। তাই ডচ শাসকদের অভীপ্সিত কৃষি পণ্য চাষের কাজে তারা অংশ নিল, অন্যকে অংশ নিতে উৎসাহিত করল। এইভাবে তারা বিদেশী শাসকদেরই প্রতিনিধিত্ব করেছিল। পরিকল্পিত চাষ আবাদের কাজ দেখাশোনার জন্য কর্মচারীর সংখ্যাও বেড়ে গেল। ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামোর সংগে Priyayi শ্রেণী অঙ্গাঙ্গী যুক্ত হয়ে পড়ল। ধীরে ধীরে তারা সেখানকার সনাতন ঐতিহ্যাগ্রয়ী সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল।

ইউরোপীয়দের আগমনের অনেক আগে থেকেই চীনারা ইন্দোনেশিয়ার

উপকূলবর্তী শহরে বসবাস করত। ডচ সরকার তাদেরকে দেশের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যিক কাঠামোর মধ্যে টেনে আনল। কখন-সখন তাদের হাতে এক একটা গ্রাম লিজ্ হিসাবে ছেড়ে দেওয়া হল। এই সব গ্রাম থেকে তারা উৎপন্ন শস্যের কিয়দংশ ডচ সরকারকে নির্দিষ্ট পরিমাণে দিত। অবশিষ্টাংশ তারা নিজেরা ভোগ করত। ইন্দোনেশিয়ার খুচরা বাণিজ্যে চীনাদের আধিপত্য এই সময় থেকেই শুরু হয়। পণ্য সংগ্রহের কাজে ইন্দোনেশীয় সামন্ত শ্রেণীর চেয়ে চীনা ব্যাপারী ছিল অধিক দক্ষ। কিন্তু ইন্দোনেশীয় সমাজের তারা অঙ্গীভূত হয় নি এবং সমাজ রূপান্তরের বাহনও হয় নি।

বাধ্যতামূলক কর্ষণ প্রথায় গ্রামপ্রধানের প্রতিপত্তি বেড়ে গিয়েছিল। গ্রামের ভূসম্পত্তির উপর তার নিয়ন্ত্রণাধিকার ছিল সবচেয়ে বেশী। কিন্তু তার পদের ক্ষমতা ও মর্যাদা নির্ভর করত ডচ শাসকদের দয়া দাক্ষিণ্যের উপর। শস্য উৎপাদন ও সংগ্রহের ক্ষেত্রে গ্রামণীর দক্ষতা দেখলে বিদেশী শাসক সন্তুষ্ট হতেন এবং ব্যর্থতা দেখলে রুষ্ট হতেন।

গ্রামণীর মাধ্যমেই বিদেশী শাসক গ্রামের জমি-জমা নিয়ন্ত্রণ করতেন। গ্রামপ্রধানরা ছিল বিদেশী শাসকের সঙ্গে গ্রামের যোগসূত্র। এককালে গ্রাম-প্রধান ছিল গ্রামে সংহতির প্রতীক, গ্রামের রক্ষক। নতুন ব্যবস্থায় সে ঔপনিবেশিক শোষণ ও নিপীড়নের যন্ত্রে পরিণত হল। গ্রামের মানুষরা তাই ভেবেছিল। গ্রামপ্রধানরা এবং Priyayi শ্রেণী ঔপনিবেশিক শাসনযন্ত্রের হাতে খেলার পুতুল হয়ে দাঁড়াল। গ্রামের মানুষের মন থেকে তারা ধীরে ধীরে মুছে গেল। মুসলিম ধর্মগুরু এবং Santri শ্রেণী সমাজে অগ্রচারী ভূমিকা গ্রহণ করল। ইন্দোনেশিয়ায় জাতীয় সংহতি তাদেরকে ঘিরে গড়ে উঠল। 1869 সালের পর সুয়েজের পথ উন্মুক্ত হলে মধ্য প্রাচ্যের মুসলিম জগতের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ আরও দৃঢ় হল। তাদের কর্মধারাকে কেন্দ্র করে ধর্মীয় রক্ষণশীলতা পল্লবিত হল।

কালচার সিসটেমের প্রভাব ছিল সর্বগ্রাসী। অর্থনীতিতে ও শাসন কাঠামোতে রূপান্তরের ফলে গ্রামীন উচ্চবর্গশ্রেণীর চারিত্রিক রূপান্তর ঘটেছিল। পূর্বে তাদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি ছিল প্রথা নির্দেশিত। এখন তাদের ক্ষমতার উৎস হল বিদেশী শক্তির অনুগ্রহ। সরকারকে সমর্পণের জন্য উৎপন্ন শস্য সংগ্রহের দায়িত্ব গ্রামপ্রধানের উপর ন্যস্ত হয়েছিল। নতুন দায়িত্বের জন্য তারা অধস্তন সরকারি কর্মচারীরূপে পরিগণিত হলেন। নতুন শাসন সংগঠন পরম্পরাগত শাসন কাঠামোকে তারা অগ্রাহ্য করে নি। কিন্তু পরম্পরাগত পদের চারিত্রিক রূপান্তর ঘটেছে। 1854 সালের আইনানু-

সারে Regent এর পদ হয়েছে বংশানুক্রমিক। কালচার সিসটেমের ফলে তাদের স্বাতন্ত্র্য, মর্যাদা ও স্বাধীনতা লুপ্তপ্রায় হয়ে পড়ে।

জাভার বাইরে কোন কোন স্থানে—Ambon, Makassar, Minhasa প্রভৃতি অঞ্চলে ডচ কোমপানি একচেটিয়া অধিকার চালু রেখেছিল। ডচ নিয়ন্ত্রণে এই সব অঞ্চলে শুধুমাত্র প্রভু বদল হয়েছিল, কিন্তু সমাজে ও অর্থনীতিতে বিপ্লব সাধিত হয় নি।

ইন্দোনেশিয়ার অর্থনীতিও দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পড়ল। চাষবাস করত ইন্দোনেশিয়ার কৃষক। উৎপন্ন শস্য আদায় করত এবং তা বাজারে পৌঁছে দিত বিদেশী বণিক। বিশ্ব বাজারের সঙ্গে ইন্দোনেশিয়ার যোগাযোগ ঘটল। কিন্তু জাভার কৃষকরা তা থেকে কিছুই পেল না। ইন্দোনেশিয়ার কৃষি-ভিত্তিক সমাজ অচলায়তনের গোলক ধাঁধাঁয় আবদ্ধ হয়ে থাকল। কালচার সিসটেমের ফলে ধানী জমির পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। নতুন নতুন ক্ষেত্রে আরও বেশী শ্রমিকের প্রয়োজন হয়েছে। কিন্তু জাভার উৎপাদক তাঁর পণ্যের বাজারের সঙ্গে কোন যোগাযোগ রাখতে পাবে নি। উৎপাদন বৃদ্ধিতে বা নতুন প্রযুক্তির প্রয়োগে তাকে উৎসাহিত করা হয় নি। বিশ্ব বাজারের বৃহত্তর প্রাঙ্গনে জাভার উৎপাদক শ্রেণী স্বেচ্ছায় কোন যোগা-যোগ গড়ে তোলার সুযোগ পায় নি।

J. H. Boeke জাভাতে কৃষির অগ্রগতিকে স্থানু প্রসার (static expansion) বলেছেন। এর অর্থ হচ্ছে যে পতিত জমিতে প্রচলিত সনাতন পদ্ধতিতে চাষআবাদ প্রসারিত হয়েছে, কিন্তু নতুন প্রযুক্তি বিদ্যা বা কলাকৌশল নিয়ে কোন পরীক্ষা নিরীক্ষা হয় নি। জাভার অর্থনীতি ছিল দ্বিরূপ। দেশী লোক ছিল উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত। কিন্তু পণ্য সংগ্রহ ও বিপণন ছিল ইউরোপীয়দের হাতে। জাভার কৃষক তাঁর নিজের পণ্যের লভ্যাংশ থেকে বঞ্চিত ছিল। বৃহত্তর অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত হবার জন্য তাদের উৎসাহ ছিল না এবং সুযোগও ছিল না। এ কথা সত্য ডচ কোমপানি ও ডচ সরকার ইন্দোনেশিয়াকে বিশ্ব অর্থনীতির সঙ্গে গভীর ও ব্যাপক ভাবে যুক্ত করেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও ইন্দোনেশিয়ার সমাজ ছিল সনাতন, গ্রামীণ, শ্রমনির্ভর, কৃষি-ভিত্তিক ও পরিবর্তনবিমুখ। ধ্যানধারণা, আদর্শ ও মূল্যবোধের ক্ষেত্রে 1870 সাল পর্যন্ত ডচ শাসন ছিল নিষ্ফল ও নিষ্প্রভ। হিন্দু, বৌদ্ধ ও ইসলামী সংস্কৃতি ইন্দোনেশিয়া অনায়াসে আত্মসাৎ করেছে। কিন্তু আড়াই শত বছরের যোগাযোগ সত্ত্বেও ইউরোপীয় সভ্যতা তাদের কাছে এতটুকুও আকর্ষণীয় মনে হয় নি। 1870 সালের আগে সেখানকার অর্থনীতি ও রাজনীতিতে ডচ শাসকবৃন্দ আগ্রহ বোধ করেছে।

কিন্তু আদর্শগত ভাববিনিময়ে তারা সচেষ্ট হয় নি। 1870 সালের পর এবং খুব বেশী করে 1900 সালের পর ডচ শাসননীতিতে বৈচিত্র্য এসেছে, গতি এসেছে এবং দুই দেশের মধ্যে ভাব বিনিময়ের পথ প্রশস্ত হয়েছে।

লিবরল পলিসি

কালচার সিসটেম ডচদের পক্ষে খুবই লাভজনক ছিল। তা সত্ত্বেও হল্যানডের অনেকেই এই ব্যবস্থার সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেছিল। এই যুগে বাণিজ্যিক উদ্যোগের আদর্শ ছিল জনপ্রিয়। 1848 সালের পর ডচ পারলামেনটের সভ্যরা ঔপনিবেশিক সমস্যা বিষযে তাদের মতামত প্রকাশের অধিকার পেয়েছিলেন। ফলে উদারনীতির প্রবক্তাবা জাভায় অবাধ মুক্ত উদ্যোগ প্রবর্তনের জন্য সোচ্চার হয়ে ওঠেন।

1850 ও 1860 এর দশকে ডচ পারলামেনটেব সভ্যরা দুটি দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একদল ছিল অবাধ শ্রমনীতিব (free labour) এবং অপর দলটি বাধ্যতামূলক শ্রমনীতিব (forced labour) পক্ষপাতী। বাধ্যতামূলক শ্রমনীতির রক্ষণশীল প্রবক্তারা ছিলেন ইন্দোনেশিযায় অনিয়ন্ত্রিত পশ্চিমী শোষণ নীতির সমালোচক। অবাধ শ্রমনীতিতে বিশ্বাসী উদারনৈতিক সভ্যবা সেখানে ইউরোপীয় মূলধনের অবাধ অনুপ্রবেশের পক্ষপাতী ছিলেন। এই বিতর্কে কিন্তু যবদ্বীপীয় কৃষকের দুঃখদুর্দশার কথা এতটুকুও স্থান পায় নি। কয়েকটি মানবতাবাদী ধর্মীয় গোষ্ঠী অবাধ শ্রমনীতির প্রবক্তাদের সমর্থন করেছিল। ইতিমধ্যে 1860 সালে প্রকাশিত হয় Max Havelaar শিরোনামে একটি উপন্যাস। এই উপন্যাসেব লেখক ছিলেন E. Douwes Dekkar নামে একজন প্রাক্তন ডচ রাজকর্মচাবী। Multatuli ছদ্মনামে তিনি এই উপন্যাস লেখেন। ইন্দোনেশিয়ায় ডচ শাসন ও শোষণের নির্মম সমালোচনা ছিল এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু। উপন্যাসটি প্রকাশিত হবার পর, যা ছিল শুধুমাত্র সংসদীয় বিতর্কের বিষয়, আপামর জনসাধারণের হৃদয় তা উদ্বেল করে তোলে।

এই নীতিগত মতবিরোধের জন্য ডচ সরকার প্রবর্তিত কালচার সিসটেম গুরুত্বহীন ও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। শুরু হয় ডচ ঔপনিবেশিক শাসনের লিবরল পলিসির যুগ (1870-1900)। একথা সত্য নয় যে লিবরল পলিসি চালু হল বলে কালচার সিসটেম পর্বের অবসান হল। কালচার সিসটেম আরও কয়েক দশক টিকে ছিল। কিন্তু এর কোন গুরুত্ব ছিল না।

1870 সালের কৃষি ও চিনি সম্পর্কিত আইন উদারনৈতিক পর্বের সূচনা

করে। এই আইনে বলা হল চিনি উৎপাদন ক্ষেত্রে সরকারী নিয়ন্ত্রণ ক্রমে ক্রমে কমিয়ে আনা হবে। পরিবর্তে ব্যক্তিগত উদ্যোগ উৎসাহ দেওয়া হবে। এই আইন অনুসারে প্রচলিত প্রথাসিদ্ধ ভূমি সংক্রান্ত অধিকারগুলিকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। বিদেশীদের কাছে ইন্দোনেশিয়ার চাষযোগ্য জমি বিক্রয় নিষিদ্ধ ছিল। ইউরোপীয় বিনিয়োগকারীদের কাজকর্ম শুধুমাত্র লিজ হোলড জমিতে সীমাবদ্ধ রাখা হল। ইন্দোনেশীয়গণের জীবন ধারণের উপযোগী জমি যাতে লিজ দেওয়া না হয়, সে বিষয়ে ডচ সরকারের সতর্ক দৃষ্টি ছিল। তা ছাড়া শ্রমিক স্বার্থ সংক্রান্ত আইনে ইন্দোনেশীয় শ্রমিকদের ন্যূনতম বেতন ও কাজের শর্ত স্থির কবা হয়। ইউরোপীয় অবাধ বাণিজ্যিক উদ্যোগের গ্রাস থেকে ইন্দোনেশিয়ার কৃষককুলকে বাঁচাবার উদ্দেশ্যে এই সব আইন চালু করা হয়েছিল। 1917 সাল পর্যন্ত কফি চাষ সরকারী নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়। কিন্তু এক্ষেত্রেও ব্যক্তিগত উদ্যোগ প্রশ্রয় পায়।

1870 থেকে 1900 সাল পর্যন্ত ডচ ঔপনিবেশিক নীতিব উদারনৈতিক পর্ব চালু ছিল। নতুন নতুন শস্যের চাষ এবং ক্রমবর্ধমান উৎপাদনের ফলে এই পর্বের অর্থনৈতিক সাফল্য কালচার সিসটেম পর্বের সমৃদ্ধির মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। 1885 সাল পর্যন্ত ছোট ছোট ব্যক্তিগত উদ্যোগে এবং 1885 সালের পর থেকে বড় বড় ধনিক গোষ্ঠীর উদ্যোগে এই অগ্রগতি ঘটেছিল। বৃহৎ খেতখামার ও রোপণ অর্থনীতি এই সময় থেকেই ইন্দোনেশিয়াতে বিপুল প্রসারতা লাভ করে।

অনেকে বলেন এই অগ্রগতির আসল কারণ হল উদারনৈতিক অবাধ ব্যক্তিগত উদ্যোগ নীতির সার্থক রূপায়ণ। এই ধারণা পুরোপুরি সত্য নয়। কারণ, একদিকে যেমন ব্যক্তিগত উদ্যোগে চিনি, চা ও তামাকের উৎপাদন বেড়েছে, ঠিক তেমনি সরকারী উদ্যোগে কফির উৎপাদনও বেড়েছে। সেখানে অভাবনীয় সমৃদ্ধির আসল কারণ হল, সুয়েজের পথ উন্মুক্ত হলে ইউরোপ ও এশিয়ার মধ্যে বাণিজ্যিক লেনদেন বেড়ে যায়। নেদারল্যানডের সর্বক্ষেত্রে নতুন উদ্দীপনা সঞ্চারিত হয়। এর আগে ধনী পরিবারের বাড়তি সন্তান এবং সাধারণভাবে সমাজ থেকে বিচ্যুত, বহিষ্কৃত ও বিচ্ছিন্ন মানুষ ইন্দোনেশিয়াতে ভাগ্যান্বেষণে পাড়ি দিত। এখন থেকে হল্যানডের শিক্ষিত উদ্যোগী ও উৎসাহী মানুষ ঐ অঞ্চল নতুন ও বিপুল সুযোগের ক্ষেত্ররূপে বেছে নিল।

অর্থনীতির প্রসার্যমান ইউরোপীয় শাখার ক্রমবর্ধমান দাবির জন্য

ইন্দোনেশিয়ায় ইউরোপীয়দের বিপুল সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটে। অনুরূপভাবে শাসন বিভাগের ইউরোপীয় শাখাও প্রসারিত হয়। দেশীয় উচ্চবর্গের স্বেচ্ছাচারিতার হাত থেকে ইন্দোনেশিয়ার কৃষককুলকে বাঁচাবার জন্য আইনের বিধান রচিত হয়। রিজেনটরা ছিলেন ইন্দোনেশিয়ার সর্বোচ্চ রাজকর্মচারী। তাঁদের বংশানুক্রমিক স্বাধিকার প্রমত্ততা হ্রাস পায়। বাধ্যতামূলক কর্ষণ প্রথা Priyayi শ্রেণীর উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে ছিল। নতুন ব্যবস্থায় এই শ্রেণীর দাপট কমে আসে। ইউরোপীয় আমলা বাহিনীর সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটলে ইন্দোনেশীয় ও ইউরোপীয়দের বিভেদ ও বিরোধ তীব্র হয়ে ওঠে।

লিবরল পলিসির লিবরল কথাটি *'classical laissez faire'* অর্থে বুঝতে হবে। Clifford Geertz এই নীতিকে মৌলিক নতুন নীতি রূপে অভিহিত করতে চান নি। ৫ তাঁর মতে ডচ ঔপনিবেশিক পরিকল্পনা রূপায়ণের পথে এটি ছিল একটি নতুন পদ্ধতি, নতুন নীতি নয়। লিবরল পলিসিরও মূল লক্ষ্য ছিল পশ্চিম ইউরোপের বাজারে ইন্দোনেশীয় কৃষিপণ্য রপ্তানি করা। Clifford Geertz মনে করেন রপ্তানি পণ্যের সুনিয়ন্ত্রিত উৎপাদন ও বিপণনের উদ্দেশ্যে কালচার সিসটেমের মতই এই পদ্ধতির মাধ্যমে ইন্দোনেশিয়ার দ্বৈত অর্থনীতির ইউরোপীয় অঙ্গকে আরও নিপুনভাবে সংগঠিত করা হয়েছিল।

Legge ভিন্নমত পোষণ করেন। তাঁর মতে ডচ মূলধনের প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের ফলে সম্পূর্ণ নতুন ধরণের রোপণ অর্থনীতির আবির্ভাব ঘটেছিল। 6 এই রোপণ অর্থনীতির মূল লক্ষ্য ছিল বাগিচা পণ্য (Garden Products) নয়, শিল্প পণ্যের (Industrial Products) উৎপাদন। কালচার সিসটেম পর্বে বা তারও আগে কৃষক পণ্য উৎপাদন করত নিজের জমিতে এবং সনাতন অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে। কিন্তু রোপণ অর্থনীতির কাঠামো ছিল যৌথ উদ্যোগে সৃষ্ট। ইন্দোনেশিয়ায় নয়, হল্যানডে বসবাসকারী বেতনভোগী ম্যানেজার রোপণ অর্থনীতি তত্ত্বাবধান করত। বৃহদাকার কারবারে বিপুল অর্থ বিনিয়োগ করা হয়েছিল, একথা ঠিক নয়। তবু বিপুল লাভ হত। কারণ জমি ছিল সস্তা এবং শ্রমিক ছিল সুলভ। এই ব্যবস্থায় খেত-খামার গড়ে উঠেছিল প্রধানত জাভা এবং উত্তর সুমাত্রায়।

Clifford Geertz এর মত অনুসরণ করে বলা যায় যে লিবরল পলিসি ফলাফলের বিচারে একটি বিশেষ অর্থে কালচার সিসটেম থেকে পৃথক ছিল না। উভয় ক্ষেত্রেই বিদেশ বাণিজ্যের সঙ্গে ইন্দোনেশীয়দের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ গড়ে ওঠে নি। হল্যানডের উদারনীতির প্রবক্তারা এটা ভাবতেই পারেন নি। ইন্দোনেশিয়ার ক্ষেত্রে তাঁরা দুটি তত্ত্ব প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন।

প্রথমত, তাঁদের ধারণা ছিল যে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ঘটলেই জনকল্যানমূলক প্রকল্প, রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ না থাকলেও, অবধারিতভাবেই সফল হবে। এই উদ্দেশ্যেই তাঁরা 1870 সালের কৃষি আইন চালু করেন। দ্বিতীয়ত, তাঁরা ভেবেছিলেন যে ডচ ব্যক্তিগত উদ্যোগের দৃষ্টান্ত ইন্দোনেশিয়ায় ব্যক্তিগত উদ্যোগকে বৃহত্তর অর্থনীতিতে অংশ নিতে উৎসাহিত করবে।

কিন্তু বাস্তব অবস্থায় তাত্ত্বিক প্রত্যাশা অপূর্ণ থেকেছে। ইউরোপীয় ধনসম্পত্তির প্রসার ঘটেছে। নতুন অর্থনীতি ও সম্পদ বিকশিত হয়েছে। কিন্তু তুলনামূলক বিচারে ইন্দোনেশিয়ার সাধারণ মানুষের মঙ্গল হয় নি। বৃহত্তর অর্থনীতিতে তাদের অংশ গ্রহণ বাড়ে নি। ইন্দোনেশিয়া থেকে পণ্য রপ্তানি বিপুলভাবে বেড়েছে। কিন্তু সেখানে মাথা পিছু আয় কমেছে। সমাজে ও সংস্কৃতির প্রাঙ্গনে নানা ধরণের বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। কৃষক-কুলেরও দুর্দশা ঘোচে নি। নীতিগতভাবে গ্রামগুলি স্বয়ং শাসিত ছিল। কিন্তু বাস্তবে ডচ শাসনকর্তারা প্রায়ই নানা কাজে হস্তক্ষেপ করত। অনেক ক্ষেত্রে গ্রামণীর সঙ্গে জমি বন্দোবস্ত করা হত না। বহু ক্ষেত্রে গ্রাম-প্রধানদের অবৈধ সিদ্ধান্ত কৃষকদের মানতে বাধ্য করা হত। 1890 এর দশকে এসব কারণে হলানডে প্রতিবাদ দানা বেঁধে উঠেছে। নীতি পরি বর্তনের দাবি উঠেছে।

এথিকাল পলিসি

ইন্দোনেশিয়ায় সমাজ রূপান্তরের কাজে রাষ্ট্রের কোন ভূমিকা থাকা কি বাঞ্ছনীয় ? এ বিষয়ে ডচ সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল দ্বিধাগ্রস্ত ও স্ববিরোধী। ইন্দোনেশিয়ায় সমাজ রূপান্তর তাদের কাম্য ছিল, আবার তারা তা প্রতিহত করতেও চেয়েছে। প্রচলিত সামাজিক ব্যবস্থা পালটাতে তারা প্রয়াসী হয়েছে, আবার তা রক্ষা করতেও তারা সচেষ্ট থেকেছে।

ডচ মানবতাবাদীরা দুশ্চিন্তায় কাতর হয়েছিল এই ভেবে যে ইন্দোনেশিয়ায় ডচ মূলধনের অনুপ্রবেশের ফল শুভ হয় নি। ডচ মূলধনের প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ, ইন্দোনেশীয় কৃষকদের কর্মসংস্থান, লেনদেনের মাধ্যম হিসাবে মুদ্রার প্রচলন, জমি অধিগ্রহণ, এই সব নানা কারণে সমাজে ভাঙ্গন দেখা দিয়েছিল। তারা ভেবেছিলেন এই ভাঙ্গনের গ্রাস থেকে সমাজ রক্ষা করা আশু কর্তব্য।

ডচ শাসক গোষ্ঠীর অন্য এক দল মনে করেছিল ইন্দোনেশিয়ার গ্রাম স্তরে সুপরিকল্পিত অর্থনৈতিক সুনির্দিষ্ট ইতিবাচক সক্রিয় নীতি ডচ সরকারের গ্রহণ করা উচিত। তাহলেই সমাজ রূপান্তর এলোমেলো ভাবে ঘটবে না।

তার গতি প্রকৃতি সরকার নিয়ন্ত্রিত হবে। এই দু'টি লক্ষ্য ছিল, পরস্পর বিরোধী এবং এই দু'টি লক্ষ্যেই ডচ সরকারের মহত্ত্ব ও ভ্রান্তি প্রকাশ পেয়েছে। 7

লেফটেনানট গভরণর জেনারেল Hubertius J. van Mook দেখিয়েছেন যে ডচ শাসনে গ্রাম ও ক্ষুদ্র স্বাধীন কৃষকের স্বার্থ ক্ষুন্ন হয় নি। প্রথাসিদ্ধ আইন, রীতিনীতি, দেশি আমলাতন্ত্র, গ্রামপতি নির্বাচন, এ সব কিছুই অব্যাহত থেকেছে। 8 Furnivall সাধারণভাবে ডচ ঔপনিবেশিক নীতির সমালোচক। কিন্তু তিনিও স্বীকার করেছেন যে ইন্দোনেশিয়ায় প্রথাসিদ্ধ রীতিনীতির পরিবর্তন ঘটান হয় নি। 9 অ-ইন্দোনেশীয়দের হাতে গ্রামের জমি হস্তান্তর ব্যাপারে বাধা নিষেধ কার্যকর ছিল। গ্রামের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে ডচ সরকার হস্তক্ষেপ করতে চান নি। এ সব কারণে ইন্দোনেশীয় গ্রাম জীবন ডচ শাসনে সুরক্ষিতই ছিল। ডচ শাসনের ফলে আধুনিক পশ্চিমী অভিঘাতের স্পন্দন ছিল মন্থর ও মৃদু।

এ সত্ত্বেও গ্রামে যে সব গুরুতর পরিবর্তন ঘটেছে, সে সম্বন্ধে Furnivall অবহিত ছিলেন। কালচার সিসটেম পর্বে সরকারী চাহিদার ফলে গ্রামের অভ্যন্তরীন শক্তিগুলির ভারসাম্য বিঘ্নিত হয়েছে। গ্রামণীর ক্ষমতার প্রকৃতি রূপান্তরিত হয়েছে। লিবারেল সিসটেম পর্বে এই সব পরিবর্তনের গতি আরও ত্বরান্বিত হয়েছে। অনেক গ্রাম (বিশেষ করে যে সব গ্রামে চিনি উৎপাদন হত) বিপণন অর্থনীতির বৃত্তভুক্ত হয়েছে। কৃষি ও কুলী আইন দ্বারা ডচ মূলধন বিনিয়োগ নিঃসন্দেহে নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে। কিন্তু এ ব্যবস্থা ছিল নিছক ন্যূনতম পদক্ষেপ। এর ফলে হয়ত ব্যক্তি বিশেষ রক্ষা পেয়েছে, কিন্তু সমাজ রক্ষা পায় নি। সরকারী স্তরে ও প্রশাসনের ক্ষেত্রে পরম্পরাগত শাসন কাঠামো জিইয়ে রাখার চেষ্টা হয়েছে। জাভায় প্রত্যক্ষ ডচ শাসনাধীন অঞ্চলে প্রশাসনের নিচু স্তরে ইন্দোনেশীয় উচ্চবর্গশ্রেণীকে ব্যবহার করা হয়েছে। Legge বলেছেন এই শ্রেণীর মান মর্যাদা ছিল, বিত্তও ছিল, কিন্তু ক্ষমতা ছিল না। তাই সমাজেব ভাঙ্গন রোধ করতে এই শ্রেণী ছিল অপারগ।

1849 সালে বলি দ্বীপ ডচদের অধিকারে আসে। 1873 সালে উত্তর সুমাত্রার সঙ্গে তাদের যুদ্ধ বাধে। তিন দশক ধরে যুদ্ধ চলে। এই যুদ্ধ আচের যুদ্ধ নামে খ্যাত। ছোট ছোট ইন্দোনেশীয় রাজ্যগুলির স্বাধীনতা লুপ্ত হয়ে যায়। বৃহত্তর রাজনৈতিক ঐক্য ও সংহতি গড়ে ওঠে। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বিস্তার লাভ করে। জাভার মত সুমাত্রাও বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসাবে বেশ উন্নত হয়ে দাঁড়াল। সুমাত্রার পূর্বতীরে তামাকের চাষ শুরু হল,

পশ্চিমতীরে রবার ও পাম তেলের। ঊনিশ শতকের শেষের দিকে দক্ষিণ সুমাত্রায় তেল পাওয়া গেল এবং বোর্ণিওতে পেট্রোলিয়াম। নিছক জাভা কেন্দ্রিক অর্থনৈতিক বিকাশের পর্ব শেষ হয়ে গেল। গোটা ইন্দোনেশিয়া আধুনিক জগতের অর্থনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হল। ইন্দোনেশিয়ার রপ্তানি বাণিজ্য বেড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সরকারের ব্যয়ও বেশ বেড়ে গেল। ডচ রাজনৈতিক প্রভুত্ব আরও জোরদার হয়ে জাভা থেকে সুমাত্রা এবং সুমাত্রা থেকে বাইরের দ্বীপপুঞ্জ-গুলিতে প্রসারিত হয়। ইন্দোনেশিয়ার আধুনিকী-করণের ভিত্তি হল রাজনৈতিক সংহতি, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং সনাতন সমাজশ্রেণীবিন্যাসে বিপুল রদবদল।

এই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে, বর্তমান শতকের গোড়ার দিকে ডচ ঔপনি-বেশিক নীতিতে পুনরায় পরিবর্তন দেখা দিল। নতুন নীতি ইংরেজীতে এথিকাল পলিসি (Ethical Policy) নামে পরিচিত। এই নীতির মূলকথা জনকল্যাণ। ডচ সরকার ইন্দোনেশিয়ার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের দায়িত্ব গ্রহণ করল। স্বাস্থ্য, কৃষি, শিক্ষা ও অন্যান্য জনকল্যাণ-মূলক কাজের জন্য সরকারী দপ্তর সৃষ্টি করা হল। গ্রামীন ব্যাঙ্ক চালু হবার ফলে গ্রামের জীবনযাত্রার মান বেশ উন্নত হল। সরকারী শাসন-যন্ত্রের সঙ্গে গ্রামের জীবনপ্রবাহ যুক্ত হল। লোকসংখ্যাও বেড়ে গেল। পশ্চিমী শিক্ষাপ্রসারে দৃষ্টি দেওয়া হল। পশ্চিমী শিক্ষায় শিক্ষিত ডচ রাজকর্মচারী ও ইন্দোনেশীয় রাজকর্মচারীর হাতে গ্রামের নেতৃত্ব এসে গেল। নেতৃত্ব ও ক্ষমতার প্রাচীন ও সনাতন উৎসগুলি ম্রিয়মান হয়ে পড়ল। Priyayi শ্রেণীর প্রভাব প্রায় বিলীন হয়ে গেল। লক্ষণীয় যে এই সব নীতির ফলে কিছু হালকা সংস্কার চালু হল, কিন্তু যুগোপযোগী প্রযুক্তি বিদ্যার প্রচলন হল না।

1899 সালে হলানডের স্টেটস-জেনারেলের লিবরল ডেমোক্রাট সদস্য C. The. Van Deventer বলেছিলেন যে কালচার সিসটেম পর্বে ইন্দো-নেশিয়ার থেকে অর্থ সংগ্রহ করে হলানড ধনী হয়েছে। এই ঋণ শোধ করা হলানডের অবশ্য কর্তব্য। হলানড রাজকোষের অর্থ ইন্দোনেশিয়ার জন-কল্যান প্রকল্পে ব্যয়িত হওয়া উচিত। এই নীতিকে তিনি 'সাম্মাণিক ঋণ' (honour debt) নামে অভিহিত করেছেন। এই নীতি বিশ্লেষণ করে তিনি বলেছেন যে ইন্দোনেশিয়ায় গ্রাম স্তরে কৃষি বিস্তার পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থনীতিকে সুদৃঢ় করা উচিত। গ্রামের উপরের স্তরে প্রশাসন ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে নিপুন কর্মী সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পশ্চিমী শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে।

পূর্ব ভারতীয় সমাজ

এথিকাল পলিসির প্রবক্তাদের স্বপ্ন ছিল, এই নীতির সফল রূপায়ণের ফলে একটি নতুন সমাজ গড়ে উঠবে। এই সমাজের তারা নামকরণ করেছিলেন পূর্ব ভারতীয় সমাজ (East Indian Society)। শুধুমাত্র পশ্চিমী নয়, শুধুমাত্র প্রাচ্য নয়, কিন্তু উভয়ের সংমিশ্রণে গঠিত হবে এই নতুন সমাজ। আধুনিক বিশ্বের সঙ্গে তান লয় ছন্দ মিলিয়ে চলবে পূর্ব ভারতীয় সমাজ। পরম্পরাগত ইন্দোনেশিয়া ও আধুনিক পশ্চিম থেকে এই সমাজ সাংস্কৃতিক প্রাণশক্তি আহরণ করবে।

Legge বলেছেন ইন্দোনেশিয়ার বহু ডচ নিজেদের প্রবাসী ভাবত না। ইন্দোনেশিয়াকে তাবা স্বদেশ মনে করত। পূর্ব ভারতীয় সমাজ গঠনে তাবা নিজেদেবকে ইন্দোনেশীয়দেব সঙ্গে সমানভাবে অংশীদার মনে করত। তাবা বিশ্বাস করত ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে তারা চিরস্থায়ী বন্ধনে আবদ্ধ। শিক্ষালাভের জন্য সন্তানদের হল্যানডে পাঠান তারা অবশ্য কর্তব্য মনে করে নি। চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণেব পর তাদের অনেকেই স্বদেশে ফিরে যেতে চান নি। ইন্দোনেশিয়াতে তারা ঘরসংসার পেতেছেন এবং মাঝে মাঝে স্বদেশে বেড়াতে গেছেন। ইন্দোনেশিয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা বা হল্যানডের সঙ্গে পূর্ণ বিচ্ছেদ তাদের কাম্য ছিল না। পূর্ব ভারতীয় সমাজ গঠনের আদর্শ তাদেব কাছে আকর্ষণীয় মনে হয়েছিল।

কিন্তু এই আদর্শ ছিল খুবই অস্পষ্ট। সুনির্দিষ্ট করে বলা হয় নি, পশ্চিমী সভ্যতার সঙ্গে ইন্দোনেশীয় পারম্পরার সাঙ্গীকরণ কি কাম্য? অথবা একটি রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে নানা ধরণের পরম্পরার সহাবস্থান কি বাঞ্ছনীয়? 10 উভয় মতের অনুকূলেই বেশ কিছু সমর্থক ছিলেন।

অনেকেই ইসলাম ধর্ম ও Adat আইনকে প্রগতিব প্রতিবন্ধক মনে করেছেন। তারা ভেবেছেন আধুনিক জগতে স্থান করে নিতে হলে ইন্দোনেশিয়াকে পশ্চিমী অর্থনৈতিক কাঠামো এবং পশ্চিমী জঙ্গম জীবনাচরণ গ্রহণ করতেই হবে। উচ্চবংশজাত মানুষ পশ্চিমী শিক্ষা লাভ করবে। তাদেব মাধ্যমে আপামর জনসাধারণের মধ্যে পশ্চিমী সভ্যতার আশীর্বাদ প্রসারিত হবে। 11 এই মতবাদে নিছক আধুনিকীকরণ নয়, সর্বাঙ্গীন পশ্চিমীকরণ নীতিকে অগ্রগণ্য স্থান দেওয়া হয়েছে।

অনেকে আবার পশ্চিমী সভ্যতাকে শ্রেষ্ঠ মনে করতে পারেন নি। সাংস্কৃতিক রূপান্তরের ক্ষেত্রে নানা জটিলতা ও বিচ্যুতি সম্বন্ধে তারা অবহিত ছিলেন। ইন্দোনেশীয় সাংস্কৃতিক পরম্পরাকে স্বমহিমায় তারা প্রতিষ্ঠিত

দেখতে ও রাখতে চেয়েছেন। পরিবর্তন তাদের কাম্য ছিল, কিন্তু স্বল্প-মেয়াদী দৃষ্টিতে গ্রামীণ সমাজ এবং দীর্ঘ-মেয়াদী দৃষ্টিতে ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য তারা বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছেন।

ডচ শাসনের প্রথম দিকে ইউরোপীয় সভ্যতা ইন্দোনেশিয়াকে নতুন কোন সাংস্কৃতিক বিকল্পের সন্ধান দিতে পারে নি। কিন্তু উনিশ শতকের শেষ দিকে ডচ শাসন সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদের ইঙ্গিত নির্দেশ করেছিল। Legge বলেছেন যে শিল্পোন্নত ইউরোপের সহজ, আত্ম-নির্ভর, দর্পিত উচ্চাশা এথিকাল পলিসির বিরাট পরিকল্পনার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। এই নীতি ভিন্ন ধরণের সমাজের সুদৃঢ় ও সুসমঞ্জস চরিত্র অনুধাবন করতে পারে নি। এই নীতির রূপকাররা খুব সহজেই ধরে নিয়েছিল যে সমাজ রূপান্তর যেন নির্দিষ্ট পথে খুশিমত পরিচালনা করা সম্ভব। একথা সত্য এথিকাল পলিসির ফলে অনেক নতুন প্রবণতা সমাজে দেখা দিয়েছিল। কিন্তু সেগুলি অপ্রত্যাশিত পথে মোড় নিয়েছে এবং অপ্রত্যাশিত রূপে প্রকাশ পেয়েছে। ডচ শাসকরা যদি ভেবে থাকেন যে নির্দিষ্ট দিকে সচেতনভাবে সমাজ রূপান্তর আনা সম্ভব এবং নির্দিষ্ট দিকে তা ব্যাহত করাও সম্ভব, তাহলে তারা ছিলেন বিভ্রান্ত। কারণ ঘটনা ছিল নিজেই নিজের নিয়ামক।

সদাশয় স্বৈরশাসন

এথিকাল পলিসি বা প্রজা হিতৈষী নীতির রূপায়ণে সরকারী প্রশাসন ব্যাপক ভূমিকা নিয়েছিল। নতুন নতুন পরিকল্পনার জন্য উপযুক্ত পরিমাণ অর্থের যোগান এবং প্রশাসনিক তত্ত্বাবধান ছিল অপরিহার্য। কৃষি প্রসার পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে গ্রাম নতুন অভিজ্ঞানের সন্ধান পেয়েছে। নতুন নতুন পথ নির্মাণ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করেছে। জল-সেচ প্রকল্প প্রসারিত হয়েছে। অনেক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে।

এ সব কিছুর জন্য সরকারী কর্মচারীর সংখ্যা দ্রুত বেড়েছে। প্রশাসন কাঠামোর নিচু স্তরে ইন্দোনেশীয় রাজকর্মচারীর সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটেছিল। রিজেনট, জেলা অফিসার এবং মহকুমা অফিসার বিপুল ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি ভোগ করেছে। বিদেশী শাসনের সঙ্গে তারা ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ হয়েছে। প্রশাসনের উচু স্তরেও ইউরোপীয় আমলাতন্ত্রের তত্ত্বাবধান হয়েছে সম্প্রসারিত। গ্রামজীবনে সর্বাত্মক সরকারী অনুপ্রবেশ এবং বিদেশী শাসনের প্রবল অস্তিত্ব ও প্রখর প্রভাব গ্রামবাসী প্রতি মুহূর্তে অনুভব করেছে। এই প্রথম নতুন করভার ও অন্যান্য চাপ তাদের বহন করতে হয়েছে। সে সময় সরকারী অনু-

শাসনে তাদের এমন অনেক দায়দায়িত্ব বহন করতে হয়েছিল, যা ইতিপূর্বে একান্ত অভাবনীয় ছিল।

(এথিকাল পলিসি কি সত্যই ব্যর্থ হয়েছিল? তৎকালীন আর্থিক পরিস্থিতিতে যে ব্যাধি দেখা দিয়েছিল, এই ব্যবস্থায় তা নির্মূল করার কোন আয়োজন ছিল না। কিন্তু দুর্গতিমোচনের জন্য কিছু প্রলেপ ছিল। মৌলিক প্রযুক্তিগত রূপান্তর ঘটে নি এবং তা ঘটাবার কোন চেষ্টাই হয় নি। ডচ সরকারের প্রজাহিতৈষী নীতিতে সুদূর প্রসারী অর্থনৈতিক রূপান্তরের কোন পরিকল্পনা বিন্দুমাত্র স্থান পায় নি।

বৃহৎ ডচ বাণিজ্য সংগঠন ও করপোরেশন ছিল ইন্দোনেশিয়ায় উন্নয়নের বাহন। কৃষি প্রসারের উদ্দেশ্যে জলসেচ ব্যবস্থার অগ্রগতি ঘটেছে। নতুন জমিতে চাষ প্রসারিত হয়েছে। নতুন শস্যের প্রচলনও ছিল আশাপ্রদ। কৃষকের ঋণভার হ্রাস করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। নতুন পথঘাট নির্মাণের জন্য বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির সুযোগ এসেছে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে জীবনযাত্রার মান অবনমিত হয় নি, এটাই হল এথিকাল পলিসির সব চেয়ে বড় অবদান। জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও দারিদ্রের অভিশাপ দূর করার জন্য শিক্ষা, জলসেচ ও জনসংখ্যা স্থানান্তরের কথা ভাবা হয়েছিল।

শিক্ষানীতির লক্ষ্য ছিল বৈপ্লবিক। ডচ শাসকবৃন্দের দৃষ্টিতে শিক্ষানীতি ছিল পশ্চিমীকরণের বাহন। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সফলতা ছিল খুব সীমিত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে ইন্দোনেশিয়ায় শিক্ষিতের হার ছিল মাত্র 6 শতাংশ। উপযুক্ত সংখ্যায় শিক্ষিত প্রশাসক, বাস্তুশিল্পী ও যন্ত্রবিৎ সেখানে তৈরি হয় নি। এটাই ছিল এথিকাল পলিসির সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা।

এথিকাল পলিসির ত্রিশ বছরে সমাজ রূপান্তরের সুস্থিত ভিত্তির সামান্যতম প্রস্তুতি গড়ে ওঠে নি। 1930 এর দশকে বিশ্বব্যাপী মন্দার সময়ে ইন্দোনেশিয়ার রপ্তানি বাণিজ্য হ্রাস পায়। রোপণ অর্থনীতির প্রাঙ্গন থেকে বহু শ্রমিক কর্মচ্যুত হয়। তারা গ্রামে ফিরে আসে। ফলে গ্রামগুলিও অতিরিক্ত চাপের সম্মুখীন হয়। এ সব ব্যর্থতা সত্ত্বেও একথা মানতেই হবে যে এথিকাল পলিসির আমলেই কিছু নাটকীয় পরিবর্তন ঘটেছিল এবং সমাজে চলৎ শক্তি আত্মপ্রকাশ করেছিল।

এমনি একটি নাটকীয় পরিবর্তন হল সরকারী শাসনযন্ত্রের সর্বব্যাপী উপস্থিতি। একথা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। সরকারী শিক্ষানীতিরও সুদূর প্রসারী ফল ছিল। একথা সত্য অন্যান্য দেশের সঙ্গে

তুলনা মূলক বিচারে খুব অল্পসংখ্যক লোকই শিক্ষার সুযোগ পেয়েছে। কিন্তু নিছক সংখ্যাটা এখানে গুরুত্বপূর্ণ নয়। ডচ সরকার শিক্ষিত উচ্চবর্গ শ্রেণীর কর্ম সংস্থানের জন্য কোন পরিকল্পনা করে নি। ফলে এই শ্রেণী উচ্চ কন্ঠে অসন্তোষ প্রকাশ করেছে। তারাই ইন্দোনেশীয় জাতীয়তাবাদের আদর্শ ও প্রেরণা জুগিয়েছে।

উচু সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণী এবং সাধারণ নিচু শ্রেণী, উভয় শ্রেণীর মানুষই শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করেছে। পশ্চিমী শিক্ষার প্রভাবে তারা সনাতন সমাজ ও প্রচলিত পরম্পরা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। তারা ছিল নতুন নগর সংস্কৃতির প্রতিনিধি। তাদের জাতিগত (ethnic) আনুগত্য শিথিল হয়ে পড়েছিল। নতুন ধরণের নগর-কেন্দ্রিক জীবনাচরণে তারা অভ্যস্থ হয়েছিল। তাদের মধ্যে অনেকেই প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে এবং বাণিজ্যে কর্মের সুযোগ পেয়েছিল। এই সুযোগ শুধুমাত্র মধ্য ও নিচু স্তরে সম্ভব ছিল। কিন্তু উচু স্তরের পদগুলি ছিল শুধুমাত্র ডচ আমলাতন্ত্রের করায়ত্ত। শিক্ষিত ইন্দোনেশীয়দের এটাই ছিল বড় অভিযোগ। মধ্য ও নিচু স্তরেও অনেকেই কর্মের সুযোগ পায় নি। সুতরাং এই শিক্ষানীতির ফলে সুসংহত পূর্ব ভারতীয় সমাজ গড়ে ওঠার কোন সম্ভাবনা ছিল না। এর ফলে একটি বেকার, বঞ্চিত ও অসন্তুষ্ট শ্রেণী সৃষ্টি হয়েছিল।

অর্থনৈতিক ফলাফল নানা দিক দিয়ে ছিল সুদূর প্রসারী। ব্যক্তিগত মূলধন বিনিয়োগ এবং রোপণ অর্থনীতির ফলে কিছু আনুষঙ্গিক পরিবর্তন ঘটেছিল। ব্যাঙ্ক, বাণিজ্যিক সদর দপ্তর, রপ্তানি কেন্দ্র, আধুনিক বন্দর ব্যবস্থা, অভ্যন্তরীন যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রসার, সীমিত শিল্পায়ণ, খুচরা বাণিজ্যের প্রসার—এ সব কারণে বাটাভিয়া, সুরবায়া এবং মেদান প্রভৃতি শহর আধুনিক বাণিজ্যিক নগরে পরিণত হয়। অদক্ষ কর্মের সন্ধানে গ্রাম থেকে বহু মানুষ এই সব নগরে এসে ভীড় জমায়। ফলে নানা ধরণের সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি হয়। নগরের চার পাশ ঘিরে অসংখ্য বস্তি গড়ে ওঠে। সে সব জায়গায় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি হয়। ছিন্ন মূল বাসিন্দাদের মধ্যে সামাজিক সংহতি ছিল না। নাগরিক কর্তব্য ও দায়িত্ব বোধ তাদের মধ্যে দানা বেঁধে ওঠে নি।

গ্রামীণ সমাজেও ভাঙ্গন দেখা গিয়েছিল। বিপণন অর্থনীতির কাঠামোর মধ্যে গ্রামের অনুপ্রবেশ ঘটে। ফলে পরম্পরার বন্ধন শিথিল হয়ে পড়ে। চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক হিসাবে গ্রাম ছেড়ে তাদের অনেকেই শহরে নগরে কাজ পেয়েছে। নতুন পরিবেশে গ্রামের সনাতন প্রথা অকেজো মনে হয়েছে। চুক্তির মেয়াদ শেষ হলে তারা পুনরায় গ্রামে ফিরে গেছে। নবলব্ধ অভিজ্ঞতা ও আয়ের

সঞ্চয় নিয়ে তারা গ্রামে ফিরেছে। গ্রামের ফেলে আসা জীবনে তারা পুনরায় অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারে নি। গ্রামীণ সমাজও তাদের সহজ ভাবে গ্রহণ করতে পারে নি। এ সব ক্ষেত্রে সমাজ রূপান্তর সৃজনধর্মী হয় নি, ধ্বংসাত্মক হয়েছে। অভিজ্ঞতা ও অর্থের সঞ্চয় দিয়ে তারা গ্রামীণ সমাজকে সচল করতে পারে নি।

রিজেনসি, জেলা ও মহকুমা শহরে নানা ধরণের প্রশাসনিক দপ্তর ও সরকারী কর্মচারীদের জন্য আবাসন গৃহ ছিল। এই শহরগুলি ছিল চীনা ও ইন্দোনেশীয় বণিকদের বাণিজ্যকেন্দ্র। চীনা বণিক ও গ্রামের সাধারণ মানুষের মধ্যে যোগসূত্র হিসাবে কাজ করত ইন্দোনেশীয় বণিক। নতুন অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে দেশী বণিকদের অংশ গ্রহণের সুযোগ ছিল। কিন্তু অর্থনীতির কাঠামোতে বিদেশীদের প্রাধান্য এত বেশী ছিল যে ক্ষুদ্র দেশী বণিকরা অর্থনৈতিক রূপান্তরে অগ্রচারী ভূমিকা নেবার কোন সুযোগই পায় নি।

দ্বৈত অর্থনীতি

এথিকাল পলিসির রূপকারদের উচ্চাশা ছিল গগনচুম্বী। তাদের সমাজ রূপান্তর পরিকল্পনা ছিল অবাস্তব। অর্থনৈতিক বিকাশের তাত্ত্বিক দিক সম্পর্কে তারা অবহিত ছিলেন না। ইন্দোনেশিয়ায় সুনিয়ন্ত্রিত অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিকাশ সাধনে তারা ব্যর্থ হয়েছিলেন। আক্ষেপের কথা এই যে এই নীতির ফলেই সমাজের বিচ্ছিন্নতাকামী শক্তি প্রাধান্য পেয়েছিল।

এ কথা সত্য লিবরল পলিসির ফলে স্থায়ী সম্পদ বাড়ে নি এবং আশানুরূপ জনকল্যাণ সাধিত হয় নি। এই নীতির সমালোচকদের বক্তব্য ছিল যে ক্ল্যাসিকাল অর্থনীতির তত্ত্ব ইউরোপের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, কারণ ইউরোপীয় সমাজ সর্বত্রই সমপ্রকৃতি বিশিষ্ট। ইন্দোনেশিয়ার বহু জাতি ও গোষ্ঠী অধ্যুষিত সমাজে ক্ল্যাসিকাল অর্থনীতির তত্ত্ব অপ্রাসঙ্গিক।

ইন্দোনেশিয়ার জন্য দ্বৈত অর্থনীতির তাত্ত্বিক কাঠামো প্রাসঙ্গিক মনে করা হয়েছিল। J. H. Boeke এই তত্ত্বের প্রবক্তা। তাঁর মতে ঔপনিবেশিক পরিস্থিতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দ্বৈত অর্থনীতি। একদিকে আধুনিক রোপণ অর্থনীতি, আমদানি-রপ্তানি দপ্তর, ব্যাঙ্ক ও বৃহদাকার বাণিজ্য এবং অপরদিকে রক্ষণশীল, সনাতন, পরিবর্তন বিমুখ, শুধুমাত্র খেয়ে-পড়ে-বাঁচার মত গ্রামীণ অর্থনীতি। গ্রামীণ অর্থনীতি প্রাচীন পদ্ধতি নির্ভর মৃত প্রথা

সর্বস্ব সমাজের অঙ্গ। এখানে অর্থনৈতিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নেই, কিন্তু অর্থনৈতিক বিকাশের পথে বাধা আছে।

এই দ্বৈত চরিত্র বোঝাতে হলে 'নগর বনাম গ্রাম', 'প্রাচ্য বনাম পাশ্চাত্য', 'দেশী বনাম বিদেশী' ইত্যাদি ছকগুলি যথেষ্ট অর্থবহ মনে হয় না।12 শুধু-মাত্র অর্থনৈতিক দ্বৈত চরিত্র বোঝাতে গিয়ে তিনি 'দেশী প্রাক-ধনতন্ত্র এবং বিদেশাগত ধনতন্ত্র' ছকটি প্রয়োগ করেছেন।

Boeke এর বক্তব্য হচ্ছে প্রাক-ধনতন্ত্র কথাটি এশীয় পরিপ্রেক্ষিতে কালানু-ক্রমিক স্তর বিভাগ নয়। ক্ল্যাসিকাল অর্থনীতির তত্ত্ব দিয়ে এক্ষেত্রে প্রাক-ধনতন্ত্রকে বিশ্লেষণ করা যাবে না। অর্থনৈতিক বিকাশের প্রতিকূল সামাজিক পরিবেশকে তিনি প্রাক-ধনতন্ত্ররূপে চিহ্নিত করেছেন। তিনি বলেছেন প্রাচ্যের গ্রামগুলি প্রধানত সামাজিক ও ধর্মীয় সংগঠন। এখানে অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য নিষ্ক্রিয় ও অনুপস্থিত। ব্যক্তি মানুষের কিছু কিছু অর্থনৈতিক চাহিদা থাকে। এই চাহিদা একান্তই তাঁর ব্যক্তিগত অভিলাষ সঞ্জাত। কিন্তু ব্যক্তি মানুষের সামাজিক চাহিদার উৎস হল যৌথ সামাজিক মূল্যবোধ। প্রাচ্যের গ্রাম জীবনে ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক লক্ষ্য নেই বললেই চলে। সেখানে আছে কিছু সামাজিক চাহিদা এবং যৌথ সামাজিক মূল্যবোধ।

Boeke মনে করেন প্রচলিত সামাজিক মূল্য বোধ অনেক ক্ষেত্রেই সমাজ প্রগতির অন্তরায়। সমাজ সংহতি সংরক্ষণের দায়িত্বের যূপকাষ্ঠে সেখানে ব্যক্তিগত উদ্যম ও প্রচেষ্টা অর্পিত। গ্রামীণ সমাজের ধর্মীয় ও সামাজিক নানা ধরণের আচার অনুষ্ঠান অর্থনৈতিক অগ্রগতির বাধা স্বরূপ। আধ্যাত্মিক আকুতি, অন্বেষা ও জীবন বোধের সঙ্গে এ সব ধর্মীয় ও সামাজিক আচার অনুষ্ঠানের কোন আবশ্যিক যোগ নেই। শুধুমাত্র পরম্পরা সমর্থিত বলেই এগুলি অনুষ্ঠিত ও আচরিত হয়। কিন্তু সমাজ রূপান্তর ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এগুলি প্রায় অনড়, অটল ও স্থায়ী প্রতিবন্ধক।

Boeke বর্ণিত দ্বৈত অর্থনীতির এই তাত্ত্বিক কাঠামো দিয়ে ইন্দোনেশীয় সমাজের একটি অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্যের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। তত্ত্বটি এমন কিছু অভিনব নয়। খুঁটিয়ে দেখতে গেলে এই তত্ত্বের কিছু গুরুতর বিচ্যুতি ধরা পড়ে। অর্থনীতির দ্বৈত রূপের মধ্যে যে ব্যবধান আছে, এই তত্ত্বে তা অতি-সরলীকৃত হয়েছে। ব্যবধানের বিস্তার প্রসঙ্গে অতিশয়োক্তি করা হয়েছে। ব্যবধান আছে, এটা মেনে নিয়েও বলা যায়, যে দ্বৈত অর্থনীতি শুধুমাত্র প্রাচ্য জগতেরই বৈশিষ্ট্য নয়। অর্থনৈতিক

উন্নয়নের সমস্যাকে সামাজিক প্রেক্ষাপটে বিচার করা সঙ্গত, এটাই, যদি Boeke এর তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মূল কথা হয়, তাহলে এই তাত্ত্বিক কাঠামো পাশ্চমী ধনতান্ত্রিক সমাজ এবং প্রাক ধনতান্ত্রিক ইন্দোনেশীয় সমাজ, উভয় ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য।

ইন্দোনেশীয় সমাজের প্রাক-ধনতান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক রূপ নিয়েও অতি-শয়োক্তি করা হয়েছে। Boeke এর সমালোচকরা বিশেষ করে Benjamin Higgins দেখিয়েছেন যে আলোচ্য কালপর্বে ইন্দোনেশিয়ার কৃষক সমাজ সবক্ষেত্রেই রক্ষণশীল ও পরিবর্তন বিমুখ ছিল না। 13 বোর্ণিওর রবার খেতের কৃষক সাইকেল, বিছানার গদি, হাত ঘড়ি, ফাউনটেন পেন এবং বিদেশ থেকে আমদানি করা আরও নানা ধরণের জিনিস ব্যবহার করত। দূর গ্রামাঞ্চলে নৌকার মাঝিদের তিনি অসট্রেলিয়ার টিনের দুধ ব্যবহার করতে দেখেছেন। সুমাত্রা ও বোর্ণিওতে রবার খেতে ছোট ছোট দেশী-মালিকদের Higgins ধনতান্ত্রিক ব্যক্তিগত উদ্যোগ লক্ষ্য করেছেন। 1870 সালের পর ধনতান্ত্রিক উদ্যোগে অংশ নিতে গ্রামের মানুষ গ্রামের ভিটামাটি ছেড়ে শিল্পনগরের জঙ্গম জীবন আঁকড়ে ধরেছে। এ সব থেকে এটা স্পষ্ট যে ইন্দোনেশীয় অর্থনীতি ছিল নানা বৈচিত্র্যে জটিল। দ্বৈত অর্থনীতির কাঠামো এ ক্ষেত্রে একটি অতি সরলীকৃত ব্যাখ্যা।

এ সব সত্ত্বেও বলা উচিত যে দ্বৈত অর্থনীতির বক্তব্য উপেক্ষণীয় নয়। 1870 সালে ডচ মূলধন নিয়োগের ফলে এক নতুন রপ্তানি অর্থনীতি সৃষ্টি হয়েছিল। পাশাপাশি ছিল সনাতন ও পরিবর্তন বিমুখ দেশী অর্থনীতি। এই দুই ব্যবস্থার মধ্যে ব্যবধান ছিল অতি স্পষ্ট। এই সহজ সত্য বোঝার জন্য বিশেষ অর্থনৈতিক তত্ত্বের অবতারণা নিষ্প্রয়োজন। বিশ্বের বাজার থেকে ইন্দোনেশীয়রা সম্পূর্ণ ভাবে না হলেও অনেকটাই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। সনাতন পদ্ধতিতে পরিচালিত পরম্পরাগত স্থানু কৃষি ব্যবস্থায় বিপুল সংখ্যক মানুষ নিযুক্ত ছিল। ঔপনিবেশিক পর্বের শেষ সত্তর বছরে দ্বৈত অর্থনীতির ইউরোপীয় শাখার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে দেশী শাখার মধ্যে কিছু পরিবর্তন এসেছিল। কিন্তু এই পরিবর্তন এসেছিল প্রচলিত ব্যবস্থা প্রসারের ফলে, নতুন কোন পদ্ধতি বা ব্যবস্থা প্রচলনের ফলে নয়। এই প্রক্রিয়াকে Cliflord Geertz বলেছেন 'Involution' বা জট-পাকান অবস্থা।

পূর্বে চাষের সনাতন পদ্ধতি ছিল ফসল কেটে জমি পুড়িয়ে দেওয়া। সেখানে প্রবর্তিত হল ব্যাপক জলসেচ ব্যবস্থা। ডচদের উদ্যোগে সেচ ব্যবস্থায় কিছু উন্নতিও ঘটে। সেচ ব্যবস্থায় প্রচুর লোকের প্রয়োজন পড়ে।

অধিক নিবিড় চাষ শুরু হয়। দেশী সনাতন পদ্ধতি অনুসরণ করলে জমি অকুলান হতে পারে। মাথা পিছু আয় কমতে পারে। সে ক্ষেত্রে নতুন পদ্ধতির সন্ধানে কৃষি বিপ্লব ঘটার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু ইন্দোনেশিয়ায় জমি ব্যবহারের ক্ষেত্রে কৃষি বিপ্লব ঘটল না। কারণ ডচ সরকার নতুন শস্য, নতুন যন্ত্রপাতি এবং উন্নত সেচ ব্যবস্থা প্রচলন করে। দেশী কৃষি ব্যবস্থায় অল্পস্বল্প উন্নতি ঘটল। সনাতন কৃষি ব্যবস্থা টিকে থাকল। বিপুল জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঘটল। বর্ধিত জনসংখ্যা কৃষি ব্যবস্থার সঙ্গে অনায়াসে যুক্ত হয়ে পড়ল। ক্ষেত্র বিশেষে উচু পাহাড়ে সারিবদ্ধ স্তর (terrace) কেটে জমি খণ্ড বিখণ্ড করা হল। শুরু হল একই জমিতে বছরে দু'বার চাষ। আধুনিক বিকল্প চাষ পদ্ধতি চালু হল না। কালচার সিসটেম পর্বে এবং পরবর্তী রোপণ অর্থনীতির ব্যবস্থায় যে ধরণের চাষ পদ্ধতি ছিল, সেই পদ্ধতিরই সাংগঠনিক সম্প্রসারণ ঘটল।

এই পরিস্থিতিই Geertz এর ভাষায় 'Involution' বা জট পাকান অবস্থা রূপে চিহ্নিত। সনাতন অর্থনীতি এবং অগ্রসর অর্থনীতির মধ্যে ব্যবধান থেকেই গেল। Boeke এর দ্বৈত অর্থনীতিকে Geertz সংশোধিত রূপে দেখিয়েছেন, কিন্তু তাকে অস্বীকার করেন নি। সাম্প্রতিক ইন্দোনেশিয়ায় এই ব্যবস্থার পরিণতি অতি প্রকট। শুধু দ্বৈত অর্থনীতি নয়, দ্বৈত সমাজ ব্যবস্থাও অদ্যাপি সেখানে বিরাজিত। জাকারতা, সুরাবায়া বা অন্য যে কোন শহর থেকে কয়েক মাইল দূরে গেলেই দেখা যাবে গ্রামীণ অর্থনীতি ও গ্রামীণ সমাজ যুগ যুগ ধরে অপরিবর্তিত এবং এখনও পরিবর্তন বিমুখ। Boeke এর তত্ত্বে এই চিত্রই প্রতিফলিত। তাঁর ত্রুটি এই যে তিনি চিত্রপটে মাত্রাতিরিক্ত রঙ প্রয়োগ করেছেন।

আধুনিক ইন্দোনেশিয়ার জন্ম

ডচ ঔপনিবেশিক নীতির এই সব কার্যক্রম 1942 সাল পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। 1870 সালে ইন্দোনেশিয়া থেকে রপ্তানির মোট মূল্য ছিল 107 মিলিয়ণ Guilder, তা বেড়ে 1160 মিলিয়ণ Guilder হয় 1930 সালে। এই হিসেব থেকে আর্থিক অগ্রগতির সুস্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়। 1870 সালে রপ্তানি পণ্য ছিল কফি, চিনি, তামাক, লবঙ্গ, গোলমরিচ, জায়ফল ইত্যাদি নানা ধরণের খেত ও বাগিচা সামগ্রী। কিন্তু 1930 সালে রপ্তানি পণ্য ছিল শিল্প সামগ্রী। এই পরিবর্তন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 1930 সালে ইন্দোনেশিয়া থেকে 173 মিলিয়ণ Guilder মূল্যের রবার এবং 190 মিলিয়ণ

Guilder মূল্যের তেল রপ্তানি হয়েছে। আলোচ্য কালপর্বে কোপরা, টিন, চিনি এবং চা এর রপ্তানির পরিমাণও যথেষ্ট বেড়েছে।

এই অর্থনৈতিক অগ্রগতি নিছক জাভা-কেন্দ্রিক ছিল না। তা জাভা থেকে সুমাত্রায় প্রসারিত হয়েছে। অনুরূপভাবে রাজনৈতিক ভারকেন্দ্র জাভা থেকে সুমাত্রা ও বাইরের দ্বীপপুঞ্জে স্থানান্তরিত হয়েছে। 1824 সালে ব্রিটেনের কাছ থেকে মালাক্কার বিনিময়ে বেনকুলেন ডচ অধিকারভুক্ত হয়। 1825 সালে পালেমবাঙ ডচ নিয়ন্ত্রণে আসে। 1858 সালের চুক্তির শর্তানুসারে উত্তর-পূর্ব উপকূলের কয়েকটি অঞ্চল (Siak, Deli, Serdang, Lingkat Asahan) ডচ প্রভুত্ব মেনে নেয়। প্রায় একই সময়ে Batak অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা হয়েছে। 1873 সালে Acheh ডচদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তোলে। অবশেষে 1908 সালে Acheh তাদের হস্তগত হয়। 1906 সালে Bone এবং Luwuর আত্মসমর্পণের ফলে দক্ষিণ এবং মধ্য সেলেবেস ডচ অধিকারে চলে আসে। 1907 সাল নাগাদ মলুক্কা দ্বীপপুঞ্জের Ceram এবং Buru অঞ্চলে ডচ নিয়ন্ত্রণ প্রসারিত হয়। 1909 Ternate এ ডচ প্রভুত্ব ছিল সুপ্রতিষ্ঠিত। বোর্ণিওতেও তাদের লোলুপ দৃষ্টি পড়ে। 1898 থেকে 1901 সালের মধ্যে নিউ গিনির নানা স্থানে ডচ কর্মচারী পাঠান হয়েছিল।

ডচ সাম্রাজ্যের এই বিস্তার ছিল প্রকৃত অর্থে বৈপ্লবিক। জাভায় 205 বছরের সুদৃঢ় ডচ শাসনের ফলে সমাজ সংগঠনে মৌলিক পরিবর্তন আসে নি। কিন্তু জাভার বাইরে ইন্দোনেশিয়া দ্বীপপুঞ্জ জুড়ে তাদের প্রসার ছিল বিস্ফোরক। শিল্প বিপ্লবের পর ইউরোপের বিশ্বময় প্রসার ঘটেছে। ব্রিটেন, ফ্রানস, জারমানি এবং ইতালি প্রমুখ ইউরোপীয় দেশগুলি আফ্রিকা বন্টনের জন্য তৎপর হয়েছে। 1874 থেকে 1914 সালের মধ্যে মালয় উপদ্বীপে ব্রিটিশ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইউরোপীয় দেশগুলির সাম্রাজ্য বিস্তার প্রক্রিয়ার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে জাভা থেকে বাইরের দ্বীপপুঞ্জে ডচ সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ ঘটেছে। এই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়েই ইন্দোনেশিয়াতে সুস্থিত সংহতি গড়ে উঠেছে, আধুনিক অর্থনীতির ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে এবং পরম্পরাগত সমাজ শ্রেণী বিন্যাসে রূপান্তর ঘটেছে। এক কথায়, আধুনিক ইন্দোনেশিয়া জন্ম নিয়েছে।

পাদটীকা

1. J. S. Furnivall, *Colonial Policy and Practice* (Cambridge 1948) p. 218

2. D. G. E. Hall, *A History of South-East* Asia (London 1960) p. 469

3. R. van Niel, 'The Function of Land-rent under the Cultivation System in Java' *The Journal of Asian Studies*. Vol. 23, No. 3, May 1964.

4. জাভায় সমাজ শ্রেণী বিন্যাসে ও সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে একটি মাত্র পরম্পরা ছিল না, ছিল নানা ধরণেব পরম্পরা। এগুলির মধ্যে তিনটি ছক খুব স্পষ্ট ঃ চিরাচরিত জড়োপাসনা ও সনাতন সর্বপ্রাণবাদ, ভারতীয় (হিন্দু-বৌদ্ধ) বিশ্ববীক্ষা এবং ইসলাম। Clifford Geertz তাঁর *Religion of Java* (Illinois 1960) গ্রন্থে দেখিয়েছেন, গ্রামীণ জীবনেব শৃঙ্খলা ও সহযোগিতার মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে আছে সর্বপ্রাণবাদ, হিন্দুধর্ম ও ইসলাম ধর্মের সংমিশ্রণ ও সমন্বয়। এই ধারাটি *Abangan* পরম্পরা নামে পরিচিত। জাভার হাট বাজার ও গঞ্জের জীবনের সঙ্গে মিশে আছে ইসলামী ঐতিহ্য। এই পরম্পরা *Santri* নামে চিহ্নিত। সরকারী শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত সামন্তকুলের পরম্পরা *Priyayi* নামে অভিহিত।

কিন্তু এই তিন পরম্পরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়। একটি গ্রামের মধ্যেই হয়ত তিনটি ধারা অল্প বিস্তর বিদ্যমান ছিল। ব্যক্তি বিশেষ বা গোষ্ঠী বিশেষের মধ্যেও তিন পরম্পরার লক্ষণ দেখা গেছে। গ্রাম ভিত্তিক *Abangan* দৃষ্টিভঙ্গি, বাজার কেন্দ্রিক ইসলামী *Santri* দৃষ্টিকোন এবং সরকারী প্রশাসন যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত *Priyayi* জীবন বীক্ষা. এই তিন পরম্পরা থেকে এটা স্পষ্ট যে জাভার সমাজ ও সংস্কৃতি ছিল জটিলতাপূর্ণ।

Ruth T. McVey (ed.). *Indonesia* (New york 1967) গ্রন্থে Indonesian Cultures and Communities শিরোনামে একটি অধ্যায় আছে। Hildred Geertz এই অধ্যায়ের লেখক। উপরে উল্লিখিত তিন পরম্পরা বিষয়ে এই অধ্যায়ে লেখকের আলোচনা বিশেষ প্রণিধেয়। সুদূর অতীতকাল থেকেই যে সব অঞ্চলে রাজদরবার বসত, সনাতন যবদ্বীপীয় সংস্কৃতি সে সব জায়গাতে বিকশিত হয়েছে। জোগজাকারতা ও সুরকারতা নগর এখন যেখানে অবস্থিত, ঐ সব অঞ্চলেই অতীতের ক্লাসিকাল সাম্রাজ্যের

রাজধানী গড়ে উঠেছিল। দেশের মধ্যভাগের উপত্যকাগুলিতে প্রাচীন ও মধ্যযুগের রাজতন্ত্রের স্মৃতি এখনও ছড়িয়ে আছে। জাভার অন্যান্য অঞ্চলের মানুষ এখনও এই অঞ্চলকে মতরাম নামে উল্লেখ করে। সুনিপুন নৃত্য-ভঙ্গিমা, চিত্তহারী Gamelan সংগীত, নয়নানন্দ ছায়া নাটক এবং অতীন্দ্রিয়-বাদী দর্শনশাস্ত্রের নানা শাখা প্রশাখা এই অঞ্চলেবই অবদান। আধুনিক জাভার কৃতী শিল্পী এবং যশস্বী চিন্তাবিদদের অনেকেই মতরাম অঞ্চলের সামন্ত শ্রেণীর উত্তরসূরী। সামাজিক মর্যাদা ও আভিজাত্যের সংগে একাকার হয়ে মিশে আছে আত্মার আভিজাত্য এবং প্রজ্ঞা ও শিল্প কুশলতার গরিমা। জাভার মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়েছে অভিজাত আচার আচরণে এবং পরস্পরের প্রতি সৌজন্যমূলক সম্ভাষণে।

হিন্দুধর্ম প্রভাবিত নান্দনিক রীতিনীতি এবং ধর্মশাস্ত্রানুমোদিত জটিল জীবন যাত্রা যবদ্বীপীয় ধর্মের *Priyayi* শাখা নামে অভিহিত। অতীতকালে রাজপুরুষ শ্রেণীর সম্ভ্রান্ত জীবনাচরণ বোঝাতে *Priyayi* শব্দটি ব্যবহার করা হত। আধুনিক যুগে সামাজিক পরিচয় নির্বিশেষে জাভার প্রায় প্রত্যেক রাজকর্মচারীর ও বাবুকাজে লিপ্ত মানুষের যাবতীয় ধ্যানধারণা আচার আচরণ ও নৈতিক প্রত্যয় *Priyayi* সংস্কৃতির অন্তর্গত মনে করা হয়।

Tjirebon থেকে Banjuwangi পর্যন্ত প্রসারিত উত্তর উপকূলেব বাণিজ্য নগরগুলিতে যবদ্বীপীয় সংস্কৃতির আর একটি ধারা বিকশিত হয়েছে। উপকূলবর্তী অঞ্চলেই সর্বপ্রথম ইসলামের প্রভাব দৃঢ়মূল হয় এবং ষোড়শ শতকে সমগ্র জাভায় তা বিস্তার লাভ করে। প্রথম থেকেই ইসলাম ছিল বণিক ও কারিগর শ্রেণীর ধর্ম। তাদের মাধ্যমেই উত্তর উপকূল থেকে অন্যান্য অঞ্চলে তা ছড়িয়ে পড়ে।

জাভায় এমন অনেক মুসলমান আছেন, যাদের আচার আচরণ বিশ্বাস ও সংস্কারে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের অনেক লক্ষণ এবং আঞ্চলিক যবদ্বীপীয় জড়োপাসনার অনেক নিদর্শন মিশে গেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা নিজেদেব মুসলমান ভাবেন, প্রতিদিন পাঁচবার নামাজ পড়েন, প্রতি শুক্রবার মসজিদে যান, রমযান মাসে উপবাসী থাকেন, মক্কায় হজ্ব করতে যান এবং নিয়মিত কোরআন পড়েন। এই মুসলমান সমাজ *Santri* নামে পরিচিত। জাভার শহরে ও গ্রামে সর্বস্তরেই তারা আছেন। তবে সাধারণত তাদের অধিকাংশই ব্যবসা বাণিজ্য ও কারিগরবৃত্তির সংগে যুক্ত। মসজিদ ও বাজারের আশে-পাশে তাদের বসবাস।

জাভার নগর সংস্কৃতির ধারা *Priyayi* এবং *Santri,* এই দুই খাতে প্রবাহিত। এই দুই প্রবাহ মোটামুটি অভিজাত জীবনধারার পরিচয় বহন করছে। গ্রামের বিপুল সংখ্যক কৃষকের জীবনে তাদের প্রভাব নগণ্য নয়। জাভার গ্রামীণ জীবনকে স্বনির্ভর, বাইরের জগত থেকে বিচ্ছিন্ন এবং বদ্ধ সমাজ ভাবলে ভুল করা হবে। প্রাচীন কাল থেকেই জাভার গ্রাম ছিল মুক্ত সমাজ। সেখানকার গ্রামীণ জীবনের সাংস্কৃতিক ধারা *Abangan* নামে পরিচিত। এই ধারাটি কৃষক জীবনের পরিচয় বহন করছে। H. Geertz বলেছেন, এই তিনটি ছক মূলত অভিন্ন। এগুলি স্বতন্ত্র ধারা নয়, সাধারণ যবদ্বীপীয় মূল্যবোধ, আচরণ বিধি ও ধর্মবিশ্বাসের ঈষৎ ভিন্ন ভিন্ন নমুনা মাত্র।

5. Clifford Geertz, *Agricultural Involution : The Process of Ecological Change in Indonesia* (Berkeley and Los Angeles 1963) p. 47.

6. J. D. Legge, *Indonesia* (Australia 1980) p. 94.

7. *Ibid.*, p. 96.

8. H. J. van Mook, *The Stakes of Democracy in South East-Asia* (London 1950) p. 108.

9. J. S. Furnivall, *op. cit.*, p. 263.

10. Robert van Niel, *The Emergence of the Modern Indonesian Elite* (The Hague 1960) pp. 36 ff.

11. Harry J. Benda, *The Crescent and the Rising Sun* (The Hague 1958) pp. 20-31.

12. Boeke, *The Structure of the Netherlands Indian Economy* (New York 1942) p. Chapter I.

13. Benjamin Higgins, "The 'Dualistic Theory' of Under-developed Areas" *Economic Development and Cultural Change,* IV January 1956.

'South East Asian Society : Dual or Multiple' by Manning Nash and 'Comments' by Benjamin Higgins in *Journal of Asian Studies,* Vol. XXIII No. 3. (May 1964).

॥ 10 ॥

মালয়ে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন

পেনাঙে ইংরেজ প্রাধান্য

পেনাঙে ইংরেজ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার ইতিহাস আলোচনা করতে হলে তিনটি তথ্য মনে রাখা দরকার। প্রথম, 1786 সালের পূর্ব পর্যন্ত কেদার সুলতান ছিলেন পেনাঙের বংশানুক্রমিক শাসক। দ্বিতীয়ত, ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পূর্বাঞ্চলের সদর দপ্তর প্রথমে ছিল মাদ্রাজে এবং পরে কলকাতায়। লন্ডন ছিল কোম্পানির প্রধান দপ্তর। তৃতীয়ত, Francis Light পেনাঙের ভৌগোলিক গুরুত্ব যথার্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন; তাঁরই প্রচেষ্টায় কেদার সুলতান ও ইংরেজ কোম্পানির মধ্যে পেনাঙ সম্পর্কে বোঝাপড়া সম্ভব হয়েছিল।

কেদা ছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার উর্বর ক্ষেত্রে অবস্থিত একটি প্রাচীন মালয় রাজ্য। 1474 খ্রীষ্টাব্দে কেদা একটি মুসলিম রাষ্ট্রে পরিণত হয়। কেদার শাসকবংশ বৈবাহিক সম্পর্কে মালাক্কার সঙ্গে যুক্ত ছিল। ইতিহাসের আদি-পর্ব থেকেই কেদার নদীগুলি ছিল বাণিজ্যিক জাহাজের আশ্রয় কেন্দ্র। ভারতীয় জাহাজগুলি এখানে আশ্রয় নিত। উত্তর সুমাত্রা এবং মালয় উপ-দ্বীপের পশ্চিম উপকূলের বণিকরাও এখানে যাতায়াত করত। কেদার প্রধান রপ্তানি দ্রব্য ছিল টিন। তাছাড়া হাতী, হাতীর দাঁত, কাঠ ও বেতের ছড়িও রপ্তানি হত। সপ্তদশ শতক থেকে কেদাতে গোলমরিচের চাষ শুরু হয়। গোলমরিচও রপ্তানির তালিকায় যুক্ত হয়। মুসলমান বণিকরা ভারতবর্ষ ও মধ্যপ্রাচ্যের দ্রব্যসম্ভার এখানে আমদানি করত। কোরো-মণ্ডল ও বাংলার উপকূল থেকে ভারতীয় বস্ত্র, ধাতবদ্রব্য, কাঁচের জিনিস, ঔষধপত্র ও মশলা আসত পেনাঙের বাজারে। বাণিজ্যিক শুল্ক এবং রাজপ্রতিনিধিদের নিজস্ব ব্যবসার লভ্যাংশই ছিল কেদার সুলতানের আয়ের উৎস। কেদার আর্থিক সমৃদ্ধি ছিল, কিন্তু রাজনৈতিক নিরাপত্তা ছিল না। কেদার উত্তরে শ্যামদেশ। প্রায় 1300 সাল থেকে শ্যামের রাজারা কেদায় প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করেছে।

সপ্তদশ শতকের প্রথম দিকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইংরেজ ইসট ইনডিয়া কোমপানির কয়েকটি বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল। উত্তর পশ্চিম জাভার বানতাম অঞ্চলে একটি এবং মালয় উপদ্বীপের পাটানি (Patani) অঞ্চলে আর একটি বাণিজ্য কুঠি ছিল। শক্তিশালী ওলন্দাজ ইসট ইনডিয়া কোমপানির প্রতি-যোগিতার চাপে ইংরেজ কোমপানি ক্রমশ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ছেড়ে ভারতবর্ষের দিকে মনোযোগ দিতে শুরু করে।

অক্টোবর ও নভেম্বর মাস জুড়ে উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত হয। উত্তাল ঝোড়ো হাওয়ার দাপটে বঙ্গোপসাগরে এই সময়ে নৌযুদ্ধ পরিচালনা করা প্রায় অসম্ভব। যুধ্যমান নৌবাহিনী তখন হয় মেরামতি কাজের জন্য বা বিশ্রামের জন্য আপন আপন পোতাশ্রয়ে আশ্রয় নিত। ইংরেজ জাহাজ নানা ধরণের বিপত্তির সম্মুখীন হত। কোরোমণ্ডল উপকূল ছিল উত্তর-পূর্ব মৌসুমীর অন্তর্গত। এখানে তাই জাহাজ মেরামত সম্ভব ছিল না। ইংরেজ জাহাজগুলি দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে পশ্চিম কূলে বোম্বেতে এসে আশ্রয় নিত। মেরামতির কাজ শেষ করে বঙ্গোপসাগরে এ সব জাহাজ এপ্রিলের আগে ফিরে আসতে পারত না। জানুয়ারি মাসের মধ্যে ফিরে আসতে না পারলে শত্রুপক্ষ নিঃসন্দেহে তার সুযোগ নিত। ইংরেজ ও ফরাসী উভয় পক্ষই বঙ্গোপসাগরে উপযুক্ত পোতাশ্রয়ের সন্ধান করছিল। অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার যুদ্ধ (1740-48), সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ (1756-63) এবং আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ (1775-83)—এই তিনটি যুদ্ধেই পূর্ব পশ্চিমে ইংরেজ ও ফরাসীরা ছিল পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী। ভারত মহাসাগরে নৌযুদ্ধগুলি বার বার প্রমাণ করেছে মেরামতি কাজের জন্য নিরাপদ বন্দরের প্রয়োজন কতখানি।

অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ভারত ও চীনের মধ্যে ক্রমবর্ধমান বাণিজ্যিক যোগাযোগের জন্য আর একটি বন্দরের প্রয়োজন অনুভূত হল। বোম্বে, মাদ্রাজ (বা কলকাতা) এবং ক্যানটনের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আপন নিয়ন্ত্রণাধীন একটি বন্দরের প্রয়োজন ইংরেজরা অনুভব করেছিল। 1786 সালের পূর্বে ভারতবর্ষ ও ক্যানটনের মধ্যে হয় মেরামতি কাজের জন্য বা মালপত্র সংগ্রহের জন্য ইংরেজরা সাধারণত ওলন্দাজ বন্দর ব্যবহার করত। এজন্য ওলন্দাজরা চড়া হারে শুল্ক দাবি করত। নিরন্তর রাজনৈতিক অস্থিরতার জন্য এ সব বন্দরে আশ্রয় নেওয়া সব সময় যুক্তিযুক্ত ছিল না। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আপন অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হলে ইংরেজদের প্রয়োজন ছিল নিজস্ব নৌ-ঘাঁটি এবং ভারতবর্ষ ও ক্যানটনের মধ্যে চলাচলের সময় ইংরেজ জাহাজের জন্য একটি নিরাপদ আশ্রয়। তা ছাড়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাজারে অনুপ্রবেশের জন্য ইংরেজরা লালায়িত হয়ে উঠেছিল।

এক্ষেত্রে ফ্রানসিস লাইটের ভূমিকা স্মর্তব্য। তিনি ছিলেন ইংরেজ নৌ-বাহিনীর প্রাক্তন কর্মচারী। তারপর তিনি মাদ্রাজে ইউরোপীয় প্রতিষ্ঠান—Jourdain, Sullivan, and de Souza কোমপানির জাহাজের ক্যাপটেন হন। এই কোমপানির হয়ে তিনি মালয় উপদ্বীপের পশ্চিম কূলে এবং উত্তর সুমাত্রায় এসেছিলেন। তিনি মালাই ও শ্যাম দেশীয় ভাষায় খুব ভাল কথা বলতে পারতেন।

1771 খ্রীষ্টাব্দে লাইট কেদায় ছিলেন। সামরিক সাহায্যের বিনিময়ে বাণিজ্যিক সুযোগ সুবিধার প্রস্তাব তাঁকে জানালেন কেদার সুলতান। লাইট ইসট ইনডিয়া কোমপানিব সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করতে সুলতানকে নির্দেশ দিলেন। মাদ্রাজে নিজের প্রতিষ্ঠানকে তিনি বোঝালেন যে ইংরেজ ইসট ইনডিয়া কোমপানির পক্ষে পেনাঙ কতটা অনুকূল। 1772 খ্রীষ্টাব্দেব জানুআরি মাসে তিনি সরাসরি ওয়ারেণ হেস্টিংসকে পেনাঙ গ্রহণের অনুমোদন জানালেন। ঐ সালে কেদার সুলতানের সঙ্গে আলোচনা করতে এডওযার্ড মংকটনকে (Edward Monckton) কোমপানির প্রতিনিধিরূপে পাঠানো হল। এ আলোচনা ব্যর্থ হয়। তারপর বারো বছর কেটে গেল। আমেরিকাব স্বাধীনতা যুদ্ধে কোমপানি ব্যস্ত ছিল বলে এ সব ব্যাপারে নজর দিতে পারে নি।

1786 সালে ফ্রানসিস লাইট কেদার সুলতানের এক প্রস্তাব নিয়ে কলকাতায় আসেন। অস্থায়ী গভরণর জেনারেল, ম্যাকফারসনের (Macpherson) অনুমোদনে পেনাঙে একটি বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করা হল এবং লাইটকে তাব সুপারিনটেনডেনট নিয়োগ করা হল। শুধুমাত্র বাণিজ্যিক কারণেই পেনাঙ হস্তগত করা কোমপানি সমীচিন মনে করেছিল।

["When Penang was founded, the Directors of the Company defined the reasons as being 'for extending our Commerce among the Eastern Islands, and indirectly by their means to China.": J. Kennedy, *A History of Malay* (London 1962) p. 77].

কোমপানির অনুমোদন নিয়ে লাইট কলকাতা থেকে কেদায় ফিরে এলেন। 1786 সালের 11 আগস্ট ফ্রানসিস লাইট পেনাঙ দখল করেন। তিনি পেনাঙের নামকরণ করেন প্রিনস অব ওয়েলস দ্বীপ। ব্রিটিশ সম্রাটের নামানুসারে নতুন বন্দরের তিনি নামকরণ করেন জরজ টাউন।

কেদার সুলতানের অভিপ্রায় ছিল শত্রুর আক্রমণের বিরুদ্ধে ইংরেজদের

কাছ থেকে সামরিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি আদায় করা। কোমপানি শুধুমাত্র দ্বীপটি ও তার বিপরীত তীরভূমি রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল। পেনাঙ হস্তান্তরের শর্তাদি ছিল খুবই বিতর্কমূলক। উনিশ শতকের প্রথম দিকে যখন কেদার উপর শ্যাম দেশের চাপ ছিল অতি প্রবল, তখন সামরিক সাহায্যের প্রত্যাশা ছিল কেদার পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। পাঁচ বছর ধরে কেদা সামরিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি প্রত্যাশা করেছে। কিন্তু সামরিক সাহায্য দানে অনিচ্ছা বা ঔদাসীন্য ছিল কোমপানির বিদেশ নীতির একটি প্রধান অঙ্গ। কেদার সুলতান হতাশ হয়ে বলপ্রয়োগে পেনাঙ দখল করতে উদ্যত হলে লাইট প্রথমেই আক্রমণ শুরু করেন এবং তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেন।

1791 সালে উভয় পক্ষের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তির শর্তানুযায়ী বার্ষিক 6000 স্পেনীয় ডলারের বিনিময়ে কেদার সুলতান পেনাঙ দ্বীপ ইংরেজ কোমপানির হাতে সমর্পন করেন। সামরিক সাহায্যের কোন শর্ত এই চুক্তিতে উল্লেখ করা হয় নি। 1800 খ্রীষ্টাব্দে সার জরজ লিথ (Sir George Leith) পেনাঙের গভরণর জেনারেল রূপে কেদার সুলতানের সঙ্গে আর একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তির শর্তানুযায়ী কেদার একটি ভূখন্ড কোমপানিকে দান করা হয়। ভারতের তৎকালীন গভরণর জেনারেলের নামানুসারে এই ভূখণ্ডের নতুন নামকরণ হয় প্রভিন্স ওয়েলেসলি। 1800 সালের এই চুক্তি অনুসারে সুলতানের বার্ষিক অনুদান বাড়িয়ে 10,000 ডলার করা হয়।

1794 সালে ফ্রানসিস লাইট মারা যান। আমৃত্যু তিনি পেনাঙের সুপারিনটেনডেনট ছিলেন। তাঁর আমলে পেনাঙ ছিল অবাধ বাণিজ্যের বন্দর। আমদানি ও রপ্তানির জন্য কোন শুল্ক ধার্য করা হত না। যার যেমন খুশি জমি দখল করত, চাষ করত বা বসতি গড়ে তুলত। জমি বন্টন ও জমির মালিকানা নির্ধারণের কোন নিয়মনীতি ছিল না। ফাটকাবাজী প্রশ্রয় পায়। রাজস্ব নিয়েও সমস্যার অন্ত ছিল না। বাণিজ্য শুল্ক ছিল না, এবং বাইরে থেকেও কোন অর্থ সাহায্যের সুযোগ সম্ভাবনা ছিল না। 1803 সালে অল্প স্বল্প আমদানি শুল্ক বসান হয়েছিল। কিন্তু এক বছর পরে তা বাতিল করা হয়। গোলমরিচ ও অন্যান্য স্থানীয় উৎপন্ন দ্রব্যের উপর রপ্তানি শুল্ক বসান হয়েছিল। সর্বাপেক্ষা বেশী রাজস্ব দিতে প্রস্তুত থাকত, এমন ব্যক্তির কাছে শুল্ক আদায় ইজারা দেওয়া হত। 1805 সালের পূর্ব পর্যন্ত কোন শুল্ক কর্মচারী (Customs Officer) ছিল না।

পেনাঙের প্রথম গভরণর ছিলেন ফিলিপ ডানডাস (Philp Dundas) এবং সহকারী সচিব (Assitant Secretary) ছিলেন টমাস রাফেলস। 1812

সালে পেনাঙকে একটি নৌ-ঘাঁটি রূপে গড়ে তোলার পরিকল্পনা চিরতরে পরিত্যক্ত হয়। 1788 সালে পেনাঙের জনসংখ্যা ছিল প্রায় এক হাজার। 1804 সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় (প্রভিনস ওয়েলেসলির জনসংখ্যা যোগ করে) বারো হাজার। জনগোষ্ঠীর মধ্যে মালাই, ভারতীয়, চীনা এবং ইংরেজরাই ছিল প্রধান।

লাইট লবঙ্গ ও এলাচ চাষ শুরু করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তিনি ব্যর্থ হন। গোলমরিচ চাষও তিনি প্রবর্তন করেন। গোলমরিচের চাষ অর্থ-নৈতিক দিক দিয়ে লাভজনক হয়েছিল। পথঘাট, সরকারী দপ্তর, নগর বিন্যাস, এসব পেনাঙে বিশেষ গড়ে ওঠে নি। 1807 সালের পূর্বে আইন আদালত ছিল না, নির্দিষ্ট আইনকানুনও সৃষ্টি হয় নি। সাধারণভাবে দেওয়ানী ও ফৌজদারী নালিশের নিষ্পত্তি করতেন স্বয়ং সুপারিনটেনডেনট বা তাঁর সহকারী কর্মচারীরা। তাদের কোন কোন সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে হলে বাংলা সরকারের অনুমোদন লাগত। গুরুতর অভিযোগে অভিযুক্ত ইউরোপীয়দের পাঠানো হত বাংলাদেশের আদালতে।

ইংলন্ড ও ভারতবর্ষ থেকে পেনাঙে আসত বস্ত্র, ধাতুদ্রব্য, অহিফেন। বর্মা, শ্যাম দেশ মালয় উপদ্বীপ ও সুমাত্রা থেকে আসত চাউল, টিন, মশলা, বেতের ছড়ি, স্বর্ণচূর্ণ, হাতীর দাঁত, আবলুস কাঠ ও গোলমরিচ। ব্যবসায়ের লেনদেনের ক্ষেত্রে বিশেষ করে চীনের সঙ্গে, রূপার বদলে, এই সমস্ত উপ-করণের অনেকগুলিই বিনিময় মূল্যে যথেষ্ট উপযোগী ছিল। লাইটের পরে শাসনের অধিকর্তা হয়ে আসেন মেজর ম্যাকডোনালড (1795-9) জর্জ লিথ (1799-1804), এবং আর. টি. ফারকুহার (1804-5)। কালক্রমে 1805 সালে পেনাঙকে একটি প্রেসিডেনসি রূপে গন্য করা হল। কলকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বের মতন পেনাঙও ছিল সমপর্যায়ভুক্ত প্রেসিডেনসি।

মালাক্কা ও সিঙ্গাপুর

1805 সালে টমাস রাফেলস সহকারী সচিব পদে যোগ দিতে পেনাঙে এসে পৌঁছান। কোমপানির লনডন অফিসে তিনি চোদ্দ বছর বয়সে কাজে যোগদান করেন। চব্বিশ বছরে তিনি পেনাঙে নতুন জীবন শুরু করেন। 1807-8 সালে অসুস্থ হয়ে তিনি পেনাঙ থেকে মালাক্কায় আসেন। সেখানে বিস্তৃত অনুসন্ধান করে মালাক্কা সম্পর্কে একটি বিশদ প্রতিবেদন লেখেন এবং তা পেনাঙের ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দেন। এই প্রতিবেদনের একটি অনুলিপি তিনি কলকাতায় গভরণর জেনারেল লর্ড মিনটোর কাছেও পাঠান।

রাফেলসের প্রতিবেদন থেকে আমরা জানতে পারি যে মালাক্কায় বিপুল জনসংখ্যা ছিল। তাদের অধিকাংশই সেখানে দীর্ঘকাল ধরে বসবাস করেছে। তুলনায় পেনাঙের জনসংখ্যা ছিল নবাগত ও অস্থায়ী। মালাক্কার জমিজমা ছিল উর্বর ও সুকর্ষিত। জনগণ ছিল সুশৃঙ্খল ও করদানে অভ্যস্ত। ব্রিটিশরা তাদের প্রতিরক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। এই প্রতিশ্রুতি পালন তারা দাবি করতে পারে। মালাক্কা প্রণালীর উপর এই বন্দরের অবস্থান কোনমতেই উপেক্ষণীয় নয়। ব্রিটিশ কোমপানি যদি মালাক্কা সম্পর্কে আগ্রহান্বিত না হয়; তাহলে কোন শত্রুপক্ষীয় ইউরোপীয় শক্তি মালাক্কা দখল করবে এবং ফলে পেনাঙের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে। রাফেলসের প্রতিবেদনের একটি বিরাট অংশ জুড়ে ছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নানা অঞ্চলের সঙ্গে মালাক্কার বাণিজ্যিক সম্পর্কের বিস্তৃত বিবরণ। মালাক্কা ব্রিটিশ কোমপানির করতলগত থাকুক, এই ছিল তাঁর আবেদন।

রাফেলসের আবেদন ব্যর্থ হয় নি। ইসট ইনডিয়া কোমপানি মালাক্কা হস্তগত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। রাফেলসের পর্যবেক্ষণ শক্তি ও দক্ষতা লর্ড মিনটোর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। 1810 সালে তাঁর পদোন্নতি ঘটে। তিনি হলেন 'এজেনট টু দি গভরণর জেনারেল ফর দি মালয় স্টেটস'। তাঁর এই নতুন পদে কাজ হল ওলন্দাজ জাভার বিরুদ্ধে নৌঅভিযান বিষয়ে তথ্যাদি সংগ্রহ করা এবং পরামর্শ দেওয়া। মালাক্কা হল রাফেলসের সদর দপ্তর। সেখান থেকেই 1811 সালের জুন মাসে ইংরেজ রণতরী জাভা অভিযান করে। ওলন্দাজ প্রতিরোধ অকেজো হয়ে পড়ে। তাঁকে জাভার লেফটেনানট গভরণর নিয়োগ করা হয়। পাঁচ বছর তিনি এই পদে সমাসীন ছিলেন। এই সময় সেখানে তিনি নানা দুঃসাহসিক উদারনৈতিক সংস্কার চালু করেন। কোমপানির ব্যয় খুব বেড়ে যায়। জাভার পূর্বে অবস্থিত দ্বীপগুলিতেও তিনি ব্রিটিশ শক্তির স্থায়ী প্রভাব বিস্তারে প্রয়াসী হয়েছিলেন। জাভা ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত রাখতে তিনি সচেষ্ট ছিলেন।

ভিয়েনা কংগ্রেসের (1815) চুক্তি অনুযায়ী 1816 সালের আগস্ট মাসে জাভা ডচদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। 1818 খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ডচ প্রতিপত্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠার মূলে ইংরেজ নীতিই ছিল দায়ী। ইংরেজরা ফরাসী শক্তিকে প্রতিহত করতে চেয়েছিল। ক্যাসলরিগ প্রমুখ ব্রিটিশ কূটনীতিবিদ ফরাসী আতঙ্কের প্রতিষেধক হিসাবে ডচদের শক্তিবৃদ্ধি কামনা করেছিলেন। শুধুমাত্র সিংহল ও কেপ কলোনি ইংরেজরা আপন দখলে রেখেছিল। কারণ এ দুটি অঞ্চলকে তারা ব্রিটিশ বাণিজ্যের স্বার্থে প্রয়োজনীয় মনে করেছিল। এ ছাড়া ইউরোপে ইংরেজদের

স্বার্থে সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলে ডচ শক্তির আধিপত্য বিস্তারে উৎসাহিত করা হয়েছিল। কিন্তু পেনাঙ বা বেনকুলেন বা কলকাতার ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলে ওলন্দাজদের প্রতিপত্তি বিস্তার নিঃসন্দেহে আতঙ্কজনক মনে হয়েছিল।

সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা থেকে ইংরেজ কোমপানি বুঝতে পেরেছিল যে জাভা এবং জাভার পূর্বাঞ্চলের দ্বীপাপুঞ্জ থেকে পেনাঙের দূরত্ব খুবই বেশী। ফলে পেনাঙকে কেন্দ্র করে সমস্ত অঞ্চল থেকে বড় আকারের বাণিজ্য আকর্ষণ করা আদৌ সম্ভব নয়। 1808 সালে স্বয়ং রাফেলসও বলেছিলেন যে বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসাবে পেনাঙের চেয়ে মালাক্কা অনেক বেশী উপযোগী। নির্দিষ্ট পণ্যের বিশেষ সুবিধার জন্য বণিকরা পেনাঙ যাবে, কিন্তু অন্যথা নয়।

পেনাঙের দক্ষিণে ও পূর্বে আর একটি বন্দরের প্রয়োজন হয়েছিল মূলত দুটি কারণে। প্রথমত, ডচ নিয়ন্ত্রণ নীতির পুনরাবির্ভাব ইংরেজ ইস্ট ইনডিয়া কোমপানির কাম্য ছিল না। দ্বিতীয়ত, তারা মালয় দ্বীপপুঞ্জের বাণিজ্য প্রবাহের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত হতে চেয়েছিল।

নতুন বন্দর অন্বেষণের কাজে উদ্যোগ গ্রহণ করেন স্বয়ং রাফেলস। প্রথমে তিনি ডচদের স্বার্থ উপেক্ষা করে সুমাত্রায় ব্রিটিশ প্রভাব প্রসারিত করার চেষ্টা করেন। তাঁর বিরুদ্ধে ডচেরা নালিশ জানায়, ইংরেজ কোমপানিও তাঁকে এজন্য ভৎর্সনা করে। 1818 সালের অক্টোবর মাসে রাফেলস বাংলাদেশে এসে গভরণর-জেনারেল লর্ড হেস্টিংসের সঙ্গে দেখা করেন। আচেতে (Acheh) একটি ঘাঁটি এবং মালাক্কা প্রণালীর দক্ষিণতম অঞ্চলে একটি নতুন বসতি বিস্তারের পরিকল্পনা হেস্টিংস অনুমোদন করেন। মালাক্কা প্রণালীতে ব্রিটিশ জাহাজের অবাধ বিচরণ এবং কোমপানির পক্ষে একটি সুবিধাজনক বাণিজ্য-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, এই দুই উদ্দেশ্যে পরিকল্পনাটি গৃহীত হয়েছিল। একটি লিখিত নির্দেশে হেস্টিংস রাফেলসকে জানান যে রিও Rhio) বন্দরটি হবে এই দুই উদ্দেশ্যে খুবই সুবিধাজনক। রিও যদি ইতিমধ্যে ডচ কবলিত হয়, তাহলে সম্ভাব্য বিকল্প হবে জোহোর।

এ জন্য রাফেল্‌স্‌কে একটি ছোট রণতরী বাহিনী দেওয়া হয়েছিল। পেনাঙ থেকে অভিযান শুরু করার নির্দেশ ছিল। 1818 সালের ডিসেম্বর মাসে রাফেল্‌স্‌ কলকাতা থেকে পেনাঙ অভিমুখে রওনা হলেন। পেনাঙের গভরণর কর্ণেল ব্যানারম্যান (Colonel Bannerman) ছিলেন এই পরিকল্পনার বিরোধী। তিনি রাফেলসের যাত্রাপথে নানা ধরণের বাধা সৃষ্টির

চেষ্টা করলেন। একারণে রাফেল্‌স্‌ আচেতে যেতে পারলেন না, কিন্তু রিও অভিমুখে রওনা হলেন।

পেনাঙে রাফেলসের সঙ্গে মালাক্কার বিদায়ী রেসিডেন্ট উইলিয়ম ফারকুহারের (William Farquhar) দেখা হয়। মালাক্কায় অবস্থানের শেষ পর্বে তিনি সুমাত্রার সিয়াক, (Siak) এবং মালয় দ্বীপপুঞ্জের রিও (Rhio ও লিঙ্গ (Lingga) অঞ্চলের মালাই শাসকদের সঙ্গে ইংরেজ কোমপানির পক্ষে বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষর করেছিলেন। ক্যারিমন দ্বীপপুঞ্জে (Carimon Islands) ব্রিটিশ বসতি গড়ে তোলার সম্ভাবনার কথা তিনি ভেবেছিলেন। পেনাঙে থাকতেই রাফেল্‌স্‌ সংবাদ পেয়েছিলেন যে ওলন্দাজরা রিওতে একটি ঘাঁটি নির্মাণ করেছে এবং সেখানে একজন রেসিডেনটও নিয়োগ করেছে। ফারকুহার স্বাক্ষরিত চুক্তি ডচেরা বাতিল করে দিয়েছে। ইতিমধ্যে হেস্টিংসেরও মনে হয়েছে যে তিনি রাফেলসকে অবাধ স্বাধীনতা দিয়েছেন। নতুন কোন বসতি (Settlement) গড়ে না তোলার নির্দেশ তিনি পাঠালেন। এই নির্দেশ পেনাঙে পৌঁছয় খুব বিলম্বে।

যাহোক রাফেলসের রণতরী বাহিনী সিয়াকের (Siak) তীর অতিক্রম করে ক্যারিমন দ্বীপপুঞ্জে এসে পৌঁছয়। এই অঞ্চল তাদের মনে ধরে নি। তখন তারা সিঙ্গাপুরের দিকে রওনা হন।

রাফেলস ও ফারকুহার সিঙ্গাপুর দ্বীপের দক্ষিণ উপকূলে অবতরণ করলেন 1819 খ্রীষ্টাব্দের 29 জানুয়ারি। মালাই গোষ্ঠীর লোক সেখানে বসবাস করত। জোহোরের তেমেংগং (Temenggong) শাসন সেখানে চালু ছিল। 30 জানুয়ারি তেমেংগং ও রাফেলসের মধ্যে একটি প্রাথমিক চুক্তি সম্পাদিত হয়। চুক্তির শর্তানুযায়ী ইংরেজ কোমপানি সিঙ্গাপুরে বাণিজ্য কুঠি স্থাপনের অনুমতি পেল। তেমেংগং প্রতিশ্রুতি দিলেন যে তিনি অন্য কোন দেশের সঙ্গে চুক্তিবন্ধ হবেন না বা সেই দেশকে সিঙ্গাপুরে বসতি স্থাপন করতে দেবেন না। পরিবর্তে কোমপানি তাঁকে রক্ষা করবে এবং বছরে 3,000 ডলার দেবে। রাফেলস জানতেন যে জোহোরের সুলতানের অনুমোদন না পেলে তেমেংগং স্বাক্ষরিত চুক্তির কোন দাম নেই। কারণ নীতিগতভাবে তেমেংগং সার্বভৌম ছিলেন না, তিনি ছিলেন জোহোরের সুলতানের অধীন।

6 ফেব্রুয়ারি তারিখে দ্বিতীয় চুক্তি সম্পাদিত হয়। জোহোরের সুলতান, তেমেংগং এবং র‍্যাফেল্‌স্‌ ছিলেন এই চুক্তির স্বাক্ষরকারী। আগের চুক্তির মত এখানেও সুলতান এবং তেমেংগং প্রতিশ্রুতি দিলেন যে তারা অন্য কোন ইউরোপীয় বা আমেরিকার শক্তির সঙ্গে চুক্তিবন্ধ

হবে না। সিঙ্গাপুরে বাণিজ্যকুঠি স্থাপনের অধিকার পেল ইংরেজ কোমপানি। সিঙ্গাপুরে তাদের অবস্থানকালে সুলতান ও তেমেংগংকে ইংরেজরা রক্ষা করবে। জোহোরের আভ্যন্তরীন ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করবে বা আপদে বিপদে সুলতানের ক্ষমতাকে অস্ত্রবলে জিইয়ে রাখবে, এমন কোন প্রতিশ্রুতি ইংরেজ কোমপানি দেয় নি। সুলতানের বার্ষিক পেনসনের বরাদ্দ হল 5000 ডলার এবং তেমেংগঙ্গের 3000 ডলার। আঞ্চলিক জাহাজ সিঙ্গাপুর বন্দরে যে অর্থ দিত, তার অর্ধেক পাবে তেমেংগং—এও স্থিরীকৃত হয়।

সিঙ্গাপুরে ব্রিটিশ অধিকার বিনা প্রতিবাদে প্রতিষ্ঠিত হয় নি। এ বিষয়ে ডচদের অসন্তোষ ছিল খুবই তীব্র। সিঙ্গাপুর থেকে ব্রিটিশ শক্তির আশু প্রত্যাহার তারা উচ্চ কণ্ঠে দাবি করেছে। কলকাতায় গভরণর-জেনারেল-ও রাফেলসের কাজ অনুমোদন করেন নি। তাঁর ডচ বিরোধী নীতি হেস্টিংস পছন্দ করেন নি। বাটাভিয়া, মালাক্কা, পেনাঙ, বেনকুলেন, কলকাতা, লনডন এবং দি হেগ—সিঙ্গাপুরের ব্রিটিশ অধিকারের প্রশ্ন নিয়ে এই দেশগুলিব মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে পত্র বিনিময় চলেছিল। হেস্টিংসের পরামর্শ ছিল যে ইংলণ্ড ও হলান্ডের মধ্যে বিষয়টির নিষ্পত্তি হওয়া প্রয়োজন। এই প্রস্তাবে ডচদের সম্মতি ছিল। এ নিয়ে উভয় পক্ষেব আলোচনা বেশ কিছুদিন চলেছে, কিন্তু ব্রিটিশ শক্তি সিঙ্গাপুর ছেড়ে দেবে, এমন সম্ভাবনা ছিল না।

সিঙ্গাপুরের প্রথম রেসিডেন্ট ছিলেন ফারকুহার। প্রথম দু'তিন বছরের মধ্যে সেখানে বসতি বিস্তাব ঘটেছে, লোকসংখ্যা বেড়েছে এবং ব্যবসায় বেড়েছে। 1824 সালের জানুয়ারি মাসের একটি হিসেব মত সিঙ্গাপুবের লোকসংখ্যা ছিল দশ এগারো হাজার। এদেব মধ্যে অর্ধেকের কিছু কম ছিল মালাই গোষ্ঠীর লোক, এবং এক-তৃতীয়াংশ ছিল চীনা। অবাধ বাণিজ্য, প্রচুর জমি, ব্রিটিশ প্রদত্ত নিরাপত্তা, বন্দরের উপযোগী বিচিত্র রকমের কর্ম-সংস্থানের সুযোগ—এসব কারণে সিঙ্গাপুরে প্রচুর লোক সমাগম হয়েছিল। বোম্বে ও ক্যানটনের পথে যে সমস্ত জাহাজ চলাচল করত, সেগুলি সিঙ্গাপুর বন্দর ছুঁয়ে যেত। এখানে আসত চীনা জাঙ্ক, শ্যাম ও ত্রেংগানুর নৌকা এবং কখনো কখনো বাটাভিয়ার ওলন্দাজ তরী। মালয় উপদ্বীপের ও অন্যান্য দ্বীপের ছোট নৌকা নিয়ে আসত টিন, মশলা, গোলমরিচ, রজন বা জতু, বেতের ছড়ি, হাতে বোনা সারঙ, চাউল, পাখীর বাসা ও নারিকেল।

1820 সালে সিঙ্গাপুরে যে রাজস্ব আদায় হত, তা দিয়ে শাসনের ব্যয় নির্বাহ হত। 1822 সাল নাগাদ বাণিজ্যে সিঙ্গাপুর পেনাঙকে ছাড়িয়ে গেছে। পেনাঙের ব্যবসায় ছিল সুমাত্রার উপকূলের সঙ্গে বিশেষ করে উত্তর সুমাত্রা,

বর্মা ও পশ্চিম শ্যামের সঙ্গে। তাছাড়া চীনের সঙ্গেও সিঙ্গাপুরের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল। শ্যাম ও মালয়ের পূর্ব উপকূলের এবং জাভা ও সুমাত্রার পূর্ব উপকূলের সঙ্গেও সিঙ্গাপুরের যথেষ্ট বাণিজ্য ছিল। চীনের সঙ্গেও সিঙ্গাপুরের বাণিজ্য দিনে দিনে বেড়ে চলেছিল। বড় বড় চীনা জাহাজ পেনাঙ ছেড়ে সিঙ্গাপুরকেই বেশী পছন্দ করত।

1822 সালের অক্টোবর থেকে 1823 সালের জুন পর্যন্ত রাফেলস সিঙ্গাপুরে ছিলেন। সেখানকার সার্বিক বিকাশের জন্য তাঁর পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টা বিশেষ স্মর্তব্য। ইংরেজ আইনকে ভিত্তি করে তিনি সিঙ্গাপুরের আইন কাঠামো প্রণয়ন করেন। অবশ্য প্রচলিত প্রথাকে তিনি উপযুক্ত মর্যাদা দিয়েছিলেন। তিনি 12 জন বণিককে সাময়িকভাবে ম্যাজিস্ট্রেটরূপে নিয়োগ করেন, পুলিশ বাহিনী সৃষ্টি করেন, জমির তালিকা প্রণয়নের পরিকল্পনা করেন এবং নির্দিষ্ট সময়ের জন্য জমি ইজারা দেবার বন্দোবস্ত তিনি করেন। বন্দর পরিচালনার জন্য তিনি নিয়মকানুন রচনা করেন। তাছাড়া তিনি একটি বহু জাতিক সমিতির উপর প্রধান প্রধান সম্প্রদায়ের বাসগৃহ নির্মাণের স্থান নির্বাচনের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। ক্রীতদাস প্রথা ও জুয়া-খেলার বিরুদ্ধে তিনি শাস্তিদানের বিধান চালু করেন। সিঙ্গাপুরে প্রথম বোটানিকাল গার্ডেন এবং প্রথম কলেজ তিনিই স্থাপন করেন। চীন, শ্যাম ও মালাই গোষ্ঠীর ভাষাগুলি এই কলেজে শেখান হত।

1823 সালের জুন মাসে রাফেলস সুলতান হোসেন ও তেমেংগং-এর সঙ্গে চুক্তি করেন। চুক্তির শর্তানুযায়ী অতিরিক্ত পেনসনের বিনিময়ে সিঙ্গাপুরের যাবতীয় বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের অধিকার কোমপানি পায়। 1824 সালের আগস্ট মাসে ক্রফোর্ড (ফারকুহারের পর তিনিই ছিলেন রেসিডেনট) সুলতান এবং তেমেংগং-এর কাছ থেকে সমগ্র সিঙ্গাপুর দ্বীপের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা পেয়েছিলেন। এই কারণে সুলতান অর্থের পরিমাণ 33,200 ডলার এবং মাসিক বর্ধিত পেনসন 1300 ডলার এবং তেমেংগং অর্থের পরিমাণ 26,800 ডলার এবং মাসিক বর্ধিত পেনসন 700 ডলার পেয়েছিলেন। ব্রিটেন ও জোহোরের মধ্যে সামরিক ও রাজনৈতিক সম্পর্কের কোন উল্লেখ এই চুক্তিতে ছিল না।

ইতিমধ্যে ইংলণ্ড ও হল্যাণ্ডের মধ্যে লনডনে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয় (মার্চ 1824)। ব্রিটিশ-ওলন্দাজ সম্বন্ধের ইতিহাসে ভিয়েনা কংগ্রেসের পর লনডন চুক্তি হল একটি প্রধান পদক্ষেপ। চুক্তির শর্তগুলি নিচে উল্লেখ করা হল।

হল্যাণ্ড ব্রিটেনকে ছেড়ে দিল ভারতের যাবতীয় ডচ বাণিজ্য কুঠি, মালাক্কা

শহর ও দুর্গ এবং অধীন অঞ্চল সমূহ (dependencies)। ব্রিটিশ সিঙ্গাপুর বিষয়ে নানা অভিযোগ ও প্রতিরোধ হল্যান্ড প্রত্যাহার করে নিল। ইংলন্ড হল্যান্ডকে বেনকুলেন ফিরিয়ে দিল। মালয় উপদ্বীপের শাসকদের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন ও অন্য কোন বন্দোবস্ত না করার প্রতিশ্রুতি দিল হল্যান্ড। ইংলন্ডও সুমাত্রা এবং সিঙ্গাপুর প্রণালীর দক্ষিণে দ্বীপগুলি (Carimon ও Rhio-Lingga দ্বীপপুঞ্জ সহ) সম্পর্কে অনুরূপ প্রতিশ্রুতি দিল। উভয় দেশের জাহাজ নির্দিষ্ট শুল্ক দিয়ে বিনা বাধায় উভয় দেশের বন্দরে যাতায়াত করতে পারবে। মালয় উপদ্বীপে ওলন্দাজরা একচেটিয়া বাণিজ্য চালাবার চেষ্টা করবে না বা অসঙ্গতভাবে ব্রিটিশ বাণিজ্যের বিরুদ্ধাচারণ করবে না। এই ব্যতিক্রম করা হল যে ওলন্দাজরা অবশ্য মলুক্কার মশলা বাণিজ্য বিষয়ে একচেটিয়া অধিকার ভোগ করবে। সপ্তদশ শতকে ইউরোপের বাজারে মলুক্কার মশলার বিশেষ চাহিদা ছিল। উনিশ শতকে মশলা বাণিজ্যে মলুক্কার কোন গুরুত্ব ছিল না।

এই সময় বেনকুলেন ও মালাক্কা সমৃদ্ধ ছিল না। বেনকুলেনের বাণিজ্যিক সম্ভাবনা কোনদিনই সফল হতে পারে নি। মালাক্কার সম্ভাবনাকে ম্লান করে দিয়েছিল উত্তরে পেনাঙ এবং দক্ষিণে সিঙ্গাপুর। তাছাড়া মালাক্কার নদীর মুখে নিয়তই পলিমাটি জমেছিল বলে মালাক্কা বন্দর প্রায় অচল হয়ে পড়ছিল। মালাক্কা প্রণালীর মালয়ের দিকেই ইংলন্ডের তিনটি বাণিজ্যিক ঘাঁটি গড়ে উঠল। মালয় উপদ্বীপ থেকে ওলন্দাজ শক্তি সরে দাঁড়াল। মালয় রাজ্যগুলির সঙ্গে এই তিনটি বাণিজ্যিক ঘাঁটির যোগাযোগের ফলেই মালয় উপদ্বীপে ব্রিটিশ প্রভাব প্রতিপত্তি বেড়ে গেল। সুমাত্রা, মলাক্কা এবং সিঙ্গাপুরের দক্ষিণের দ্বীপগুলি থেকে ব্রিটিশ প্রভাব অন্তর্হিত হল বলে সেখানে ডচ বাণিজ্য ও প্রভাব প্রতিপত্তির ক্ষেত্র উন্মুক্ত হল। ফলে এই অঞ্চলে নেদারল্যানড ইসট ইনডিজ বা ইন্দোনেশিয়ার প্রাধান্য অর্জনের পথ প্রশস্ত হয়েছিল।

মালাক্কার অধীন যে সমস্ত অঞ্চল ব্রিটেনকে হস্তান্তরিত করা হয়েছিল, সেগুলির বিবরণ স্পষ্ট ভাষায় লিখিত হয় নি। যতদিন মালাক্কা ডচদের কুক্ষিগত ছিল, ততদিন তারা মাঝে মাঝে মালাক্কা/জোহোর অঞ্চলের অন্তর্গত অন্যান্য মালয় রাজ্যে প্রভুত্ব বিস্তারের চেষ্টা করেছে। এগুলির মধ্যে প্রধান হল জোহোর, সেলাংগোর এবং মিনাংকাবৌ রাজ্যগুলি। ডচেরা ভূমি দখলে আগ্রহী ছিল না। টিনের ব্যবসায় করায়ত্ত করা এবং বুগিস রাজ্যের ক্ষমতা প্রতিহত করাই তাদের লক্ষ্য ছিল। তাদের প্রভুত্বের অধিকার ছিল অস্পষ্ট। ইংরেজ ইসট ইনডিয়া কোমপানি এসব বিষয়ে উদাসীন ছিল। চুক্তি শর্তানুযায়ী

জোহোর ভাগ করা হয়। বরঞ্চ বলা ভাল জোহোরের বাস্তব বিভাজন চুক্তির মাধ্যমে চিরস্থায়ী স্বীকৃতি পায়। সিঙ্গাপুর ছিল ব্রিটিশ উপনিবেশ। উপদ্বীপের বা ভূভাগ স্থিত জোহোর ছিল ব্রিটিশ প্রভাবাধীন। Rhio-Lingga দ্বীপপুঞ্জে ডচ প্রভাবাধীন একজন সুলতান ছিলেন। সিঙ্গাপুর দ্বীপে ছিলেন একজন সুলতান এবং একজন তেমেংগং। পাহাঙ রাজ্যের শাসক ছিলেন একজন বেনদাহারা।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি ব্রুণির সুলতানের সঙ্গে ইংলণ্ডের সম্পর্ককে কেন্দ্র করে 1824 সালের চুক্তির পরস্পর বিরোধী ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছিল। প্রশ্ন উঠেছিল ব্রিটেনকে লাবুআন (Labuan) দেওয়া নিয়ে। ব্রিটেনের পক্ষে যুক্তি ছিল যে বোর্ণিওর এই অংশ সিঙ্গাপুর প্রণালীর উত্তরে অবস্থিত। ডচ সরকারের দাবির যুক্তি হচ্ছে যে বোর্ণিওর অনেকটা সিঙ্গাপুরের দক্ষিণে প্রসারিত। লনডনের চুক্তিতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় শান্তির পরিবেশ ফিরে এসেছিল। এই চুক্তির গুরুত্ব সুদূর প্রসারী ফলাফলে। উনিশ শতক ও বিশ শতকের প্রারম্ভে ইংরেজ ও ডচ উপনিবেশের যে রূপরেখা বিকশিত হয়েছিল তা লনডন চুক্তির সৃষ্টি।

শ্যাম দেশের সঙ্গে মালয় রাজ্যগুলির সম্পর্ক

সিঙ্গাপুর ছিল ব্রিটিশ রেসিডেনট শাসিত অঞ্চল। রেসিডেনট ছিলেন ভারতস্থিত কোমপানির কাউনসিলের প্রতি দায়িত্বশীল। রাফেলস যতদিন বেনকুলনে ছিলেন, সিঙ্গাপুরের রেসিডেনট তাঁর কাছ থেকেই নির্দেশ নিতেন। 1824 সালে রাফেলস ইংলণ্ডে চলে গেলেন। তখন থেকে সরাসরি ভারতবর্ষ থেকেই রেসিডেনট নির্দেশ নিতেন। 1824 সালে ডচ শাসন থেকে ইংরেজ শাসনে মালাক্কা হস্তান্তরিত হয়। তখন থেকে রেসিডেনট শাসিত অঞ্চলরূপে মালাক্কাও ভারতবর্ষের সঙ্গে যুক্ত হয়। পেনাঙ, মালাক্কা ও সিঙ্গাপুরের শাসন ব্যবস্থাকে ইসট ইনডিয়া কোমপানি একই ঐক্য সূত্রে আবদ্ধ করতে চেয়েছিল। 1826 সালে মালাক্কা ও সিঙ্গাপুর পেনাঙ প্রেসিডেনসির অন্তর্ভুক্ত হয়। তিনটি অঞ্চলেই একজন করে রেসিডেনট কাউনসিলার ছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনটি অঞ্চলেরই সামগ্রিক দায়িত্ব পেনাঙের গভর্ণরের হাতে ন্যস্ত হয়েছিল। প্রায় চার বছর এই আয়োজন বহাল ছিল।

1829 সালে গভরণর জেনারেল লর্ড বেনটিঙ্ক পেনাঙে আসেন। সেখানে উচ্চ বেতনের মাথাভারী শাসন কাঠামো দেখে তিনি অসন্তোষ প্রকাশ করেন। 1830 সালে পেনাঙও রেসিডেনসিতে অবনমিত হয়। পেনাঙ, মালাক্কা ও

সিঙ্গাপুর, তিনটি স্বতন্ত্র রেসিডেন্সি হিসাবে প্রত্যক্ষভাবে ভারতবর্ষের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। শাসনের সুবিধার জন্য সিদ্ধান্ত করা হল যে তিনটি অঞ্চলের জন্য একজন কেন্দ্রীয় প্রধান রেসিডেনট বা গভরণর থাকা উচিত। অনেকে এ ব্যাপারে পেনাঙকে উপযুক্ত ভাবলেন, কারণ পেনাঙ ছিল এই তিনটি অঞ্চলের মধ্যে সবচেয়ে পুরানো। পেনাঙ ও সিঙ্গাপুরের মধ্যে যাতায়াতের পথে মালাক্কা অবস্থিত। একারণে অনেকে মালাক্কাকে উপযুক্ত ভেবেছিলেন। কিন্তু সুদৃঢ় অর্থনীতি ও ক্রমবর্ধমান উন্নতির কথা ভেবে সিঙ্গাপুরকেই নির্বাচিত করা হল। 1832 সালে সিঙ্গাপুরের প্রধান অফিসার গভরণররূপে পরিচিত হলেন। তিনটি অঞ্চলই (Settlement) ছিল রেসিডেন্সি। তিনটি অঞ্চলের জন্যই নীতিনির্দেশ আসত ভারতবর্ষ থেকে। কিন্তু এই তিনটি রেসিডেন্সির মধ্যে, সিঙ্গাপুরের গভরণরের হাতে ন্যস্ত হয়েছিল কেন্দ্রীয় দায়িত্ব। স্ট্রেটস সেটেলমেনটস (Straits Settlements) কথাটি 1832 সাল থেকে চালু হয়েছিল। ঐ সময় থেকেই সিঙ্গাপুরের প্রধান অফিসার স্ট্রেটস সেটেলমেনটসের গভরণর রূপে পরিচিত হলেন।

এই সব পরিবর্তন যখন ঘটছে, তখন কেদা, পেরাক ও সেলাংগোর ইত্যাদি মালয় রাজ্যের উপর শ্যাম দেশ নানা চাপ সৃষ্টি করছিল। উনিশ শতকের প্রথম দিকে চাকরি (Chakri) বংশের শাসনাধীনে শ্যাম দেশ ছিল একটি বলবান রাষ্ট্র। তার রাজধানী ছিল ব্যাংকক। সীমান্ত সমীপবর্ত্তী মালয় রাজ্যগুলিকে শ্যাম দেশ তার আশ্রিত (vassal) অঞ্চল বলে ভাবত। ঐ সব দেশের বৈদেশিক নীতি ব্যাংককের নির্দেশে পরিচালিত হওয়া উচিত বা ঐ সব দেশের শাসনের রদবদলে শ্যাম সরকারের অনুমোদন থাকা উচিত, একথা ভাবত শ্যামদেশের কর্তৃপক্ষ। শ্যাম দেশকে না জানিয়েই কেদা যে প্রথমে পেনাঙ এবং পরে প্রভিনস ওয়েলেসলি ব্রিটিশদের হাতে ছেড়ে দিয়েছে, শ্যাম সরকার তা ভাল চোখে দেখেনি। তৎকালীন কেদার সুলতান আহমদ তাজুদ্দিন (1798—1843) শ্যামদেশের বিরুদ্ধে বর্মার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করছে, এ ধরণের সন্দেহ পোষণ করছিল শ্যামদেশের শাসকগোষ্ঠী।

আনুষঙ্গিক সমস্যাগুলির সমাধানের উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সরকারের দূত-রূপে ক্যাপটেন হেনরি বারণেকে (Burney) ব্যাংককে পাঠানো হল। সেখানে তিনি 1825 এর শেষ থেকে 1826 এর জুন মাস পর্যন্ত ছিলেন। তাঁর প্রতি গভরণর জেনারেলের নির্দেশ ছিল যে ইংরেজ কোমপানি এবং শ্যাম দেশের মধ্যে মৈত্রী স্থাপন হবে তাঁর দৌত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য। শ্যাম সরকারকে নিশ্চিন্ত করা প্রয়োজন যে ইঙ্গ-বর্মা যুদ্ধে ব্রিটিশের জয়লাভ শ্যাম

দেশে বা মালয় উপদ্বীপে ব্রিটিশের প্রসার বাসনা সূচিত করেনা। বাণিজ্যিক চুক্তি, কেদার সুলতানের ক্ষমতা প্রত্যর্পণ, পেরাক ও সেলাংগোরের স্বাধীনতা, ইত্যাদি ব্যাপারকে আলোচনায় গৌণ স্থান দিতে হবে।

পেনাঙের গভর্ণর রবার্ট ফুলারটোন (Robert Fullerton) ভিন্ন মত পোষণ করতেন। তিনি 1824 সালে পেনাঙের গভরণর পদে যোগ দেন। তিনি বলিষ্ঠ স্বাধীন নীতির উদ্‌গাতা ছিলেন। শ্যামদেশের বিরুদ্ধে আরও কঠোর মনোভাব অবলম্বনের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। বারণেব প্রতি তাঁর তিনটি নির্দেশ ছিল ঃ (i) মালয় রাজ্যগুলির স্বার্থজড়িত সমস্যা আলোচনায় প্রধান গুরুত্ব পাবে। (ii) শ্যাম দেশের কর্তৃত্বের প্রয়াস ও দাবির বিরুদ্ধে শক্ত মনোভাব গ্রহণ করতে হবে। (ii) সবচেয়ে বড় কথা মালয় রাজ্যগুলির অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে শ্যাম দেশের হস্তক্ষেপ প্রবণতাকে বাধা দিতে হবে।

যা হোক, বারণে মিশনের ফলে ইঙ্গ-শ্যাম চুক্তি বা ব্যাংকক চুক্তি (জুন 1826) স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির ধারা মতে স্থির হয় যে কেদার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা থাকবে শ্যাম সরকারের হাতে। সুলতান আহমদ তাজুদ্দিনকে পেনাঙ, প্রভিন্স ওয়েলেসলি, পেরাক, সেলাংগোর বা বর্মাতে আশ্রয় দেওয়া হবেনা। কেদার প্রাক্তন সুলতান বা তাঁর কোন অনুচর কেদা আক্রমণ করবেনা বা শ্যাম দেশ আক্রমণ করবেনা, ইংরেজরা এই প্রতিশ্রুতি দিল। ইংরেজরা আরও জানাল যে তারা পেরাককে অতিষ্ঠ করবেনা এবং সেলাংগোর যাতে পেরাক আক্রমণ না করে সেদিকে দৃষ্টি রাখবে। শ্যাম সরকার প্রতিশ্রুতি দিল যে তারা পেরাক ও সেলাংগোর আক্রমণ করবে না। কোমপানি জানাল যে পেরাক ও শ্যামদেশের মধ্যে যদি 40/50 জনের কূটনীতি মিশন বিনিময় হয়, তাহলে তারা হস্তক্ষেপ করবে না। পেরাকের সুলতান যদি পেরাকে 'বুঙ্গা মাস' (Burga Mas) পাঠাতে চায়, তাহলেও তারা আপত্তি জানাবে না।

বুঙ্গামাস কথাটির বাংলা হচ্ছে হিরন্ময় পুষ্প। উৎসবে অনুষ্ঠানে অন্যান্য উপহারের সঙ্গে রাজাকে দেওয়া হত স্বর্ণ ও কাঞ্চন নির্মিত পল্লব ও পত্রশোভিত চারাগাছ। প্রতি তিনবছর অন্তর কেদার সুলতান প্রথমে আয়ুথিয়ায় এবং পরে ব্যাংককে রাজদরবারে শ্যাম দেশের রাজার উদ্দেশ্যে এইসব উপহার পাঠাতেন। এই উপহার শ্যাম দেশের রাজা বশ্যতার অঙ্গীকার হিসাবে গ্রহণ করতেন। মালয়ের সুলতান কিন্তু উপহার বশ্যতার প্রতীক হিসাবে পাঠাতেন না। উত্তরাঞ্চলের পরাক্রান্ত প্রতিবেশী রাজ্যের

সঙ্গে মৈত্রী ও সখ্যতার নিদর্শনরূপে তিনি শ্যাম দেশের রাজার কাছে উপহার পাঠাতেন। কেদা রাজ্যের অধীশ্বর হিসাবে তিনি ছিলেন সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, কেদার সুলতান তা কখনই বিস্মৃত হননি। আসলে, সব কিছু নির্ভর করত বাস্তব পরিস্থিতির উপর। শ্যামদেশের দৈন্য দশার সময়, কেদার সুলতান হিরন্ময় পুষ্প পাঠাতে ভুলে যেতেন। শ্যাম দেশের পরাক্রম যখন তুঙ্গে, সুলতান তখন শুধু হিরন্ময় পুষ্পই নয়, অর্থ, লোকজন ও অন্যান্য জিনিসও পাঠাতেন। কেলানতন ও ত্রেংগানু সংক্রান্ত চুক্তির ধারা ছিল খুবই অস্পষ্ট। উভয় পক্ষই আপন স্বার্থে এই ধারাগুলিকে ব্যাখ্যা করেছে।

ইতিমধ্যে ক্যাপটেন James Low কে পেরাকের সুলতানের কাছে পাঠানো হল। তিনি ছিলেন পেনাঙের শ্যাম বিরোধী গোষ্ঠীর সমর্থক। 1826 সালের 8 অক্টোবর পেরাকের সুলতান আবদুল্লার সঙ্গে তিনি একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। শ্যামদেশ ও ভারতবর্ষে এই চুক্তি ছিল নিন্দিত, কিন্তু পেনাঙে ফুলারটোন কর্তৃক বন্দিত। সুলতান প্রতিশ্রুতি দিলেন যে শ্যাম দেশ-লিগোর, সেলাংগোর, বা অন্য কোন মালয় রাজ্যের সঙ্গে তাঁর রাজনৈতিক যোগাযোগ থাকবে না। এই সব রাষ্ট্রে তিনি 'বুঙ্গা মাস' বা অন্য কোন ধরণের কর পাঠাবেন না। এই সব রাষ্ট্র থেকে কোন দলকে তিনি পেরাকে অনুপ্রবেশ করতে দেবেন না। এইসব উদ্দেশ্যে প্রয়োজন মতো ব্রিটিশ সাহায্য তিনি পাবেন। 1825 সালের অ্যানডারসন চুক্তি (Anderson Treaty) অনুমোদিত হল। সুলতান ব্রিটেনকে দিলেন দিনদিংস তীরভূমিতে একখণ্ড জমি এবং পাংকোর (Pangkor) সহ কয়েকটি সমীপবর্তী দ্বীপপুঞ্জ।

1825 সালের অ্যানডারসন চুক্তি এবং 1826 সালের বারণে চুক্তি বলে শ্যাম দেশের বিরুদ্ধে কোমপানি পেয়েছিল পেরাক, সেলাংগোর, কেলানতন, ও ত্রেংগানু প্রতিরক্ষার দায়িত্ব। কিন্তু 'লো চুক্তির বলে কোমপানি পেল একটি মালয় রাজ্যের সঙ্গে সুদৃঢ় মৈত্রী ও বন্ধুত্বের সম্বন্ধ। উনিশ শতকের মধ্য ভাগে মলয়ের পশ্চিম উপকূলে শুধুমাত্র পারলিস ও কেদাতে শ্যাম দেশের প্রভাব নিবদ্ধ ছিল। এ দুটি দেশের নিজস্ব মালাই শাসক ছিল। তারা শ্যাম দেশের প্রতি নিছক প্রথাগত আনুগত্য দেখিয়েছে। পেরাক ও সেলাং-গোর ছিল স্বাধীন। কেলানতন ছিল নামমাত্র মালাই শাসকের অধীন। ত্রেংগানু শক্ত প্রতিরোধ দাঁড় করিয়েছিল। প্রতি তিনবছর অন্তর সে 'বুঙ্গা মাস' পাঠাত। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে ত্রেংগানু ছিল স্বাধীন। 1863 সাল নাগাদ পূর্বতীরের মালয় রাজ্য গুলিতে শ্যাম দেশের আগ্রাসী ভূমিকার অবসান হয়েছে বলা চলে।

মালয়ে ব্রিটিশ হস্তক্ষেপ

ভারতীয় স্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্রিটিশ কোমপানি স্ট্রেটস সেটেলমেনটস সম্পর্কে ভাবনাচিন্তা করেছিল। 1867 সাল পর্যন্ত ভারতবর্ষ থেকেই নীতিনির্দেশ যেত। বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচলের পথে মালাক্কা প্রণালীর অবস্থান। পেনাঙ, মালাক্কা ও সিঙ্গাপুর ছিল এই যাত্রাপথে শুধুমাত্র বিশ্রামকেন্দ্র বা রসদ সংগ্রহের আশ্রয়। মালয়ের অন্যান্য অংশে অনুপ্রবেশ করার বাসনা কোমপানির ছিল না। মালয় রাজ্যগুলি তাদেব কাছে ছিল অচেনা, অজানা ও বিপদসংকুল। অনিশ্চিত ফলের জন্য সামরিক ঝুঁকি নেওয়া কোমপানি যুক্তিযুক্ত মনে করে নি।

এ সত্ত্বেও, মালয় রাজ্যগুলির নানা ব্যাপারে ব্রিটিশ কোমপানি সক্রিয় নীতি গ্রহণ করেছে। আসলে, প্রচলিত স্বার্থ সুরক্ষার তাগিদ তারা প্রতি-নিয়তই অনুভব করেছে। সদাসর্বদাই তাদের আশঙ্কা ছিল যে বাণিজ্য ব্যাহত হতে পারে এবং খাদ্য সরবরাহ বিপর্যস্ত হতে পারে। শ্যাম রাজ্যের দিক থেকে রাজনৈতিক চাপেরও আতঙ্কময় সম্ভাবনা ছিল।

অন্যান্য কাবণেও স্ট্রেটস সেটেলমেনটসের সরকার মালয় উপদ্বীপের ব্যাপাবে হস্তক্ষেপ করেছে। ইতিমধ্যে স্ট্রেটস সেটেলমেনটসে অনেকেই জন্ম-গ্রহণ করেছে। জন্মসূত্রে তারা ব্রিটিশ নাগরিক অধিকারের সুযোগ সুবিধা দাবি করতে পারে। তাদের অধিকাংশই ছিল চীনা। পেরাক, সেলাংগোর, মিনাংকাবৌ রাজ্যগুলির টিনখনিতে নিযুক্ত অনেক শ্রমিক ও বণিক তাদের মধ্যে ছিল। লারুৎ, বা কুয়ালালামপুর বা সুংগি উজোং—এ কোন গোলযোগ ঘটলে পেনাঙ, মালাক্কা বা সিঙ্গাপুরের কাছে সাহায্য বা রক্ষণাবেক্ষণ বা ক্ষতি পূরণের জন্য আবেদন আসত। মালয়ের পশ্চিম উপকূলের বিশৃঙ্খলা দূরী-করণার্থে পেনাঙ ও সিঙ্গাপুরের বণিককুল ব্রিটিশ হস্তক্ষেপের জন্য বার বার করে আবেদন জানিয়েছিল।

গোপন সমিতিরগুলির মধ্যে পারস্পরিক হানাহানি পরিস্থিতিকে আরো জটিল ও ভয়াবহ করে তুলেছিল। ঘি হীন (Ghee Hin) ও হাইসান (Haisan) গোপন সমিতির সদর দপ্তর ছিল পেনাঙে। তাদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব অরাজক অবস্থা সৃষ্টি করেছিল। 1867 সালে জরজ টাউনে এই দুই বিবদমান গোষ্ঠী পথে ঘাটে প্রায়ই লড়াই করত। স্ট্রেটস সেটেলমেনটসে গোপন সমিতিগুলির হানাহানির জন্য খনি অঞ্চলের অবস্থা ছিল ভয়াবহ।

অরাজকতার সুযোগে জলদস্যুরাও তৎপর হয়ে উঠেছিল। চীন

থেকে স্ট্রেটস সেটেলমেনটসে যে সব চীনা জাংক নৌকা যাতায়াত করত সেগুলি এবং মালয় উপদ্বীপের ছোট ছোট নৌকাগুলি প্রায়ই আক্রান্ত হত। উনিশ শতকে ষাটের দশকে পেরাক ও সেলাংগোরের মধ্যে যুদ্ধের সময় এক পক্ষ আর এক পক্ষের বিরুদ্ধে জলদস্যুতা প্রশ্রয় দিয়েছে। রসদ ও খাদ্য সংগ্রহের জন্য জলদস্যুতাই ছিল তাদের প্রধান অবলম্বন।

1870 সাল নাগাদ মালয় উপদ্বীপের পশ্চিম উপকূলে নিত্যই উদ্বেগজনক ঘটনা ঘটছিল। লারুতে চীনাদের অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকাশ্য গৃহ যুদ্ধের রূপ নিয়েছিল। সেলাংগোরে চীনা ও নানা মালাই গোষ্ঠীর মধ্যে গৃহযুদ্ধ লেগেই থাকত। সুংগি উজোং অঞ্চলে দুটি মালাই গোষ্ঠীর মধ্যে হানাহানি চলছিল।

মালয় উপদ্বীপের নানা রাজ্যে, বিশেষ করে পেরাকে উত্তরাধিকার সমস্যার জন্য অবস্থা ছিল জটিল ও বিশৃঙ্খল। এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য সিঙ্গাপুর চেমবারস অব কমারস এবং বহু উদ্যোগী বণিক প্রায়ই লিখিতভাবে ব্রিটিশ হস্তক্ষেপের আবেদন জানিয়েছিল।

1871 সালে একটি কমিটি প্রস্তাব নেয় যে এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য মালয় রাজ্যগুলিতে রেসিডেনট নিয়োগ করা উচিত। 1872 সালে পেনাঙের লেফটেন্যানট গভরণর সার জর্জ ক্যামবেল (Sir George Campbell) লিখেছেন,

"I speak with diffidence, being so new to this portion of the East, but I think it worth consideration whether the appointment under a British Government of a British Resident or Political Agent for certain of the Malay States would not, as in India, have a markedly beneficial effect

1872 সালের ডিসেম্বর এবং 1873 সালের জুলাই মাসের লনডনের কলোনিয়াল অফিসের নির্দেশ থেকে এটুকু স্পষ্ট বোঝা গিয়েছিল যে শুধুমাত্র জলদস্যুতা দমনের কাজে ব্রিটিশ শক্তি মালয়ে হস্তক্ষেপ করতে পারে। কিছুদিন পরে অবশ্য কলোনিয়াল অফিস সুনির্দিষ্ট সতর্ক হস্তক্ষেপের নীতি গ্রহণ করেছিল।

1873 সালের নভেম্বর মাসে সিঙ্গাপুরে Sir Andrew Clarke নামে একজন নতুন গভরণর এলেন। কলোনিয়াল অফিস থেকে মালয় রাজ্যের অভ্যন্তরীণ অবস্থা বিষয়ে তাঁকে অনুসন্ধান করতে বলা হয়েছিল। শান্তি ফিরিয়ে আনা ও বাণিজ্য সুরক্ষার জন্য তাঁর কাছ থেকে সম্ভাব্য পন্থার

অনুমোদন চাওয়া হয়েছিল। তা ছাড়া কোন একটি রাজ্যে একটি ব্রিটিশ কর্মচারী নিয়োগ যুক্তিযুক্ত কিনা—(যার পিছনে আঞ্চলিক সরকারের পূর্ণ অনুমোদন থাকবে, ও স্ট্রেটস সেটেলমেনটস থেকে তার ব্যয় নির্বাহ হবে), এ বিষয়েও তাঁর মতামত চাওয়া হয়েছিল।

1858 সালে ইসট ইনডিয়া কোমপানির অধীন অঞ্চল লনডনের ইনডিয়া অফিসের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। 1867 সালে স্ট্রেটস সেটেলমেনটস ইনডিয়া অফিস থেকে কলোনিয়াল অফিসে হস্তান্তরিত হয়। 1858 সালের ব্যবস্থায় স্ট্রেটস সেটেলমেনটসকে ভারতবর্ষের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছিল। ভারতবর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে এগুলিকে, বিশেষ করে সামরিক দায়দায়িত্বের জন্য, ব্যয়বহুল বোঝা মনে করা হত। কিছু শাসনতান্ত্রিক এবং কিছু আর্থিক কারণে ভারত সরকার স্ট্রেটস সেটেলমেনটস অঞ্চলে ভারতীয় মুদ্রার প্রচলনে সচেষ্ট হয়েছিল এবং অবাধ বাণিজ্যের ব্যাপারেও হস্তক্ষেপ করতে প্রয়াসী হয়েছিল।

সিঙ্গাপুরের সমৃদ্ধির মূল কারণ হল অবাধ বাণিজ্য নীতি। সুতরাং এই নীতির পরিবর্তন সেখানকার শাসক ও বণিককুল ভাল চোখে দেখেনি। ভারত থেকে নানা ধরণের অপরাধীদের এখানে চালান করা হত। সিঙ্গাপুরে তা নিয়েও বিস্তর অভিযোগ ছিল। সিঙ্গাপুরের বণিককুল অর্থনৈতিক উদ্যোগের ক্ষেত্র হিসাবে মালয়কে উপযুক্ত মনে করেছিল। কিন্তু ভারতবর্ষের সঙ্গে যুক্ত থাকলে মালয় রাজ্যগুলির সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্বন্ধ গড়ে তোলা প্রায় অসম্ভব ছিল।

1867 সালে স্ট্রেটস সেটেলমেনটস কলোনিয়াল অফিসের দপ্তরে স্থানান্তরিত হলে দু'টি পরিবর্তন ঘটল। প্রথমত, বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে স্ট্রেটস সেটেলমেনটসের সমস্যাগুলি অনুধাবন করা সম্ভব হল। নিছক ভারতীয় উপমহাদেশের লেজুড় নয়, এই অঞ্চল এখন বিশ্বের মানচিত্রে স্বতন্ত্র উপনিবেশরূপে চিহ্নিত। বিশ্বের অন্যত্র ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে এই অঞ্চলের ভাগ্য এখন জড়িত। দ্বিতীয়ত, সিঙ্গাপুরের সদাগর গোষ্ঠী, বিশেষ করে চেমবারস অব কমার্স মালয় রাজ্যগুলিতে অনুকূল বাণিজ্যিক পরিবেশ সৃষ্টির জন্য চাপ দিতে সক্ষম হয়েছিল।

1860 এর দশকের শেষের দিকে একাধিক কারণে সিঙ্গাপুরের বণিকরা নিরাপত্তার অভাব বোধ করছিল। কলোনিয়াল অফিসও ছিল একারণে উদ্বিগ্ন। নেদারল্যানড ইসট ইনডিজে ডচ শাসন প্রসারিত হয়েছিল। ডচ-নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে উপকূলবর্তী বাণিজ্যে ব্রিটিশ পতাকাবাহী জাহাজের প্রবেশ নির্বিন্ধ ছিল। ব্রিটিশ মালপত্তরের উপর ধার্য শুল্ক ছিল বৈষম্যমূলক।

1824 সালের ইঙ্গ-ডচ চুক্তির পরে ডচদের রাজনৈতিক প্রভাবের এলাকা ছিল প্রসার্যমান। 1865 সাল নাগাদ সুমাত্রায় ডচ নিয়ন্ত্রণ আচের (Ácheh) দক্ষিণ সীমা পর্যন্ত পৌঁছেছিল। 1871 সাল নাগাদ এটুকু স্পষ্ট যে সমগ্র দ্বীপটি কালক্রমে ডচ শাসনের অধীনে চলে আসবে।

1850 এর দশকের শেষ দিকে ইন্দোচীনে ফরাসী সাম্রাজ্যের প্রসার নীতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 1870-71 সালে ইউরোপে ফরাসীদের পরাজয়ের পর এশিয়ায় সাম্রাজ্য বিস্তার নীতিকে তারা হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের একটি সহজ পথ বলে মেনে নেয়।

1869 সালে সুয়েজ খাল উন্মুক্ত হলে প্রাচ্যে ইউরোপীয় বাণিজ্যের পথ প্রশস্ত হল। পশ্চিম ইউরোপের উৎপন্ন দ্রব্যের জন্য এবং কাচামাল সংগ্রহের জন্য অতিরিক্ত বাজারের অনুসন্ধানে তারা আত্মনিয়োগ করেছিল।

মালয় রাজ্যগুলিতে বিশৃঙ্খলা ছিল উদ্বেগজনক। মালয় উপদ্বীপে অন্যান্য ইউরোপীয় শক্তিগুলির হস্তক্ষেপের যথেষ্ট আশঙ্কা ছিল। এখানে ব্রিটিশ বাণিজ্যিক স্বার্থ ছিল ক্রমবর্ধমান। তাই সিঙ্গাপুরের বণিক শ্রেণী, বাণিজ্যের সম্প্রসারণ, মূলধন বিনিয়োগ এবং প্রাকৃতিক সম্পদ বিকাশের অনুকূল সুশৃঙ্খল শান্তিপূর্ণ অবস্থার জন্য দাবি জানাচ্ছিল।

রেসিডেন্ট প্রথা প্রবর্তন

Sir Andrew Clarke রাজ্যের অভ্যন্তরীন বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার পরম্পরাগত ব্রিটিশ নীতির অবসান ঘটান। 1874 সালে তিনি মালয় রাজ্যে রেসিডেন্ট ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। ঐ বছরে জানুআরি মাসে পেরাক নদীর মোহনায় পাংকোর দ্বীপে তিনি পেরাক রাজ্যের প্রধান কর্তাব্যক্তিদের একটি সভা ডাকেন। সেই সভায় তিনি আবদুল্লাকে পেরাকের বৈধ শাসক-রূপে স্বীকৃতি জানান।

এই সভায় পাংকোর চুক্তি নামে খ্যাত একটি মহামূল্য দলিল গৃহীত হয়। চুক্তির শর্তানুযায়ী পেরাকের সুলতান তাঁর দরবারে একজন ব্রিটিশ রেসিডেন্ট রাখতে সম্মত হন। রেসিডেন্ট ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্যই পাংকোর চুক্তি প্রসিদ্ধ। এই চুক্তির 6 ধারায় বলা হয়েছে যে সুলতান তাঁর দরবারে প্রেরিত ব্রিটিশ রাজকর্মচারীর জন্য উপযুক্ত গৃহের বন্দোবস্ত করবেন। ব্রিটিশ রাজকর্মচারী রেসিডেন্ট নামে পরিচিত হবেন। শুধুমাত্র ধর্ম ও দেশীয় প্রথা ছাড়া প্রায় সব বিষয়েই রেসিডেন্টের পরামর্শমত সুলতান রাজ্য পরিচালনা করবেন। চুক্তির 10 ধারায় বলা হয়েছে যে, দেশের সাধারণ

প্রশাসন ও সমস্ত রাজস্ব ব্যবস্থা রেসিডেন্টের পরামর্শমত নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হবে।

1874 সালের প্যাংকো'র চুক্তির শর্তানুযায়ী স্টেটস রাজ্যগুলিতে ব্রিটিশ রেসিডেন্ট নিয়োগ করা হয়। কিন্তু রেসিডেন্ট ব্যবস্থাকে ফলপ্রসূ করার জন্য কোন নিয়ম কানুন রচিত হয় নি, কোন রীতিনীতিও গড়ে ওঠে নি। রেসিডেন্ট প্রথা কার্যকরী হবে কি না, তা নির্ভর করবে দুটি শর্তের উপর। প্রথম- মলয় রাজ্যগুলির কর্তৃপক্ষ কতটা উপদেশ চান এবং দ্বিতীয়ত, স্টেটস সরকারের কাছ থেকে রেসিডেন্টরা কতটা সমর্থন আদায় করতে পারেন। প্যাংকোর চুক্তিমত রেসিডেন্টদের উপদেশ দানের অধিকার ছিল খুবই সীমাবদ্ধ। মালয়ের ধর্ম ও প্রথাসিদ্ধ বিধিনিষেধ বিষয়ে তাঁর পরামর্শ দেবার অধিকার ছিল না। অথচ মালয় রাজ্যগুলিতে রাজস্বনীতি ও সাধারণ শাসন ব্যবস্থা ছিল প্রথাসিদ্ধ নিয়মকানুন দ্বারা পরিচালিত। সেখানে প্রথামত রাজস্ব ছিল সুলতান ও তার প্রধান অনুচরদের ব্যক্তিগত আয়। তাছাড়া অনেকগুলি শাসন দপ্তরে বংশানুক্রমিক দাবির পিছনে ছিল প্রথাগত নিয়ম কানুনের সমর্থন।

রেসিডেন্টের পরামর্শ মেনে চলার ব্যাপারে সুলতানের আগ্রহ থাকলেও, সেই উপদেশ বাস্তবে রূপায়িত করার পথে যথেষ্ট বাধা ছিল। মালয় রাজ্যগুলির শাসন ব্যবস্থা কেন্দ্রীভূত ছিল না। তাদের আমলাতন্ত্র ছিল না। রেসিডেন্টের সামনে দুটি পথ খোলা ছিল : হয় কিছু না করা অথবা নিজের পরামর্শ বা মতামত নিজেই উদ্যোগী হয়ে কার্যকর করা। নিজেই উদ্যোগী হলে, তিনি আর পরামর্শদাতা থাকছেন না, সরকারী আমলা হয়ে যাচ্ছেন।

সাধারণ মানুষ একথা ভাবত যে বিদেশী রেসিডেন্ট মালয়ের জীবনযাত্রা সম্পর্কে অজ্ঞ। শুধুমাত্র অর্থ রোজগারের মতলব নিয়ে তিনি সেখানে এসেছেন। ব্যক্তিগত জমি জমা ও ব্যক্তিগত সুযোগ সুবিধার বাইরে মালয়ের রাষ্ট্রনায়করা অন্য কিছুই ভাবতে পারতেন না। সম্পত্তি ও সুযোগ সুবিধার অধিকারে কেউ হস্তক্ষেপ করতে চাইলে, প্রতিবন্ধকতা ছিল অবশ্যম্ভাবী। আধুনিক নৈর্ব্যক্তিক প্রতিষ্ঠানরূপে রাষ্ট্র কল্পনা তৎকালীন মালয়ে ছিল না।

1874 থেকে 1895 সালের মধ্যে পেরাক, সেলাংগোর, নেগ্রি সেমবিলান এবং পাহাঙে রেসিডেন্ট ব্যবস্থা সুদৃঢ় রূপ নিয়েছিল। এই চারটি মধ্য মালয় রাজ্যে এইভাবে পরোক্ষভাবে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

শাসনতান্ত্রিক সুবিধার জন্য এই চারটি রাজ্য নিয়ে একটি যৌথ সংগঠন সম্ভব কি না, তা নিয়েও ভাবনা চিন্তা শুরু হয়ে গেল। চারটি মালয় রাজ্যে ব্রিটিশ রেসিডেন্ট প্রথাকে অনেকে রাজনৈতিক বিপ্লবরূপে অভিহিত করেছেন। এই রাজনৈতিক বিপ্লব থেকেই আধুনিক মালয় বা মালয়েশিয়ার জন্ম। রাষ্ট্রিক কাঠামো ও শাসন কার্যে আমূল পরিবর্তন এনেছিল বলেই, তা বিপ্লব রূপে চিহ্নিত হতে পারে। উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে মালয় রাজ্যগুলির অর্থনৈতিক জীবনেও মৌলিক পরিবর্তন শুরু হল। নতুন সামাজিক শ্রেণীর উদ্ভব হল। খনি থেকে টিন উত্তোলন ও টিন গলানো শিল্পের বিপুল প্রসার ঘটল। সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর মূলধন বিনিয়োগের সম্ভাবনাও বেড়ে গেল।

শাসনতান্ত্রিক রূপান্তর (1895-1941)

1893 সালে স্ট্রেট্স্ সেটেলমেন্টসের গভর্ণর সার সিসিল ক্লেমেন্টি স্মিথের (Sir Cecil Clementi Smith) কাছে যে সব রাজ্যে ব্রিটিশ রেসিডেন্ট আছে, সেগুলি নিয়ে একটি যুক্তরাষ্ট গঠনের পরিকল্পনা সুইটেনহাম (Sweetenham) পেশ করেন। খসড়া পরিকল্পনাটি লন্ডনে সেক্রেটারি অব স্টেট ফর কলোনিজ-এর কাছে পাঠান হয়। স্মিথের পর স্ট্রেট্স্ সেটেলমেন্টসের গভর্ণর হন সার চার্লস মিচেল (Sir Charles) Mitchell)। 1895 সালে মিচেল অনুমোদন করেন যে মালয় রাজ্য গুলির শাসকদের সম্মতি থাকলে যুক্তরাষ্ট্র গঠনের খসড়া পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত। লনডনের কলোনিয়াল অফিস মিচেলের অনুমোদন সমর্থন করেন।

মালয়ে যুক্তরাষ্ট্র পরিকল্পনার পিছনে অনেকগুলি যুক্তি ছিল। চারটি রাজ্যের মধ্যে এবং রাজ্যগুলির রেসিডেন্টদের মধ্যে যোগাযোগ ছিল সীমিত এবং অনিশ্চিত। প্রত্যেক রেসিডেন্ট হয়ত একই ধরণের নীতি অনুসরণের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তাদের মধ্যে পারস্পরিক আলোচনার ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের কোন সুযোগ ছিল না। সিঙ্গাপুর থেকে রেসিডেন্টদের নিয়ন্ত্রণ করাও সহজ সাধ্য ছিল না। অনেকে ভেবেছিলেন যে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হলে প্রত্যেকটি রাজ্যে বিচার বিভাগ, কর-কাঠামো, ভূমি-বন্টন ও আন্তঃ রাজ্য যোগাযোগ গড়ে তোলার ব্যাপারে সমতা বজায় রাখা সম্ভব হবে। এ কারণে যুক্তরাষ্ট্র পরিকল্পনায় একটি ব্রিটিশ 'রেসিডেন্ট-জেনারেল' পদ সৃষ্টির প্রস্তাব করা হয়েছিল। তার মূল দায়িত্ব ছিল প্রতি রেসিডেন্টের মাধ্যমে

চারটি রাজ্যের শাসনকার্য তত্ত্বাবধান করা। রেসিডেন্ট-জেনারেলের কার্যাবলী তত্ত্বাবধান করতেন স্ট্রেটস সেটেলমেন্টসের গভর্ণর। ফেডারেডেট মালয় স্টেটস এর হাই কমিশনার (High Commissioner for the Federated Malay Stotes) নামে তিনি পরিচিত হলেন। বিভাগীয় প্রধানদের নিয়ে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় আমলা বাহিনী (Federal Civil Service) গঠন করা হয়। আইন প্রণয়নের জন্য বা অর্থ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেবার জন্য কোন যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ (Federal Council) গঠন করা হয় নি। প্রস্তাব করা হয়েছিল যে চারটি রাজ্যের প্রত্যেকটিতে রাজ্য পরিষদ (State Council) সমজাতীয় ধারা বা শর্ত সমন্বিত আইন প্রণয়ন করবে। যুক্তরাষ্ট্র পরিকল্পনায় একথা স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছিল যে নীতিগত ভাবে স্ব স্ব রাজ্যে শাসকদের এবং রাজ্য পরিষদের ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ করা হবে না। চারটি রাজ্যের শাসকবর্গ সানন্দে এই সব প্রস্তাব মেনে নিয়েছিলেন। তাঁরা মনে করেছিলেন যে যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হলে তাঁদের সম্মান ও মর্যাদা বাড়বে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুযোগ আসবে এবং বিভিন্ন রাজ্যগত বিবাদ ও সংঘর্ষ কমবে। সমৃদ্ধ রাজ্যের শাসক হিসাবে পেরাক ও সেলাংগোর-এর সুলতানদ্বয় নেগ্রি সেম্বিলান ও পাহাঙকে কিছু অর্থনৈতিক সাহায্য দিতে সম্মত হয়েছিলেন।

1896 সালের 1 জুলাই মালয় যুক্তরাষ্ট্র, 'দি ফেডারেটেড মালয় স্টেটস' (FMS) নামে গঠিত হয়েছিল। রেসিডেন্ট-জেনারেল এবং বিভাগীয় প্রধানদেব সদর দপ্তর কুআলা-লুম্পুরে স্থাপিত হয়েছিল। অর্থাৎ কুআলা-লুম্পুর ছিল মালয় যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী। রেসিডেন্ট-জেনারেল পদে প্রথম অধিষ্ঠিত হলেন সুইটেনহাম। কুআলা-লুম্পুরে তিনি অনেকগুলি বিভাগীয় সদর দপ্তর গড়ে তুললেন। 1897 সালের জুলাই মাসে কুআলা-কংসরে রাজ্যগুলির শাসকদের প্রথম সম্মেলন বসে। এই সম্মেলন প্রায় এক সপ্তাহ ধরে চলেছিল। শাসকদের সর্বপ্রথম মিলিত সভা রূপে এবং পরামর্শদাতা সমিতি হিসাবে প্রথম সম্মেলনের বিশেষ গুরুত্ব ছিল। সম্মেলনের প্রস্তাবগুলি আইনে রূপায়িত করার উদ্দেশ্যে রাজ্য-পরিষদে (State Councils) পঠন হয়েছিল। ফলে রাজ্য পরিষদের স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ভূমিকা নিষ্প্রভ হয়ে পড়ল। দৈনন্দিন শাসন সংক্রান্ত নীতি কুআলা-লুম্পুরের আমলাতন্ত্র নিয়ন্ত্রণ করতে লাগল এবং শাসক সম্মেলনের পরামর্শকে রাজ্য পরিষদ আইনের রূপ দিল। সামগ্রিকভাবে শাসন ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করার প্রবণতা বেড়ে গেল। শাসকদের দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় 1903 সালে কুআলা-লুম্পুরে। এই সম্মেলনে মালয়ের শাসন সংগঠনে

ব্রিটিশ অবদানের সুখ্যাতি করে এবং শাসন ক্ষমতার মাত্রাতিরিক্ত কেন্দ্রীকরণ নীতির সমালোচনা করে পেরাকের সুলতান বক্তৃতা দেন।

মালয় যুক্তরাষ্ট্রের অগ্রগতি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। রেলপথের প্রসার ঘটেছে। একই ধরণের ভূমি-আইন ও খনি-আইন রাজ্যগুলিতে চালু করা হয়েছে। সরকারী উদ্যোগে পেরাকে জমি জরিপের কাজ শুরু হয়েছে। রাজ্যগুলিতে কৃষি, বনসম্পদ ও চিকিৎসা বিজ্ঞান বিষয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা উৎসাহিত হয়েছে। 1891 সালে চারটি রাজ্যে 424,218 ছিল মোট জনসংখ্যা। দশ বছর পরে, অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হবার পাঁচ বছর পরে, জনসংখ্যা বেড়ে মোট 678, 595 হয়েছে। 1895 থেকে 1905 সালের মধ্যে চারটি রাজ্যের মোট রাজস্ব 8 মিলিয়ন ডলার থেকে 24 মিলিয়ন ডলার হয়েছে। ডাক ও তার বিভাগের অভাবনীয় উন্নতি ঘটেছে। প্রতি ক্ষেত্রে টেলিগ্রাফের তার 2,000 মাইল ব্যাপ্ত হয়েছে এবং 10 মিলিয়ন চিঠিপত্র চারটি রাজ্যে বিলি করা হয়েছে। 1904 সালে 13,000 ছাত্র বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে। সড়ক, রেলপথ এবং হাসপাতালের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটেছে।

এই সমস্ত অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন যে যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হবার ফলেই হয়েছে, তা মনে করা সংগত নয়। টিন-খনি ও কৃষি-খামারের উন্নতি এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি যুক্তরাষ্ট্র গঠিত না হলেও ঘটত। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন কাঠামোর জন্য পথঘাট ও যোগাযোগ ব্যবস্থার দ্রুত উন্নতি সম্ভব হয়েছে এবং সাধারণ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গবেষণার পথ সুগম হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার রাজনৈতিক ফলাফল বিশেষভাবে সমালোচিত হয়েছে। একথা সত্য যে প্রকৃত যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয় নি। যদিও মাঝে মাঝে চারটি রাজ্যের শাসক, বিভাগীয় প্রধান এবং রাজ্য পরিষদের (State) Council) সদস্যরা সম্মেলনে মিলিত হয়ে আলাপ আলোচনা করেছেন, কিন্তু সম্মেলন গুলির আইন প্রণয়ণের ক্ষমতা ছিল না। যুক্তরাষ্ট্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে ক্ষমতা বিভাজনের সুনির্দিষ্ট সীমারেখা চিহ্নিত করা হয় নি।

তা ছাড়া এককভাবে রেসিডেন্ট-জেনারেলের হাতে সর্বময় কর্তৃত্ব ন্যস্ত করা হয়েছিল। নীতিগত ভাবে না হোক, বাস্তব পরিস্থিতিতে রাজ্য পরিষদগুলি (State Councils) দুর্বল হয়ে পড়েছিল। শাসকরাও শাসন সংক্রান্ত দায় দায়িত্ব থেকে দূরে সরে দাঁড়িয়েছিলেন। নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে সম্মেলন আহ্বানের বাধ্যতামূলক নির্দেশ ছিল না এবং বিধিমাফিক আয়োজনও ছিল না। দুটি সম্মেলনের মধ্যবর্তী সময়ে অনেক কিছু ঘটে যেত। এই সব ঘটনা নিয়ে চারটি রাজ্যের শাসক তাৎক্ষণিক আলাপ

আলোচনার সুযোগ পেতেন না। শুধুমাত্র চারটি রাজ্যের শাসকবৃন্দ নয় বা রাজ্য পরিষদের সদস্যবৃন্দ নয়, খনি, বাণিজ্য ও কৃষির সঙ্গে সম্পর্কিত সবাই ভাবত যে শাসন কাজে তাঁদের সক্রিয় ভূমিকা থাকা উচিত এবং শাসন দপ্তরে তাদের প্রতিনিধিও থাকা সঙ্গত। শাসনতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক কারণে মালয় যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনায় নানা ধরণের ত্রুটি বিচ্যুতি ছিল এবং বিভিন্ন শ্রেণীর মনুষের মনে অসন্তোষ জমা হয়েছিল।

এ কারণে 1909 সালে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ (Federal Council) গঠন করা হয়। চারটি রাজ্যের সুলতানের সম্মতি নিয়ে সিঙ্গাপুরের সার জন অ্যানডার্সনের (Sir John Anderson) উদ্যোগে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ গঠিত হয়েছিল। এই পরিষদের সভাপতি ছিলেন হাই কমিশনার অর্থাৎ স্ট্রেটস্ সেটেলমেন্টসের গভর্ণর। অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে ছিলেন চার রাজ্যের সুলতান, চার রেসিডেন্ট, রেসিডেন্ট জেনারেল এবং হাই কমিশনার মনোনীত ও ব্রিটিশ রাজসরকার সমর্থিত চারজন বেসরকারী সদস্য। যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্য হিসাবে শাসন বিভাগীয় প্রধানদের (Heads of Administrative Departments) হাই কমিশনার ইচ্ছামত গ্রহণ করতে পারতেন, কিন্তু তাহলে বাণিজ্য, শিল্প ও কৃষি থেকে আরও চারজন বেসরকারী সদস্য গ্রহণ করা তাঁর পক্ষে বাধ্যতামূলক ছিল। রেসিডেন্ট-জেনারেলের পদের নাম পরিবর্তন করে রাখা হল চিফ সেক্রেটারি। তিনি যে হাই কমিশনারের অধস্তন কর্মচারী, তা বোঝাবার জন্যই পদের নাম পরিবর্তন করা হয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের অধিবেশন বসত বছরে একবার। প্রতি রাজ্যের আয় ব্যয়ের খসড়া হিসাব পরীক্ষা করে দেখত এই পরিষদ। প্রায় সব গুরুত্বপূর্ণ নীতি নিয়ন্ত্রণ করত যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ। রাজ্য পরিষদগুলির (State Councils) এক্তিয়ারভুক্ত ছিল শুধুমাত্র ইসলাম ধর্ম, মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা এবং বিদেশী অপরাধীর নির্বাসন সংক্রান্ত বিষয়গুলি। হাই কমিশনার অবশ্য ইচ্ছে করলে রাজ্য পরিষদকে অন্যান্য বিষয় আলোচনার সুযোগ দিতে পারতেন।

শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ ছিল একটি বিচিত্র ধরণের পরীক্ষা। এই সংগঠনের সভাপতি ছিলেন প্রতিবেশী উপনিবেশের গভর্ণর। বেসরকারী সদস্যদের জন্য প্রয়োজন হত ব্রিটিশ সরকারের অনুমোদন, কিন্তু সুলতানদের অনুমোদন নয়। চারজন সুলতান ছিলেন পরিষদের সাধারণ সদস্য। আইনের প্রস্তাব নাকচ (veto) করার কোন অধিকার তাদের ছিল না। তারা উপস্থিত না থাকলেও যথারীতি পরিষদের বৈঠক বসত। সেখানে আলাপ আলোচনা বিতর্কে অংশ নেবার অধিকার

তাদের ছিল। কিন্তু পরম্পরাগত শাসক হিসাবে সম্মান ও মর্যাদা হানির ভয়ে অনেক সময় তারা নীরব দর্শক হয়ে বসে থাকতেন, অথবা আদৌ আলোচনায় অংশ নিতেন না বা সভায় উপস্থিত থাকতেন না। যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের আইনে স্বাক্ষর করতেন হাই কমিশনার। এই পরিষদে অবশ্য বেসরকারী মতামত প্রতিফলিত হয়েছিল। চারজন বেসরকারী সদস্যের মধ্যে তিনজন ব্রিটিশ, আর একজন চীনা। রাজ্য পরিষদের ও সুলতানদের ক্ষমতা সঙ্কুচিত হয়েছিল এবং মালাইদের প্রতিনিধিত্ব হ্রাস পেয়েছিল। যুক্ত-রাষ্ট্রীয় পরিষদ ফেডারেটেড মালয় স্টেটসকে নিবিড়ভাবে সিঙ্গাপুরের সঙ্গে শিকলবন্ধ করেছিল। এ ব্যাপারে হাই কমিশনার এবং চিফ সেক্রেটারি ছিলেন দুটি অঞ্চলের মধ্যে অসম সম্বন্ধ ও যোগাযোগের মাধ্যম। ফেডারেটেড মালয় স্টেটস এবং সিঙ্গাপুরের মধ্যে অসম সম্বন্ধের প্রতীক ছিলেন চিফ সেক্রেটারি। তাই এই পদের পরিবর্তিত নামকরণ মালয়বাসীর মনঃপূত ছিল না।

ফেডারেটেড মালয় স্টেটসের রাজনৈতিক অসন্তোষ ও অভিযোগ উচ্চ-কণ্ঠে ধ্বনিত হয় নি। কারণ দেশে তখন শান্তি, শৃঙ্খলা ও সমৃদ্ধি ছিল বিরাজমান। বর্তমান শতকের বিশের দশকে বাণিজ্য ও রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে মন্দা সৃষ্টি হয়। ফলে সরকারের বিরুদ্ধে তিক্ততা বাড়ে। 1909 সালের পর থেকে ফেডারেটেড মালয় স্টেটস এবং স্ট্রেটস সেটেলমেন্টসের ব্রিটিশ রাজকর্মচারীরা মনে করেছিল, যে সমস্ত রাজ্য যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভূত নয়, অনতিবিলম্বে তারা যুক্তরাষ্ট্রের সদস্য হবে। জোহোর সহ এই সব অ-যুক্তরাষ্ট্রীয় রাজ্যগুলির নিজস্ব পরিষদ ছিল। যদিও এই রাজ্যগুলি ব্রিটিশ সরকারের পরামর্শে পরিচালিত হত, কিন্তু এগুলি যথেষ্ট স্বাধীনতা ভোগ করত। ফেডারেটেড মালয় স্টেটসের সুলতানরা তাদের স্ব স্ব রাজ্যের স্বাধীনতা ফিরে পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন।

স্ট্রেটস সেটেলমেন্টসে অনেকেই একথা ভাবতে শুরু করেছিলেন যে ফেডারেটেড মালয় স্টেটসে বিকেন্দ্রীকরণ নীতি অনুসৃত হলে অন্যান্য রাজ্য-গুলিও যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভূত হবার জন্য উৎসাহিত বোধ করবে। এই পটভূমিকায় 1927 সালে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের পুনর্গঠন করা হয়েছিল। এ বিষয়ে উদ্যোক্তা ছিলেন স্ট্রেটস সেটেলমেন্টসের গভর্ণর সার লরেন্স গিলমার্ড (Sir Lawrence Guillemard)। এই সময় যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদে আটজন ছিলেন বেসকারী সদস্য। এদের মধ্যে পাঁচজন ইউরোপীয় ছিলেন, দুইজন চীনা এবং একজন মালাই। গিলমার্ড সরকারী সদস্যদের সংখ্যা বাড়িয়ে করলেন তেরো এবং বেসরকারী সদস্যদের সংখ্যা এগারো। বিভাগীয়

প্রধানরা (Heads of Departments) পরিষদে আসন পেলেন। কিন্তু চারজন সুলতান আসন হারালেন। হাই কমিশনার ও চিফ সেক্রেটারির সঙ্গে চারজন সুলতানের বার্ষিক বৈঠক বসত। আসলে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের আগামী সভার কার্যসূচি রেসিডেন্টরা আলোচনা করতেন সুলতানদের সঙ্গে।

1930 এর দশকে আরও কিছু পরিবর্তন ঘটেছিল। চিফ সেক্রেটারির নামকরণ করা হল ফেডারেল সেক্রেটারি। রেসিডেন্টদের উপর প্রভুত্ব তিনি হারালেন। তিনি হলেন নিছক সংযোগরক্ষক কর্মচারী। কৃষি, শিক্ষা, চিকিৎসা ও পূর্ত বিভাগ সংক্রান্ত কাজের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা রাজ্য পরিষদগুলির হাতে ন্যস্ত হল। যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদে পেশ করার জন্য স্ব স্ব রাজ্যের বজেট প্রস্তুত করার দায়িত্ব রাজ্য পরিষদগুলির উপর অর্পিত হল। পুলিশ-শুল্ক, সামরিক প্রতিরক্ষা ও সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ সংক্রান্ত বিষয়গুলির দায়িত্ব যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের হাতেই থাকল। আইন প্রণয়নের দায়িত্ব পেল রাজ্য পরিষদগুলি, যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ নয়। চারটি রাজ্য পরিষদ ও যুক্ত-রাষ্ট্রীয় পরিষদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার জন্য দুজন যুক্তরাষ্ট্রীয় কর্মচারী নিয়োগ করা ছিল। একজনের দায়িত্ব ছিল অর্থনৈতিক সমস্যা দেখাশোনা করা। দ্বিতীয় জনের দায়িত্ব ছিল সমস্ত রাজ্য পরিষদের সদস্যপদ সংক্রান্ত আইন দেখাশোনা করা। তাছাড়া পূর্বে যারা রাজ্য পরিষদের বেসরকারী সদস্য ছিলেন, তাদেরকে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদে নিয়োগ করে উভয় পরিষদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার সক্রিয় ও কার্যকর চেষ্টা করা হয়েছিল। 1941-42 সালে মালয়ে জাপানী অভিযান পর্যন্ত এটাই ছিল সেখানে রাজ্য ও কেন্দ্রের মধ্যে সম্বন্ধের রূপরেখা। মালয়ে ব্রিটিশ নীতির মূল কথা ছিল একদিকে চারটি রাজ্য ও তাদের সুলতানদের ক্ষমতা ও অধিকার রক্ষা করা এবং অপর-দিকে কেন্দ্রীকরণ নীতির মাধ্যমে চারটি রাজ্যে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত করা। ফেডারেটেড মালয় স্টেটসের শাসন সংস্কারে নানা শ্রেণীর মানুষের স্বার্থ জড়িত ছিল। তাদের মধ্যে সুলতানবর্গ, খেত খামারের ইউরোপীয় ও চীনা কর্মকর্তা, খনির মালিক, বণিক এবং স্ট্রেটস সেটেলমেন্টসের রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক গোষ্ঠী হল বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তাদের পরস্পর বিরোধী স্বার্থের মধ্যে আপস ছিল দুঃসাধ্য। আমূল পরিবর্তন বা উদার ও ব্যাপক প্রতিনিধিত্বের দাবি জানিয়ে রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে ওঠে নি। 1930 এর দশকে রাজ্য পরিষদ গুলিতে অবশ্য কিছু চারিত্রিক রূপান্তর ঘটেছিল। ইউরোপীয়, ভারতীয়, মালাই এবং চীনা বেসরকারী সদস্যের সংখ্যাবৃদ্ধি হয়েছিল। মালাই সদস্যদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন তরুণ।

উনিশ শতকের শেষের দিকে শ্যাম ও ফ্রান্স এবং শ্যাম ও ব্রিটেনের মধ্যে সীমান্ত সমস্যা ছিল। 1867 সালে কাম্বোডিয়াতে ফরাসী প্রোটেকটোরেট দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তারপর ত্রিশ বছর ধরে নানা অঞ্চল নিয়ে ফ্রান্স ও শ্যাম দেশের মধ্যে বিবাদ চলেছে, আবার আলাপ-আলোচনাও হয়েছে। যে অঞ্চল এখন লাওস নামে পরিচিত, সেখানে এবং নিম্ন মেকং অঞ্চলের (Lower Mekong basin) দাবি নিয়ে শ্যাম ও ফ্রান্স বিবাদে অবতীর্ণ হয়েছে। আপন দাবির পক্ষে ফ্রান্স ব্যঙ্ককের উপর সামরিক ও কূটনৈতিক চাপ সৃষ্টি করেছে।

শ্যাম ও ফ্রান্সের মধ্যে সংঘর্ষ ইংলণ্ডের পক্ষে উদ্বেগের কারণ হয়েছিল। 1886 সালে উত্তর বর্মা (Upper Burma) ইংলণ্ডের অধিকারভুক্ত হয়। শ্যাম দেশের পশ্চিমাঞ্চলে ছিল ব্রিটিশ বর্মার অবস্থান। লাওস অঞ্চলে ফরাসী নিয়ন্ত্রণ প্রসারিত হলে ব্রিটিশ ও ফরাসী অধিকৃত অঞ্চলের মধ্যে একটি সমস্যা সঙ্কুল সীমারেখা গড়ে ওঠে। 1880 এবং 1890 এর দশকে ব্রিটিশ নীতির মূলকথা ছিল শ্যামের উপর ফরাসী দাবি রোধ করা এবং ফরাসী ইন্দোচীনের সঙ্গে সীমারেখা গড়ে ওঠার সম্ভাবনা প্রতিহত করা। এই উদ্দেশ্যে বর্মা-শ্যাম সীমান্ত নিয়ে তারা শ্যামের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে একটি শান্তিপূর্ণ সমাধানে পৌঁছাতে চেয়েছিলেন। আফগানিস্থান যেমন ইংরেজ ও রুশ সাম্রাজ্যের মধ্যে একটি মধ্যবর্তী (buffer) রাষ্ট্র ছিল, অনুরূপ ভাবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ব্রিটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যের মধ্যে মধ্যবর্তী রাজ্য হিসাবে শ্যাম দেশকে তারা গড়তে চেয়েছিলেন।

1896 খ্রীষ্টাব্দে একটি ইঙ্গ-ফরাসী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির শর্তানুযায়ী ফ্রান্স ইংলণ্ডের কাছ থেকে মেকং-এর পূর্ব তীরে যে অংশ উত্তর বর্মার শান্ রাজ্যের অন্তর্ভূত ছিল, সেই অঞ্চল লাভ করে। ব্রিটেন এবং ফ্রান্স, উভয়েই মেনাম উপত্যকা কেন্দ্রিত মধ্য শ্যাম অঞ্চলের স্বাধীনতা ও ভৌমিক অখণ্ডতা রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেয়। ফলে মেনাম অঞ্চলে ফরাসী প্রসার কামনা প্রতিহত হয়, শ্যামদেশে ব্রিটিশ বাণিজ্যিক স্বার্থ সংরক্ষিত হয় এবং দক্ষিণ সীমান্ত নিয়ে ইঙ্গ-শ্যাম আলোচনার পথ প্রশস্ত হয়। পরের বছর শ্যাম দেশের সঙ্গে ইংলণ্ড চুক্তিবদ্ধ হয়। এই চুক্তির শর্তমত শ্যাম দেশ ব্রিটিশ অনুমোদন ছাড়া একাদশ সমান্তরাল রেখার (eleventh parallel) দক্ষিণে কোন অঞ্চল ছেড়ে দেবে না, বা ঐ অঞ্চলে কাউকে কোন বিশেষ বাণিজ্যিক সুবিধা দেবে না, এই প্রতিশ্রুতি দেয়। ব্রিটেনও শ্যাম দেশকে জানায় যে যদি কোন তৃতীয় শক্তি কোন ভাবে চাপ সৃষ্টি করে ঐ অঞ্চলে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে, তাহলে তার বিরুদ্ধে ইংলণ্ড শ্যামদেশকে

সমর্থন জানাবে। এই সাহায্যের প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে ইংলণ্ডকে মূল্য দিতে হয়েছিল। উত্তর মালয়ের রাজ্যগুলিতে শ্যামদেশ প্রভুত্বের দাবি জানিয়েছিল। 1899 সালে পাহাঙ এবং ত্রেংগানুর মধ্যে সীমারেখা নিয়ে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। এই চুক্তিতে ব্যাঙ্ককের প্রাধান্য স্বীকৃত হয়েছিল। 1902 সালের ইঙ্গ-শ্যাম চুক্তিতে স্থির করা হয় যে কেলানতন ও ত্রেংগাণুর সুলতানদ্বয় শ্যাম দেশের মাধ্যমে তাঁদের বিদেশ নীতি পরিচালিত করবে। এই দুই রাজ্যে শ্যাম একজন করে উপদেষ্টা (Adviser) ও সহকারী-উপদেষ্টা (Assistant Adviser) নিয়োগ করবে। শুধুমাত্র মালয়ের ধর্ম ও প্রথা বাদ দিয়ে শাসন বিভাগের সব ক্ষেত্রেই উপদেষ্টাদের উপদেশ গৃহীত হবে। উপদেষ্টা ও সহকারী উপদেষ্টার নিয়োগ হবে ব্রিটিশ সরকারের সম্মতি সাপেক্ষ। শান্তি, শৃঙ্খলা ও সুশাসন বজায় থাকলে, এই দুই রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকার হস্তক্ষেপ করবে না।

1902 সালের ইঙ্গ-শ্যাম চুক্তি স্বাক্ষর করতে ত্রেংগাণুর সুলতান আপত্তি করলেন, কিন্তু কেলানতনের সুলতান রাজী হলেন। 1903 সালে শ্যাম সরকার কেলানতনে একজন উপদেষ্টা এবং একজন সহকারী উপদেষ্টা নিয়োগ করলেন। উপদেষ্টা ও সহকারী উপদেষ্টা দু'জনেই ছিলেন শ্যাম সরকারের অধীন ব্রিটিশ কর্মচারী। কিন্তু তারা মালাই ভাষা জানতেন না।

1904 সালে ব্রিটেন ও ফ্রান্স, পারস্পরিক বিবাদ ভুলে মৈত্রী সন্ধানে ব্যাকুল হয়। ঐ সালের পর থেকে উভয় দেশই শ্যামের সঙ্গে সীমান্ত সমস্যা নিয়ে আরও কথাবার্তা চালায়। 1904 ও 1907 সালে ফ্রান্স ও শ্যাম দেশের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। 1904 সালে শুরু হয় ইংলণ্ড ও শ্যামের মধ্যে আলাপ আলোচনা। আলোচনার সফল পরিণতি হল 1909 সালের ইঙ্গ-শ্যাম চুক্তি। এই চুক্তির শর্তানুযায়ী কেলানতন, ত্রেংগানু, কেদা এবং পারলিসকে ব্রিটিশ করতলে (protection) স্থাপন করা হল। এই চারটি রাজ্যের উপর শ্যামের যে সমুদয় অধিকার ছিল, তা ব্রিটিশ শক্তির হাতে হস্তান্তরিত হল। প্রতিটি রাজ্যের সঙ্গে স্বতন্ত্র চুক্তিতে আবদ্ধ হবার সুযোগ ইংরেজরা পেল। এ কথা সত্য 1909 সালের চুক্তিতে ঐ রাজ্যগুলিতে ব্রিটিশ রাজের অধিকার ও সুযোগ সুবিধা সুস্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করা হয় নি। যাহোক, 1855 সাল থেকে কনসুলেট ব্যবস্থা মারফৎ শ্যাম দেশের ব্রিটিশ নাগরিকদের উপর ব্রিটিশ সরকার যে এক্তিয়ারের অধিকার ভোগ করে

আসছিল, বর্তমান চুক্তিতে ব্রিটিশ সরকার সে সব অধিকার ত্যাগ করে। নতুন করে ইঙ্গ-শ্যাম সীমারেখা নির্দেশিত হল। একটি স্বতন্ত্র চুক্তিতে শ্যামদেশে রেলপথ নির্মাণের জন্য ফেডারেটেড মালয় স্টেটস সেখানকার রেলবিভাগকে চার মিলিয়ন পাউন্ড অর্থ ঋণ দেয়। 1897 সালের ইঙ্গ-শ্যাম চুক্তি বাতিল করা হল। কিন্তু শ্যাম এই প্রতিশ্রুতি দিল যে শ্যাম উপসাগরের পশ্চিম তীরে কোন তৃতীয় পক্ষকে সামরিক সুযোগ সুবিধা দেওয়া হবে না।

1909 সালের চুক্তির ধারানুযায়ী কেলানতন, ত্রেংগানু কেদা এবং পারলিসে ব্রিটিশ আধিপত্য স্বীকৃত হয়েছিল, সন্দেহ নেই; কিন্তু আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ধীরগতিতে। 1902 সালে শ্যাম দেশ কেলানতন ও ত্রেংগানুতে উপদেষ্টা ও সহকারী উপদেষ্টা নিয়োগ করেছিল। স্বাভাবিক ভাবেই অন্যান্য রাজ্যের চেয়ে শ্যামের সঙ্গে কেলানতনের সম্বন্ধ ছিল ঘনিষ্ঠতর। ফেডারেটেড মালয় স্টেটস থেকে অন্যান্য রাজকর্মচারী কেলানতনে নিযুক্ত হয়েছিল। সেখানে ব্রিটিশ আমলা বাহিনীর যে অস্তিত্ব ছিল, তা ছিল ব্যাঙ্ককের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। নতুন ব্যবস্থায় এই শাসন সংগঠন শ্যাম থেকে বিচ্ছিন্ন হল। একটি রাজ্য পরিষদ (State Council) গঠন করা হল। সুলতান ছিলেন রাজ্য পরিষদের সভাপতি। ব্রিটিশ উপদেষ্টা ছাড়া, স্বল্প সংখ্যক ব্রিটিশ রাজকর্মচারী সেখানে নানা দপ্তরে বিভাগীয় প্রধান হিসাবে কাজ করেছেন। এদের বাদ দিলে পরিষদের অধিকাংশ সদস্য ছিল মালাই।

অনেক দিন থেকেই ত্রেংগানু শ্যাম-সার্বভৌমত্বের দাবী অগ্রাহ্য করেছে। 1910 সালে ত্রেংগানুর সুলতান বিদেশ-নীতি নির্ণয়ে ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণ অধিকার মেনে নিলেন। খুবই সীমিত ক্ষমতা সম্পন্ন একজন ব্রিটিশ প্রতিনিধিকে গ্রহণ করতে তিনি স্বীকৃত হলেন। কিছুদিন পর একটি রাজ্য পরিষদ (State Council) গঠন করা হয়েছিল। কেলানতন ও পাহাঙের মত ত্রেংগানুতেও কিছু শাসনতান্ত্রিক সংস্কার সাধন করা হয়েছিল। 1919 সালের চুক্তির শর্তানুযায়ী একজন ব্রিটিশ উপদেষ্টা (Adviser) গৃহীত হয়েছে। কেলানতনের মতই রাজ্য পরিষদে মালাই সদস্য ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। রাজ্য পরিষদের সভাপতি ছিলেন মন্ত্রী বেসার (Mentri Besar)। সুলতান ছিলেন রাজ্যের আইনানুগ প্রধান। শাসন কার্যের জন্য অল্পসংখ্যক ব্রিটিশ কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছিল। রাজ্যের প্রায় সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে পরামর্শদাতার সঙ্গে আলোচনা করা হত। সদস্য না হয়েও রাজ্য পরিষদের সভায় তিনি যোগ দিতেন।

কেদা রাজ্যও ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হতে দীর্ঘকাল বিলম্ব করেছিল। 1910 সাল থেকে কেদার সুলতান শাসনকার্যে ব্রিটিশ

উপদেশ ও সাহায্য গ্রহণ করেছেন। 1923 সালের চুক্তির ধারানুযায়ী একজন ব্রিটিশ উপদেষ্টা নিয়োগ করা হয়েছিল। একটি রাজ্য পরিষদও এখানে গঠন করা হয়। এই পরিষদের সভাপতি ছিলেন স্বয়ং সুলতান। অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে ছিলেন ব্রিটিশ উপদেষ্টা, সুলতান নিযুক্ত এবং ফেডারেটেড মালয় স্টেটসের হাই কমিশনার অনুমোদিত তিনজন মালাই সদস্য। এই চুক্তিতে স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছিল যে সপারিষদ সুলতানের সম্মতি ছাড়া অন্য কোন রাজ্য বা উপনেবেশের সঙ্গে কেদাকে সংযুক্ত করা যাবে না।

ক্ষুদ্র রাজ্য পারলিসেও অনুরূপ পরিবর্তন ঘটেছিল। ইঙ্গ-শ্যাম চুক্তি বলে শ্যাম দেশীয় উপদেষ্টার স্থান দখল করলেন ব্রিটিশ উপদেষ্টা। ব্যাঙ্ককের কাছ থেকে গৃহীত ঋণ সংক্রান্ত অর্থনীতি বিষয়ে তিনি সজাগ ছিলেন। বিশ বছর পরে শ্যাম দেশের ঋণ পরিশোধ করা হয়েছিল। 1930 সালের নতুন চুক্তি অনুযায়ী শাসন বিভাগে ব্রিটিশ উপদেষ্টার ভূমিকা প্রসারিত করা হয়। অন্যান্য ব্রিটিশ কর্মচারীও ছিল, কিন্তু আমলা বাহিনীতে মালাইদেরই প্রাধান্য ছিল।

কেলানতন, ত্রেংগানু, কেদা এবং পারলিস—এই চারটি রাজ্যে ফেডারেটেড মালয় স্টেটসের তুলনায় ব্রিটিশ প্রভাব ছিল অপেক্ষাকৃত কম। এই চারটি রাজ্যের সুলতান ফেডারেটেড মালয় স্টেটসের সঙ্গে সংযুক্ত হতে আগ্রহী ছিলেন না। তাঁরা তাদের স্বাধীনতা হারাতে চান নি, এবং রাজ্যের অর্থনীতিকে কুআলা লুম্পুরের নিয়ন্ত্রণাধীন করতে চান নি। ব্রিটিশ উপদেষ্টার মতামতে পরিচালিত মালয় শাসন ব্যবস্থা—এই ছিল এই রাজ্যগুলির শাসন কাঠামো। কিন্তু ফেডারেটেড মালয় স্টেটসের শাসন কাঠামোর মূল কথা ছিল ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণে সুলতানদের কিছু কিছু অধিকার সংরক্ষণ। কেলানতন, ত্রেংগানু, কেদা এবং পারলিসের সুলতান স্ব স্ব রাজ্যে সংস্কার সাধনে ব্রতী হয়েছেন এবং আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার ও স্বতন্ত্র পরিচয় রক্ষায় সজাগ থেকেছেন।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি টুংকু আলী (Tunku Ali) এবং তেমেংগং ইব্রাহিমের (Temenggong Ibrahim) মধ্যে বিবাদ শুরু হয়েছিল। টুংকু আলী ছিলেন সুলতান হুসেনের (Sultan Hussein) এবং তেমেংগং ইব্রাহিম ছিলেন তেমেংগং আবদুল রহমানের (Temenggong Abdul Rahaman) পুত্র। টুংকু আলী এবং তেমেংগং ইব্রাহিম, উভয়েই ছিলেন ইসট ইনডিয়া কোমপানির পেনসনভোগী। জোহোর ও জোহোরের রাজস্বের উপর নিয়ন্ত্রণাধিকার নিয়েই উভয়ের মধ্যে বিবাদ বাধে। জোহোরের সুলতান হিসাবে টুংকু আলী

কোমপানির কাছ থেকে স্বীকৃতি চেয়েছিলেন। তাঁর যুক্তি ছিল কোমপানির প্রতিনিধি রূপে র‍্যাফেলস তাঁর পিতাকে সুলতান হিসাবে মেনে নিয়েছিলেন। তেমেংগং ইব্রাহিমের দাবি হচ্ছে তিনিই হলেন জোহোরের প্রকৃত (de facto) শাসক। 1855 সালে এই দুই রাজপুত্র এবং স্ট্রেটস সেটেলমেন্টসের কর্তৃপক্ষের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। চুক্তির শর্তানুযায়ী টুংকু আলী পেলেন সুলতান উপাধি, কিছু অর্থ, বর্ধিত পেনসন এবং কেসং (Kesang) ও মুয়ার (Muar) নদীর মধ্যবর্তী ভূমিখণ্ডের মালিকানা। ইব্রাহিম ও তাঁর বংশধররা হলেন জোহোরের প্রকৃত শাসক। আলী ও তাঁর উত্তরাধিকারীর জন্য সুলতান উপাধি ও পেনসন দান তাদের মেনে নিতে হল।

তেমেংগং ইব্রাহিম সিঙ্গাপুরে বসবাস করতে লাগলেন। তিনি জোহোরের রাজস্ব পেলেন। তানজং পুত্রি (Tanjong Putri) অঞ্চলে তিনি একটি শহর গড়ে তুললেন। এই শহরের পরে নামকরণ হয় জোহোর বাহরু (Johore Bahru)। 1862 সালে ইব্রাহিম মারা যান। তখন তাঁর পুত্র আবু বকর (Abu Bakar) পেলেন তেমেংগং উপাধি। তিনি জোহোরের রাজধানীকে নতুন রূপ দিলেন। জোহোরে তিনি জনসমাগম উৎসাহিত করলেন, অনেক কৃষি খামার গড়ে তুললেন এবং নতুন ভূমি-আইন ও শুল্ক দপ্তর চালু করলেন।

1868 সালে তিনি ইউরোপে যান। ফিরে এসে স্ট্রেটস সেটেলমেন্টসের গভর্ণরের সঙ্গে পরামর্শ করে মহারাজা উপাধি গ্রহণ করেন। একথা স্মর্তব্য যে অতীতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অনেক রাজা শ্রীমহারাজা উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। বেশ কয়েকবার আবু বকর ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ও মালয় রাজাগুলির মধ্যে মধ্যস্থতা করেছেন। 1877 সালে মুয়ার (Muar) জেলায় সুলতান আলী মারা যান। পরের বছর অর্থাৎ 1878 সালে মুয়ার জেলা তিনি অধিকার করেন। 1855 সালের চুক্তি মত সুলতান আলীর উত্তরাধিকারী মাসিক 500 ডলার পেনসন পাবার অধিকারী ছিলেন। মুয়ার জেলার ক্ষতিপূরণ বাবদ পেনসনের পরিমাণ বাড়িয়ে তিনি করলেন 750 ডলার। 1885 সালে মহারাজা সুলতান উপাধি পেলেন, ইংরেজদের সঙ্গে মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হলেন এবং কনসাল পদে এক ব্রিটিশ রাজকর্মচারী গ্রহণ করলেন। এর পরে জোহোরে আর বংশ বিরোধ ঘটে নি। সুলতান আবু-বকর ছিলেন একজন প্রথম শ্রেণীর সংগঠক। তিনি জোহোরে কফি, চা, তামাক, গোলমরিচ এবং গামভাবি বৃক্ষের চাষ প্রবর্তন করেন। এই চাষের ক্ষেত্রে প্রধান উৎপাদক ছিল সিঙ্গাপুরের চীনা সম্প্রদায়। জোহোরের চীনাদের প্রতি তাঁর প্রসন্ন ব্যবহারের জন্য চীন সম্রাটের কাছ থেকে 1892

সালে তিনি অর্ডার অব ডবল ড্রাগন (Order of Double Dragon) নামে একটি প্রথম শ্রেণীর সম্মান অর্জন করেন।

1895 খ্রীষ্টাব্দে তিনি দেহত্যাগ করেন। মারা যাবার কিছুদিন আগে কয়েকজন ব্রিটিশ আইনজীবী রচিত একটি লিখিত শাসনতন্ত্র তিনি প্রচলন করেন। শাসনতন্ত্রে সুলতানকে পরামর্শ দেবার জন্য একটি মন্ত্রী পরিষদের (Council of Minister) বিধান ছিল। মন্ত্রীরা সবাই ছিলেন মালাই ও মুসলিম। একটি রাজ্য পরিষদও (Council of State) ছিল। বলা হয়েছিল যে রাজ্য পরিষদের সদস্যদের জোহোরের নাগরিক হতেই হবে। মন্ত্রী পরিষদের পরামর্শ বা সম্মতি নিয়ে সুলতান রাজ্য পরিষদের সদস্যদের নিয়োগ করতেন। মন্ত্রী পরিষদের সভ্যরা পদাধিকার বলে রাজ্য পরিষদের সদস্য ছিলেন। রাজ্য পরিষদ আইন প্রণয়ন করত। আইনে সম্মতি জানিয়ে স্বাক্ষর করতেন স্বয়ং সুলতান। 1912 সালে আবু বকরের সন্তান সুলতান ইব্রাহিমের রাজত্বকালে এই শাসনতন্ত্র সংশোধন করে একটি কার্য-নির্বাহক সমিতি (Executive Council) গঠন করা হয়। কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্যদের সুলতান নিয়োগ করতেন। সুলতানের সভাপতিত্বে প্রতি সপ্তাহে একবার এই সমিতির বৈঠক বসত। এই সমিতি দৈনন্দিন শাসন দেখাশোনা করত এবং নতুন আইনের প্রস্তাব আনত।

1914 সালে শাসনতন্ত্রে আরও কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়। জোহোরের নাগরিক নয়, এমন লোকের জন্য, এমন কি ব্রিটিশ কর্মচারীর জন্যও রাজ্য পরিষদের সদস্যপদ উন্মুক্ত করা হল। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা ও জটিল অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান কল্পে সুলতান ইব্রাহিম ব্রিটিশ উপদেষ্টা গ্রহণ করেছিলেন। সুলতানের অধীনে একজন মালাই মন্ত্রী বেসার (Mentri Besar) শাসনের শীর্ষে স্থাপন করা হল। উচ্চপদের বিভাগীয় দায়িত্ব পেয়েছিলেন মালাই ও ব্রিটিশ রাজকর্মচারী। সিঙ্গাপুর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে জোহোর কর্তৃপক্ষের নিবিড় সম্বন্ধ ছিল, কিন্তু একথা সত্য জোহোর কখনই সিঙ্গাপুরের অধীন ছিল না বা সিঙ্গাপুরের উপর নির্ভরশীল ছিল না।

1941 সালে জাপানী অভিযানের পূর্ব লগ্ন পর্যন্ত মালয়ের রাজনৈতিক ও শাসন তান্ত্রিক পরিস্থিতি ছিল জটিল। পেনাঙ, মালাক্কা ও সিঙ্গাপুর নিয়ে গঠিত স্ট্রেটস সেটেলমেন্টস ছিল ব্রিটিশ উপনিবেশ। পেরাক, সেলাংগোর, নেগ্রি সেম্বিলান এবং পাহাঙ নিয়ে গঠিত ফেডারেটেড মালয় স্টেটস ছিল বহুলাংশে কুআলা লুমপুর-ভিত্তিক এবং ব্রিটিশ শাসনে শাসিত।

1930 এর দশকে অবশ্য রাজ্যপরিষদগুলি কিছু ক্ষমতা ও মর্যাদা ফিরে পায়। পারলিস, কেদা, কেলানতন এবং ত্রেংগানু প্রমুখ উত্তরের চারটি

রাজ্য ছিল ইংরেজদের সঙ্গে চুক্তিবন্ধ। এসব রাজ্যে ব্রিটিশ উপদেষ্টা ছিল, কিছু ব্রিটিশ রাজকর্মচারী ও ছিল।

দক্ষিণে জোহোর ছিল সিঙ্গাপুরের পত্তনের সময় থেকেই ব্রিটেনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবন্ধ, তা সত্ত্বেও জোহোর অনেকাংশে স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য ভোগ করত। উত্তরের চার রাজ্য ও জোহোর সাধারণভাবে 'আন-ফেডারেটেড স্টেটস' নামে পরিচিত। ফেডারেটেড মালয় স্টেটস থেকে পার্থক্য বোঝাবার জন্যই আনফেডারেটেড স্টেটস শব্দ ব্যবহার করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় (Federated) রাজ্য, অ-যুক্তরাষ্ট্রীয় (Unfederated) রাজ্য এবং স্ট্রেটস সেটেলমেন্টস এই তিন ধরণের রাজ্য 1941 সাল পর্যন্ত মালয় মানচিত্রে স্থান পেয়েছিল।

॥ 11 ॥

মালয়ের রাজনীতি, সমাজ ও অর্থনীতি

রাজনৈতিক ব্যবস্থা

নদীর উপত্যকায় মালয় রাজ্যগুলির বসতি বিস্তার ঘটেছিল। রাজধানীর অবস্থানও ছিল নদীর মুখে। সমুদ্র আর নদীই ছিল যোগাযোগের কোথাও প্রধান, কোথাও বা একমাত্র পথ। অরণ্য, পাহাড় আর জলাভূমি ছিল যোগাযোগের প্রতিবন্ধক।

প্রতিটি রাজ্যই ছিল এক একটা স্বতন্ত্র জগৎ। বৃহত্তর মালয় চেতনা বা মালয় রাজ্যগুলির যৌথ পরিচয় কামনা দানা বাঁধেনি। পঞ্চদশ শতকে মালাক্কা এবং ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে জোহোর অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালী রাজ্যগুলির উপর অল্প বিস্তর প্রভাব প্রতিপত্তি জাহির করেছিল। কিন্তু উনিশ শতকের মধ্যভাগে অবস্থার যথেষ্ট রূপান্তর ঘটেছিল। এক একটি রাজ্য কখনো কখনো সাময়িকভাবে প্রতিবেশী রাজ্যের উপর নিয়ন্ত্রণাধিকার খাটিয়েছে। উদাহরণ, 1821 সালে কেদা এবং পেরাক। 1822 সালে সেলাংগোর এবং পেরাক। কোন কোন রাজ্যকে অল্পবিস্তর শ্যাম দেশের প্রভুত্ব মানতে হয়েছে। কিন্তু মূলত রাজ্যগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে থেকেছে। প্রতিটি রাজ্য ছিল স্বনির্ভর। যুদ্ধবিগ্রহ ও মাঝে মাঝেই হয়েছে। কিন্তু সেগুলি হল আসলে গৃহযুদ্ধ।

মালাইদের মধ্যে বৃহত্তর গোষ্ঠীচেতনার একান্তই অভাব ছিল। ইসলামের ঐক্যবন্ধন সত্ত্বেও এক রাজ্যের মালাইরা ভিন্ন রাজ্যের মালাইকে বিদেশী বলেই ভাবত। অনেকেই ছিল সুমাত্রা থেকে আগত মালাইদের বংশধর, তাছাড়া আচে এবং জাভার মালাইরাও ছিল, ক্ষুদ্র কিন্তু প্রভাবশালী কিছু আরবও ছিল। আবার আরব-মালাই সংকর বংশধরও ছিল। বুগিশরাও এসেছিল সেলেবেস থেকে। অভিন্ন সাংস্কৃতিক বন্ধন সত্ত্বেও, এই সব মালাই জনগোষ্ঠীর মানুষরা তাদের ভাষাগত ও আচার আচরণ প্রথাগত বৈষম্য সম্পর্কে খুবই সজাগ ও স্পর্শকাতর ছিল।

উনিশ শতকের পূর্ব থেকেই অল্পসংখ্যক চীনা প্রতি মালয় রাজ্যেই ছিল। কখনো কখনো Kampong China নামে পরিচিত স্বতন্ত্র গ্রামে তারা বাস করত। 1820 সালের পর থেকে বিপুল সংখ্যায় চীনারা এসে বসবাস শুরু করে সুংগি উজোং, সেলাংগোর এবং পেরাকে। বৃহদাকার টিনখনির কাজের সঙ্গে তারা যুক্ত ছিল। ভারতীয়রা তুলনায় অল্পসংখ্যক এসেছিল। পশ্চিম উপকূলস্থ বন্দরে বাণিজ্যের কাজে তারা ছিল জড়িত। উনিশ শতকের শেষে পূর্তবিভাগের এবং কৃষি খেতের কাজ বেড়ে গেলে ভারতবর্ষ ও সিংহল থেকে অসংখ্য মানুষ মালয়ে এসে ভীড় করেছে।

শাসনযন্ত্র ছিল ব্যক্তি কেন্দ্রিক এবং স্বেচ্ছাতান্ত্রিক। শাসন কাঠামোর শীর্ষে ছিলেন সুলতান। সব রাজ্যেই তাঁকে সুলতান বলা হত। নেগ্রি সেমবিলানে শাসনের শীর্ষে ছিলেন নির্বাচিত Yang-di-Pertuan Besar এবং পাহাঙের সর্বোচ্চ শাসক বেন্দাহারা নামে পরিচিত ছিলেন। প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক নীতি নির্ণয়ে সুলতান ছিলেন সর্বেসর্বা। শাসনের অন্যান্য দপ্তর কয়েকজন মনোনীত প্রধানের হাতে ন্যস্ত ছিল। রাজসিংহাসনে উত্তরাধিকারের প্রশ্নে প্রধানদের প্রতাপ ছিল প্রবল।

প্রতি রাজ্য কয়েকটি জেলায় বিভক্ত ছিল। নদী ও শাখানদীর অংশবিশেষকে কেন্দ্র করে জেলাগুলি ভাগ করা হত। জেলা প্রধানের ক্ষমতার উৎস স্বয়ং সুলতান। কিন্তু অনেক বিষয়েই জেলা প্রধান নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। জেলার রাজস্ব আদায় হত শস্যের এবং খনি-ভূমির (mining land) উপর কর থেকে বা নদীর উভয় দিকে গমনাগমনের পথে বাণিজ্য পণ্যের উপর ধার্য শুল্ক থেকে। রাজস্বের একটি নির্দিষ্ট অংশ সুলতানকে পাঠান হত। তাঁর আয় থেকে জেলা প্রধান নিজের বৃহৎ পরিবার গোষ্ঠী ও নিজস্ব ব্যক্তিগত সেনাবাহিনী পোষণ করতেন। জেলার প্রতিরক্ষা ও আইন শৃঙ্খলা ছিল সম্পূর্ণ ভাবে জেলা প্রধানের দায়িত্ব।

গ্রাম প্রধানের নাম ছিল পেংগুলু (Penghullu)। তিনি ছোটখাট অপরাধের বিচার করতেন। বড় রকমের অপরাধ গুলি তিনি জেলা প্রধানের নজরে আনতেন। মালয়ে না ছিল আইন আদালত, না ছিল আইনকানুন। মৃত্যুদণ্ড দেবার অধিকার একমাত্র সুলতানেরই ছিল। তাঁর এই অধিকার অনেকক্ষেত্রে জেলা প্রধানেরা গ্রাস করেছিল।

উনিশ শতকে সমাজ চিত্র

মালয় সমাজ ছিল দুইভাগে বিভক্ত: সামন্তশ্রেণী এবং সাধারণ প্রজাপুঞ্জ।

সামন্তশ্রেণী ছিল বিশেষ সুবিধাভোগী। এই শ্রেণী নানা স্তরে বিন্যস্ত ছিল। সাধারণত জন্ম ও পারিবারিক বন্ধন ছিল সামন্তশ্রেণীর পরিচয় চিহ্ন। কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্য ব্যতিক্রম দেখা গেছে। সমাজের নিচু শ্রেণী থেকে অনেকেরই উচ্চ স্তরে উত্তরণ হয়েছে নিপুণ যোদ্ধা হিসেবে, বা ধনাঢ্য শ্রেষ্ঠী হিসেবে। এইভাবে আচিন, জাভা, আরব এবং বুগিশ থেকে আগত কিছু লোক মালয় সামন্তশ্রেণীর সমপর্যায়ভুক্ত হয়েছিল।

সাধারণ প্রজা চাষ আবাদ করে এবং মাছ ধরে জীবন যাপন করত। পরিবারের লোকজন একত্রে যৌথভাবে চাষ-আবাদ করত। উৎপন্ন ফসল দিয়ে শুধুমাত্র জীবনধারণ করাটুকুই সম্ভব ছিল। নিরন্তর গৃহযুদ্ধের জন্য জেলা-প্রধানরা প্রায়ই কৃষকদের কাছ থেকে লোকজন, শস্য ও অন্যান্য রসদ চেয়ে পাঠাত। তার ফলে চাষীদের পক্ষে অর্থ সঞ্চয় সম্ভব হত না। বৃহৎ খেত-খামারও তারা গড়ে তুলতে পারত না।

দু'টি প্রচলিত প্রথা চাষীদের জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছিল। একটি প্রথা Kerah নামে পরিচিত। গোলাঘর তৈরির জন্য, নদীমুখ পরিষ্কার করার জন্য, জলপথে নৌকা চালনার জন্য, বা হলঘর, মসজিদ ইত্যাদি নির্মাণের জন্য জেলা প্রধানের অনেক লোকজনের প্রয়োজন হত। যে কোন উদ্দেশ্যে, যে কোন সময়, যতদিন খুশি, বাধ্যতামূলকভাবে কৃষকদের এসব কাজে লাগাত জেলাপতিরা। সাধারণভাবে গ্রামণীর মাধ্যমে এইসব লোক সংগ্রহ করা হত। তারা খাদ্য পেত, কিন্তু বাধ্যতামূলক শ্রমের জন্য কোন বেতন পেতনা। আর একটি প্রথা হচ্ছে ঋণ-দাসত্ব। অর্থের বা কোন জিনিসের প্রয়োজন হলে সে জেলা প্রধানের বা গ্রামপতির দ্বারস্থ হত। নির্দিষ্ট দিনে শোধ দেবার প্রতিশ্রুতিতে প্রধান তার ঋণ পাওয়ার বন্দোবস্ত করত। ঋণ শোধ দিতে অক্ষম হলে, তাকে যতদিন ঋণ শোধ না হচ্ছে, ততদিন ঋণদাতার হয়ে যাবতীয় কাজ করতে হত। সে বিবাহিত হলে, তার স্ত্রী, পরিবারবর্গ এবং এমনকি বংশধররাও, যতদিন ধার শোধ না হচ্ছে, ততদিন এই ধরণের দাসত্বের জীবন কাটাত। এক একজন প্রধান এইভাবে প্রচুর বেগার খাটা লোক জোগাড় করত। তারা ছিল সব কাজের উপযোগী, গৃহকর্মে নিপুণ এবং ব্যক্তিগত সেনা হিসাবেও দক্ষ।

1850 সাল নাগাদ টিন শিল্পের যে বিপুল সমৃদ্ধি ঘটেছিল, তাতে চীনা অবদান ছিল অপরিমেয়। পেনাঙ, মালাক্কা ও সিঙ্গাপুরের চীনা বণিকরা টিন শিল্পের মূলধন সরবরাহ করেছিল। মালয়ের সাধারণ মানুষের জীবন ছিল জমির সঙ্গে বাঁধা। তাদের অনেকে ছোটখাটো টিন শিল্পে আংশিক (Part-time) ভাবে নিযুক্ত ছিল। পুরোপুরি ভাবে একমাত্র পেশা

হিসাবে টিন শিল্পে কাজ করতে তারা অনিচ্ছুক ছিল। যেহেতু টিন খনির কাজে চীনা মূলধন বিনিয়োগ করা হয়েছিল, তাই স্বাভাবিকভাবেই চীনা ম্যানেজার নিয়োগ করা হত। শ্রমিকদেরও সংগ্রহ করা হত চীনা দালালদের মাধ্যমে। স্ট্রেটস সেটেলমেনটস থেকেই চীনা শ্রমিক সংগ্রহ করা হত। তাতে না কুলালে দক্ষিণ চীনের প্রদেশগুলি থেকে শ্রমিক জোগাড় হত। জীবিকার অন্বেষণে যে সব চীনা কৃষক মালয়ে এসেছিল, তারা ছিল স্বভাবতই নিরীহ ও শান্তিপ্রিয়। কিন্তু ঘটনাবৈগুণ্যে শান্তিপ্রিয় গোষ্ঠী কালক্রমে একটি সশস্ত্র বিপজ্জনক যুদ্ধবাজ দলে পরিণত হয়েছিল। চীনা বসতিতে জীবনযাত্রা ছিল কঠোর ও দুঃসহ। পরম্পরাগত জীবন যাত্রা তখন বিপর্যস্ত। টিন খনির রোজগার তারা অপব্যয় করত মদ্যপানে বা জুয়া খেলে। এসব কারণে সামাজিক বিশৃঙ্খলা ছিল নিত্যনৈমিত্তিক।

মালয়ের চীনা শ্রমিকরা কোন না কোন গোপন সমিতির সভ্য ছিল। গোপন সমিতির শাখা প্রশাখা প্রসারিত ছিল একদিকে যেমন টিনখনির মালিকদের মধ্যে, ঠিক তেমনি সাধারণ শ্রমিকদের মধ্যেও। গোপন সমিতিগুলি নবাগত চীনা শ্রমিকদের যাবতীয় নিরাপত্তার দায়িত্ব নিয়েছিল। এমনকি তার মৃত্যুর পরে তার পারলৌকিক ক্রিয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করত সমিতি। সমিতি তার মৃত্যুর পর তার বংশধরদেরকে আর্থিক সাহায্য দিত। চীনা সহকর্মীদের মধ্যে এই গোপন সমিতিগুলি ছিল ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের সেতু। গোপন সমিতিগুলির সভ্য হতে হলে খুব কঠিন মূল্য দিতে হত। সমিতিগুলির গোপনীয়তা ছিল অলঙ্ঘণীয়। বাইরের লোকদের সঙ্গে সমিতিগুলির ব্যাপার নিয়ে আলোচনা ছিল দন্ডনীয় অপরাধ। আর সে শাস্তি ছিল মৃত্যুদন্ড। সমিতির প্রতি সভ্যদের আনুগত্য ছিল সংশয়াতীত। সমিতির অধিনায়কের নির্দেশে শত্রুর বিরুদ্ধে সভ্যদের বিনা প্রতিবাদে অস্ত্রধারণ করতে হত। সমিতিগুলির নিজস্ব বিচার সভা ছিল। পথভ্রষ্ট সভ্যকে বিচার করে মৃত্যুদণ্ড দিত এই সমিতিগুলি। উনিশ শতকের মাঝামাঝি মালয়ের টিন খনিতে নিযুক্ত চীনা শ্রমিকরা শুধুমাত্র একটি রাজনৈতিক কর্তৃত্বের কাছে নতিস্বীকার করেছিল—তা হল গোপন সমিতিগুলির কর্তৃত্ব। মালয় উপদ্বীপের চীনাদের সব গোপন সমিতিগুলিই ছিল Triad সোসাইটির শাখা-প্রশাখা। Triad মানে একের মধ্যে তিন,—স্বর্গ, মর্ত্য ও মানব সমাজ।

উনিশ শতকের মধ্যভাগে মালয় রাজ্যগুলি ছিল বিশৃঙ্খলায় জর্জরিত। স্ব স্ব রাজ্যে সুলতানরা ছিলেন ভীরু। উত্তরাধিকারের প্রশ্ন নিয়ে অধিকাংশ রাজ্য ছিল গৃহযুদ্ধে বিধ্বস্ত। সামন্ত প্রভুরা সশস্ত্র সেনাবাহিনী রাখতেন। ঋণ শোধে অক্ষম অধমর্ণ ব্যক্তিরা সামন্ত প্রভুদের ব্যক্তিগত

সেনাবাহিনীতে যোগ দিত। টিন খনিকে কেন্দ্র করে যে সব বড় বড় চীনা অধ্যুষিত এলাকা গড়ে উঠেছিল, সেগুলিতে আইন শৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছিল বললেই চলে। মালয় রাজ্যগুলির শাসন ও বিচার কাঠামো এই প্রতিকূল পরিস্থিতির চাপে অকেজো হয়ে পড়ে।

অর্থনৈতিক অগ্রগতি

মালয়ের অর্থনীতির প্রধান ভিত্তি হচ্ছে টিন ও রবার। উপদ্বীপ অঞ্চল টিন উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত। উনিশ শতকের শেষ চতুর্থাংশে সেখানে রবার উৎপাদনের প্রচলন হয়। এই দু'টি কাঁচামালের জন্যই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে মালয়েশিয়া সবচেয়ে ধনী অঞ্চল হিসাবে গড়ে ওঠে। উপদ্বীপ অঞ্চলে এই দুই সামগ্রী থেকেই রাজস্ব সংগৃহীত হয়েছে। বোর্ণিও অঞ্চলে সাবা ও সারাবাক রাজ্য কাঠ, গোলমরিচ, নারিকেলের শুষ্ক শাঁস এবং রবার থেকে রাজস্ব পেয়েছে। তৈলখনি থেকে সারাবাক কিছুটা এবং বোর্ণিও যথেষ্ট পরিমাণে সম্পদশালী হয়েছে। এই উৎপন্ন দ্রব্যগুলিই হল মালয়ের অর্থ-নৈতিক সমৃদ্ধির মূল বনিয়াদ।

উনিশ শতকের রাজনৈতিক রূপান্তরের ফলে টিন ও রবারের উৎপাদন প্রসারের সুযোগ এসেছিল। বিশ শতকের শুরু থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত পশ্চিম মালয়ের অর্থনৈতিক কাঠামোতে বিশেষ পরিবর্তন ঘটেনি। শুধুমাত্র টিন ও রবারের উৎপাদনেই সমস্ত শক্তি নিয়োজিত হয়েছিল। 1929-30 সালের বিশ্বব্যাপী মন্দার সময় টিন ও রবার কেন্দ্রিক অর্থনৈতিক কাঠামোর ত্রুটি বিচ্যুতি ও বিপদ আপদ ধরা পড়েছিল। এই ধরণের অর্থ-নীতির ফলে দেশের সামগ্রিক বিকাশ কখনই সম্ভব হয়নি। শুধুমাত্র যে সব অঞ্চলে টিন ও রবার উৎপন্ন হত, সেসব ক্ষেত্রেই পথঘাট, রেলযান গড়ে উঠেছিল এবং আধুনিক শহরের বিকাশ ঘটেছিল। ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কোন পরিকল্পনা করা হয়নি। কৃষি ব্যবস্থা অবহেলিত হয়েছিল। শ্যাম ও বর্মা থেকে চাউল আমদানি করা হত। কৃষি ও চাষ আবাদের সঙ্গে সম্পর্কিত মানুষের সমাজে মান মর্যাদা প্রতিপত্তি ছিলনা। 1946 সালের পর থেকে অবশ্য পাম তেল, নারিকেলের শুষ্ক শাঁস, আনারস উৎপাদন, মৎস্য চাষ ও ধান্য রোপণের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে।

টিন

মালয় উপদ্বীপে দীর্ঘকাল থেকেই টিন ধাতুর মুদ্রার প্রচলন ছিল।

চীনা ও ভারতীয় বণিকদের কাছেও টিন বিক্রি করা হত। অষ্টাদশ শতক ও উনিশ শতকের প্রথম দিকে কিনটা উপত্যকা এবং মালাক্কার পশ্চাৎ প্রদেশে আকরিক টিন প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেত। উনিশ শতকের প্রথমদিকে পেরাকে প্রতি বছরে পাঁচ শত টন আকরিক টিন উৎপাদন করা হত। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে টিন প্লেটের ব্যবহার প্রচুর বেড়ে গিয়েছিল। ফলে টিনের চাহিদাও বেড়ে গিয়েছিল। লারুৎ, কুআলা-লুমপুর ও রাসা অঞ্চলে নতুন নতুন টিনের খনির সন্ধান পাওয়া গেল।

এই সমস্ত খনিতে কাজের জন্য অসংখ্য চীনা মজুর মালয় উপদ্বীপে এসে হাজির হয়েছিল। উনিশ শতকের সত্তরের দশকে মালয় রাজ্যগুলির রাজস্ব সংগৃহীত হয়েছে টিনের উৎপাদন থেকে।

1880-র দশক পর্যন্ত স্বল্পসংখ্যক চীনা ধনিকের মালিকানা ছিল এই সব খনিতে। চুক্তিবন্ধ চীনা কুলী তারা আমদানি করত। একজন চীনা সর্দার এইসব কুলীদের পরিচালনা করত, তাদের কাজের শর্তাদি স্থির করে দিত। মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে মধ্যস্থতা (middle man) করত কুলী সর্দাররা। শ্রমিকদের আহার ও পোষাকের সংস্থান করত মালিক শ্রেণী। মালয়ে আসার পথ খরচার জন্য শ্রমিকদের কে ঋণ করতে হত এবং বহুক্ষেত্রেই এই ঋণের ভার থেকে মুক্ত হওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব ছিলনা।

1880-র দশকের শেষের দিক থেকে টিন উৎপাদনের ক্ষেত্রে ইউরোপীয় মূলধনের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। বিশ শতকের প্রথম দিক থেকে ব্রিটিশ ধনিক-গোষ্ঠী মূলধন বিনিয়োগে আগ্রহ প্রকাশ করেছিল। চীনাদের কাছ থেকে কাঁচা টিন কেনার চেয়ে সরাসরি টিন উৎপাদনে অংশ গ্রহণ করার দিকেই পশ্চিমী বণিক শ্রেণীর আগ্রহ ছিল বেশী। প্রথম ইউরোপীয় উদ্যোগ ছিল ফরাসীদের। 1883 খ্রীষ্টাব্দে Societe des Mines d Etains de Perak নামে একটি ফরাসী কোম্পানি গঠিত হয়েছিল। 1890 সালে পেরাকে টিন উৎপাদনের পরিমাণ ছিল 15,101 টন আর কিনটাতে পরিমাণ ছিল 8.289 টন। কিনটায় তখন চীনা অধিবাসী ছিল 46,711, লারুতেও প্রায় সম-সংখ্যক।

1913 সাল থেকে মালয়ে আধুনিক কায়দায় ড্রেজিং প্রচলিত হয়েছিল। ড্রেজিং চালু হবার আনুষঙ্গিক ফলরূপে প্রচুর পরিমাণে অর্থ বিনিয়োগের সুযোগও বেড়ে গেল। 1904 সালে মালয়ে টিন উৎপাদনের মোট পরিমাণ ছিল 51,733 টন। তৎকালীন পৃথিবীর মোট উৎপাদনের প্রায় অর্ধেক। 1929 সালে উৎপাদন বেড়ে দাঁড়ায় 69,366 টন। তৎকালীন পৃথিবীর মোট

উৎপাদনের শতকরা 36 ভাগ। অবশিষ্টাংশ আসত বলিভিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও নাইজিরিয়া থেকে। মালয়ে উৎপন্ন টিনের অধিকাংশই রপ্তানি হত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। ইংলণ্ড টিন আমদানি করত বলিভিয়া থেকে। মালয়ের আধুনিকীকরণ যেমন নির্ভর করেছে টিন রপ্তানির রাজস্বের উপর, ঠিক তেমনি সেখানে প্রথম শিল্পোদ্যোগ হচ্ছে টিন গলানো শিল্প। এমনকি ইন্দোনেশিয়া ও শ্যাম দেশের টিনও মালয়েশিয়াতে এসে গলানো হত। 1887 খ্রীষ্টাব্দে সিঙ্গাপুরে প্রথম টিন গলানো কারখানা স্থাপিত হয়েছিল। 1902 সালে দ্বিতীয়টি স্থাপিত হয় বাটারওয়ারথে।

মালয় ব্রিটিশ হাইকমিশনার সুইটেনহাম গলানো টিনের উপর কম এবং অগলানো টিনের উপর বেশী শুল্ক ধার্য করেছিলেন। ফলে টিন উৎপাদন ও টিন গলানোর উপর মালয় প্রায় পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করতে পেরেছিল।

রবার

মালয়ের ভূ-গর্ভে টিন সঞ্চিত ছিল। বিশেষ অর্থনৈতিক চাহিদা মেটাবার জন্য টিনের উৎপাদনের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু রবার উৎপাদনের পিছনে প্রথমে কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছিল না। শুধুমাত্র পরীক্ষামূলকভাবে রবার চাষের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়েছিল। মোটরগাড়ী জনপ্রিয় ও সুলভ হলে রবারের চাহিদা খুব বেড়ে গেল। মালয়ের জঙ্গলে কিছু কিছু রবার বরাবরই ছিল। কিন্তু প্রচুর পরিমাণে রবার পাওয়া যেত ব্রেজিলে। ব্রেজিলে রবারের চাষ যথেষ্ট অগ্রগতি লাভ করেছিল। ব্রেজিল থেকে কিন্তু রবার গাছের বীজ ইংলণ্ডে কিউ (Kew) রয়াল বোটানিক্যাল গার্ডেনসে পাঠান হয়েছিল। কিউ উদ্যানে চারা অঙ্কুরিত হলে, 1873 খ্রীষ্টাব্দে সেগুলি কলকাতায় পাঠান হয়। কিন্তু কলকাতার মৃত্তিকা রবার চাষের ক্ষেত্রে উপযোগী মনে হয়নি। সিংহলেও কিছু পাঠান হয়েছিল। সেখানেও রবার চাষ সম্ভব হয়নি। 1876 খ্রীষ্টাব্দে কিউ উদ্যানের রবার বীজ সিঙ্গাপুরের বোটানিকাল গার্ডেনসে প্রেরিত হয়েছিল। কুঅলা-কাংসারে স্যার হিউ লো (Hugh Low) এর রেসিডেন্সি উদ্যানেও কিছু চারা রোপিত হয়। এই সামান্য কয়েকটি বীজ থেকে মালয়ে পরবর্তী যুগে লক্ষ লক্ষ রবার গাছ সৃষ্টি হয়েছে।

1888 খ্রীষ্টাব্দে সিঙ্গাপুরে বোটানিকাল গার্ডেনসে এইচ. এন. রিডলে চাকরি নিয়ে এলেন। রবার চাষ ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ ছিল অসীম। 1874 সালের পর সিংহল থেকে কিছু বণিক মালয় উপদ্বীপে এসে পেরাক ও

সেলাংগরে কফির চাষ শুরু করেছিল। কিন্তু কফির চাষ লাভজনক হয়নি। 1896 সাল থেকে আন্তর্জাতিক বাজারে কফির দাম কমতে শুরু করে। রিডলে তখন এই সমস্ত বণিকের কাছে রবার চাষের পরিকল্পনা পেশ করেন। 1897 সালে বিকল্প আয়োজন হিসাবে তারা 345 একর জমিতে রবার চাষ শুরু করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তখন হেনরি ফোরড বিপুল সংখ্যায় মোটরগাড়ী নির্মাণে তৎপর হয়েছিলেন। মোটরগাড়ী দাম তখন অনেক কমেছে এবং চাহিদাও বেড়েছে। তাই অতি দ্রুত রবার উৎপাদনও বেড়ে গেল। 1905 সালে মালয় উপদ্বীপের 40,000 একর জমিতে রবার চাষ হয়েছে, 1906 সালে 85,000 একর জমিতে, 1920 সালে 2,475,000 একর জমিতে এবং 1937 সালে 3,302,170 একর জমিতে। 1970 এর দশকে মালয়েশিয়ার আবাদী জমির প্রায় 65 শতাংশ অঞ্চলে রবার চাষ হয়েছে। কৃষিতে নিযুক্ত কর্মীর প্রায় এক তৃতীয়াংশ ছিল রবার চাষের সঙ্গে যুক্ত। 1910—12 সালে রবার উৎপাদকদের লাভ ছিল অভাবনীয়। তখন রবারের দাম প্রতি পাউণ্ডে ছিল পাঁচ ডলার। সে সময় থেকে বিত্তবান শ্রেণী ও মাঝারি বড়লোক শ্রেণী সবাই রবার উৎপাদনে আকর্ষণ বোধ করেছিল। এমন কি অনেক কৃষকও ধান চাষ ত্যাগ করে রবার চাষেই আত্মনিয়োগ করেছিল। বিপুলাকারে রবার চাষ শুরু হবার ফলে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে লোকবসতি গড়ে উঠেছিল এবং রেলপথ ও অন্যান্য যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রসারিত হয়েছিল।

জনস্বাস্থ্য ও শিক্ষা

টিন ও রবার উৎপাদন থেকে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে জনস্বাস্থ্য ও শিক্ষা নতুনভাবে সংগঠিত করা হয়েছিল। শহরাঞ্চলে জনস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য Town Sanitary Board গঠন করা হল। দেশের সর্বত্র হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হল। 1897—98 সালে সার রোণাল্ড রস্ (Sir Ronald Ross) আবিষ্কার করলেন যে নারী এনোফেলিস মশা হল ম্যালেরিয়ার বাহন। 1901 সালেই চিকিৎসা বিদ্যার একটি গবেষণা কেন্দ্র 'ইনস্টিটিউট অব মেডিকেল রিসার্চ' কুআলা লাম্পুরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ঐ সালেই ডঃ ম্যালকম ওয়াটসন (Klang) এর জেলা স্যার্জেন) নতুন আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক প্রথায় ম্যালেরিয়া উৎখাতে আত্মনিয়োগ করেন। 1910 সালে ম্যালেরিয়া রোগে মৃত্যুর হার ছিল প্রতি হাজারে 62.9 শতাংশ, 1920 সালে তা কমে দাঁড়ায় প্রতি হাজারে 18.57 শতাংশ।

শিক্ষাক্ষেত্রেও অগ্রগতি লক্ষ্য করা গেল। 1891 খ্রীষ্টাব্দে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা সেলাংগোরে চালু হয়েছিল। কিন্তু মালাই-রা আগ্রহী হয় নি, কারণ পাঠ্যসূচীতে ধর্মশিক্ষার কোন স্থান ছিলনা 1905

সালে কুঅলা কাংসারে মালাই কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এখানে ধর্মশিক্ষার সুযোগ ছিল। তবে এই শিক্ষাসূচীতে বৃহত্তর জীবনমুখী দৃষ্টিভঙ্গীর স্থান ছিল না। শুধুমাত্র দক্ষ আমলা সৃষ্টি কবাই ছিল শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য। এই ধবণের শিক্ষাপ্রাপ্ত মালাইদের কাছে সরকারী চাকরির সুযোগও ছিল খুবই সীমিত।

1922 সালে তানজং মালিমে (Tanjong Malim) সুলতান ইদ্রিস ট্রেনিং কলেজ স্থাপিত হয়। পরবর্তী কালের জাতীয় আন্দোলনে এই দুই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবধান প্রতিফলিত হয়েছিল। সুলতান ইদ্রিস ট্রেনিং কলেজে থেকে যারা বেরিয়ে আসত তারা ছিল মালাই ভাষায় শিক্ষিত, আর মালয় কলেজের স্নাতকরা ছিল ইংরেজি ভাষায় শিক্ষিত। মালয়ে ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন করেছিল ইংরেজ খ্রীষ্টান মিশনারিরা। 1919 সাল নাগাদ প্রায় 17টি ইংরেজি মাধ্যমের স্কুল সরকারী উদ্যোগে পশ্চিম মালয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মালয় রাজ্যগুলিতে মালাইভাষা ছিল শিক্ষার বাহন। মালয় বিদ্যালয়ে লেখা পড়ার জন্য ফি লাগত না। 7 থেকে 14 বছরের কিশোরদের জন্য যাদের বসবাস বিদ্যালয় থেকে 1 বা দেড় মাইলের মধ্যে, তাদের জন্য লেখাপড়া ছিল বাধ্যতামূলক। 1939 সালে মালয় রাজ্য-গুলিতে এই ধরণের 1500 বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। 1910 সালে কিং এডওয়ার্ড সেভেনথ কলেজ অব মেডিসিন সিঙ্গাপুরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। 1928 সালে সিঙ্গাপুরেই র‍্যাফেলস কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। কলা ও বিজ্ঞানে এখানে শিক্ষা দেওয়া হত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এই দুইটি কলেজকে মিলিত করে মালয় বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টি হয়েছিল। পরে এর নাম-করণ হয় সিঙ্গাপুর বিশ্ববিদ্যালয়। বৃত্তিমূলক ও প্রযুক্তি বিদ্যারও যথেষ্ট প্রসার ঘটেছিল।

কৃষির বিকাশ

টিন শিল্পের পরিধি ও সংগঠন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কৃষিক্ষেত্রেও বিপুল পরিবর্তন ঘটেছে। উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে বিক্রয়যোগ্য শস্যের উৎপাদন অভাবনীয় বৃদ্ধি পেয়েছে। স্থানীয় অধিবাসীর জীবন ধারণের উপযোগী খাদ্য শস্যের চাষ এবং রপ্তানির জন্য পণ্যের উৎপাদন মালয়ের কৃষিক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করেছে। টিন শিল্পের বিকাশের ফলে মালয়ে অনেক নতুন শহর সৃষ্টি হয়েছে। এসব শহরে ভীড় করে এসেছে বহিরাগত শ্রমিক। শহরের চার পাশে গড়ে উঠেছে কৃষি খেত। সেখানে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার প্রয়োজন মেটাতে চাষ করা হয়েছে ধান, ফল

ও শাক সব্জী কখনও মালয় ধাঁচে ছোট ছোট খেতে এবং কখনও চৈনিক পদ্ধতিতে বিপণন বাগিচায় (market gardens)।

রপ্তানিযোগ্য পণ্যের চাষ মালয়ে অনেক দিন থেকেই হয়েছে। সপ্তদশ শতকে কেদাতে চাষ হয়েছে গোল মরিচ। অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগে এবং উনিশ শতকের প্রথমার্ধে পেনাঙে মশলার চাষ হয়েছে। সিঙ্গাপুর স্থাপনের প্রথম দিকেও মশলা চাষ করা হয়েছে। 1840 সালের পর জোহোরে চীনা চাষীরা গোল মরিচের চাষ প্রবর্তন করে। 1850 সাল পর্যন্ত গোল মরিচ এবং 1860 সাল পর্যন্ত লবঙ্গ ও জায়ফল ছিল মালয়ের প্রধান রপ্তানি-যোগ্য পণ্য। উনিশ শতকের সাধারণত চীনা ও ইউরোপীয়দের উদ্যোগ ও উৎসাহে অর্থকর চাষের বিকাশ সম্ভব হয়েছে।

1830 এর দশকে পেনাঙ, প্রভিন্স ওয়েলেসলি এবং মালাক্কাতে কয়েকজন ইউরোপীয় বণিক ইক্ষু চাষ শুরু করে। মালাক্কা ছিল ইক্ষু উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র। 1840 এর দশকে লিঙ্গি (Linggi) নদীর তীরে একটি মালাক্কা চিনি কোমপানি গঠিত হয়েছিল। তা ছাড়া, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপ-পুঞ্জে চিনি শিল্পে অভিজ্ঞ এমন একজন ব্যক্তি মালাক্কাতে 5,000 একর জমিতে ইক্ষু চাষ শুরু করেছিল। জমি পরিষ্কার করা, চারা রোপণ করা, ইক্ষু কাটা, এ সব কাজ করত চীনা শ্রমিক। কিন্তু অনেক সময় পর্যাপ্ত সংখ্যায় শ্রমিক পাওয়া যেত না। তাই 1880র দশকে ভারতবর্ষ থেকে প্রচুর চুক্তিবন্ধ তামিল শ্রমিক মালয়ে গিয়েছিল। 1910 সালে ফেডারেটেড মালয় স্টেটসে চুক্তিবন্ধ শ্রমিক প্রথা বাতিল করা হয়। তারপর থেকেই মালয়ে চিনি শিল্পের অবনতি শুরু হয়। 1913 সালে চিনির কল একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। পঞ্চাশ বছর ধরে চিনি ছিল একটি প্রধান পণ্য।

1880-র দশকে সিংহলে যারা কফির চাষ করত, তাদের অনেকেই মালয়ে চলে আসে। পেরাক, সেলাংগোর এবং নেগ্রি সেম্বিলানে তারা লাইবেরীয় কফি চাষ শুরু করে। কিছু দিন পর্যন্ত তাদের উদ্যোগ সফল হয়েছিল। উনিশ শতকের শেষভাগে ব্রেজিলে কফির উৎপাদন খুব বেড়ে যায়। ফলে মালয়ে কফির দাম হ্রাস পায়। কয়েক বছর পরে পতঙ্গের আক্রমণে মালয়ে কফি চাষ বিনষ্ট হয়। মালয়ে যারা কফির চাষ করত, তাদের অনেকেই তারপর ইউরোপে ফিরে যায় বা মালয়ে রবার চাষে আত্মনিয়োগ করে।

1877 সালে সিংহল থেকে বাইশটি রবারের চারাগাছ সিঙ্গাপুরে আনা হয়। এগুলির কয়েকটি সিঙ্গাপুরের বোটানিকাল গার্ডেনে এবং কয়েকটি কুআলা কাংসারে হিউ লো'র (Hugh Low) রেসিডেন্সী উদ্যানে

রোপণ করা হয়। এই ভাবে সিঙ্গাপুর ও কুআলা কাংসারে মালয় রবার শিল্পের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছিল। 1890 এর দশকে এবং বিশ শতকের প্রথম দশকে অনেকেই কফির খেতে বিকল্প চাষ হিসাবে কফি গাছের পাশে রবার গাছের চারা রোপণ করেছিল। ইতিপূর্বে 1888 সালে সিঙ্গাপুর বোটানিকাল গার্ডেনে ডিরেকটর পদে যোগ দেন হেনরী রিডলে (Henry Ridley)। তিনি রবার চাষের গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন এবং চাষীদের উন্নত রবার চাষের কাজে উৎসাহিত করার জন্য বিভিন্ন স্থানে প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। খেতের মালিক বা সরকারী কর্মচারী হেনরী রিডলের উৎসাহে সাড়া দেয় নি। কিন্তু 1896 সালে তান ছে ইয়ান (Tan Chay Yan) নামে মালাক্কার একজন চীনা অধিবাসী চল্লিশ একর জমিতে রবার-গাছ রোপণ করেছিলেন। ঐ বছরেই কফি-খেতের একজন ব্রিটিশ মালিক সেলাংগেরে আলাদাভাবে পাঁচ একর জমিতে রবার চাষ করেন। পরের বছর কফি-খেতের আর একজন ব্রিটিশ মালিক পেরাকে দু'শ একর কফির জমিতে একের পর এক নারিকেল ও রবার চারা বোনেন। কয়েক বছর পর নারিকেল গাছগুলি তিনি কেটে ফেলেন। 1897 সালে অর্থাৎ মালয়ে প্রথম রবার-আবির্ভাবের বিশ বছর পরে 345 একর জমিতে রবার চাষ হত। 1905 সালে মালয়ে মাত্র 200 টন রবার পাওয়া গেছে, কিন্তু এই সময়ে বিশ্বের অন্যত্র বিশেষ করে ব্রেজিলে আনুমানিক 60,000 টন রবার উৎপাদিত হয়েছে। 1910 সাল নাগাদ মালয়ে রবার চাষ বিপুল ভাবে বৃদ্ধি পায়। দুটি কারণে তা সম্ভব হয়েছিল। প্রথমত, গাছের খুব বেশী ক্ষতি না করে বেশী পরিমাণে রবার উৎপাদনের পদ্ধতি হেনরী রিডলে উদ্ভাবন করেন। দ্বিতীয়ত, মোটর গাড়ীর প্রচলন দ্রুত বেড়ে গেলে, টায়ারের জন্য রবারের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। পরবর্তী কালে, বিশেষ করে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় থেকে জামাকাপড়, জুতো, বৈদ্যুতিক সাজসরঞ্জাম, চিকিৎসার উপাকরণ, গৃহসজ্জা ও আসবাবপত্র ইত্যাদিতে প্রচুর রবার ব্যবহৃত হয়েছে এবং তার ফলে রবারের রপ্তানি বাজারও প্রসারিত হয়েছে।

রবার চাষের জন্য যে সব কোমপানি সদ্য গঠিত হয়েছিল, মালয় রাজ্যগুলিতে তারা জমিজমা বিষয়ে বিশেষ সুযোগ সুবিধা ভোগ করেছে। অনেক ক্ষেত্রে সিঙ্গাপুরের বণিক প্রতিষ্ঠান তাদের প্রতিনিধি ও উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করেছে। সদ্য গঠিত কোমপানিগুলির অধিকাংশই ছিল ব্রিটিশ কোমপানি। তাছাড়া, ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরও কয়েকটি কোমপানি ছিল। মালয় চীনাদের পৃষ্ঠপোষকতায় মালয়েও কয়েকটি কোমপানি গঠিত হয়েছিল। পেরাক, সেলাংগোর, নেগ্রি সেম্বিলান এবং

জোহোরে অধিকাংশ রবার চাষ হয়েছে। রবার্ট ডাফ (Robert Duff) নামে একজন প্রাক্তন পুলিশ কর্মচারী একটি সিনডিকেট গঠন করেন। 1900 সালে কেলানতনের সুলতানের কাছ থেকে রবার চাষের জন্য 3,000 বর্গ মাইল জমি রবার্ট ডাফ আদায় করেন। তাছাড়া ডানলপ কোমপানি (Dunlop Company) এবং য়ুনাইটেড স্টেটস রবার কোমপানি (United States Rubber Company) রবার চাষে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল। বর্তমান শতকের প্রথম দিকে রবারের মূল্য ছিল পাউণ্ড প্রতি চার শিলিং। 1910 সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় পাউণ্ড প্রতি বার শিলিং। 1920 সাল নাগাদ মালয় থেকে রবারের বার্ষিক রপ্তানির মোট পরিমান ছিল 200,000 টন অর্থাৎ তৎকালীন বিশ্বের মোট উৎপাদনের অর্ধেকের বেশী। রবার চাষের জন্য যদিও বড় বড় কোমপানি গঠিত হয়েছিল, ছোট ছোট খেতের (small holdings) মালিক এক-তৃতীয়াংশেরও বেশী উৎপাদনে অংশ নিয়েছিল। মালাই, চীনা আর ভারতীয়রা ছিল ছোট ছোট খেতের মালিক।

1920 এর দশকে রবার চাষ সঙ্কটের সম্মুখীন হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বাণিজ্যিক মন্দার ফলে রবারের বাজার দর হ্রাস পায়। রবারের মজুত পরিমাণ বেড়ে ওঠে। পাউণ্ড প্রতি দর ছয় পেনীতে নেমে আসে। রবার উৎপাদক সমিতি (Rubber Growers' Association) সরকারী হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করে। পরিস্থিতি বিবেচনার জন্য সরকার 1921 সালে স্টিভেনসন কমিটি (Stevenson Coumitee) গঠন করেন। 1920 সালের অক্টোবর মাসে যে বছর শেষ হচ্ছে, সেই বছরের মোট উৎপাদনের ভিত্তিতে স্টিভেনসন কমিটি প্রতিটি রবার উৎপাদককে নির্দিষ্ট পরিমান রবার উৎপাদন করার নির্দেশ দেয়। নির্দিষ্ট পরিমাণ রবারের অতিরিক্ত উৎপাদিত হলে, তার উপর খুব বেশী রপ্তানি শুল্ক বসানোর নির্দেশ দেয় স্টিভেনসন কমিটি। এই কমিটির নির্দেশ 1922 সালের নভেম্বর মাস থেকে কার্যকর করা হয়। স্টিভেনসন অনুমোদিত ব্যবস্থা 1928 সালে পরিত্যক্ত হয়।

1930 এর দশকে পুনরায় বাণিজ্যিক মন্দা দেখা দেয়। রবারের বাজার দর 1921 সালের চেয়েও নেমে আসে। 1934 সালে রপ্তানির পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত করে ব্রিটিশ, ডচ, ফরাসী ও শ্যাম সরকারের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। দু'বার বাণিজ্যিক মন্দা এবং উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা সত্ত্বেও রবার চাষ গবেষণায় যথেষ্ট অগ্রগতি ঘটেছিল। 1926 সালে কুআলা লুম্পুরে একটি রবার গবেষণা সংস্থা (Rubber Research Institute) প্রতিষ্ঠিত হয়। বড় ও ছোট খেতের মালিক সরকারী সাহায্য পায়। 1950

এর দশকে বিশ্বের মোট পরিমাণের এক-তৃতীয়াংশ রবার উৎপাদিত হয়েছে মালয়ের রাজ্যগুলিতে।

বর্তমান শতকে মালয়ে ব্যাপক রবার চাষের ফলাফল ছিল সুদূর প্রসারী। দক্ষিণ ভারত থেকে রবার বাগিচায় কাজের জন্য শ্রমিক সংগ্রহ করা হয়েছে প্রথমে দালাল মারফৎ এবং পরে চুক্তি প্রথার (Indenture System) মাধ্যমে। 1910 সালে মালয়ে চুক্তি প্রথা বাতিল হয়ে গেলে, যাতায়াতের পথ খরচা দিয়ে শ্রমিক আনা হয়েছে। এর জন্য বড় বড় খেতের মালিকরা এবং ফেডারেশন অব মালয় স্টেটসের সরকার যৌথভাবে তহবিল (Indian Immigration Fund) গঠন মারফৎ অর্থ সংগ্রহ করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অল্প কিছু-দিন আগে ভারত সরকার অ-দক্ষ ভারতীয় শ্রমিকের দেশত্যাগ বন্ধ করে দেন।

রবার চাষের জন্য বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে জমি জঙ্গলমুক্ত করা হয়েছে। মালয়ের বহু শ্রমিকের কর্মসংস্থান হয়েছে। 1947 সালের একটি হিসাব থেকে জানা গেছে যে মালয় ফেডারেশনে কর্মরত পুরুষ শ্রমিকের এক-পঞ্চমাংশ এবং নারী-শ্রমিকের এক-তৃতীয়াংশ রবার চাষে নিযুক্ত ছিল। ছোট খেত মালিকদের আয় বেড়েছে। জাভা ও সুমাত্রা ছেড়ে বহু শ্রমিক মালয় রাজ্যগুলিতে ভীড় জমিয়েছে। শুধুমাত্র কৃষি ক্ষেত্রেই নয়, শিল্প ক্ষেত্রেও বহু কর্মসংস্থান সম্ভব হয়েছে। মালয় অর্থনীতিতে রবার জাত জিনিসের মহামূল্য অবদান ছিল। প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে, রবার চাষ ও রবার শিল্পের ফলে মালয়ে শহর, বন্দর ও পথঘাটের দ্রুত বিকাশ সম্ভব হয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা মালয় সরকারের রাজস্ব আয়ের একক বৃহত্তম উৎস হল রবার। টিনের মত রবারের ক্ষেত্রেও রপ্তানি শুল্ক থেকেই সব চেয়ে বেশী রাজস্ব আদায় হয়েছে। কয়েক বছর ধরে, টিন থেকে যা পাওয়া গেছে, তার দ্বিগুণেরও বেশী রাজস্ব এসেছে রবার থেকে। (তফসিল—1 দ্রষ্টব্য) জিনিসের মূল্যের অনুপাতে শতকরা 4 থেকে শতকরা 15 পর্যন্ত রপ্তানি শুল্ক ধার্য করা হত। তাছাড়া ছিল কোমপানির লভ্যাংশের উপর শতকরা 30 পর্যন্ত আয়কর। টিন ও রবারের উপর ধার্য শুল্ক থেকে সরকারের যে বাড়তি আয় হত, তা ব্যয় করা হত জনহিতকর ও সমাজ উন্নয়নমূলক কাজে। মালয়ে আবাদী জমির দুই-তৃতীয়াংশ জুড়ে রবার চাষ হয়। তাই মালয়ে জীবন ধারণের মান সম্পূর্ণ ভাবে রবারের উপর নির্ভরশীল।

প্রাচীন কাল থেকেই মালয়ে নারিকেলের প্রচলন ছিল। 1870 সাল থেকে নারিকেল ও নারিকেল জাত জিনিস রপ্তানি শুরু হয়েছে। 1957

সালে নারিকেল রপ্তানির মোট মূল্য ছিল 75 মিলিয়ন ডলার। পামতেলের গাছ মালয়ে এসেছে বিদেশ থেকে এবং ইউরোপীয় পরিচালনাধীন বড় বড় খেতে এই গাছের চাষ হয়েছে। 1875 সালে পাম-তেল গাছের বীজ সিংহল থেকে সিঙ্গাপুরে আনা হয়। বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য 1917 সালে সেলাংগোরে এই গাছের বীজ প্রথম রোপণ করেন একজন ফরাসী ভদ্রলোক। 1920 এর দশকে রবার চাষে মন্দা দেখা দিলে পাম-গাছের চাষ বেড়ে যায়। 1933 সালে 64,000 একর জমিতে 32টি বড় খেতে পাম তেল গাছ রোপণ করা হয়েছিল। 1941 সালে আবাদী জমির পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে 79,000 একর। 1888 সালে ইউরোপীয়গণ সিঙ্গাপুরে আনারস চাষ শুরু করে। সেখান থেকে জোহোরে তা প্রসারিত হয়। জোহোরই ছিল আনারস চাষের প্রধান কেন্দ্র। জোহোরে এবং অল্প মাত্রায় সেলাংগোর ও পেরাকে রপ্তানিব জন্য আনারস উৎপাদন করা হয়েছে। 1920 ও 1930 এর দশকে ছোট খেতের চীনা মালিকরা ছিল আনারসের প্রধান উৎপাদক। ফেডারেটেড মালয় স্টেটসের কৃষিবিভাগ 1930 এর দশকে কোকো চাষ নিয়ে কিছু পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ত্রেংগানু ও পাহাঙে কোকো চাষ সম্পর্কে কিছু বাস্তব পরিকল্পনা গ্রহণ করা হযেছে। তবে এখনো মালযে কোকোর বাণিজ্যিক সম্ভাবনা সুনিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়।

পেনাঙ বন্দর

ভারতীয় ও চীনা বন্দরের সঙ্গে পেনাঙের সম্বন্ধ অব্যাহত ছিল। আচ ও সুমাত্রার অন্যান্য বন্দর থেকে পেনাঙে আমদানি হত গোলমরিচ, সুপারি, কর্পূর, বেতের ছড়ি এবং রজন। পরিবর্তে পেনাঙ থেকে রপ্তানি হত আফিম এবং ভারতীয় ও ইউরোপীয় বস্ত্রসম্ভার। বর্মা ও শ্যাম দেশের পশ্চিম উপকূল থেকে পেনাঙ আমদানি করত চাউল, পাখীর বাসা, তামাক এবং টিন। এই অঞ্চলে বস্ত্রসম্ভার, আফিম এবং চীনা পণ্য বন্টিত হত পেনাঙের মাধ্যমে। পশ্চিম মালয় রাজ্যগুলি থেকে পেনাঙ টিন সংগ্রহ করেছে। 1830 এবং 1840 এর দশকে প্রতি বছর দুই থেকে তিন হাজাব চীনা শ্রমিক এখানে এসেছে। বিশ শতকের প্রথম দিকে যখন মালয়ে রবার উৎপাদন ছিল ঊর্ধ্বমুখী, দক্ষিণ ভারতীয় শ্রমিকরা পেনাঙ বন্দরে এসে ভীড় করেছে।

পেরাকের টিন শিল্পের সঙ্গেও পেনাঙের যোগাযোগ ছিল ঘনিষ্ঠ। লারুতের টিন খনিতে পেনাঙের বণিকরা অর্থ বিনিয়োগ করেছে এবং টিন-বাণিজ্য পরিচালনা করেছে। 1897 সালে চীনা উদ্যোগে পেনাঙে একটি টিন-

গলানো সংস্থা স্থাপিত হয়েছিল। দশ বছর পরে এই সংস্থা অধিগ্রহণ করে ইস্টার্ন স্মেলটিং কোম্পানি (Eastern Smelting Company)।

প্রভিন্স ওয়েলেসলীতে বেশ বড় ধরণের কৃষি-খামার গড়ে উঠেছিল। 1860 সালে সেখানে চাষজমির পরিমাণ ছিল 70,000 একর। এর মধ্যে 40,000 একর জমিতে ধান চাষ হত, 12,000 একরে নারিকেল এবং 10,000 একরে ইক্ষু। অবশিষ্ট জমিতে চাষ হত মশলা এবং ফলের গাছ। 1868 সাল নাগাদ প্রভিন্স ওয়েলেসলীর জনসংখ্যা ছিল 80,000। এর মধ্যে মালাই ছিল 56,000 এবং ভারতীয় 10,000। ঐ সময় পেনাঙ দ্বীপের লোকসংখ্যা ছিল 70,000। তাদের অধিকাংশই ছিল চীনা। 1950 সালে জর্জটাউনের লোকসংখ্যা ছিল 180,000 এবং প্রভিন্স ওয়েলেসলী সহ পেনাঙের অর্ধ মিলিয়নের কাছাকাছি।

সিঙ্গাপুর বন্দর

মালয়ের অর্থনৈতিক বিকাশে সিঙ্গাপুরের অবদান বিশেষ প্রণিধেয়। সিঙ্গাপুরের ভৌগোলিক অবস্থান ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। এখানে অবাধ বাণিজ্য নীতির সফল প্রয়োগ ঘটেছিল। ইংলন্ড থেকে এখানে প্রচুর পরিমাণে কাটা কাপড় আমদানি করা হত। তাছাড়া, আমদানির তালিকায় ছিল লৌহ, পশমী পোষাক, সুরা স্পিরিট এবং তামার তরবারি-খাপ। এখান থেকে ইংলন্ডের বাজারে রপ্তানি করা হত চীনের নানকিন, কাঁচা রেশম, কফি, চিনি, কচ্ছপের খোলস, কর্পূর এবং গোলমরিচ। ইউরোপের অন্যান্য দেশ থেকে এখানে আসত পশমী পোষাক, সুরা, স্পিরিট, এবং লৌহ এবং দক্ষিণ আমেরিকা থেকে আসত লৌহ ও তাম্র। সিঙ্গাপুর থেকে ইউরোপে ও দক্ষিণ আমেরিকায় রপ্তানি হত চীনের ও স্ট্রেটস সেটেলমেন্টসের উৎপন্ন জিনিস। এখানে মরিশস পাঠাত সামুদ্রিক শামুক এবং আবলুস কাঠ। সিঙ্গাপুর থেকে মরিশস সংগ্রহ করত চা এবং অন্যান্য ভোগ্য পণ্য। কলিকাতা, মাদ্রাজ এবং বোম্বে থেকে জাহাজ ভর্তি করে পাঠান হত আফিম, ভারতীয় এবং ইউরোপীয় কাটা কাপড়, পশমী পোষাক, কার্পাস। ঐ তিনটি বন্দরে সিঙ্গাপুর থেকে যেত তামা, টিন, স্বর্ণ-চূর্ণ, গোলমরিচ, চিনি, বিশেষ বিশেষ কাঠ এবং নানা ধরণের অরণ্যজাত জিনিস। চীন থেকে আসত কাঁচা রেশম এবং 'নানকিন', মশলা এবং কর্পূর। চীনে পাঠান হত আফিম, পাখীর বাসা, বেতের ছড়ি, টিন, সামুদ্রিক শামুক, আবলুস কাঠ, মালয় কর্পূর এবং গোলমরিচ। জাভা থেকে বা জাভার মাধ্যমে সিঙ্গাপুরে আমদানি করা হত তামা, কফি, চাউল, তামাক, মালয়ের ছিটকাপড়। জাভাতে রপ্তানি করা হত

ভারতীয় ও ইউরোপীয় কাটা কাপড় এবং আফিম। শ্যাম, কোচিন-চীন, মালয় উপদ্বীপের পূর্ব উপকূল এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপময় অঞ্চলে আফিম সরবরাহ হত সিঙ্গাপুর থেকে। এই সব অঞ্চল থেকে সিঙ্গাপুর পেত চাউল, চিনি, লবণ, স্বর্ণ-চূর্ণ, পাখীর বাসা, বেত এবং কচ্ছপের খোলস। মালয়ের পশ্চিম উপকূল থেকে আসত টিন। সিংহল, কাম্বোডিয়া এবং ম্যানিলার সঙ্গেও বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। 1828-29 সালের একটি হিসেব থেকে জানা গেছে যে সিঙ্গাপুরে বার্ষিক আমদানির মূল্য ছিল 17 মিলিয়ন টাকা এবং রপ্তানির 15 মিলিয়ন টাকা। তুলনায় পেনাঙে আমদানির মূল্য ছিল 5 মিলিয়ন এবং রপ্তানির প্রায় 3·5 মিলিয়ন টাকা। 1829 সালে কি অর্থ মূল্যের বিচারে এবং কি পণ্য সংগ্রহ ও বন্টনের বিস্তৃত ক্ষেত্রের বিচারে, বিশ্ব বাণিজ্যে সিঙ্গাপুরের নিঃসন্দেহে অগ্রণী ভূমিকা ছিল।

বাণিজ্য বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সিঙ্গাপুরের লোক সংখ্যাও দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছিল। 1830 সালে জনসংখ্যা ছিল 16,634; 1836 সালে 29,984; 1860 সালে 80,792 এবং 1901 সালে 228,555 জন। 1950 সালে লোকসংখ্যা ছিল এক মিলিয়ণের বেশী। সিঙ্গাপুরের সমাজ ছিল বহু জাতির সমন্বয়ে গঠিত। এখানে অধিবাসীদের মধ্যে ছিল চীনা, মালাই, যবদ্বীপীয়, বুগিস্, আরব, ভারতীয় হিন্দু ও মুসলমান, ইউরোপীয় এবং বিশেষ করে ব্রিটিশ। আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেস 1854 থেকে 1862 সালের মধ্যে বেশ কয়েকবার সিঙ্গাপুরে এসেছিলেন। তাঁর *The Malay Archipelago* গ্রন্থে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সিঙ্গাপুরের একটি স্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়।1 সেখানে চীনাদের সংখ্যাবৃদ্ধি লক্ষ্যণীয়। 1836 সালে মোট ত্রিশ হাজার জনসংখ্যার অর্ধেকের কম ছিল চীনা, 1860 সালে আশী হাজার জনের মধ্যে পঞ্চাশ হাজার এবং 1901 সালে দুই লক্ষ আটাশ হাজারের মধ্যে এক লক্ষ চৌষট্টি হাজার ছিল চীনা। 1950 সালে এক মিলিয়ণ জনসংখ্যার মধ্যে চীনারা ছিল শতকরা আশীভাগ।

সিঙ্গাপুরের বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি খুব বেশী দিন স্থায়ী হয় নি। 1833 সালে ইংরেজ ইসট ইনডিয়া কোমপানির বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার বিলুপ্ত হয়। তার ফলে চীন থেকে আগত এবং চীনগামী মালবাহী জাহাজগুলি সিঙ্গাপুরকে বন্দররূপে ব্যবহার করতে বাধ্য ছিল না। এর ফল ছিল সুদূরপ্রসারী। তাছাড়া মাল ওঠানো-নামানোর জন্য সিঙ্গাপুরের বণিকরা কমিশন বাবদ যে অর্থ পেত, তা থেকে তারা বঞ্চিত হল। 1842 সালে হংকং এবং 1846 সালে লাবুআন (Labuan) ব্রিটিশদের হস্তগত হয়। পশ্চিমী জগৎ ও চীনের মধ্যে এবং মালয় দ্বীপপুঞ্জে যে ব্যবসা-

বাণিজ্য চালু ছিল, তার অনেকটাই পরিচালিত হত সিঙ্গাপুর বন্দরের মাধ্যমে। 1842 সালের পর হংকং এবং 1846 সালের পর লাবুআন সিঙ্গাপুরের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়াল। পশ্চিমী শক্তিগুলির সঙ্গে চুক্তির ফলে চীনের যে সব বন্দর উন্মুক্ত করা হয়েছিল, ইংলণ্ডের সঙ্গে সেগুলির প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপিত হল। এর ফলে সিঙ্গাপুরের প্রাধান্য হ্রাস পেল। 1860 এর দশকের মধ্যভাগ থেকে সিঙ্গাপুর বন্দরের দুর্বলতা দৃষ্টি গোচর হয়। প্রায় এক মিলিয়ন ডলারের দায়বদ্ধ দুটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান দেউলিয়া হয়ে পড়ে। ব্যাঙ্ক-ব্যবসায় সঙ্কট দেখা দেয়। 1867-68 সালে পুনরায় বাণিজ্যিক মন্দা শুরু হয়। 1860-র দশকে সুয়েজ খাল উন্মুক্ত হলে বহু পশ্চিমী জাহাজ আবার সিঙ্গাপুর বন্দরে এসে ভীড় করেছে। কিন্তু একারণে সিঙ্গাপুরের ব্রিটিশ বণিকদের ভাগ্য ফেরে নি। ফ্রান্স, জারমানি ও অন্যান্য ইউরোপীয় জাতিগুলির প্রতিযোগিতার চাপে তাদের বাণিজ্য ব্যাহত হয়েছে।

1874 সালের পূর্বে মালয় উপদ্বীপের অর্থনৈতিক বিকাশে সিঙ্গাপুরের নিশ্চিত অবদান ছিল। চীনা কৃষকরা সিঙ্গাপুর বন্দরে শাকসব্জী চাষ এবং গামভারি বৃক্ষ ও গোলমরিচ উৎপাদনে অগ্রণী ছিল। 1840 সাল থেকে তারা জোহোরে ছড়িয়ে পড়ে। এখানে তেমেংগং (পরে মহারাজা) আবু বকরের অনুমতি নিয়ে তারা নদীর উপত্যকায় বসতি স্থাপন করে এবং সেখানেও গোলমরিচ ও গামভারি বৃক্ষের চাষ প্রবর্তন করে। 1874 সালে পেরাক, সেলাংগোর এবং সুংগি উজোং-এ ব্রিটিশ রেসিডেন্ট নিয়োগ করা হয়। এরপর থেকেই মালয় উপদ্বীপের অর্থনৈতিক বিকাশের সঙ্গে নানাভাবে সিঙ্গাপুর জড়িত হয়ে পড়ে। একারণেই মালয় রাজ্যগুলিতে ব্রিটিশ হস্তক্ষেপের দাবিতে সিঙ্গাপুর সোচ্চার হয়েছিল।

মালয় টিনের রপ্তানি বাণিজ্যে সিঙ্গাপুর বন্দরের অগ্রগণ্য ভূমিকা ছিল। 1860 সাল পর্যন্ত চীন এবং ভারতবর্ষ ছিল টিনের প্রধান বাজার। পরবর্তী দশ বছরে ব্রিটেন ও উত্তর আমেরিকায় টিনের বাজার প্রসারিত হয়েছে। 1871 সাল পর্যন্ত সিঙ্গাপুর থেকে ব্রিটেন ও উত্তর আমেরিকায় বার্ষিক সাড়ে চার হাজার টন টিন রপ্তানি করা হয়েছে। সুয়েজ খাল উন্মুক্ত হলে এবং পশ্চিমী জগতে টিনের চাহিদা বৃদ্ধির ফলে সিঙ্গাপুর, পশ্চিম ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকা পরস্পর বাণিজ্য বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে এবং তার ফলে কালক্রমে মালয়ে টিন উৎপাদনের ক্ষেত্রে পশ্চিমী উদ্যোগের অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

মালয় টিন শিল্পের শৈশবস্থায় স্ট্রেটস-সেটেলমেন্টসের চীনারা মূলধন-

বিনিয়োগ করেছে। কিন্তু উনিশ শতকের শেষ দিকে মালয়ের টিন শিল্পে ও কৃষিতে সিঙ্গাপুরের প্রতিষ্ঠিত বণিক প্রতিষ্ঠানগুলির উদ্যোগে ব্রিটিশ মূলধনের বিনিয়োগ শুরু হয়। দি স্ট্রেটস ট্রেডিং কোমপানি (The Straits Trading Company) ছিল টিন গলানোর কাজে দক্ষ। সিঙ্গাপুরের একটি বণিক প্রতিষ্ঠানের শাখা রূপে এই কোমপানি কাজ করেছে। এই ধরণের সিঙ্গাপুরের অন্যান্য বণিকরা জাহাজে করে টিন রপ্তানির কাজে নিযুক্ত থেকেছে আবার টিন খনিতে যন্ত্রপাতি সরবরাহ করার কাজও কোন কোন কোমপানি করেছে। পরবর্তী পর্যায়ে হয় তারা খনি পরিচালনার কাজে অংশ নিয়েছে, কখনও বা খনির মালিকানা স্বত্ব কিনে নিয়েছে। মোট কথা ইউরোপীয় কোমপানিগুলির সঙ্গে সিঙ্গাপুরের বণিক প্রতিষ্ঠানগুলির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। এই ভাবে সিঙ্গাপুরের কয়েকটি প্রধান ইউরোপীয় বণিক প্রতিষ্ঠান লনডনস্থিত ব্রিটিশ কোমপানির অনেক সময় ম্যানেজিং এজেন্ট হিসাবে কাজ করেছে। এক্ষেত্রে সংগঠনের ব্যবস্থাপনা দেখা এবং মালয়ের পণ্য বিক্রি করার মধ্যেই সিঙ্গাপুরের ইউরোপীয় বণিক প্রতিষ্ঠানগুলির দায়িত্ব সীমাবদ্ধ ছিল। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে সিঙ্গাপুরের ইউরোপীয় বণিক সংস্থাগুলি বিদেশী ব্যাঙ্কের এজেন্ট হিসাবে কাজ করেছে। 1850 সাল থেকে সিঙ্গাপুরে কয়েকটি পশ্চিমী ব্যাঙ্কেব শাখা খোলা হয়। কুআলা লুম্পুর, তাইপিং ও আরও কয়েকটি মালয় শহরে এই সব ব্যাঙ্কের এজেন্ট নিয়োগ করা হয়। বর্তমান শতকের প্রথম দিকে সিঙ্গাপুরে কয়েকটি চীনা ব্যাঙ্কও প্রতিষ্ঠিত হয়। মালয় রাজ্যগুলিতে এগুলির কাজকর্মও প্রসারিত হয়। রবার ও টিন শিল্পে এই সব ব্যাঙ্ক প্রচুর মূলধন সরবরাহ করেছিল।

মালয় রাজ্যের কৃষি উৎপাদনের পরিপূরক হিসাবে সিঙ্গাপুরের শিল্প বিকাশ ঘটেছে। সিঙ্গাপুরে যে রবার, নারিকেলের শুষ্ক শাঁস এবং পাম তেল থেকে সৃষ্ট শিল্প দেখা গেছে এবং সাগু পরিষ্কার করার যে যান্ত্রিক আয়োজন গড়ে উঠেছে, তা সম্ভব হয়েছে মালয় রাজ্যগুলির কৃষি উৎপাদনের জন্যই। একথাও সত্য যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চল থেকে যে সব কাঁচা মাল পাওয়া যায়, সেগুলি সিঙ্গাপুরের প্রসেসিং শিল্পের উপকরণ জুগিয়েছে। শুধু তাই নয়, সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় খনিজ তৈল সংগ্রহ ও বন্টনের কাজে আধুনিক বাণিজ্য প্রক্রিয়ার সঙ্গে সিঙ্গাপুর গভীরভাবে যুক্ত হয়েছে। বর্তমান শতকের মাঝামাঝি আমদানি রপ্তানির গঞ্জ হিসাবে সিঙ্গাপুরের গুরুত্ব একেবারে বাতিল হয়ে যায় নি, তবে অনেকটা হ্রাস পেয়েছে। মালয় ফেডারেশনের সঙ্গে সিঙ্গাপুরের সম্বন্ধ নিবিড়তর হয়েছে, ফলে সিঙ্গাপুরের আমদানি রপ্তানি বাণিজ্য বৃদ্ধি পেয়েছে। মালয় ফেডারেশনে কৃষি ও শিল্পের উপযোগী উপকরণের চাহিদা বাড়ে এবং তার

ফলে যাবতীয় ভোগ্য পণ্যের বাজার প্রসারিত হয়। 1952 সালের একটি হিসেব থেকে জানা গেছে যে মালয়ের আমদানির শতকরা 74 ভাগ এবং রপ্তানির শতকরা 67 ভাগ বিদেশ বাণিজ্য সিঙ্গাপুর বন্দরের মাধ্যমে পরিচালিত হয়েছে।

জনসংখ্যা

1911 সালের আগে সমগ্র মালয় জুড়ে লোকগণনা হয় নি। এর আগে ফেডারেটেড মালয় স্টেটসে কিছু লোক গণনা হয়েছিল, কিন্তু তাতে যথেষ্ট ত্রুটিবিচ্যুতি ছিল। 1911 সাল থেকে 1947 সাল পর্যন্ত লোকগণনার যে হিসাব পাওয়া গেছে, তা হচ্ছে মালয় ফেডারেশনের সঙ্গে সিঙ্গাপুরকে যুক্ত করে গণনার ফলাফল। 1911 1921 এবং 1931 সালে যথারীতি দশ বছর অন্তর লোক গণনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য 1941 সালে লোকগণনা সম্ভব হয় নি। পরবর্তী গণনা হয়েছে 1947 ও 1957 সালে। (তফসিল—2 দ্রষ্টব্য) এই সব গণনার মোট লোকসংখ্যার হিসাব নিচে দেওয়া হল ঃ

1911	2.3	মিলিয়ন	1947	4.9	মিলিয়ন
1921	2.9	মিলিয়ন	1957	6.3	মিলিয়ন
1931	3.8	মিলিয়ন			

এটুকু স্পষ্ট যে 50 বছরেরও কম সময়ে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা 300 হারে। অনুমান করা হয় 1911 সালের পূর্বেও সেখানে দ্রুত হারে লোকসংখ্যা বেড়েছে। 1850 থেকে 1950,—এই একশত বছরের মধ্যে যে অঞ্চল জুড়ে এখন আধুনিক মালয় প্রতিষ্ঠিত, সেখানে লোকসংখ্যা বেড়েছে বারো গুণ থেকে কুড়ি গুণ। ইংলণ্ডের সঙ্গে তুলনা করলে চিত্রটা আরও স্পষ্ট হবে। ব্রিটেনে 1700 সাল থেকে 1950 সাল পর্যন্ত লোকসংখ্যা বেড়েছে 5 মিলিয়ণ থেকে 50 মিলিয়ণ অর্থাৎ দশ-গুণ। 1860 সালে সিঙ্গাপুরের লোকসংখ্যা ছিল 80,000 এবং 1950 সালে তা বেড়ে হয়েছে প্রায় এক মিলিয়ণ। অর্থাৎ নব্বই বছরে বৃদ্ধির হার হয়েছে প্রায় বারো গুণ।

জনস্বাস্থ্যের উন্নতি মালয়ে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির একটি অন্যতম কারণ। পূর্বে মালয় ছিল একটি অস্বাস্থ্যকর দেশ। কলেরা, টাইফয়েড, বসন্ত,

আমাশয়, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগ মহামারী আকারে দেখা দিলে, অগণিত মানুষ অকালে প্রাণ হারাত। তাছাড়া শিশু মৃত্যুর হারও ছিল বেশী। উনিশ শতকে মালয়ে সরকারী উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায় জনস্বাস্থ্যের প্রভূত উন্নতি ঘটে। অকাল মৃত্যু ও শিশু মৃত্যুর হার কমে যায়। সেখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির এটি একটি অন্যতম প্রধান কারণ।

বিদেশ থেকেও মালয়ে প্রচুর লোক সমাগম হয়েছে। মালয়ের আর্থিক সমৃদ্ধি দেখে প্রলুব্ধ হয়ে দক্ষিণ চীনের নানা প্রদেশ থেকে চীনারা এসেছে। বণিক, দোকানদার, বড় খেতের মালিক, খনি ও রোপণ খেতের শ্রমিক রূপে চীনারা মালয়ে এসেছে। ধান্য রোপণে তারা অংশ নেয় নি, তবে মৎস্য ব্যবসায়ে চীনারা পারদর্শী ছিল, কেউ বা ধীবর ছিল আবার অনেকেই দালাল-রূপেও কাজ করেছে। 1929 সাল পর্যন্ত বিদেশ থেকে লোক আসার ব্যাপারে কোন বিধিনিষেধ ছিল না। 1930 সালে একটি ইমিগ্রেসন আইন চালু হয়। এই আইনে কিছু বিধিনিষেধের শর্ত আরোপ করা হয়েছে এবং বিদেশী লোক আসার ব্যাপারে নির্দিষ্ট সংখ্যা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। 1930 সালের বাণিজ্যিক মন্দার দরুণ মালয়ে বেকার সমস্যা তীব্র আকার ধারণ করেছিল। এ কারণেই ইমিগ্রেসন আইন চালু করা হয়েছিল। এই আইনে 1930 সাল থেকে শুরু করে জাপানের মালয় অভিযান পর্যন্ত এই কালপর্বে চীনা পুরুষদের মালয়ে অনুপ্রবেশের ব্যাপারে নির্দিষ্ট সংখ্যা (quota) নির্দেশিত হয়েছে। এই নিয়মের বিশদ শর্তগুলি প্রতি বছরে পালটিয়েছে, আবার কখনও কখনও একই বছরের বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তন করা হয়েছে। অবশ্য চীনা শিশু ও মহিলার অনুপ্রবেশের ব্যাপারে কোন বাধা নিষেধ আরোপিত হয় নি। 1947 সালের সেনসাস্ রিপোর্টে বলা হয়েছে যে মালয়ের নগর-কেন্দ্রিক বা শহরবাসী জনসংখ্যার (urban population) শতকরা 62.4 ভাগ হচ্ছে চীনা। সিঙ্গাপুরের হিসাব বাদ দিলে, ঐ সময় মালয়ের মোট জনসংখ্যার শতকরা 38 ভাগ হল চীনা এবং 49 ভাগ হল মালাই। চীনাদের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটেছে ক্রমবর্ধিত হারে। 1950 সালের একটি হিসেব থেকে জানা গেছে যে সিঙ্গাপুরের প্রায় এক মিলিয়ণ জনসংখ্যার শতকরা 80 ভাগ ছিল চীনা।

মালয়ের রেল, বাণিজ্য-সংস্থা, নানা ধরণের সরকারী চাকরি এবং কৃষিখেতে কর্মের অন্বেষণে প্রচুর ভারতীয় এখানে এসেছে। 1907 থেকে 1920 সাল পর্যন্ত অর্থাৎ মালয়ে যখন রবার উৎপাদন উর্ধ্বমুখী, সে সময় দক্ষিণ ভারত ও সিংহল থেকে অসংখ্য শ্রমিক এসেছে। 1922 সালের পর থেকে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে পুনরায় অ-দক্ষ শ্রমিকের ভারত

ত্যাগ করে যাওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। তাছাড়া 1930 সালের মালয়ের ইমিগ্রেসন আইন ভারতবাসীর ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা হয়েছিল। 1947 সালের হিসেব থেকে পাওয়া যাচ্ছে যে মালয়ের মোট জনসংখ্যার শতকরা 11 ভাগ হল ভারতীয়। মালয়ের প্রবাসী ভারতবাসী স্বদেশের সঙ্গে নিত্য যোগাযোগ নিয়মিত ভাবে বজায় রেখেছে। চীনা ও ভারতীয়দের মালয়ে আগমনের চিত্র স্পষ্ট। কিন্তু অন্যান্য বিদেশীদের মালয়ে আগমন প্রসঙ্গে প্রয়োজনীয় তথ্যের যথেষ্ট অভাব আছে। তাছাড়া মালয়েশীয় বা ইন্দোনেশীয় জন-গোষ্ঠী মালয়ে এসে মালয় সমাজের মধ্যে একাকার হয়ে মিশে গেছে। 1931 সালের একটি বিবরণে বলা হয়েছে যে সেলাংগোরের মালয়েশীয়দের মধ্যে শতকরা 28 ভাগ এবং জোহোরে মালয়েশীয়দের মধ্যে শতকরা 27 ভাগের জন্ম হয়েছে মালয়ের বাইরে। 1947 সালে এই সংখ্যা কমে দাঁড়ায় যথাক্রমে শতকরা 14 ও 13 ভাগ। আরব মুসলমান, ইউরেশীয় এবং ইউরোপীয়ান ছিল মালয়ের মোট জনসংখ্যার শতকরা 2 বা 3 ভাগ। বাণিজ্য, ধর্মপ্রচার, বিবাহ, কৃষিকর্ম ও চাকরি সূত্রে এই সব জনগোষ্ঠীর মানুষ মালয়ে এসেছে।

পাদটীকা

1. The harbour is crowded with men-of-war and trading vessels of many European nations, and hundreds of Malay praus and Chinese junks, from vessels of several hundred tons burthen down to little fishing boats and passenger sampans; and the town comprises handsome public buildings and Churches, Mahometan mosques, Hindoo temples, Chinese joss-houses, good European houses, massive ware houses, qucer old kling and China bazaars, and long suburbs of Chinese and Malay cottages'

A. R. Wallace, *The Malay Archipelago*, (London, 1869) p. 16

Quoted in J. Kennedy, *A History of Malay* A. D. 1400-1959 (London, 1962) p. 213

তফসিল 1

Period : 1953—57. Figures in Millions of Straits Dollars.

Export duty from

Year	Rubber	Tin	All Sources
1953	54	51	112
1954	52	53	112
1955	174	55	235
1956	143	60	210
1957	120	54	180

মালয় ফেডারেশনের বার্ষিক বিবরণ থেকে হিসেব গৃহীত হয়েছে

বিশেষ দ্রষ্টব্য

1. রবার ও টিন থেকে অন্য ভাবেও রাজস্ব আদায় হয়েছে। টিনখনি ও রবার খেত কোমপানির উপর আয়কর ধার্য করা হত। তাছাড়া রাজ্য ভিত্তিক খাজনা ও লাইসেন্স ফিও আদায় করা হত।

2. টিনের চেয়ে রবারের বাজারে দরের ওঠানামা খুব বেশী হয়েছে। বছর বছর দরের ওঠানামা আগে অনুমান করা প্রায় অসম্ভব ছিল।

তফসিল 2

জনসংখ্যার হিসাব

সাল	মালয় ফেডারেশন	সিঙ্গাপুর
1911	2,339,051	305,439
1921	2,906,691	420,004
1931	3,787,758	559,946
1947	4,908,086	940,824
1957	6,276,915	1,445,929

মালয়ের (সিঙ্গাপুর সহ) জাতিগোষ্ঠী
(হাজারের হিসাবে)

সাল	মালাই	চীনা	ভারতীয়
1911	1420	920	270
1921	1630	1180	870
1931	1930	1710	620
1947	2540	2620	610

সূত্র নির্দেশ : J. Kennedy, *A History of Malay* A. D. 1400—1959 (London 1962) p. 235.

।। 12 ।।

ইন্দোনেশিয়ায় জাতীয়তাবাদ

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মুক্তি-সংগ্রাম

প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালীন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শাসনের তুঙ্গতম পর্ব দেখা গিয়েছিল। ব্রিটিশ মালয়, নেদারল্যান্ড ইনডিজ, ফ্রেনচ ইন্দোচায়না শব্দগুলিতে সাম্রাজ্যবাদের জয়ডঙ্কা ধ্বনিত হয়েছে। 1920 ও 1930 এর দশকে ইউরোপীয় শাসকের যে চিত্র আমরা পেয়েছি, তার কিছু আভাস পাওয়া যায় সমরসেট মমের গল্পে, উপন্যাসে ও নানা লেখকের ভ্রমণ কাহিনীতে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশের যে সীমান্ত এই সময় সৃষ্টি হয়েছিল অদ্যাবধি তা মোটামুটি অপরিবর্তিত। বর্মা ছিল ব্রিটিশ শাসনাধীন। ভিয়েতনাম, কাম্বোডিয়া ও লাওস রাজ্যগুলিতে ফরাসী শাসন ছিল প্রতিষ্ঠিত। এই রাজ্যগুলি একত্রে ফরাসী ইন্দোচীন নামে বর্ণিত হয়েছে। থাইল্যান্ড কোন মতে স্বাধীনতা বাঁচিয়ে রেখেছিল। নেদারল্যান্ড ইনডিজ নামে পরিচিত অঞ্চল পরবর্তীকালে ইন্দোনেশিয়া নামে অভিহিত হয়েছে। স্পেনীয় ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অধীন ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের সীমারেখা অনুরূপভাবে স্বাধীন সার্বভৌম ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের সীমানারূপে স্বীকৃত হয়েছে। শুধুমাত্র মালয়েশিয়া রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে এর অন্যথা ঘটেছে। মালয় উপদ্বীপ ও সিঙ্গাপুর ছিল ব্রিটিশ শাসনাধীন। সারাবাক ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত ব্রুক (Brook) পরিবারের শাসন-নিয়ন্ত্রণে এবং সাবা-তে একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল। তা সত্ত্বেও সারাবাক ও সাবার সঙ্গে ব্রিটিশ যোগাযোগ ছিল সুদৃঢ় ও স্পষ্ট। এগুলিকে একত্র করে 1956 থেকে 1963 সালের মধ্যে মালয়েশিয়া রাষ্ট্র গঠিত হয়েছে।

1920 সালের পর থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে রাজনৈতিক অর্থে আধুনিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু হয়েছিল। বিদেশী কর্তৃত্বের বন্ধন থেকে স্বাধীনতা লাভ ছিল রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য। নতুন অভিনব রাজনৈতিক দর্শন এবং কোথাও বা বৈপ্লবিক রাজনৈতিক ভক্রেম

উপর ভিত্তি করে নতুন রাষ্ট্রগঠন প্রচেষ্টা ছিল এসব দেশে রাজনৈতিক আন্দোলনের কর্মসূচীর অন্যতম প্রধান অঙ্গ। অবশ্য একথা সত্য নয় যে 1920 সালের আগে সাম্রাজ্যবাদের প্রসার ঘটেছিল বিনা বাধায়, বিনা প্রতিরোধে। উনিশ শতক জুড়ে ইন্দোনেশিয়া দ্বীপপুঞ্জে ওলন্দাজ শক্তির প্রসার ঘটেছিল যুদ্ধের মধ্য দিয়ে। দীর্ঘকাল ধরে বর্মার বহুসংখ্যক অধিবাসী সেখানে ব্রিটিশ প্রভুত্ব মেনে নেয় নি। ভিয়েতনামে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রাম ছিল প্রায় নিরবচ্ছিন্ন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে যে সব প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, সেগুলির প্রকৃতি ছিল মূলত পরম্পরাগত, অর্থাৎ সেগুলি সনাতন পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়েছিল। পরম্পরাগত প্রতিরোধ থেকে আধুনিক সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে যে গুণগত রূপান্তর ঘটেছে, ইতিহাসে তা জাতীয়তাবাদ নামে পরিচিত। কিন্তু জাতীয়তাবাদ কথাটির দ্বারা সবকিছু স্পষ্ট বোঝা ও বোঝান সম্ভব নয়। প্রশ্ন উঠতে পারে, ইউরোপ ও লাতিন আমেরিকায় যে ধরণের জাতীয়তাবাদের উন্মেষ দেখা গিয়েছিল, তার সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জাতীয়তাবাদের মিল আছে কি ? এ নিয়ে পণ্ডিত মহলে অবশ্যই নানা বিতর্ক ও মতভেদ আছে। নানা মত বিরোধ সত্ত্বেও এটুকু সর্বজনস্বীকৃত যে 1920 ও 1930 এর দশকে যে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, তা পরম্পরাগত আন্দোলনকে অস্বীকার বা অগ্রাহ্য করেনি। বরঞ্চ প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যকে যথাযথ মূল্য দিয়ে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বর্তমান প্রজন্মের মানুষ আধুনিক যুগের রূপান্তরিত সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সুদৃঢ় কাঠামো গড়ে তুলেছে।

এই প্রসঙ্গে ইন্দোনেশিয়ার ইতিহাস বিশেষভাবে স্মরণীয়। জাভা যুদ্ধ (1815—30), সুমাত্রার পার্দেরি (Paderi) যুদ্ধ (1820 ও 1830 এর দশক), সুমাত্রার আচে যুদ্ধ (1872—1908) ইত্যাদির মধ্য দিয়ে ইন্দোনেশিয়ায় ওলন্দাজ কর্তৃত্বের বিস্তার ঘটেছিল।

1920 এর দশকে ইন্দোনেশিয়ায় যারা স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন তাঁরা অবশ্যই ঐ সমস্ত যুদ্ধের ঐতিহ্য সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। সুকর্ণ ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দের দৃষ্টিতে স্বাধীনতা আন্দোলন ও অখণ্ড ইন্দোনেশীয় জাতি গঠন ছিল পরস্পর অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কিত। অখণ্ড জাতীয় সংহতি ও ঐক্যের প্রয়াসের মূলে একটি বিশেষ রাজনৈতিক দর্শন ছিল সক্রিয়। ইন্দোনেশিয়ার পরম্পরাগত ঐতিহ্য ও উনিশ শতকের ইউরোপের রাজনৈতিক

চিন্তাধারার সমন্বয়ে গঠিত হয়েছিল ইন্দোনেশীয় নেতৃবৃন্দের রাজনৈতিক জীবনদর্শন।

প্রশ্ন উঠতে পারে 1920 ও 1930 এর দশকে নতুন চেতনা সৃষ্টি হয়েছিল, কিন্তু তার আগে হয়নি কেন ? উত্তরটা খুবই সহজ। বিশ ও ত্রিশের দশকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বহু মানুষ ঔপনিবেশিক শাসন সম্পর্কে নানাভাবে সংশয়, প্রশ্ন ও অনাস্থা সচেতনভাবে জ্ঞাপন করতে পেরেছিল। ভিয়েতনামে জাতীয় চেতনার ঐতিহ্য দীর্ঘকাল ধরে সেখানকার মানুষ বহন ও লালন পালন করেছে। তাই সেখানে নতুন ধরণের রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদকে আশ্রয় করে তাদের সচেতনতা গড়ে উঠেছিল। ঔপনিবেশিক বন্ধন থেকে মুক্তি তারা খুঁজেছিল এই নতুন রাষ্ট্রিক মতবাদকে আঁকড়ে ধরে। ইন্দোনেশিয়ায় জাতীয় চেতনা ঔপনিবেশিক শাসনের ফলেই সৃষ্টি হয়েছিল। এজন্য বিশেষ কোন রাষ্ট্রিক মতবাদ তাদেরকে গ্রহণ করতে হয়নি। স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্ররূপে থাইল্যান্ডের ঔপনিবেশিক বন্ধনের কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও, শাসন কাঠামোর প্রকৃতি ও শাসনের উদ্দেশ্য নিয়ে নানা ভাবনা চিন্তায় থাই মানুষদের সচেতনতা প্রকাশ পেয়েছিল।

বলা বাহুল্য, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পশ্চিমী শিক্ষাদীক্ষার সুযোগ প্রসারিত হবার ফলেই সেখানে জাতীয় জাগরণ ত্বরান্বিত হয়েছিল। পরিবর্তিত শাসন কাঠামো ও সমাজ বিন্যাসের প্রয়োজনে এক নতুন শ্রেণী সেখানে জন্ম নিয়েছিল। এই শ্রেণী হল বুদ্ধিজীবী শ্রেণী। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পশ্চিমী শিক্ষায় শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী শ্রেণী রাজনৈতিক তত্ত্ব ও মতবাদের আলোকে ঔপনিবেশিক শাসনের গুণাগুণ বিচারে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নতুন প্রজন্মের নেতৃত্ব এসেছিল এই বুদ্ধিজীবী শ্রেণী থেকে। উদাহরণ, ইন্দোনেশিয়ার মহম্মদ হট্ট আর ভিয়েতনামের হো চি মিন। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি নিজেদের দেশে যে রীতিনীতি আচরণ মেনে চলত, ঠিক তার বিপরীত রীতিনীতি আচরণ অনুসরণ করত অধীন উপনিবেশগুলিতে। আচরণের এই বৈষম্য দেখেই বুদ্ধিজীবী শ্রেণী তিক্তবিরক্ত বোধ করেছিল।

এই মনোভাব থেকেই অনেকের মনে প্রশ্ন জেগেছিল যে পশ্চিমী জগতের রাজনৈতিক মতবাদ ও অর্থনৈতিক তত্ত্ব দিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির বিপুল জটিল সমস্যার সমাধান সম্ভব কিনা। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির রাষ্ট্র কাঠামো ও উপনিবেশগুলির আর্থিক দুর্দশার মধ্যে একটি অভিন্ন যোগাযোগ তাদের দৃষ্টি গোচর হয়েছিল। আশ্চর্য নয় যে, মুক্তির

অন্বেষণে সাম্যবাদী ধ্যানধারণাকে তারা অনেক বেশী গ্রহণযোগ্য মনে করেছিল। *1917* সালের রুশ বিপ্লবের সাফল্যের প্রভাব 1985 সালে আমাদের পক্ষে অনুভব করা কঠিন। 1920 এর দশকে বিশ্ববিপ্লবের স্বপ্নের মধ্যেই মানুষ ঔপনিবেশিক দুঃখ যন্ত্রণার অবসান কামনা করেছিল। তাই বিশ ও ত্রিশের দশকেই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মানুষ কমিউনিসট বিপ্লবের মধ্য দিয়েই স্বাধীনতা লাভ করতে চেয়েছিল। ইন্দোনেশিয়ায় কমিউনিসট পারটির অনুগামীর সংখ্যা নগন্য ছিল না। ব্রিটিশ মালয়ে চীনাদের মধ্যেও কমিউনিসটরা সক্রিয় ছিল। কিন্তু চীনদেশের স্বার্থ সম্বন্ধেই তারা বেশী সজাগ ছিল। ইন্দোনেশিয়া ও ভিয়েতনামে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মুক্তি সংগ্রাম দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। ইন্দোনেশিয়াতে কমিউনিসট পারটি ছিল ডচ বিরোধী জাতীয়তাবাদী দলগুলির মধ্যে অন্যতম প্রধান দল। কিন্তু এই জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব তাদের হাতে ছিল না। অপর দিকে ভিয়েতনামে ফরাসী বিরোধী প্রতিরোধ আন্দোলনে কমিউনিস্ট পারটি নেতৃত্ব দিয়েছিল। এর কারণ কি ? প্রথমত, ভিয়েতনাম কমিউনিস্ট পারটির নেতারা ছিলেন অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন। ইন্দোনেশিয়াতে কিছু আদর্শনিষ্ঠ সক্ষম নেতা ছিলেন কমিউনিস্ট দলের মধ্যে, কিন্তু অ-কমিউনিস্ট জাতীয়তাবাদী দল-গুলির মধ্যেও অনুরূপ নেতার অভাব ছিল না। দ্বিতীয়ত, ইন্দোনেশিয়াতে ডচ এবং ভিয়েতনামে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ ছিল নিঃসন্দেহে অত্যাচারী। সুকর্ণ, হট্ট প্রভৃতি বরেণ্য নেতাকে যদিও ডচ শাসকবর্গ দেশত্যাগে বাধ্য করেছিল ও আরও শত শত দেশপ্রেমিককে কারারুদ্ধ করেছিল, কিন্তু, তুলনায় ভিয়েতনামে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ ছিল অনেক বেশী নির্মম, নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী। নিদারুণ অত্যাচারের ফলেই অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলি সেখানে উচ্ছেদ হয়, অথবা পঙ্গু হয়ে পড়ে। ভিয়েতনাম কমিউনিস্ট পারটি গোপন সন্ত্রাসবাদী দল হিসেবে আত্মরক্ষায় সমর্থ হয়েছিল। ভিয়েতনামের সমাজ ছিল কনফুসীয় ধাঁচে তৈরী। যখন সেখানে কনফুসীয় সমাজের সনাতন মূল্যবোধ ভেঙ্গে পড়ল, তার শূন্যস্থান দখল করেছিল বিশ শতকের কমিউনিস্ট রাজনৈতিক মতবাদ।

ইন্দোনেশিয়ার পরিস্থিতি ছিল অন্যরূপ। সেখানে জাতীয়তাবাদ ছিল নব্যবিকশিত অভিজ্ঞতা। সেখানে পরম্পরাগত সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ এবং ঐতিহ্যনুসারী ও আধুনিক ধর্মীয় মূল্যবোধ সমাজ সংরক্ষণে অসম্পূর্ণ বা বিফল মনে করা হয়নি। বরঞ্চ সেখানে পরম্পরাগত সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ থেকেই জাতীয়তাবাদ প্রাণশক্তি আহরণ করেছে। সুকর্ণ হলেন ইন্দোনেশীয় জাতীয়তাবাদের প্রতীকী ব্যক্তিত্ব। তাঁর ব্যক্তিত্বে নানা ধরণের

সংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রবণতার মিশ্রণ ঘটেছিল। ইন্দোনেশীয় জাতীয়তাবাদের প্রকৃতি ছিল সর্বাত্মক। বিচিত্র ধরণের পরস্পরবিরোধী রাজনৈতিক প্রত্যয় এই জাতীয়তাবাদের পক্ষপুটে স্থান পেয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদও সেখানে স্থান পেয়েছিল, কিন্তু ভিয়েতনামের মত সর্বগ্রাসী রূপ পায়নি।

কাম্বোডিয়া ও লাওস-এ বিশ ও ত্রিশের দশকে জাতীয়তাবাদের আবির্ভাব ঘটেনি বললেই চলে। উভয় দেশেই ফরাসী শাসনের নিয়ন্ত্রণে সনাতন সমাজ এবং সনাতন শাসক শ্রেণীর স্বার্থ ছিল সুরক্ষিত। ফরাসী শাসনে এই দুই দেশে পরিবর্তন আসেনি, তা নয়। কিন্তু ইন্দোনেশিয়া ও ভিয়েতনাম বা বর্মার মত সে পরিবর্তন জাতীয়তাবাদের জন্ম দেয়নি। কাম্বোডিয়ার রাজা রাজত্ব করেছেন এবং প্রজাপুঞ্জ তাঁকে দেবজ্ঞানে পূজা করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে পশ্চিমী ধ্যানধারণা ও পশ্চিমী শিক্ষার সেখানে অনুপ্রবেশ ঘটেনি। ফরাসী সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতির প্রভাব বৃহত্তর জনগোষ্ঠী এতটুকু অনুভব করে নি। *1939* সালে ফরাসী মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্তরের শিক্ষায় শিক্ষিত লোকের সংখ্যা কাম্বোডিয়ায় এক ডজনের বেশী ছিল না। কাম্বোডিয়া, লাওস ও মালয়ে সনাতন শাসক গোষ্ঠীর সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পারস্পরিক স্বার্থের মৈত্রী বন্ধন ঘটেছিল। কাম্বোডিয়ার শাসক গোষ্ঠী এই ভেবেই আশ্বস্ত ছিলেন যে ভিয়েতনামের আগ্রাসী পরিকল্পনার বিরুদ্ধে ফরাসী শক্তি তাদের রক্ষা করবে। মালয়ের শাসকগোষ্ঠী তেমনি আশ্বস্ত বোধ করেছিল যে পরিশ্রমী চীনাদের অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার হাত থেকে ব্রিটিশ শক্তি তাদের স্বার্থ রক্ষা করবে।

বিশ শতকের প্রথম দিকে স্পেনের বিরুদ্ধে ফিলিপাইনে যে বিপ্লবের প্রচেষ্টা হয়, তার মধ্যে আধুনিক জাতীয়তাবাদের অনেকগুলি লক্ষণ ছিল বেশ স্পষ্ট। কিন্তু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কোন জাতীয় প্রতিরোধ গড়ে উঠে নি। কারণ আমেরিকান শাসক গোষ্ঠী তাদের স্বাধীনতা দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। ফিলিপাইনের এলিট সমাজ সেই প্রতিশ্রুতিতে আস্থা স্থাপনও করেছিল।

পরম্পরা ও পরিবর্তন

ইন্দোনেশিয়ার গ্রামে গ্রামে প্রাক্-সামন্ততন্ত্র ও প্রাক্-ধনতন্ত্র পর্বের আদিম সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। কিছুদিন পূর্বেও ভূ-সম্পত্তিতে অবাধ ব্যক্তি মালিকানার ধারণা ইন্দোনেশিয়ার অধিকাংশ মানুষের অজানা ছিল। জমি ছিল গ্রামীণ সমাজের যৌথ মালিকানায় ন্যস্ত। গত শতকে *Adat* (প্রথা কানুন) অনুযায়ী এক ধরণের স্থায়ী পারিবারিক

Leasehold ব্যবস্থা উদ্ভূত হয়েছিল, কিন্তু সে ক্ষেত্রেও গ্রামের বিনা অনুমতিতে জমি বিক্রয় আইনসিদ্ধ ছিল না। কোন পরিবার গ্রাম ছেড়ে চলে গেলে, নির্দিষ্ট সময়ের পর তার জমি গ্রামীণ সমাজের মালিকানা স্বত্বে ফিরে আসত। বিশ শতকে জাভা অঞ্চলে যৌথ স্বত্বাধীন জমির পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও যৌথ মালিকানা ভিত্তিক গ্রামীণ সমাজের সাধারণ সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং সাংস্কৃতিক ধ্যানধারণা প্রায় অবিচ্ছিন্ন ও অবিকৃত থেকে গেছে।

গ্রামের পরম্পরাগত রাজনৈতিক সংগঠন *Desa* ব্যবস্থা নামে পরিচিত। এই ব্যবস্থার দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল *Musjawarat*, অর্থাৎ গ্রামবাসীদের মধ্যে আলাপ আলোচনা; এবং *Mufakat*, অর্থাৎ আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে একটি সর্বসম্মত ঐকমত্যে পেঁাছান। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের শাসন বা সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামত সংখ্যালঘু সম্প্রদায় কর্তৃক গ্রহণ, পশ্চিমী গণতন্ত্রের এ সব রীতিনীতি ইন্দোনেশিয়ার গ্রামীণ মানুষের কাছে একেবারেই গ্রহণযোগ্য ছিল না। সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হত আলোচনা ও আপস-রফার মধ্য দিয়ে, সমাজ শাসিত হত যৌথ দায়িত্বের ভিত্তিতে। সমাজ দর্শনের অন্তর্নিহিত নীতি ছিল *Gotong Rojong* বা পারস্পরিক সাহায্য। এই নীতির মর্মার্থ হচ্ছে যে সমাজের প্রতিটি মানুষের পরস্পরের প্রতি দায়িত্ব আছে, আবার সামগ্রিকভাবে সমাজের প্রতিও দায়িত্ব আছে। *1956* সালের ডিসেম্বর মাসে President Sukarno তাঁর শাসন কাঠামোর মূল নীতি হিসাবে *Gotong Rojong* এর কথা উল্লেখ করেন।

জমির যৌথ-স্বত্ব, আলাপ আলোচনার মাধ্যমে ঐকমত্য এবং পারস্পরিক সাহায্য, এই সব ছিল ইন্দোনেশিয়ার সনাতন সমাজের অঙ্গীভূত চিরন্তন সত্য। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে ইন্দোনেশীয় সমাজের অন্যান্য দিকে নানা পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল। শিক্ষার প্রসার, অর্থকরী ফসলের চাষ, খেত খামারে বেতন-ভোগী মজুরের (wage labor) প্রবর্তন, এবং বিনিময় অর্থনীতির (barter economy) পরিবর্তে অর্থের (money economy) প্রচলন শুরু হয়। এ সবের ফলে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীতেও পরিবর্তন আসে। পারিবারিক বন্ধন ও গ্রামীণ সংহতি শিথিল হয়ে পড়ে।

পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ইসলাম ধর্মও ছিল ইন্দোনেশিয়ার সমাজ রূপান্তরের একটি অন্যতম প্রধান বাহন। প্রাচীন ধর্ম বিশ্বাস ও আচার আচরণের সঙ্গে সেখানে যুক্ত হয়েছিল হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম বিশ্বাস ও রীতি-

নীতি। এই সমন্বয়-ধর্মী সাংস্কৃতিক পটভূমিকায় ইসলাম-ধর্মকে ইন্দোনেশিয়ার মানুষ সাদরে বরণ করেছে। ফলে ইসলাম সেখানে অনড় অচল অনুশাসন নয়। সহিষ্ণু এবং বেগবান ধর্ম হিসাবে ইসলাম আধুনিক যুগোপযোগী ভূমিকা নিয়েছে এবং ঐক্য বন্ধনে সমগ্র দেশকে দৃঢ় সংহতি দিয়েছে। মুসলমান সমাজের একটি বিরাট অংশ ইসলাম ধর্মের সংস্কার সাধনে ব্রতী হয়। এই উদ্যোগের ফলেই ইন্দোনেশিয়ায় দেখা দেয় ইসলাম ধর্মে নব জাগরণ এবং জাতীয় চেতনার উন্মেষ।

ইন্দোনেশিয়ার অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করত ডচ ও অন্যান্য ইউরোপীয়রা। চীনা, আরব ও ভারতীয়রাও নানা কারবারে অংশ নিয়েছে। কিন্তু স্বদেশের অর্থনীতিতে ইন্দোনেশীয়দের ভূমিকা ছিল খুবই নগণ্য। পশ্চিমী শিক্ষায় শিক্ষিত ইন্দোনেশীয় যুবকদের জন্য ডচ ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামোতে প্রবেশাধিকার ছিল সীমাবদ্ধ, উন্নতির সুযোগ ছিল না বললেই চলে। উনিশ শতকের ইউরোপীয় উদারনৈতিক ও জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার সঙ্গে তাদের পরিচয় ঘটেছিল। তাদের শ্রেণীগত ও ব্যক্তিগত অসন্তোষকে তারা সদর্থক জাতীয়তাবাদে উত্তীর্ণ করতে পেরেছিলেন।

Furnivall বলেছেন এশিয়ার বিভিন্ন দেশে জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম ইন্দোনেশিয়ায় তরুণদের মনে প্রেরণা সঞ্চার করেছে। স্পেনের বিরুদ্ধে চলেছিল ফিলিপাইনের দেশপ্রেমিকদের সংগ্রাম। কয়েকটি ইউরোপীয় শক্তির বিরুদ্ধে চীনারা বক্সার বিদ্রোহ সংগঠিত করে। তখন ভারতবর্ষে ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছে। তুরস্কের ঘটনায় মুসলিম দুনিয়া কেঁপে উঠেছে। 1905 সালে বৃহৎ পাশ্চাত্ত্য শক্তি রাশিয়া ক্ষুদ্র প্রাচ্য শক্তি জাপানের হাতে পরাজিত হয়েছে। Furnivall মনে করেন এ সব ঘটনার ফলে ইন্দোনেশিয়ার দেশপ্রেমিক তরুণ সমাজের মনে গভীর আত্ম-প্রত্যয় বোধ সঞ্চারিত হয়েছিল।

ইতিমধ্যে গ্রামাঞ্চলে কিছু কিছু পরিবর্তন ও প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে। উনিশ শতকের শেষের দিকে জাভাতে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কৃষক অভ্যুত্থান ঘটেছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষ পর্যন্ত বহু কৃষক বিদ্রোহের খবর পাওয়া গেছে। বাধ্যতামূলক কৃষি প্রথার ফলে গ্রামীণ সমাজে যে অনিবার্য ভাঙন দেখা দিয়েছিল, তারই প্রতিক্রিয়া রূপে এ সব কৃষক বিদ্রোহ ঘটেছিল। কৃষক বিদ্রোহগুলির মধ্যে Samin আন্দোলন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 1890 সালে মধ্যজাভায় Samin আন্দোলন শুরু হয় এবং 1907 সালে প্রায় তিন হাজার পরিবার-প্রধান আন্দোলনে অংশ নেয়। আন্দোলনের নেতা ছিলেন

Samin নামে একজন ধর্মবিশারদ। সরকারী হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া হিসাবে শুরু হলেও কিছু কিছু সাম্যবাদী লক্ষণ এই আন্দোলনে প্রচ্ছন্ন ছিল। আন্দোলনকারীরা রাজস্ব বা কর দিতে অস্বীকার করে এবং সরকারী কর্মচারীদের সংস্রব এড়িয়ে চলে। 1907 সালে Samin ও তাঁর আটজন সহযোগীকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তাঁদের নির্বাসিত করা হয়। 1920 সাল পর্যন্ত এই আন্দোলন টি‍ঁকে ছিল।

পরম্পরা ও পরিবর্তনের পটভূমিতে কয়েকটি ধারা ছিল সক্রিয়। যৌথ ভূমি স্বত্ব, পারস্পরিক সাহায্য নীতি, ইসলাম ধর্মের ঐক্য গ্রন্থি, এবং ঔপনিবেশিক পর্বের সমাজ শ্রেণী বিন্যাস ইন্দোনেশিয়ার ভাবজগতের পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছিল। বিশ শতকে এই পরিমণ্ডলের সঙ্গে যুক্ত হয় এশিয়ার জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের প্রেরণা, পশ্চিমী শিক্ষায় শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর উদ্ভব, ক্রমবর্ধমান সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসন্তোষ এবং কৃষক বিদ্রোহের ঐতিহ্য।

ইসলামের নবজাগরণ

ডচ ঔপনিবেশিক নীতির ফলে ইন্দোনেশিয়ায় গ্রামীণ আঞ্চলিকতা, সাম্প্রদায়িকতা এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার পরম্পরাগত ছক ভেঙ্গে পড়েছিল। বাধ্যতামূলক কর্ষণ প্রথার জন্যই ভাঙ্গন শুরু হয়। শোষিত কৃষককুল এবং *Priyayi* শ্রেণী পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। কৃষকদের দৃষ্টিতে Regentরা ছিলেন বিদেশী শাসকের হাতে যন্ত্রবিশেষ। 1870 সালে ইন্দোনেশিয়ায় উদারনৈতিক যুগ (Liberal era) শুরু হয়। সে সময় ব্যক্তিগত মূলধনের অনুপ্রবেশ ঘটে। ওলন্দাজ বিনিয়োগকারীদের স্বার্থেই এই নীতি গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও অ-ইন্দোনেশীয়দের হাতে জমি হস্তান্তর নিষিদ্ধ হওয়ায় ইন্দোনেশীয় কৃষকদের স্বার্থ সংরক্ষিত হয়েছিল। অবশ্য এর ফলে তাদের ঋণের বোঝা কমে নি, বরঞ্চ তাদের জীবনযাত্রার মান দ্রুত নেমে গেছে।

Priyayi শ্রেণীর মর্যাদা ক্ষুন্ন হয়েছে। Regentদের অগ্রাহ্য করে সরাসরি গ্রাম প্রধানদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছিল ডচ ব্যক্তিগত উদ্যোক্তাগণ (Dutch private enterprise)। ক্রমবর্ধমান সামাজিক অবক্ষয়ে ও অবনতিতে সাধারণ মানুষ দিশাহারা বোধ করেছে। উদভ্রান্ত কৃষককুল এই সংকটের সময় যোগ্য নেতৃত্বের প্রত্যাশায় উলেমাদের শরণাপন্ন হয়েছে।

Laissez-Faire উদারনৈতিক পর্বের স্থান দখল করে এথিকাল নীতির যুগ। এথিকাল নীতির মূল কথা ছিল জন কল্যাণ আদর্শে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পরিচালিত হবে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে। শোষণ নয়, জনহিতে শাসন সংস্কার—এই ছিল বিংশ শতাব্দীতে ডচ ঔপনিবেশিক নীতির সারমর্ম। প্রথম মহাযুদ্ধের পর কয়েকটি বছরে অনেকগুলি যুগান্তকারী শাসন সংস্কার চালু করা হয়। কিন্তু বিশের দশকের মাঝামাঝি থেকে উদারনৈতিক পর্বের অবসান ঘটে এবং রক্ষণশীলতা মাথা চাঁড়া দিয়ে ওঠে। সংস্কারগুলির মধ্য দিয়ে অতি অল্প সময়ের মধ্যে অনেক কিছু সম্পন্ন করার চেষ্টা হয়েছিল। পরম্পরাগত ক্ষমতার উৎস ধ্বংস হয়েছে, কিন্তু তার জায়গায় কোন কার্যকর বিকল্প গড়ে ওঠে নি। এই পরিস্থিতির প্রতিক্রিয়ারূপে রক্ষণশীলতা প্রশ্রয় পায়।)

ইতিমধ্যে ইন্দোনেশিয়ার নগরে ও গ্রামে একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটেছে। এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল পেশা বা বৃত্তিতে দক্ষ মানুষ, বিদ্যালয়ের শিক্ষক, ব্যক্তিগত বাণিজ্যিক উদ্যোগে ও সরকারী দপ্তরে নিযুক্ত হাজার হাজার করণিক। গ্রামাঞ্চলে এই শ্রেণী ছিল একদিকে অগণিত সাধারণ মানুষ ও অন্য দিকে *Priyayi* শ্রেণীর মধ্যবর্তী স্তরে অবস্থিত।

নগরাঞ্চলে মধ্যবিত্ত শ্রেণী ছিল ইউরোপীয় ও ইউরেশীয় উচ্চবিত্ত সম্ভ্রান্ত আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ। পশ্চিমী শিক্ষার ফলে শাসক ও শাসিতের মধ্যে ব্যবধান এতটুকু কমে নি, বরঞ্চ তা দিনের পর দিন বেড়েই গেছে। নতুন বুদ্ধিজীবী শ্রেণী ছিল পশ্চিমী শিক্ষা, সংস্কৃতি ও প্রভুত্ব বিরোধী ইন্দোনেশীয় জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা।

সামাজিক বন্ধন শিথিল হয়ে পড়েছে, পরম্পরাগত আশ্রয়ভূমি থেকে কৃষককুল বিচ্যুত বা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, এবং পশ্চিমী সভ্যতার অভিঘাতে *Priyayi* মূল্যবোধ একেবারে বিপর্যস্ত, এই অবস্থায় উলেমারা ছিলেন জাতীয় প্রতিরোধ ও প্রতিবাদের মুখ্য কেন্দ্র বিন্দু। সভাসমিতি ভিত্তিক রাজনৈতিক আন্দোলনের পুরোভাগে এসেছে ইউরোপীয় ও পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ইন্দোনেশীয় নেতৃবৃন্দ। বিভিন্ন গোষ্ঠির নেতারা (তাদের মধ্যে পশ্চিমী শিক্ষায় শিক্ষিত নেতৃবৃন্দও ছিলেন) যৌথ ভাবে ইন্দোনেশিয়ায় রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করেন। এই রাজনৈতিক দলে ইসলাম ধর্মের ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নগর কেন্দ্রিত নেতৃত্বের অধীনে গ্রামীণ অসন্তোষকে ব্যাপক গণ আন্দোলনে রূপান্তরিত করা সম্ভব হয়েছিল রাজনৈতিক সংগঠনের মাধ্যমেই। ইন্দোনেশীয় ইসলামের ইতিহাসে এ ধরণের ঘটনা ছিল অভিনব

ও অভূতপূর্ব। এ সব রাজনৈতিক রূপান্তরের পাশাপাশি সমান্তরাল ভাবে আবার কখনও বা তাকে অতিক্রম করে শহরে নগরে ইসলাম ধর্মের মধ্যে নব জাগরণ দেখা দিয়েছিল। ইন্দোনেশিয়ায় ডচ ঔপনিবেশিক শাসন পর্বে, রাজনৈতিক ঝড়ঝঞ্ঝার চেয়ে ঐশ্লামিক নব জাগরণের প্রভাব ছিল অনেক বেশী দীর্ঘস্থায়ী।

Budi Utomo দলটি ছিল সভাসমিতিমুখী ইন্দোনেশীয় সংস্কারকদের আশা আকাংক্ষার দ্যোতক। পশ্চিমী ও যবদ্বীপীয় মূল্যবোধের সংমিশ্রণে সৃষ্ট সংঘ-রাজনীতির একটি দৃষ্টান্ত হল এই দল। Indische Partyও তৈরি হয়েছিল সংঘ-রাজনীতির আদর্শে।

Sarekat Islam (SI) দলের আবেদন ছিল ব্যাপক এবং সমাজের সবস্তরে প্রসারিত। এই দলের দুই নেতা—Hadji Omar Sayyid Tjokroaminoto এবং Hadji Agus Salim ইন্দোনেশিয়ার পরম্পরাগত উচ্চবর্গ সমাজের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তাছাড়া তাঁরা ছিলেন পশ্চিমী শিক্ষায় শিক্ষিত। Salim ছিলেন ইসলামের সংস্কার আন্দোলনের প্রাণধারায় প্রভাবিত এবং শহরের মধ্যবিত্ত ও বৃত্তিভোগী শ্রেণীর সমর্থনপুষ্ট। গ্রামাঞ্চলে এই দল মূলত কৃষী ও উলেমাদের পরম্পরাগত নেতৃত্বের উপর নির্ভরশীল ছিল। Tjokroaminoto-র ব্যক্তিত্বের আকর্ষণেও গ্রামের মানুষ অনুপ্রাণিত হয়েছিল।

ইন্দোনেশীয় জাতীয়তাবাদ এবং ইন্দোনেশীয় ইসলামের ইতিহাসে SI এর ভূমিকা ছিল জটিল ও বিশেষ অর্থবহ। আদর্শের বিচারে: স্বাধীন রাষ্ট্রের কল্পনা যে জাতীয়তাবাদের মূল সূত্র, তার পূর্বসূরী হিসাবে কাজ করেছে SI এর আন্দোলন। ধর্মীয় বিচারে, ইসলাম ধর্মীয় সামাজিক ও রাজনৈতিক মূল্যবোধ, যে সংস্কার আন্দোলনের কার্যসূচীতে প্রকট, সেই সংস্কার আন্দোলনের প্রাথমিক স্তর হচ্ছে SI দল। সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কারের দাবি জানিয়েছে SI, শুধুমাত্র এই কারণে গ্রামের মানুষ তার পতাকাতলে ভীড় করেছে—একথা ভাবলে ভুল করা হবে। আসলে পরিবর্তিত পরিস্থিতির বিরুদ্ধে কৃষক সমাজের পুঞ্জীভূত বিক্ষোভ ও বিদ্রোহ রূপ পেয়েছে এই আন্দোলনে এবং তা রূপ পেয়েছে ইসলাম ধর্মের কাঠামোর মধ্য দিয়ে। ঠিক একারণেই অগণিত গ্রামীণ মানুষের কাছে SI আন্দোলন ছিল এত প্রিয়। প্রথম কয়েক বছর ধরে SI মুসলমান সমাজের আঞ্চলিক অসন্তোষকে শহর কেন্দ্রিক নেতৃত্বের পরিচালনায় ব্যাপক গণ আন্দোলনে পরিণত করতে পেরেছিল। 1920র দশকের প্রথম দিকে কিছুটা অন্তর্দ্বন্দ্বের

ফলে এবং কিছুটা ডচ সরকারের দৃঢ়তার জন্য SI দলের ভূমিকা ক্রমেই নিস্তেজ ও নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে। 1924 সালে কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের সঙ্গে SI এর নেতৃবৃন্দের সম্পর্ক ছিন্ন হয়। 1926 সালে পশ্চিম জাভা ও পশ্চিম সুমাত্রায় গ্রামীণ অসন্তোষ কম্যুনিষ্ট আন্দোলন রূপে বিদ্রোহের রূপ নেয়। বিদ্রোহ নির্মম ভাবে দমন করা হয়। এই ভাবে ইন্দোনেশিয়ার ইতিহাসে ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে গণ-আন্দোলনের প্রথম পর্বের পরিসমাপ্তি ঘটে।

ইন্দোনেশিয়ায় একদিকে আধুনিক ইসলামী সভ্যতা বিকাশের অনুকূল উপকরণ উদ্ভুত হয়েছে। আবার অপর দিকে নগর-কেন্দ্রিক পশ্চিমী ধাঁচে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটেছে। এই জাতীয়তাবাদের শিল্ড অংশত *Priyayi* পটভূমিতে প্রোথিত। আবার *Priyayi* পটভূমিকে জাতীয়তাবোধ যুগপৎ বর্জন করেছে এবং অতিক্রমও করেছে। ইন্দোনেশিয়ায় ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ, উভয় শক্তিই ছিল ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে মুক্তকণ্ঠ। উভয় শক্তিই বিদেশের মুসলিম জাগরণ থেকে অমেয় প্রেরণা লাভ করেছে।

তুরস্ক, মধ্যপ্রাচ্য ও ভারতবর্ষের মুসলমান পাশ্চাত্য সভ্যতার বিরুদ্ধে অল্প বিস্তর সোচ্চার ছিল। তাদের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় উদ্দীপনা মুসলিম জগতের অন্যত্র সঞ্চারিত হয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্কের পরাজয় ঘটলে মিশর, প্যালেস্টাইন, সিরিয়া ও লেবাননে ব্রিটিশ ও ফরাসী আধিপত্য ছড়িয়ে পড়ে। যুগপৎ মধ্যপ্রাচ্য ও ভারতবর্ষে শুরু হয় সংস্কার আন্দোলন এবং আরবে রক্ষণশীল Wahhabi আন্দোলন। কিছুটা মক্কা, কিছুটা মিশরের al-Azhar বিশ্ববিদ্যালয় এবং কিছুটা ভারতের লাহোর, এবং আলিগড় থেকে ইন্দোনেশিয়ার মুসলমানরা প্রেরণা পেয়েছিল। সংস্কার-বাদ (Reformism) এবং Wahhabi আন্দোলন ছিল বিশ্বব্যাপী ইসলামী জাগরণের দুটি স্পষ্ট স্বতন্ত্র অঙ্গ। এই দুটি আন্দোলনই উলেমা প্রভাবিত ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ ছিল। কিন্তু ধর্মীয় জাড্যের বিরুদ্ধে রক্ষণশীলদের চেয়ে সংস্কারপন্থীদের আক্রমণ ছিল অনেক বেশী তীক্ষ্ণ। Jamalal-Dan al-Abgani এবং Muhammad Abduh এর মত মিশরের ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ এবং Sayyid Ahmad Khan, Sayyid Amir Ali এবং Muhammad Iqbal প্রমুখ ভারতীয় নেতারা একদিকে মুসলমানদের মধ্যে পশ্চিমী প্রভাব সম্পর্কে উৎকণ্ঠিত ছিলেন, ঠিক তেমনি অপর দিকে আধুনিক পাশ্চাত্য চিন্তাধারার আলোকে ইসলাম ধর্মের রীতিনীতি তাঁরা পুনর্নির্ধারণ করতে চেয়েছিলেন।

তাঁদের বক্তব্য ছিল যে হজরত মহম্মদ প্রবর্তিত খাঁটি ইস্লাম ধর্ম অনুশীলন করতে হবে, মধ্যযুগীয় গোঁড়ামি, অন্ধত্ব ও কুসংস্কারের হাত থেকে ইসলাম ধর্মকে মুক্ত করতে হবে, ধর্মশাস্ত্রের নিষ্প্রাণ যান্ত্রিক পুনরাবৃত্তি বর্জন করে যুক্তি ও বুদ্ধি-নির্ভর অনুশীলন শুরু করতে হবে এবং শিক্ষা-ক্ষেত্রে যুগোপযোগী ধ্যানধারণা গ্রহণ করতে হবে। অন্য জগত-মুখী (other worldly) এবং বর্তমান জগত-বিমুখ দৃষ্টিকোনের জন্যই ইসলাম ধর্ম সমাজ রূপান্তরের বাহন হতে পারে নি। এই দৃষ্টিভঙ্গীর অন্ধ কারাগার থেকে আশু মুক্তি ঘটলেই ইসলাম প্রাণবন্ত সজীব ধর্ম হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হবে। তখনই খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারক ও পশ্চিমী জড়বাদের বিরুদ্ধে ইসলাম ধর্ম প্রাণপ্রদ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারবে।

SI দলের আবির্ভাব ঘটেছিল নাটকীয় পরিস্থিতির মধ্যে। তুলনামূলক বিচারে সংস্কারপন্থী আন্দোলনের জন্মের মধ্যে নাটকীয়তা ছিল না, চমক ছিল না। এর কারণ হল সংস্কার আন্দোলনের আদি পর্বের নেতৃবৃন্দ রাজনীতির সঙ্গে সম্পার্কশূন্য ছিলেন এবং দেশের বাইরে থেকে তাঁরা প্রেরণা লাভ করেছেন। তবে, কালক্রমে এই আন্দোলনের মধ্যে রাজনীতি এসে পড়েছে। শুধুমাত্র পরম্পরাগত স্থবিরতার বিরুদ্ধে নয়, হীনমন্যতার বিরুদ্ধেও তাঁদের সংগ্রাম করতে হয়েছে। তাই ধর্মীয় সংস্কারের সঙ্গে রাজনৈতিক কার্যসূচী তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন।

সংস্কারবাদী আন্দোলনের প্রধান সংগঠন ছিল মহম্মদীয়া দল। এই দলের জন্ম হয় 1912 সালে। একই বছরে SI দলেরও জন্ম হয়েছিল। উভয় দলের আবির্ভাবক্ষেত্র ছিল মধ্য জাভা অঞ্চল। মধ্য জাভা অঞ্চল ছিল এক দিকে মতরাম সাম্রাজ্যের *Priyayi* সভ্যতার লীলাভূমি এবং অপর দিকে সমৃদ্ধ মুসলমান বণিক সমাজের বাণিজ্য কেন্দ্র। সপ্তদশ শতকের পর এই প্রথম জাভার নগর-কেন্দ্রিক ইসলাম দেশের বাইরে থেকে বেগবান সভ্যতার প্রেরণা পেয়েছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে ইন্দোনেশিয়ার মুসলমান সম্প্রদায় ছিল বাণিজ্য ব্যাপারে চীনা বণিকের প্রতিযোগিতার এবং ধর্ম ব্যাপারে খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারকদের দাপটে ম্রিয়মাণ। এ কারণে মহম্মদীয়া দলকে সাদরে তারা গ্রহণ করেছিল। গ্রামীণ *Santri* সভ্যতা ছিল বিচ্ছিন্নতার কোটরে আত্ম-নিমগ্ন এবং অন্য-জগত-মুখী। কিন্তু সংস্কার আন্দোলনের ফলে একটি গতিশীল, যুক্তিবাদী, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী এবং ইহলোকমুখী জীবনযাত্রা সৃষ্টি হয়েছিল। আবালবৃদ্ধবণিতার জন্য মহম্মদীয়া দল একটি আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিল। পাঠ্যসূচীতে পশ্চিমী ধরণের বিষয়বস্তু

স্থান পেয়েছিল, কিন্তু ধর্মশিক্ষার জ্ঞেয় বিষয় ইসলামী ধর্মগ্রন্থ ও আরবি সাহিত্য থেকে সংগৃহীত হয়েছে। শুক্রবারের প্রার্থনা সভায় বক্তব্য পরিবেশিত হয়েছে মাতৃভাষায় এবং সেই বক্তব্যে স্থান পেয়েছে যুগোপযোগী সমস্যার আলোচনা। সুসংগঠিত ধর্ম প্রচারকদের মাধ্যমে এ সব আলোচনা দূরে গ্রাম গ্রামান্তরে পৌঁছে গেছে। যুবসংগঠন, নারী সংঘ, দাতব্য চিকিৎসালয় এবং বিদ্যালয় স্থাপন—এ সব কিছুতেই পশ্চিমী পদ্ধতির ছাপ এবং বিশেষ করে ইন্দোনেশিয়ার খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারকদের প্রভাব ছিল স্পষ্ট। সংস্কার আন্দোলনের ফলে ইন্দোনেশীয় ইসলামের মধ্যে গুণগত পরিবর্তন ঘটেছিল। উনিশ শতকে আমরা দেখি গ্রামীণ *Santri* সমাজের গোঁড়ামির প্রতাপ এবং বিশ শতকে দেখতে পাই নগর-কেন্দ্রিক, সংস্কারবাদী চলন ধর্মী ইসলামী সভ্যতার অভ্যুদয়।

অন্যান্য পরাধীন মুসলমান দেশগুলির মত ইন্দোনেশিয়াতেও সংস্কার আন্দোলন যুগপৎ চতুর্মুখী সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিল।

প্রথমত, গ্রামীণ *Santri* সভ্যতার শাস্ত্রীয় অন্ধ গোঁড়ামির বিরুদ্ধে এবং গ্রামীণ ইসলাম ধর্মের আচার আচরণে অনুপ্রবিষ্ট হিন্দু-বৌদ্ধ কুসংস্কার সমষ্টি এবং সর্বপ্রাণবাদী জড়োপাসনার (animism) বিরুদ্ধে সংস্কার আন্দোলন ছিল সমালোচনা মুখর।

দ্বিতীয়ত, প্রাক্-ইসলাম পর্বে সেখানে যে সব প্রতিষ্ঠান-অনুষ্ঠান ছিল, সেগুলি *Adat* রীতিনীতি ও *Priyayi* সভ্যতার অঙ্গীভূত ছিল। প্রকৃত ইসলামী জীবনাচরণ প্রসারের পক্ষে এ সব অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান রীতি নীতি ছিল বাধাস্বরূপ। এসবের বিরুদ্ধে সংস্কার আন্দোলন আক্রমণ চালিয়েছে।

এই দুই ধরণের আক্রমণের মূল উদ্দেশ্য ছিল ইন্দোনেশিয়ায় কোরান-অনুমোদিত (কিন্তু আঞ্চলিক *Adat* রীতি নীতি অনুশাসিত নয়) ধর্মনিষ্ঠ, ঐক্যবদ্ধ প্রকৃত ইসলামী সম্প্রদায় গঠন করা। ফলে ইসলাম ধর্ম ও *Adat* আইনের মধ্যে কয়েকশত বছর ধরে যে বিরোধ ছিল, তা এখন আরও তীব্র আকারে প্রকাশ পেল। *Adat* আইনের সম্পত্তির যৌথ মালিকানার পরিবর্তে সংস্কার আন্দোলন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তি মালিকানার নীতি গ্রহণ করেছিল। সদ্যসৃষ্ট সামাজিক শ্রেণীর ব্যক্তি মালিকানা নীতিতে কায়েমী স্বার্থ ছিল। তাই এই শ্রেণী ছিল সংস্কার আন্দোলনের প্রধান সমর্থক।

তৃতীয়ত, ইসলাম ধর্ম ও ইন্দোনেশীয়ত্ব যে সমার্থক একথা প্রচার করে সংস্কারপন্থীরা পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার গতিরোধ করতে চেয়েছিল। রাজনৈতিক দলমত-

নির্বিশেষে পশ্চিমী শিক্ষায় শিক্ষিত ইন্দোনেশীয় বুদ্ধিজীবীকে সংস্কারপন্থীরা ইসলাম ধর্মের শত্রু বলেই ভাবত। পাশ্চাত্য ভাবধারার অগ্রগতি তারা পশ্চিমী ধাঁচের সংগঠন গড়ে রোধ করতে চেয়েছিল। এই উদ্দেশ্য নিয়ে 1925 সালে বাটাভিয়াতে Hadji Agus Salim একটি দল তৈরি করেন। এই দলের নাম ছিল Jong Islamieten Bond বা Young Muslim League. ইসলামধর্মী তরুণ নেতৃত্ব সৃষ্টি করতে এই দলের ভূমিকা ছিল অনন্য।

চতুর্থত, ঔপনিবেশিক স্থিতাবস্থার বিরুদ্ধেও সংস্কারপন্থীরা আক্রমণ চালিয়েছে। এর কারণ শুধুমাত্র এই নয় যে গ্রামের বিত্তশালী লোকের এবং অগণিত শহরবাসীর মধ্যে ইসলাম ধর্ম দৃঢ় মূল হয়েছে। 1920 এর দশকে ডচ ঔপনিবেশিক নীতি *Adat* রীতি নীতি কে সমর্থন করছিল, একারণেও সংস্কারপন্থীরা ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে রুষ্ট হয়েছিল।

একথা সত্য যে সংস্কার আন্দোলন যুগপৎ ইসলাম ধর্মের গোঁড়ামি, *Adat* এর রীতি নীতি এবং পশ্চিমী ভাবধারার বিরুদ্ধে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয়েছিল বলে ইন্দোনেশীয় ইসলাম এবং ইন্দোনেশীয় সমাজের মধ্যে নানা ধরণের বিরোধ ও টানাপোড়েন সৃষ্টি হয়েছিল। সংস্কারপন্থীদের বিরুদ্ধে গোঁড়া মুসলমান, *Adat* প্রধান, *Priyayi* উচ্চবর্গ শ্রেণী এবং ডচ সরকার একজোট হয়েছিল। পশ্চিমী শিক্ষায় শিক্ষিত ইন্দোনেশীয়দের বিরুদ্ধেও সংস্কার-পন্থীদের সংগ্রাম ছিল অনিবার্য। এই অন্তর্বিরোধের পুরোপুরি সুযোগ নিয়েছিল ডচ সরকার। এ সব বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও সংস্কার আন্দোলন একটি মজবুত সংগঠনের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে।

1920এর দশকের প্রথম দিকে ইন্দোনেশিয়ায় সংস্কার আন্দোলনের ফলে গোঁড়া মুসলমানরা আতঙ্ক বোধ করছিল। মিশরের সংস্কারবাদ Wahhabi আন্দোলন এবং ইন্দোনেশিয়ায় Ahmadiyah দলের ব্যাপক প্রচার কার্যের জন্য গ্রামাঞ্চলে *Santri* ও *Abangan* শ্রেণীর প্রভাব প্রতিপত্তি স্তিমিত হয়ে পড়েছিল। এ কারণে 1926 সালে পূর্ব জাভার উলেমারা 'বিধর্মী'দের হাত থেকে ইসলাম ধর্মকে বাঁচাবার জন্য একটি রক্ষণশীল মুসলমান সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। এই সংগঠন হল Nahdatul Ulema (NU)। মহম্মদীয়া দলের মত এই সংগঠনের জাঁকজমক ছিল না। কিন্তু খুব অল্প দিনের মধ্যেই এই দলের শাখা জাভা ও বাইরের দ্বীপপুঞ্জে ছড়িয়ে পড়ে।

বেশ কিছুদিনের জন্য ইন্দোনেশিয়ায় ইসলাম ধর্ম দুটি ভাগে বিভক্ত ছিল। একদিকে ছিল শহর কেন্দ্রিক সংস্কার আন্দোলন, আর এক দিকে ছিল গ্রাম-কেন্দ্রিক রক্ষণশীল আন্দোলন। এই বিভাজনের মধ্যে কিন্তু সামাজিক শ্রেণী

বিভাগ প্রতিফলিত হয় নি। উভয় আন্দোলনই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। গ্রামের বিত্তবান হাজীরা ছিলেন রক্ষণশীল। নগরের ধনাঢ্য বণিক ও সরকারী চাকুরীজীবীরা ছিলেন সংস্কারপন্থী। সমাজ শ্রেণী বিন্যাসে সচলতার (mobility) জন্য গ্রাম ও শহরের ব্যবধান ক্রমেই হ্রাস পেয়েছে। গোঁড়া ইসলাম ধর্ম এবং সংস্কার আন্দোলনের মধ্যে ব্যবধান ডচ শাসনের শেষ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে এই ব্যবধান ধ্বংসাত্মক না হয়ে প্রতিযোগিতামূলক হয়ে দাঁড়িয়েছে। আবার এও দেখা গেছে যে দল গঠনে ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে NU মহম্মদীয়া দল অনুসৃত পদ্ধতি গ্রহণ করেছে।

উভয় দল অ-ইসলামী প্রবণতার বিরোধী ছিল। উভয় দল ডচ ঔপনিবেশিক শাসনের সমালোচনায় মুখর ছিল। 1924 সালের পর থেকে এই দুই দল SI এর প্রভাব প্রতিপত্তি ক্ষুন্ন করতে তৎপর হয়েছে। পশ্চিমী শিক্ষায় শিক্ষিত অ-ধর্মীয় রাজনৈতিক উচ্চবর্গ শ্রেণী শক্তিশালী হয়ে উঠলে এই দুই দলই ইসলাম ধর্মের স্বার্থে এবং আত্মরক্ষার তাগিদে কাছাকাছি হয়েছে। এ সব কারণে ধর্মীয় গোঁড়ামি ও সংস্কার আন্দোলনের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়ার পথ প্রশস্ত হয়েছে।

সব চেয়ে বড় কথা ধর্মীয় গোঁড়ামি ও সংস্কার আন্দোলনের মধ্যে নিছক ধর্মসংক্রান্ত কারণে যে বিরোধ ছিল, তা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে নি। এর অন্যতম প্রধান কারণ হল Wahhabi আন্দোলনের বিশ্বব্যাপী আবেদন ইতিমধ্যে স্তিমিত হয়ে পড়েছে। ইসলামী দেশগুলির ঐক্যগ্রন্থি শিথিল হয়েছে। স্বাধীন সার্বভৌম মুসলিম দেশগুলির মধ্যে অনৈক্য স্পষ্ট রূপ নিয়েছে। দেশের বাইরে থেকে ইন্দোনেশীয় সংস্কার আন্দোলন প্রাণশক্তি আহরণ করেছে, প্রাণশক্তির সেই উৎস এখন শুষ্কপ্রায়।

Wahhabi আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় মহম্মদীয়া ও আহমদীয়া দলের মধ্যে বিরোধ। SI দলের কোন কোন নেতা ছিলেন আহমদীয়া দলের সমর্থক। এর পর থেকে ইন্দোনেশিয়ায় জাপানী শাসনের পর্ব পর্যন্ত ইসলামের ইতিহাস হচ্ছে SI এর সঙ্গে মহম্মদীয়া ও NU দলের প্রভুত্বের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা। SI ছিল রাজনীতি সচেতন দল এবং মহম্মদীয়া ও NU ছিল রাজনীতি বিমুখ ধর্মীয় দল।

শুরুতে SI দলের আবেদন ছিল ধর্মীয়। কিছুদিন পর চরমপন্থী রাজনীতির দিকে এই দল ঝুঁকে পড়ে। 1920-র দশকের প্রথম দিকে কম্যুনিস্টরা SIকে কাজে লাগায় এবং পরে এই দলের বিরোধিতা করে। গণ

সমর্থন পুনরুদ্ধারের প্রত্যাশায় Tjokroaminota এবং Salim এর মত নেতারা পুনরায় SI দলকে ইসলাম ধর্মাশ্রয়ী করে গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। 1922 সাল থেকে 1932 সালের মধ্যে পশ্চিম জাভায় দশটি ইসলাম ধর্ম সংক্রান্ত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। SI ও মহম্মদীয়া দল যৌথভাবে সম্মেলন-গুলির আয়োজন করে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল গোঁড়া মুসলমান ও সংস্কার-পন্থীদের জন্য একটি মিলনকেন্দ্র গড়ে তোলা এবং ধর্ম-নিরপেক্ষ জাতীয়তা-বাদের বিরুদ্ধে শক্তি সঞ্চয় করা। এই সমস্ত সম্মেলনের মধ্য দিয়ে সমাজের নিম্নবর্গের মানুষের মধ্যে অভূতপূর্ব জাগরণ সৃষ্টি হয়েছিল, কিন্তু SI তার হৃত গৌরব ফিরে পায় নি। পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারল না, তাই এই দলের দ্রুত অবলুপ্তি ঘটে।

1927 সালের পর থেকে ইন্দোনেশিয়াতে নতুন প্রজন্মের নেতৃত্ব ও দলগোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটেছিল। সরকারী ইসলাম (Official Islam) বা সরকারী সাম্যবাদ (Official Communism) ধরণের আন্দোলনের সঙ্গে নতুন প্রজন্মের নেতৃত্বের কোন সম্পর্ক ছিল না। তাঁরা ছিলেন বিশুদ্ধ জাতীয়তা-বাদী। তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী। বুদ্ধি-জীবী শ্রেণীর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসাবে সমাজে তাঁরা ছিলেন বিশেষ বরণীয়। অর্থনৈতিক বিচার বিশ্লেষণে মার্কসবাদ তাঁদের প্রভাবিত করেছিল। কিন্তু রাজনৈতিক বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তাঁরা মার্কসবাদী ছিলেন না। কমিনটার্ণের নির্দেশের চাইতে জাতীয়তাবাদের প্রেরণাকেই তাঁরা অগ্রগণ্য ভেবেছেন। ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে তাঁরা সহিষ্ণু ছিলেন। তাঁদের সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারায় ইউরোপের বিভিন্ন ধরণের সমাজতান্ত্রিক মতবাদের সংমিশ্রণ ঘটেছিল। 1927 সালে প্রতিষ্ঠিত হয় Partai Nasional Indonesia (PNI) এবং 1931 সালে Partai Indonesia (PI) দল। এই দুটি দল ছিল নতুন প্রজন্মের নেতৃত্বের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

1929 সালের পর থেকে SI এর নেতৃবৃন্দ ইসলাম ধর্মকেন্দ্রিক আন্দোলনের ব্যর্থতায় হতাশ হয়ে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের দিকে আকৃষ্ট হন। তাই দ'লর নাম পাল্টিয়ে তাঁরা Partai Sarekat Islam Indonesia. নতুন নামকরণ করেন। এ সত্ত্বেও PNI এর বিপুল জনপ্রিয়তার কাছে SI এর অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা প্রায় অসম্ভব ছিল। শুধু SI কেন, সমগ্র ইসলামী আন্দোলনও ক্ষীয়মাণ হয়ে পড়ে।

1932 সালের পর থেকে ইন্দোনেশিয়ায় ইসলামী আন্দোলনের নেতৃত্ব আসে মহম্মদীয়া ও NU দলের হাতে। এই দুটি দলও রাজনীতি বর্জন

করে। ফলে ইসলামী আন্দোলন ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান সৃষ্টি হয়।

যদিও ইসলামী আন্দোলন রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল, এই আন্দোলনের রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া ছিল সুদূর প্রসারী। জাভায় আত্ম-সচেতন *Santri* সভ্যতার পুনর্জাগরণ ঘটেছিল। ডচ ঔপনিবেশিক শাসন সম্পর্কে মানুষের মোহভঙ্গ হয়েছিল। ঔপনিবেশিক কাঠামোর মধ্যে ইসলামের অগ্রগতি সম্ভব নয়, তা তারা অনুভব করতে পেরেছিল। অগণিত মুসলমান ইসলামী শিক্ষাধারায় শিক্ষিত হয়েছিল। পশ্চিমী ধাঁচে শিক্ষিত মুসলমানদের চেয়ে সংখ্যায় তাঁরা ছিলেন অনেক বেশী। ইসলামী শিক্ষা-ব্যবস্থার এক ধরণের আধা রাজনৈতিক (Quasi-political) ভূমিকা ছিল। দলগত পরিচয়ে নয়, ব্যক্তিগত ভাবে বহু মুসলমান নেতৃবৃন্দ (বিশেষ করে সংস্কার আন্দোলনের সঙ্গে যারা যুক্ত ছিলেন) সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করেছেন। Jong Islamieten Bond নামক সংগঠনের সঙ্গে যে সব তরুণ মুসলমানের যোগাযোগ ছিল, পরবর্তীকালে ইসলামী রাজনৈতিক সংগঠনগুলিতে তারাই নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

সুমাত্রায় প্রথম থেকেই ইসলামের সংস্কার আন্দোলন চরমপন্থী রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। রবার চাষ ও রবার রপ্তানিকে কেন্দ্র করে সেখানে এক নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্ম হয়েছিল। জাভায় মধ্যবিত্ত শ্রেণী ছিল মূলত সামাজিক শ্রেণী, কিন্তু সুমাত্রায় তা ছিল প্রধানত অর্থনৈতিক শ্রেণী। জাভায় ইসলাম ধর্মাশ্রয়ী বণিক শ্রেণীর চেয়ে পশ্চিমী শিক্ষায় শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর আধিপত্য ছিল বেশী। পশ্চিমী শিক্ষায় শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী শ্রেণী সুমাত্রায় ছিল না বললেই চলে। উচ্চ শিক্ষা ও সরকারী চাকুরীর সুযোগ শুধুমাত্র জাভাতেই পাওয়া যেত। তাই পশ্চিমী শিক্ষায় শিক্ষিত সুমাত্রার বুদ্ধিজীবীরা জাভাতেই বসবাস করতেন। জাভা-কেন্দ্রিক ধর্ম-নিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনেও তারা অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

ইন্দোনেশিয়ায় ইসলামের ভূমিকা প্রসঙ্গে Benda একটি বিচিত্র ধরণের সমস্যার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। ইসলাম ধর্মে বিশ্বজনীন জীবন দর্শন স্থান পেয়েছে। এই ধর্মে অন্যান্য প্রসঙ্গের সঙ্গে রাজনীতির কথাও আছে। ইউরোপে মধ্য যুগের অবসানে পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের বিলয় ঘটলে, সুসংহত স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের চর্চা শুরু হয়েছে। অনুরূপ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অনুশীলন ইসলামী সভ্যতায় পাওয়া যায় না। *Santri* সভ্যতায় নির্দিষ্ট রাষ্ট্রিক আদর্শ নেই, যেটুকু পাওয়া যায় তার মূল কথা হল

যে রাষ্ট্রের কার্যাবলী ইসলামী নীতি শাস্ত্রের অনুশাসনে সম্পন্ন হওয়া উচিত। *Dar'ul Islam* এর রাষ্ট্র কল্পনাতেও ইসলামী আইন এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রভুত্ব অত্যাবশ্যকরূপে স্বীকৃত হয়েছে। পশ্চিমী মানদণ্ডের বিচারে অন্যান্য দেশের মুসলমানদের মত, ইন্দোনেশিয়ার মুসলমানরাও ইসলামী আন্দোলনের সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক লক্ষ্য নির্ণয় করতে পারে নি।

তুলনামূলক বিচারে ইন্দোনেশিয়ার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের রাজনৈতিক লক্ষ্য ছিল স্পষ্ট। জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্র, প্রতিনিধিমূলক শাসনব্যবস্থা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিকল্পনা জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রকল্পনায় স্বচ্ছ রূপরেখায় অঙ্কিত হয়েছিল।

রাজনীতি সচেতন জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দের অধিকাংশই ইসলামী আন্দোলনকে অবজ্ঞা করেছে। ইসলামী আন্দোলনের প্রবক্তাগন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মধ্যে নিরীশ্বরবাদী ও জড়বাদী পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার প্রতিবিম্ব দেখেছেন। গোঁড়া মুসলমানদের দৃষ্টিতে সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদের চেয়ে ইসলামের বিশ্বজনীনতা ছিল হিতকর। সংস্কারপন্থী মুসলমানদের দৃষ্টিতে স্বাধীন সার্বভৌম ইন্দোনেশিয়ার ধর্ম-নিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রদর্শ হল 'বিধর্মী' ঔপনিবেশিক শাসনের মতই ইসলাম ধর্মের অনিষ্টকর প্রতিপক্ষ। যতদিন ইসলাম ধর্ম ও জাতীয়তাবাদের শত্রু হিসাবে ডচ শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল, ততদিন এই সব মতপার্থক্য চাপা ছিল। ডচ শাসনের অবসান হলে পরবর্তীকালে ইসলাম ধর্ম ও জাতীয়তাবাদের মধ্যে আদর্শগত মতবিরোধ ইন্দোনেশীয় ইতিহাসের ধারাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে।

অ-রাজনৈতিক ইসলামী আন্দোলন

অরাজনৈতিক ইসলামী আন্দোলনের পুরোধা ছিল মহম্মদীয়া দল। মিশরের আধুনিক সংস্কার আন্দোলনের প্রেরণায় এই দল ধর্মীয় ও শিক্ষামূলক কাজে আত্মনিয়োগ করে। বর্তমান শতকের প্রথম দশকে মিশরের Muhammed Abduh প্রচারিত আদর্শ জাভায় ছড়িয়ে পড়ে। 1908 সালে আধুনিক ভাবধারায় গঠিত প্রথম সংগঠন Sumatra-Batavia Alcheira স্থাপিত হয়। 1912 সালের নভেম্বর মাসে ইন্দোনেশিয়ার Ahmad Dahlan মহম্মদীয়া দলটি প্রতিষ্ঠা করেন। ইসলাম ধর্মের মর্মবাণী প্রচার, ধর্মীয় জীবন যাপনে উৎসাহ দান, ধর্মপ্রচার উদ্দেশ্যে সভাসমিতির আয়োজন, উপাসনাগৃহ নির্মাণ, ইসলাম অনুমোদিত শিক্ষাদানের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন,

এবং ধর্মপ্রচারের জন্য গ্রন্থ, পুস্তিকা, ইস্তাহার প্রকাশ—এ সব ছিল মহম্মদীয়া দলের বিঘোষিত লক্ষ্য। লক্ষ্যে পৌছাবার জন্য মহম্মদীয়া দল বিদ্যালয় স্থাপন, শিক্ষক শিক্ষণ, গ্রন্থ প্রকাশ, অনাথ ও অন্ধের জন্য গৃহ নির্মাণ, হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা এবং ইন্দোনেশীয় ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশ ইত্যাদি নানা ধরণের কাজে ব্রতী হয়। Dahlan এর পর H. Ibrahim এবং H Fakhruddin এর নেতৃত্বে মহম্মদীয়া দলের অভাবনীয় প্রসার ঘটে। 1924 সালে এই দলে ছিল 29 ডিভিশনে 4,000 সদস্য, 119 শিক্ষক, 4,000 ছাত্র, 69 ধর্মীয় শিক্ষার বিদ্যায়তন, জোগজাকার্তা এবং সুরবায়াতে 2টি দাতব্য চিকিৎসালয় এবং 12,000 রোগী। 1927 সালে এই দলে ছিল 49 ডিভিশনে বিভক্ত 10,308 সদস্য। 1928 সালে ছিল 63 ডিভিশনে বিভক্ত 17,556 সদস্য, 205 বিদ্যালয়, 16,000 ছাত্র এবং 1935 সালে 710 ডিভিশনে বিভক্ত আনুমানিক 43,000 সদস্য। 1930 এর দশকে অন্যান্য যে কোন জাতীয়তাবাদী দলের তুলনায় সভাসমিতিতে মহম্মদীয়া দল বিপুল জন সমাবেশ আকর্ষণ করেছে।

মহম্মদীয়া দলের শিক্ষামূলক ও জনহিতকর কাজের সঙ্গে রাজনীতির কোন সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু দলীয় আদর্শের অভিব্যক্তি দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে নিঃসন্দেহে প্রভাবিত করেছে। আদর্শের অভিব্যক্তিকে নিম্নে বর্ণিত ভাগে উল্লেখ করা যায়।

(1) মহম্মদীয়া দল যুক্তিবাদকে গুরুত্ব দিয়েছে এবং কুসংস্কারের বিরোধিতা করেছে।

(2) এই দল বিশ্বাস করেছে যে শিক্ষিত জনগণের উপর রাজনৈতিক অগ্রগতি নির্ভর করে।

(3) এই আন্দোলনে *Santri* সমাজের বিপুল সংখ্যক মানুষ যোগ দিয়েছিল। তাদের মাধ্যমে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রভাব এই আন্দোলনকে পুষ্ট করেছে।

(4) জাভা সংস্কৃতির বিকাশে এই দলের অসীম আগ্রহ ও উৎসাহ ছিল।

(5) কম্যুনিস্ট মতবাদ ও খ্রীষ্টধর্মের বিরুদ্ধে এই দলের বিরূপতা ও বিরোধিতা ছিল স্পষ্ট ও দ্বিধাহীন।

রাজনৈতিক অর্থে জাতীয় চেতনা সৃষ্টি ও পরিপুষ্টির কাজে মহম্মদীয়া আদর্শের যথেষ্ট অবদান ছিল।

প্রথমত, দলের নেতৃবৃন্দ জোর দিয়ে বলেছেন যে উপযুক্ত শিক্ষাগত পরিবেশ গড়ে না উঠলে, ইন্দোনেশিয়াবাসী রাজনীতিতে সৃজনশীল ভূমিকা গ্রহণ করতে পারবে না। তারা চেয়েছিলেন পশ্চিমী জ্ঞান বিজ্ঞান ও আধুনিক ইসলামের মধ্যে সমন্বয়। তাদের উদ্যোগেই দূর গ্রামাঞ্চলে শিক্ষা প্রসারিত হয়েছিল। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ শিক্ষা বিস্তারে উদাসীন থেকেছে বলে, মহম্মদীয়া দল তাদের সমালোচনা করেছে এবং দেশবাসীকে তাদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেছে।

দ্বিতীয়ত, বিদেশে না গিয়ে দেশের বহু যুবক মহম্মদীয়া প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করেছে। দেশবাসীর সঙ্গে তাদের আত্মীয়তা বন্ধন ছিল অটুট। দেশবাসীর স্বার্থ রক্ষায় তারা ছিল সদা উন্মুখ। *Priyayi* শ্রেণীর বাইরে থেকে যে সব আঞ্চলিক নেতৃত্ব গড়ে উঠেছে, তাদের অধিকাংশই হল মহম্মদীয়া শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবক। রাজনীতিতে অংশ নেবে না বলে এই দল প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছে। SI এর সঙ্গে রাজনৈতিক প্রশ্নে নিজেকে যুক্ত করতে এই দল অস্বীকার করেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও Pan-Islam ও খিলাফৎ আন্দোলনের প্রশ্নে মহম্মদীয়া দল SI এর সঙ্গে সাজুয্য বোধ করেছে। এই ভাবেই এই দল রাজনীতির নিষিদ্ধ এলাকায় পদার্পন করেছে।

তৃতীয়ত, মহম্মদীয়া দলের বহু সদস্য জাতীয় আন্দোলন সম্পর্কে সহানুভূতি সম্পন্ন ছিলেন এবং অনেকেই ছিলেন আঞ্চলিক সরকারের কর্মচারী। এই দলের সঙ্গে মধ্যবিত্ত *Santri* সমাজের ঘনিষ্ঠতা সুবিদিত। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অনেকেই ছিলেন শিল্পপতি ও বণিক। তারা ছিলেন পৌরশাসনের কেন্দ্র বিন্দু।

চতুর্থত জাভার ভাষা ও সংস্কৃতি সংরক্ষণে মহম্মদীয়া দলের অদম্য উৎসাহ ছিল। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ শিল্প সম্ভার সুরক্ষার জন্য তারা সচেষ্ট হয়েছিল। জাভার কৃষকরা যবদ্বীপীয় ভাষায় কথা বলত। এই ভাষার উন্নতি বিধানে তারা তৎপর হয়েছিল। তাদের এই সব চেষ্টা নিঃসন্দেহে ছিল জাতীয়তাবাদের পরিপূরক।

পঞ্চমত, খ্রীষ্টান ও কম্যুনিস্ট বিরোধী মনোভাবের জন্যও মহম্মদীয়া দল জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে শরিক হয়েছে। খ্রীষ্টধর্ম ও মিশনারীদের বিরুদ্ধে তারা নিরন্তর আক্রমণ চালিয়েছে। ফলে বিধর্মী শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে তাদের আক্রমণ ডচ বিরোধী আন্দোলনে ইন্ধন জুগিয়েছে। 1926

সালের কম্যুনিস্ট আন্দোলন ব্যর্থ হলে তারা মার্কসবাদের বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। ইসলামের সঙ্গে ধর্ম-নিরপেক্ষ নীতির সনাতন বিরোধ এবং মহম্মদীয়া ধনিক শ্রেণীর সঙ্গে কম্যুনিস্ট প্রোলেতারিয়েতের দ্বন্দ্ব মহম্মদীয়া দলের কম্যুনিস্ট-বিরোধী সংগ্রামে প্রতিফলিত হয়েছিল। এ সংগ্রাম ছিল মূলত রাজনৈতিক। এ সব কারণে মহম্মদীয়া দল তার ঘোষিত অ-রাজনৈতিক ভূমিকা অক্ষুন্ন রাখতে পারে নি। ক্রমে ক্রমে এই দল রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদী দলগুলির দোসর হয়েছে।

জাভার বাইরে অন্যত্র মহম্মদীয়া দল প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির সংগে জড়িয়ে পড়েছে। সুমাত্রায় মহম্মদীয়া ছিল প্রকাশ্যেই রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদী দল। আচেতে 1939 পর্যন্ত একমাত্র রাজনৈতিক দল হিসাবে মহম্মদীয়া কাজ করেছে। *Adat*, গোঁড়া মুসলমান (*Kaum Kuno*) এবং আধুনিকতাপন্থী (*Kaum muda*)—এই ত্রিশক্তির দ্বন্দ্বে মিনাংকাবোতে মহম্মদীয়াও জড়িয়ে পড়েছিল। ফলে ঐ অঞ্চলে এই দলের সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। আঞ্চলিকতার আকর্ষণ হ্রাস পায়। জাতীয়তাবাদই হল তরুণ সম্প্রদায়ের পূজার একমাত্র বেদি।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই সারেকাৎ ইসলাম ও মহম্মদীয়া দলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দানা বেঁধে উঠেছিল। 1918 সালে রক্ষণশীল উলেমা সম্প্রদায় Tasjwirul-Afkar নামে একটি সংগঠন সুরবায়াতে গড়ে তুলেছিলেন। পরবর্তীকালে Ibn Saud এর উত্থান হলে এবং SI ও মহম্মদীয়ার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা গড়ে উঠলে, পূর্ব জাভার গোঁড়া মুসলমান সম্প্রদায় আপন শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার জন্য সচেষ্ট হয়। 1926 সালের 31 জানুয়ারি সুরবায়াতে Nahdatul Ulema (NU) দলটি প্রতিষ্ঠিত হয়। সুরবায়া, কেদিরির কোন কোন অংশ এবং পেমবাঙে (Pembang) এই দলের বিরাট প্রভাব ছিল। 1935 সাল নাগাদ এই দলের 68 ডিভিশন এবং 67,000 সদস্য ছিল। প্রত্যেক ব্যক্তি আপন আপন জ্ঞান বিদ্যা যুক্তি মত পবিত্র কোরআন ব্যাখ্যা করবে, আধুনিকপন্থীদের এই চিন্তাধারার NU তীব্র বিরোধিতা করেছে। এই দলের নিয়মাবলীতে ঘোষণা করা হয় যে Imam Muhammad bin Idris Asj-shafii, Iman Malik bin Anas, Iman Abduhanifah An Numan এবং Iman bin Hambal এই চারজনের যে কোন একজনের Madzhabs মত ইসলাম ধর্মের অনুশীলন প্রচার করাই হচ্ছে এই দলের নীতি। NU যে সব পথ নির্দেশ করে, তার মধ্যে প্রধান যেগুলি, তা নিচে উল্লেখ করা হল ঃ

1. উপরে নির্দেশিত Madzhabs গুলি যে সব উলেমা বিশ্বাস করেন, তাদের মধ্যে দৃঢ় বন্ধন গড়ে তোলা,

2. ধর্মগ্রন্থ মেনে চলা,

3. উপরে নির্দেশিত Madzhabs গুলির ভিত্তিতে আইনানুগ পথে ইসলামেব প্রচার,

4. ইসলাম ধর্মীয় বিদ্যালয়গুলির প্রসার,

5. মসজিদ নির্মান ও পরিচালনা, ধর্মীয় শিক্ষার বিধিপ্রণয়ন, এবং দরিদ্র ও দুর্বল শ্রেণীর জন্য সাহায্য দান—এ সব বিষয়ে মানুষের মনে আগ্রহ গড়ে তোলা,

6. ইসলাম ধর্মের নীতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্প বিকাশের জন্য উপযুক্ত সংস্থা গঠন।

NU রাজনীতি বর্জন করেছে এবং সচেতনভাবে রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনায় অংশ নেয় নি। ইসলামী বিবাহ ও উত্তরাধিকার আইন, শুক্রবারের নমাজ, রক্ষিতা পোষণ, কোরআন অসম্মান করলে তার জন্য শাস্তিবিধান এবং শিক্ষা ও অর্থনীতি বিষয়ক কিছু কিছু প্রশ্ন ছিল NU এর বার্ষিক অধিবেশনের আলোচনার বিষয়। এ সব প্রশ্নে NU এর সিদ্ধান্তে অনেক ক্ষেত্রে শাসকগোষ্ঠী অসন্তুষ্ট হয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও অন্যান্য আন্দোলনের তুলনায় NU ছিল অপেক্ষাকৃত কম সরকার-বিরোধী। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে NU আধুনিকপন্থী এবং Ibn Saud এর সঙ্গে সংযুক্ত আন্দোলনের বিরোধিতা করেছে। জাতীয় স্তরে, এই দল SI এবং মহম্মদীয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। আঞ্চলিক স্তরে NU এর আধুনিকপন্থীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এক একটা গ্রামের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছে এবং গ্রামে গ্রামে দ্বন্দ্ব জাগিয়ে রেখেছে। ফলে অবস্থার এত অবনতি হয় যে গোঁড়া ইসলামপন্থী গ্রামের মানুষেব সঙ্গে আধুনিকপন্থী গ্রামের অধিবাসীর বিবাহ সম্পর্ক পর্যন্ত প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। জাতীয় আন্দোলনের উপর NUর প্রভাব ছিল নেতিবাচক। ঐক্যবদ্ধ ইসলাম-ধর্মীয় আন্দোলন গড়ে তোলার পথে এই দল বিচ্ছিন্নতাকামী শক্তি হিসাবে কাজ করেছে।

উনিশ শতকে ভারতবর্ষে Ahmadiyah দলের উদ্ভব ঘটেছিল। ইন্দোনেশিয়াতেও এই দল প্রভাব বিস্তার করেছিল। Ahmadiyah দলের দুটি শাখা ছিল, একটি Qadian নামে পরিচিত, অপরটি লাহোর শাখা রূপে চিহ্নিত।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর যে সব ইন্দোনেশীয় ছাত্র ভারতবর্ষে Ahmadiyah স্কুলে পড়তে আসে, তারা Perkumpulan Ahmadi Indonesia/Indonesian Ahmadi Association নামে সংগঠন গড়ে তোলে। 1925 সালে সুমাত্রায় Rahmat Aliর নেতৃত্বে Qadian শাখা ধর্মপ্রচার শুরু করে। এক বছর পর জাভাতে Mirza Wali Ahmad Baig এবং Maulana Ahmad এর নেতৃত্বে লাহোর শাখা একটি কার্যসূচী গ্রহণ করে। মহম্মদীয়া ও NU দলের মত Ahmadiyah দলও জাতীয় আন্দোলনের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। বিশেষ করে তাদের খ্রীষ্টানবিরোধী বক্তব্য মুসলমান সম্প্রদায়কে ডচদের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত করে তুলেছে। তাদের বিপুল ধর্ম প্রচার অভিযানও জাতীয়তাবাদকে উদ্দীপ্ত করেছে।

বিভিন্ন অঞ্চলে তরুণদের নিজস্ব যুব সংগঠন ছিল, যথা Young Java Union, Young Ambon Union, Young Sumatra Union, Young Minahassa Union, Young Batak Union ইত্যাদি। এ সব সংগঠন আঞ্চলিক সংস্কৃতির বিকাশ ও পুষ্টির জন্য কাজ করত। 1926 সালে তৈরি হয় Young Moslem Union|J.I.B. দল। ইসলাম-ভিত্তিক জাতীয়তাবাদ ছিল এই সংগঠনের মূল মন্ত্র। তা ছাড়া, সান ইয়াৎ-সেন ও ম্যাৎসিনী প্রমুখ জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দের আদর্শ তাদের প্রেরণা জুগিয়েছিল। J. I. B.র Salim প্রমুখ নেতারা ইসলামধর্ম ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে সাধর্ম্য খুঁজে পেয়েছিলেন। খ্রীস্টধর্মের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়ে এবং জাতীয় ভাষা ও জাতীয় ইতিহাসের উপর গুরুত্ব দিয়ে এই দল জাতীয় গৌরববোধ দীপ্যমান রেখেছে এবং জাতীয়তাবোধ সঞ্জীবিত করেছে।

ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ

নানা কারণের সমাবেশে এশিয়ায় উনিশ শতকের শেষে ও বিশ শতকে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটেছিল। এগুলির মধ্যে বিদেশী রাজনৈতিক প্রভুত্ব, অর্থনৈতিক শোষণ, সামাজিক বিপর্যয়, বর্ণবৈষম্য, পশ্চিমী শিক্ষার প্রসার, ধর্মীয় প্রেরণা, আধুনিক জাপানের দুর্বার অগ্রগতি ও তার সার্বিক প্রভাব ইত্যাদি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এ সব কারণগুলির মধ্যে ধর্মীয় প্রেরণার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল, সন্দেহ নেই। কিন্তু গুরুত্ব নির্ণয়ের সঠিক মাপকাঠি সমাজবিজ্ঞানীদের অজানা। প্রশ্ন ওঠে, অন্যান্য প্রভাব থেকে ধর্মীয় প্রভাবকে কি ভাবে তফাৎ করে দেখা সম্ভব। একটি কৃষি-ভিত্তিক সমাজে, যেখানে মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ ঘটেছে, রাজনৈতিক

চেতনা স্পষ্ট রূপ নিয়েছে, নানা ধরণের ভাবনা চিন্তা ধ্যান ধারণা মানুষের মনকে আলোড়িত করেছে, সেখানে শুধুমাত্র ধর্মীয় প্রভাব মূল্যায়ন করার সঠিক মানদন্ড আছে কি ? তাছাড়া, অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে গভীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অসন্তোষ ধর্মীয় আবরণে প্রকাশিত হয়েছে। যেমন বর্মার 1931 সালের সায়া সান বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহে পরম্পরাগত ধর্মীয় সংস্কারের প্রকাশ দেখে বিদেশী ঐতিহাসিকরা একে ধর্মীয় বিদ্রোহ মনে করেছেন। এই বিশ্লেষণ এক্ষেত্রে সংগত নয়। একটি বিশেষ ঘটনার উদ্ভব কতটা ধর্মীয় কারণে এবং কতটা ধর্ম-নিরপেক্ষ (secular) কারণে, তা নির্ধারণ করা একান্তই দুঃসাধ্য।

ইন্দোনেশিয়ায় জনসংখ্যার শতকরা 90 ভাগ হল মুসলমান। বর্তমান শতকের প্রথম দিকে সেখানে ইসলামের পুনর্জাগরণ শুরু হয়। শিক্ষা-ব্যবস্থারও পুনর্বিন্যাস ও রাজনৈতিক নীতি নির্দেশের জন্য মুসলমানরা সাগ্রহে ইসলামের শরণাপন্ন হয়েছে। তারা সবাই ইসলামের শরণাপন্ন হয়েছে প্রগাঢ় ভক্তির আকর্ষণে, একথা মনে করার কোন কারণ নেই। বিশিষ্ট রাজনৈতিক পরিচয় কামনা তাদের ধর্মীয় আনুগত্য পুষ্ট করেছে। Fred R. Von DER Mehden এর মতে, 'It is sufficient to state at present that the identification with the majority religion was the important political fact to be weighed and not the sophistication of the faith of the adherent."1

আলোচ্য কালপর্বে পুরাতন দেশীয় শাসক গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণ শিথিল হয়েছে। পশ্চিমী ধাঁচে যে শাসন কাঠামো গড়ে উঠেছে, তা অপরিচিত ও সে কারণে ভীতিপ্রদ মনে হয়েছে। নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় গ্রামীণ জীবন ভেঙ্গে পড়েছে। স্পষ্ট পরিচিত অতীত এবং অস্পষ্ট অপরিচিত বর্তমানের মধ্যে সাধারণ মানুষ নিরাপত্তা ও সংহতির সন্ধানে দোদুল্যচিত্ত হয়েছে। ইসলাম ধর্ম ছিল পরিচিত অতীত ও অপরিচিত বর্তমানের মধ্যে সুপরিচিত সেতু। ইসলাম ধর্মের পক্ষপুটে ইন্দোনেশিয়ার সাধারণ মানুষ তাই আশ্রয় খুঁজেছে। ইন্দোনেশিয়ায় ইসলামী বিদ্যায়তনের এবং মক্কাগামী হজযাত্রীর বিপুল সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটেছে।2 1914 সালে *Java Bode* সংবাদ পত্রে প্রকাশিত তথ্য থেকে জানা গেছে যে ঐ বছরে 15 হাজার হজযাত্রী ইন্দোনেশিয়া থেকে মক্কা গেছেন। তাছাড়া অনেক তরুণ ছাত্র আরব ও তুরস্কে পড়াশুনা করতে গেছে। *Nieuwe Rotterdamsche Courant*, *Java Courant* এবং *Locomotief* প্রভৃতি সংবাদপত্র থেকে জানা গেছে যে সোলো, বাটাভিয়া, বানদুং ও জোগজার্কাতা

অঞ্চলে অসংখ্য ঐশ্লামিক বিদ্যাপীঠ স্থাপন করা হয়েছে। শাসক শ্রেণী খ্রীষ্টান এবং শাসিত শ্রেণী মুসলমান। ইসলাম ধর্ম বিজিত বা শাসিত শ্রেণীর মধ্যে ঐক্য বন্ধন সৃষ্টি করেছে, জাতীয়তাবাদের সহায়ক ভাবাবেগ সঞ্চার করেছে এবং উচ্চাভিলাষী রাজনীতিবিদদের হাতে যন্ত্র রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে তাদের সুদৃঢ় প্রত্যয় এবং বিধর্মীর (কাফের) শাসনের প্রতি অনাস্থা বা আনুগত্য প্রদর্শনে অনিচ্ছা তাদের জাতীয় চেতনাকে পুষ্ট করেছে।

ইন্দোনেশিয়াতে ইসলাম ধর্মকে আধুনিক যুগোপযোগী করে গড়ে তোলার জন্য সংস্কার আন্দোলন শুরু হয়। সংস্কার আন্দোলনের মূল সূত্র ছিল তিনটি ঃ 1. যুক্তিবাদ (rationalism), 2. ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সব মানুষ সমান, 3. পরম্পরাগত কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ। যুক্তিবাদ প্রচার ও প্রসারের ফলে ধর্মীয় অতীন্দ্রিয়বাদ (mysticism), জাদুবিদ্যা এবং কাজীর প্রভুত্বের বিরুদ্ধে মানুষের মনে সংশয় ও অবিশ্বাস দেখা দিয়েছিল। ধর্ম-শাস্ত্রীয় বিদ্যানুশীলনের মর্যাদা ক্ষুন্ন হল এবং পশ্চিমী জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার পথ সুগম হল। বিদ্যোৎসাহী মুসলমানদের মধ্যে মার্কসবাদ বিষয়ে আগ্রহ দেখা দিল। কিন্তু তাঁদের বক্তব্য ছিল যে মার্কসবাদের মূল বক্তব্য হজরত মহম্মদের জীবনী ও বাণীর মধ্যে নিহিত আছে এবং পবিত্র কোরআনে তা লিপিবদ্ধ হয়েছে। সংস্কার আন্দোলনের ফলে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য নীতিও মর্যাদা পেয়েছে।

ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ প্রচার ও প্রসারের ফলে সাধারণ শিক্ষিত মানুষের মনে এই ধারণা জন্মেছিল যে কোরআন ও হাদিসের বিচার বিশ্লেষণ শুধুমাত্র উলেমা ও মৌলভীদের একচেটিয়া অধিকার নয়, সাধারণ মানুষও আপন আপন নিজের বুদ্ধি মত কোরআন ও হাদিসের বিচার বিশ্লেষণ করে ধর্মানুশীলনে সক্ষম। পশ্চিমী জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চা এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের প্রচার ও প্রসারের ফলে জাতীয়তাবোধ সুদৃঢ় হয়েছে। ইসলামের আধুনিকীকরণের ফলে বেশ কয়েকটি ইসলামী সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শহরে ও গ্রামে এই সব সংগঠনের সভাসমিতিতে একই মঞ্চ থেকে ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সাধারণ মানুষ ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যাবলী নিয়ে আলাপ আলোচনা তর্কবিতর্ক করেছে। এর ফলে জাতীয়তাবাদের ভিত্তি প্রসারিত হয়েছে।

বর্তমান শতকের প্রথম দশকে কয়েকটি ইসলামী সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এগুলির মধ্যে জাম ইয়াৎ খায়েন (Jam Yat Khain), সুমাত্রা-বাটাভিয়া আলচিরা (Sumatra-Batavia Alcheira) এবং সারেকাৎ ডগাং

ইসলামিয়া (Sarekt Dagang Islamiyah) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সব সংগঠন মূলত ছিল ধর্মীয়, অর্থনৈতিক ও শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান এবং রাজনৈতিক অর্থে সারেকাৎ ইসলামের (Sarekat Islam) পূর্বসূরী। এই সময় ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের কথা সর্বপ্রথম স্মরণ করিয়ে দেন রদেন অজেঙ কর্তিনী (Raden Adjeng Kartini)। তিনি ছিলেন জাভার একজন Regent এর কন্যা। কর্তিনী ইন্দোনেশিয়ায় নারী আন্দোলনেরও সূত্রপাত করেন। তিনি অবশ্য ইসলাম-কেন্দ্রিক জাতীযতা-বাদী মহল কর্তৃক প্রভাবিত হন নি।

বুদি উতোমো (Budi Utomo) ছিল জাভার একটি জাতীয়তাবাদী প্রতিষ্ঠান।

শিক্ষা, সংস্কৃতি ও অর্থনীতি বিষয়ে ইন্দোনেশীয় জনগণের মান-উন্নয়ন ছিল এই প্রতিষ্ঠানের মূল প্রয়াস। প্রথম দিকে কোন রাজনৈতিক প্রেরণা ছিল না বললেই চলে। কিন্তু ধর্ম বিষয়ে এই দলের নীতি ছিল দ্বিধাগ্রস্ত। 1917 সালের বার্ষিক সম্মেলনে এক নীতি ঘোষণায় ইসলামের পক্ষে ওকালতি করা হয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখার কথা বলা হয়। (.'maintaining the Islamic religion without infringing upon freedom of religion') 3 Dr Radjiman এর প্রস্তাব মত নীতি ঘোষণায় এই অংশটি সংশোধন করে নিরপেক্ষ নীতি গ্রহণের কথা বলা হয়। (The Declaration of Principles as amended then read, 'Budi Utomo maintains a neutral stand point in the area of religion.') 4 এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে Radjiman ছিলেন গণ সমিতি Volksraad এর প্রাক্তন চেয়ারম্যান ও তৎকালীন সভ্য। Radjiman প্রমুখ অনেকেই ধর্ম বিষয়ে নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে পারেন নি। তারা স্পষ্টত ছিলেন ইসলাম-বিরোধী। এটা এখন স্বীকৃত যে Budi Utomoর আদর্শ ও ধ্যান ধারণায় ইসলামের প্রভাব ছিল নগণ্য।

জাতীয় আন্দোলনের পরবর্তী পদক্ষেপ হল Nationale Indische Party. ইউরেশীয় ও ইন্দোনেশীয় সদস্যদের নিয়ে এই দল ছিল গঠিত। তাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কার্যসূচী ছিল অল্পবিস্তর চরমপন্থী। তাদের নেতা Dekker কারারুদ্ধ হলে দলটি ভেঙ্গে যায়। তখন ইউরেশীয়-গন Insulinde নামে একটি নতুন দল গঠন করে। এই দল ধর্মীয় আদর্শ হিসাবে ইসলামকে অগ্রাহ্য করেছে, কিন্তু রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে সাদরে বরণ করেছে। Sarekat Islam (SI) এর সঙ্গে রাজনীতি ও অর্থনীতি

বিষয়ে Insulinde দলের মতৈক্য ছিল। অছাড়া বৃহৎ মুসলিম সংগঠন হিসাবে Sarekat Islam এর প্রতিপত্তি ছিল সুবিদিত। একারণে একটি বৃহৎ মুসলিম সংগঠন হিসাবে SI এর সঙ্গে Insulinde সহযোগিতা করেছে। ধর্মকে Insulinde একটা বড় সমস্যা হিসাবে গণ্য করে নি। নাগরিক অধিকার, কৃষি, স্বায়ত্তশাসন এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি বিষয়ে তারা বেশী করে মনোযোগ দিয়েছে। SI এর সঙ্গে সহযোগিতা করলেও রাজনৈতিক অস্ত্র রূপে ইসলামকে ব্যবহার করার ব্যাপারে তারা উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। এটা তারা জানত যে ইসলামকে রাজনীতিতে প্রাধান্য দিলে অন্যান্য ধর্ম-নিরপেক্ষ দলের পশ্চিমী শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষরা জাতীয় আন্দোলনের প্রাঙ্গন থেকে দূরে সরে দাঁড়াবে।

Sarekat Dagang Islam (SDI) সুরকার্তায় একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানরূপে সৃষ্টি হয়। মধ্য জাভায় বাটিক শিল্পে চীনা প্রাধান্য ক্ষুন্ন করাই এই দলটির মূল উদ্দেশ্য ছিল। এই দলের অধিকাংশ সদস্য ছিলেন মুসলমান হাজী। মুসলমান হাজী এবং বিধর্মী চীনাদের মধ্যে অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় কারণে সদ্ভাব ছিল না। Samanhudir নেতৃত্বে এবং স্থানীয় হাজীদের আর্থিক সাহায্য পুষ্ট হয়ে SDI পূর্ব জাভায় প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু নেতৃবর্গের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও কলহের জন্য এই দলটি গণ আন্দোলনে প্রসারিত হতে পারে নি। তাদের চীনা-বিরোধী ক্রিয়াকলাপের কেন্দ্র ছিল সুরকার্তা। 1912 সালে এই দলের প্রায় 9 হাজার অনুগামী সদস্য চীনাদের বিরুদ্ধে আক্রোশে দাঙ্গা হাঙ্গামা ও লুঠতরাজে মেতে ওঠে। ফলে সুরকার্তার ডচ শাসক SDI এর কার্যকলাপ খর্ব করতে বাধ্য হন।

Sarekat Islam (SI) ছিল Sarekat Dagang Islam (SDI) এর উত্তরসূরী। SI এর নেতা H. O. S. Tjokroaminoto আমলাতন্ত্র ও শাসন বিভাগের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তিনি ছিলেন নির্ভীক ও সুবক্তা। 1912 সালের 10 সেপ্টেম্বর SI দলটি প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতীয় আন্দোলনের পুরোধারূপে এই দল অতি দ্রুত বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং এর সদস্য সংখ্যা 1 মিলিয়ন ছাড়িয়ে যায়। প্রশ্ন হল, এই বিপুল জনপ্রিয়তার কারণ কী ?

ডচ ঐতিহাসিক J. Petrus Blumberger ডচ পত্রিকা *Koloniaal Tijdschrift* VIII. No. I (1919) এ প্রকাশিত এক প্রবন্ধে মন্তব্য করেছেন যে SI এর আশাতীত জনপ্রিয়তা এই দলের প্রতিষ্ঠাতাদের কাছে রহস্যজনক ও বিস্ময়কর মনে হয়েছে। চীনা অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা ছিল

জনপ্রিয়তার একটি স্পষ্ট প্রতীয়মান কারণ। কিন্তু অন্য কারণও ছিল। যথা, ইন্দোনেশিয়ার অর্থনৈতিক সংকট, জাতি বিরোধ (racial antagonism), জাগ্রত জাতীয়তাবাদ, ধর্মীয় সংঘর্ষ, অবমাননাকর অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য অস্থিরতা এবং আরও নানা ধরণের ছোট ছোট অভিযোগ। নির্ভর-যোগ্য পরিসংখ্যান ও বৈজ্ঞানিক মানদণ্ডের অভাবে, এ সব কারণের তুলনা-মূলক প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়।

SI এর সাফল্যের জন্য অর্থনৈতিক কারণকে সাধারণভাবে খুব বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে। এ বিষয়ে দলের নেতৃবৃন্দের ভাষণ থেকে স্পষ্ট চিত্র মেলেনা। 1913 সালের 26 ফেব্রুয়ারি সুরবায়াতে Tjokroaminoto বলেছিলেন যে SI একটি রাজনৈতিক দল নয়। ইন্দোনেশীয়গণের মধ্যে বাণিজ্যিক স্পৃহা জাগান এবং চীনাদের বিরুদ্ধে সমবায় সংস্থা গড়ে তোলা ছিল এই দলের মূল লক্ষ্য। 1914 সালে সেমরাঙ অঞ্চলে একটি বক্তৃতায় Dr. Radjiman বলেছিলেন যে বাণিজ্যিক কারণে নয়, সরকারী ধর্মীয় দলগুলির বিরুদ্ধে বিরূপ মনোভাবের জন্যই SI জনপ্রিয় হয়েছিল। মনে রাখা দরকার SI এর শাখা প্রশাখা কোথাও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ধর্মীয় কারণে, কোথাও অর্থনৈতিক কারণে, কোথাও উভয় কারণে। একই কারণে SI এর শাখা সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বা একই কারণে এই দল সর্বত্র জনপ্রিয় হয়েছিল, এ কথা মনে করার কোন কারণ নেই। নানা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নানা কারণে এই দলে যোগ দিয়েছিল, তাই এই দলের গণ ভিত্তি ও গণ আবেদন ছিল অনস্বীকার্য।

ডচেরা জাভায় পৌঁছিয়েই ইন্দোনেশিয়ার অর্থনীতিতে চীনের প্রভাব প্রতিপত্তি দেখতে পায়। অহিফেন বাণিজ্য ও মহাজনী কারবারে চীনা মূল-ধনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। বর্তমান শতকের শুরুতে জাভায় সিগারেট ও বাটিক শিল্পে চীনারা প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল। এ সব শিল্পে ইন্দো-নেশীয়রা ছিল নামে মাত্র মালিক। ডচ গভর্ণর-জেনারেলগন চীনাদের বিরুদ্ধে নিরন্তর কটূক্তি প্রয়োগ করেছেন। *Oetoesan Melajoe* সংবাদপত্র চীনাদের রক্তশোষক বিশেষণে অভিহিত করেছে। SI এর মুখপত্র *Oetoesan Hindia* বিজাতি, বিধর্মী এবং প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে চীনাদের বিরুদ্ধে অবিরাম আক্রমণ চালি-য়েছে। এ সব কারণে ডচ ঐতিহাসিক এবং শাসকগণ জাভাবাসীর চীনা-বিরোধিতা-কে নিছক অর্থনৈতিক বাণিজ্যিক দ্বন্দ্বরূপে দেখেছেন। এটা ভুলে গেলে চলবে না যে এই সময় জাতি (race) হিসাবে একটি বিশিষ্ট 'যবদ্বীপীয়' মনোভাব গড়ে ওঠেছে, এবং জাভার ইতিহাস ও ঐতিহ্য নিয়ে আত্মম্ভরিতা সৃষ্টি হয়েছে। SI এর নেতৃবর্গ এই যবদ্বীপীয় চেতনাকে প্রচার মাধ্যম রূপে কাজে

লাগিয়েছেন। কেন্দ্রীয় গণপরিষদের (Volksraad) এক সভায় Tjokroaminoto নিজেই স্বীকার করেছেন যে SI এর জনপ্রিয়তার জন্য যবদ্বীপীয় চেতনা নানাভাবে কার্যকরী হয়েছে।

ডচ লেখকদের মতে SI এর অধিকাংশ নেতৃবৃন্দ জীবনাদর্শ রূপে ইসলামকে গ্রহণ করেন নি, কিন্তু রাজনৈতিক অস্ত্ররূপে ব্যবহার করেছেন। এই মতের পক্ষে এবং বিপক্ষে চূড়ান্ত সাক্ষ্য পাওয়া যায় না। এ কথা ঠিক, সুরকার্তায় যখন SI প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন শুরুতে ইসলাম ধর্মের কথা বিশেষ স্থান পায় নি। সুরকার্তায় অবশ্য ইসলাম ধর্মের প্রভাব ছিল না বললেই চলে। সুরকার্তা থেকে যখন এই প্রতিষ্ঠান অন্যত্র শাখা বিস্তার করেছে, তখন থেকেই ঐক্য বন্ধনের আদর্শ হিসাবে ইসলাম ধর্ম গুরুত্ব লাভ করেছে। SI এর নেতৃবৃন্দও জাতীয় ঐক্যের প্রতীক রূপে ইসলামের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। সাধারণ মানুষও রাতু আদিলের (Ratu Adil) আবির্ভাব প্রত্যাশায় Tjokroaminoto এবং SI এর দিকে দৃষ্টিপাত করেছে। SI এর বিপুল সংখ্যক হাজী সদস্যদেব কার্যকলাপের মধ্যে ধর্মীয় আবেদন এবং অর্থনৈতিক স্বার্থের সংমিশ্রন ঘটেছিল। এই সময় খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারকদের বিরুদ্ধে যেমন অসন্তোষ দেখা দিয়েছিল, ঠিক তেমনি ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের আগ্রহ বেড়েছিল। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানরা আন্তরিক-ভাবে বিশ্বাস করত যে ইসলাম ধর্মকে ভিত্তি করেই সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি ঘটা উচিত। তারা আরও বিশ্বাস করত যে পদানত ও আহত মানুষেব অভাব অভিযোগ প্রকাশের উপযুক্ত মাধ্যম হল সারেকাৎ ইসলাম। মুষ্টিমেয় পশ্চিমী শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষ নিজেরা ধর্ম-নিরপেক্ষ জীবনদর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন। এমন কি তাবাও এ ধারণা পোষণ করতেন যে ঐক্যবদ্ধ জাতীয় আন্দোলনে মানুষকে সংগঠিত করতে ইসলাম ধর্ম অপরিহার্য।

এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে জাতীয় জাগরণ ইন্দোনেশিয়ায় অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। ইন্দোনেশিয়ার শিক্ষিত সমাজ বহির্জগতের সংবাদ রাখত না বললেই চলে। কিন্তু দেশে প্রত্যাগত হাজীদের মুখ থেকে মানুষ জানা অজানা দেশ বিদেশের নানা সংবাদ শুনত। মরক্কো এবং লিবিয়াতে মুসলমান সম্প্রদায় ও ইসলাম ধর্মের উপর আক্রমণের কথা শুনে তারা রাগে অপমানে চঞ্চল হয়ে উঠত। বিভিন্ন দেশের মুক্তি-সংগ্রামের কথা শুনে তারা অনুপ্রাণিত বোধ করেছে। বিদেশের এই সব ঘটনার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া পরিমাপ করা সম্ভব নয়। শুধু এটুকু বলা যায় গ্রামাঞ্চলে এ সব সংবাদ পৌছাত না বললেই চলে এবং শহরাঞ্চলে এর প্রচার ও প্রতিক্রিয়া মুষ্টিমেয় শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।

উনিশ শতকের শেষে এবং বিশ শতকের প্রথম দশকে চীনে সংস্কার আন্দোলনের ফলে বহুমুখী পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। 1911 সালের বিপ্লবের ফলে সেখানে রাজতন্ত্রের অবসান হয় এবং প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ইন্দোনেশিয়াতে চীনের এ সব ঘটনার প্রভাব ছিল প্রবল ও গভীর। নতুন চীনা প্রজাতন্ত্রের রণতরী জাভায় এলে সেখানে চীনা অধিবাসীরা তাকে বিপুল অভিনন্দন জানায়। চীনা প্রজাতান্ত্রিক সরকারের চাপে পড়ে ডচ সবকার চীনাদের প্রচুর সুযোগ সুবিধা দেয়। জাভার সুদূর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে চীনারা বাণিজ্য করাব অধিকার পেল। 1908 সালে তারা ডচ চীনা বিদ্যালয় স্থাপনের অধিকাব পেয়েছে। 1910 সালে চীনাদের গতি-বিধির উপব যাবতীয় নিয়ন্ত্রণ দূর করা হয়েছে। 1912 সালে তারা বিচার-সংক্রান্ত কিছু নতুন অধিকাব অর্জন করেছে। প্রজাতান্ত্রিক চীন প্রতিষ্ঠিত হবার ফলে স্থানীয় অধিবাসীর তুলনায় প্রবাসী চীনাদের সম্মান ও মর্যাদা বহুগুণ বেড়েছে। ফলে উভয় সম্প্রদাযের মধ্যে ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক বিরোধ আবও জটিল হয়েছে। প্রবাসী চীনাদের সুযোগ সুবিধা অধিকার লাভে স্থানীয় অধিবাসীরা ছিল ঈর্ষাকাতব। তাই ন্যায্য অধিকার অর্জনেব জন্য তারা আরও তৎপর হয়েছে। ফলে SI এব উপর তাদের নির্ভরশীলতা বেড়েছে।

সুবিচারের প্রত্যাশাতেও মানুষ SI এব শরণাপন্ন হয়েছে। নানাবিধ অন্যায আইন, জাতি বৈষম্য মূলক ব্যবস্থা, সহানুভূতিহীন বিদেশী শাসক ও মমতা-হীন *Priyayi* শ্রেণী সব কিছুর বিরুদ্ধে দেশের লোকের মনে অভিযোগ পুঞ্জীভূত হয়েছিল। তাবা ভেবেছিল যে SI এ যোগদান করলে এ সবের বিরুদ্ধে সুবিচার পাওয়া যাবে। অজন্মা ও দুর্ভিক্ষেব সময় মানুষ মনে করেছে SI এ যোগ দিলে ত্রাণ সামগ্রী মিলবে। পরিবার-প্রধান বা আঞ্চলিক নেতার উপদেশ-নির্দেশেও অনেকে SI এ যোগ দিয়েছে। অনেকে আবাব বিচ্ছিন্নতার গ্রাস থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য SI এব আশ্রয় নিয়েছে। বিভিন্ন ও বিচিত্র কারণে মানুষ SI এর শরণাপন্ন হয়েছে। রাজনৈতিক সংগঠন হিসাবে SI এর জনপ্রিয়তা বিচার করতে হলে, এই অমোঘ সত্য স্মর্তব্য।

ইসলাম ও মার্কসবাদ

1918 থেকে 1922 খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ইসলামের সঙ্গে মার্কসবাদের সম্বন্ধ নিয়ে ইন্দোনেশিয়ায় যে সব আলাপ আলোচনা তর্ক বিতর্ক হয়েছে-সেগুলিকে সাধারণভাবে চার ভাগে ভাগ করা যায়।

1. স্থানীয় হাজী ও বণিকরা বিদেশী ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসাবে জাতীয় সমাজতন্ত্রের আদর্শকে সমর্থন করেছে।

2. SI এর নেতৃবৃন্দ মার্কসবাদের অনেক নীতি গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু আঞ্চলিক পরিস্থিতি অনুযায়ী সমাজতন্ত্রের রূপান্তর প্রয়োজন, এ কথা তাঁদের অনেকেই বিশ্বাস করতেন।

3. ধর্মপ্রাণ কম্যুনিস্টরা মার্কসবাদের সমর্থনে কোরআনের সাক্ষ্য মেনে চলতেন।

4. অনেক কম্যুনিস্ট ছিলেন ইসলাম-বিরোধী বা ধর্ম বিষয়ে নিরপেক্ষ। তারা কিন্তু ইসলাম ধর্মকে বিশেষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় হিসাবে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। দেশীয় বণিক সম্প্রদায় ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের নানা ধরণের কায়েমী স্বার্থ ছিল। একদিকে ডচ উদ্যোক্তা (entrepreneurs) এবং আর এক দিকে চীনা দালালদের চাপে পড়ে তারা দিশাহারা বোধ করছিল। তাই মার্কসবাদী শ্লোগানকে আশ্রয় করে তারা আত্মরক্ষার পথ খুঁজছিল। SI এর দ্বিতীয় জাতীয় কংগ্রেসে Tjokroaminoto বিদেশী ধনতন্ত্রের নিন্দা করেছিলেন। দেশীয় বণিক শ্রেণী এই ভেবে আশ্বস্ত হয়েছিল যে দেশী ধনতন্ত্র ছিল SI এর কাছে গ্রহণযোগ্য। দেশীয় বণিক শ্রেণী ও ধর্মীয় নেতারা মার্কসবাদের শ্রেণী সংগ্রাম তত্ত্বকে মানতে চায় নি। তাদের শঙ্কা দূর করার জন্য Tjokroaminoto তাই বলেছিলেন যে পদানত ইন্দোনেশীয় মুসলিম এবং ইউরোপীয় খ্রীষ্টান শাসকদের মধ্যে যে সংগ্রাম চলছে, তাই হল শ্রেণী সংগ্রাম।

ধর্মপ্রাণ কম্যুনিস্টদের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন সর্বাগ্রে কম্যুনিস্ট এবং তারপর মুসলমান। তারা সংখ্যায় বেশী নন। Hadji Misbach ছিলেন এই গোষ্ঠীর নেতা। তিনি সুরকার্তার Insulinde দলের সঙ্গে এক সময় যুক্ত ছিলেন। কম্যুনিস্ট বিশ্বাসের সমর্থনে তিনিও কোরআনের বাণী ব্যবহার করেছেন। পশ্চিম সুমাত্রায় কম্যুনিস্ট মতবাদের গভীর অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। সেখানে Hadji Datoek Batoeh এবং Natar Zainoeddni এর নেতৃত্বে আধুনিকপন্থীদেব সমাজ কল্যাণ চিন্তার সঙ্গে মার্কসীয় ধ্যান ধারণার সমন্বয় সাধনের চেষ্টা হয়েছিল। Padangpandjang এ Datoek Tawalib বিদ্যালয়ে ইসলামের আবরণে মার্কসীয় দর্শনের শিক্ষা দেওয়া হত। এই ধরণের সংস্কারবাদী বিদ্যালয়ে যে সব তরুণ বিদ্যাভ্যাস করত, তারা ইসলাম ধর্মকে সামাজিক অগ্রগতির বাহনরূপে ভাবতে অভ্যস্ত হয়েছিল। তারাই ধর্মীয় সাম্যবাদের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিল। 1926-27 সালের

কম্যুনিস্ট বিদ্রোহে তাদের অনেকেই অংশ নিয়েছিল। ধর্মীয় কম্যুনিস্টদের দলে রাখার তাগিদেই ইন্দোনেশিয়ার কম্যুনিস্ট পার্টি ইসলাম ধর্মের তীব্র বিরোধিতা করে নি। রাজনৈতিক কৌশল হিসাবে তারা ইসলাম সম্বন্ধে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু মনে প্রাণে তারা বিশ্বাস করতেন যে মার্কসীয় দর্শনে ধর্মবিশ্বাসের কোন স্থান নেই। SI দল গণ আন্দোলন ও ইন্দোনেশীয় রাষ্ট্রের ভিত্তি হিসাবে ইসলাম ধর্মকে প্রাধান্য দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু Semaun এবং Tan Malakar মত কম্যুনিস্ট নেতাদের কাছে SI এর এই মতবাদ গ্রহণযোগ্য ছিল না। Tjokroaminota এবং Salim এর মত SI এর নেতৃবর্গ বিশ্বাস করতেন যে ইসলাম ধর্ম দেশে ঐক্য ও সংহতি সাধনে রজ্জুবন্ধনের কাজ করবে। কিন্তু কম্যুনিস্টরা জানতেন, এই ধারণা সম্পূর্ণরূপে মার্কসীয় শ্রেণী সংগ্রাম তত্ত্ব-বিরোধী। Semaun যুক্তি দেখিয়েছিলেন, 'Religion gives no pure criterion; Christians and Mohammedans live in the same land and have the same interests.'

মূল কথা হল পরিস্থিতির চাপে ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে কম্যুনিস্ট দলের নীতি ছিল দ্বিধা ও সংশয় জড়িত। নীতিগত ভাবে, দলীয় সংগঠন চেয়েছে ধর্ম সম্বন্ধে নিরপেক্ষ নীতি বজায় রাখতে এবং রাষ্ট্রের প্রয়োজনকে ধর্ম বিশ্বাস থেকে পৃথক করে দেখতে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দলীয় সংবাদপত্রে কখনও ইসলামের গুণগান করা হয়েছে, কখনও বা ইসলামের অন্ধ গোঁড়ামির বিরুদ্ধে কশাঘাত করা হয়েছে।

SI এর মধ্যে নানা ধরণের টানা-পোড়েন ছিল। রক্ষণশীল বণিক ও হাজী, মার্কসবাদী কর্মী, ডচ রাজকর্মচারী ইত্যাদি বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের বিচিত্র ধরণের অভাব অভিযোগ ও স্বার্থদ্বন্দ্ব ছিল। দলীয় ঐক্য বজায় রাখার স্বার্থে যাবতীয় অভাব অভিযোগ ও দাবির কথা না ভেবে আক্রমণের জন্য (প্রত্যেক শ্রেণীর গ্রহণ যোগ্য) দুটি শত্রু চিহ্নিত করা হয়েছিল। এ দুটি শত্রু হল ধনতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদ। কিন্তু আক্রমণের অস্ত্র হিসাবে মার্কসীয় যুক্তি বিন্যাস ব্যবহৃত হয় নি। SI এর প্রবক্তাগণ সম্ভবত মার্কসীয় চিন্তাধারার সঙ্গে গভীরভাবে পরিচিত ছিলেন না। 1918 সালের ১ ডিসেম্বর Volksraad এ Tjokroaminoto বলেছিলেন যে তিনি একটি গণ-সংগঠনের নেতৃত্ব দিচ্ছেন বলে একথা মনে করার কোনই কারণ নেই যে তাকে মার্কসবাদী হতেই হবে বা শ্রেণী-সংগ্রাম তত্ত্ব মানতেই হবে। SI এর অনেক নেতাই কোরআনকে মনে করতেন সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার উৎস এবং হজরত মহম্মদকে সমাজতন্ত্রের শিক্ষক ও পথপ্রদর্শক রূপে গণ্য করতেন।

বিপুল অর্থ সঞ্চয়ের নিন্দা, সুদ না নেবার নির্দেশ, দরিদ্রকে সাহায্য দান, লোকহিত ব্রত এবং ভ্রাতৃত্বের বন্ধন, কোরআনের এ সব মহৎ আদর্শের কথা সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার উদাহরণ হিসাবে SI এর নেতারা উল্লেখ করেছেন। এই বিষয়ে J. M. Van der Kroef বলেছেন, 'Left-wingers came to see in the Sarekat Islam their weapon in a class-struggle with non-Islamic colonial capitalist groups, and Marxism and nationalism rather than Islam became for them the chief motive forces. But the Moslem bourgeoisie regarded the Islamic movement primarily as the expression of group solidarity, integrated along the relgious-cultural lines of Modern Islam.'[5] 1918 সালের 29 সেপ্টেম্বর থেকে 6 অক্টোবর পর্যন্ত সুরবায়াতে (Surabaja) SI এর তৃতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই সম্মেলন ছিল একটু বেশী মাত্রায় বাম-ঘেঁষা। স্বাধীনতা, বিপ্লব ও সমাজতন্ত্রের কথা এখানে উচ্চ কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল। কিন্তু 1918 সালের পর থেকেই SI এ পুনরায় ইসলাম ধর্ম প্রাধান্য পায়। অনুমান করা হয়, তিনটি কারণে ইসলাম তার হৃত আসন ফিরে পেয়েছিল।

1. জনগণের কাছে ইসলাম ছিল একটি প্রাণপ্রদ শক্তি, বুদ্ধিজীবী শ্রেণী তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে।

2. তারা আরও বুঝতে পারে যে চরমপন্থী সমাজতন্ত্রীদের বিরুদ্ধে ইসলাম ছিল একটি শক্তিশালী হাতিয়ার।

3. বামপন্থী গোষ্ঠীর দ্বারা মুসলমানরা নিরন্তর আক্রান্ত হচ্ছিল। এ কারণেও ইসলামের শক্তিবৃদ্ধি ঘটেছিল।

চরমপন্থী সমাজতন্ত্রীদের ধর্ম-বিরোধী বস্তুবাদী জীবন দর্শন SI কে পঙ্গু করে ফেলতে পারে, এ কথা ভেবে অনেকেই আতঙ্কিত হয়েছে। SI দল দেশের অভ্যন্তরে ইসলাম ধর্মের গতি প্রকৃতি নিয়ে ব্যস্ত থেকেছে, মধ্য-প্রাচ্যের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সমস্যায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে এবং Pan-Islam আন্দোলনকে সমর্থন করেছে। ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে SI এর এই আত্যন্তিক ভাবাবেগ চরমপন্থী সমাজতন্ত্রীদের মনঃপুত ছিল না। আবার 1920 সাল নাগাদ দেখা গেছে যে চরমপন্থী সমাজতন্ত্রীরা ইন্দোনেশিয়ার কম্যুনিস্ট দলের সঙ্গে মৈত্রী বন্ধন গড়ে তুলেছে। কমিনটার্ন Pan-Islam আন্দোলনের নিন্দায় মুখর হয়েছে। সোভিয়েট রাশিয়ার মুসলমান নাগরিকদের প্রতি কম্যুনিস্ট সরকারের আচরণ ছিল আক্রমণাত্মক। সোভিয়েট সরকার প্রকাশ্যে

ঘোষণা করেছে যে ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদ ইসলাম ধর্মের মধ্যে পরিপূর্ণ রূপ পেয়েছে। তুরস্কের সুলতান ও পারসিক শেখদের হাতে ইসলাম ধর্ম নিপীড়ন যন্ত্রে পরিণত হয়েছে। এ সব কারণে চরমপন্থী সমাজতন্ত্রী ও ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের মধ্যে বিরোধ ও ব্যবধান ক্রমে ক্রমে বেড়ে গেছে। 1922 সালের চতুর্থ কমিনটার্ণ কংগ্রেসে Tan Malaka বলেছিলেন যে দ্বিতীয় কমিনটার্ণ কংগ্রেসের ইসলাম বিরোধী বক্তব্য ইন্দোনেশিয়ায় কম্যুনিস্ট সংগঠনের ক্ষতি-সাধন করেছে।

1921 সালে SI এর পরস্পর বিবদমান এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে আপস-রফার চেষ্টা হয়েছিল। Semaun ও Salim এর উদ্যোগে SI এর বার্ষিক সম্মেলনে গৃহীত এক ঘোষণাপত্রে ডচ ধনতন্ত্রের নিন্দা করা হয়, সমাজতন্ত্রী গণ সংগঠনের প্রয়োজন ব্যাখ্যা করা হয় এবং ইসলাম ধর্মকে ভিত্তি করেই যে আন্দোলন পরিচালিত হবে, ঘোষণাপত্রে তা সুস্পষ্ট ভাষায় উল্লেখিত হয়।

এই ঘোষণাপত্র মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। *Sinar Hindia, Medan Moeslimin* এবং *Islam Bergerak* প্রমুখ কম্যুনিস্ট ভাবাপন্ন সংবাদপত্রগুলি মন্তব্য করে যে SI ইসলামের ধর্মের আঙিনায় কম্যুনিস্ট মতবাদকে সাদরে বরণ করে নিয়েছে। *Sinar Hindia* পত্রিকার আওয়াজ ছিল, SI এবং PKI দীর্ঘজীবী হোক। কিন্তু *Oetoesan Hindia* প্রমুখ সংবাদপত্র প্রত্যুত্তরে বলে যে শুধুমাত্র SI দীর্ঘজীবী হোক। *Oetoesan Hindia, Neratja,* এবং *Doenia-Islam* সংবাদপত্রগুলি ছিল ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের মুখপত্র। *Oetoesan Hindia* অভিযোগ করেছে যে PKI হল বস্তুবাদী সংগঠন, তারা হজরত মহম্মদকে মানেন না, মানেন কার্ল মার্কসকে। *Sinar Hindia* প্রত্যুত্তরে জানিয়েছে যে ইসলাম মানেই সাম্যবাদ এবং সাম্যবাদ মানেই ইসলাম।

SI এর ষষ্ঠ সম্মেলনে জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে ইসলামের ভূমিকা নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়। Semaun ও Tan Malaka প্রমুখ কম্যুনিস্ট নেতারা বলেন যে জাতীয়তাবাদী ও সমাজতন্ত্রী আন্দোলন কখনই ইসলাম ধর্মকে ভিত্তি করে গড়ে উঠতে পারে না। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রকৃত ভিত্তি হল শ্রেণী সংগ্রাম, ধর্ম নয়। Salim প্রমুখ ধর্মপ্রাণ মুসলমান নেতৃবৃন্দ সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনকে ইসলাম ধর্ম ভিত্তিক আন্দোলনরূপে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। Salim বেশ জোর দিয়ে বলেছিলেন যে মার্কসের বহুপূর্বে হজরত মহম্মদের কর্মে এবং কোরআনের বাণীতে সমাজতন্ত্রের বার্তা ঘোষিত হয়েছে।

1921 সালের সুরবায়া সম্মেলনের পর থেকেই SI সংগঠন ছিন্ন ভিন্ন হয়ে পড়ে এবং গণ সংগঠনরূপে এই আন্দোলনের প্রভাব স্তিমিত হয়ে পড়ে। এই সংগঠনের পরবর্তী পর্যায়ে যদিও রাজনীতি থেকে ধর্ম বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব হয় নি, কিন্তু তা সত্ত্বেও বহু ধর্মপ্রাণ মুসলমান এই দল ত্যাগ করে শিক্ষা-মূলক প্রতিষ্ঠান মহম্মদীয়া দলে যোগ দেন। চীনা ও ইউরোপীয় ধন-তান্ত্রিক অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদরূপে মধ্যবিত্ত ইন্দোনেশীয় ও আরব বণিকরা SI এর পতাকাতলে সমবেত হয়েছিলেন। মার্কসীয় শ্রেণী সংগ্রাম তত্ত্বে তাদের বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না। SI এর সমাজতান্ত্রিক প্রবণতায় আরব বণিকরা বিশেষ আতঙ্ক বোধ করেছিল। তারা ক্রমশ এই দলের সঙ্গে সম্বন্ধ ছিন্ন করে। দলের দুর্দিনে আরব বণিকদের অর্থ সাহায্য নানাভাবে দলকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। কিন্তু তাদের সমর্থন ও সাহায্য হারিয়ে দল একেবারে দুর্বল হয়ে পড়ল। ষষ্ঠ ও সপ্তম সম্মেলনের প্রস্তাব অনুযায়ী কম্যুনিস্টদের SI দল থেকে বিতাড়িত করা হয়। বিতাড়িত ও বহিষ্কৃত কম্যুনিস্টরা Sarekat Rajat বা গণ সমিতি গড়ে তোলে। 1923 সালে এই ধরণের প্রায় 16টি সংগঠন সৃষ্টি হয়। এইভাবে SI আন্দোলনের পরি-সমাপ্তি ঘটে।

জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের পটভূমি

(1913 সালের একটি হিসাবে ইন্দোনেশিয়ার বহুমুখী বৈচিত্র্যের স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। তিন হাজার মাইল সমুদ্রের তীরে ব্যাপ্ত প্রায় তিন হাজার বাসযোগ্য দ্বীপপুঞ্জের সমষ্টি আছে ইন্দোনেশিয়ায়।) এখানে 40 মিলিয়ন স্থানীয় অধিবাসী, 9 লক্ষ চীনা আর 1 লক্ষ ইউরোপীয় মানুষের বসবাস। এখানে 80টি জাতিগোষ্ঠীর লোক বাস করে। তারা 20টি ভাষায় এবং 200 ডায়লেক্টে কথা বলে। (ইন্দোনেশিয়ার মোট ভূখণ্ডের মাত্র শতকরা 7 ভাগ হল জাভা।) অথচ এই জাভাতেই মোট জনসংখ্যার 85 শতাংশ বাস করে। (এখানে ভূমি নির্ভর সংগঠিত সামন্ত শ্রেণী নেই, শিক্ষিত সজাগ অধিকার-সচেতন মধ্যবিত্ত শ্রেণী নেই।। (এখানে শিল্পের বিকাশ ঘটেনি। আবার এও চরম সত্য যে এখানে খাদ্য, জল, পোষাক ও মাথা গোঁজার আশ্রয়ের সমস্যাও নেই। শতকরা 95 জন লোক অশিক্ষিত ও দরিদ্র।) (শাসন কাঠামো সুবিন্যস্ত—শীর্ষে ডচ, মধ্যবর্তী স্তরে চীনা এবং সর্বনিম্ন স্তরে ইন্দোনেশীয়। এত বৈচিত্র্য নিঃসন্দেহে জাতীয় সংহতির অন্তরায়।)

এই সব বিচ্ছিন্ন শক্তির মধ্যে ঐক্যের উপাদান জুগিয়েছে মালাই ভাষা,

ইসলাম ধর্ম ও ডচ শাসন। ভাষাগত সংহতি প্রসঙ্গে সুনীতি কুমার লিখেছেন ঃ 'ইংরিজির রেওয়াজ নেই' বললেই হয়। ডচ আছে-কিন্তু মালাই ভাষার চলনই বেশী। তা আবার মালাই দেশের মতন আরবী অক্ষরে লেখা নয়, আমাদের সহজবোধ্য রোমানে; আর এই রোমান মালাই ডচ উচ্চারণ অনুসারী বানানে লেখে, ইংরিজি বানানে নয়। সরকারি ইস্তাহারও বেশীর ভাগ এই রোমান-মালাইয়ে। দ্বীপময় ভারতের রাষ্ট্রীয় ভাষা এই মালাই-ই দাঁড়িয়ে গিয়েছে, আর তা ডচদেরই চেষ্টায়। এই ভাষা সমগ্র ইন্দোনেসিয়ার ভিন্ন ভিন্ন জাতিকে একসূত্রে বেঁধে ফেলেছে, তাদের মধ্যে ঐক্যবোধ এনে দিচ্ছে।"6

মালাই ভাষার মত ইসলাম ধর্মও জাতীয় সংহতি সৃষ্টিতে সাহায্য করেছে। বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ধর্ম হিসাবে ইসলাম ধর্মের মধ্যে সেখানকার মানুষ আত্মপরিচিতি খুঁজে পেয়েছে। আত্মপরিচিতি থেকে জন্ম নিয়েছে গোষ্ঠী চেতনা। হাজী এবং উলেমারা স্বাভাবিক ভাবেই সমাজের নেতৃত্বে আসীন হয়েছে। তারা নিছক ধর্মানুশাসনের নেতা ছিলেন না। সমাজের সর্ববিধ প্রয়োজনে বিপন্ন মানুষ তাদের শরণাগত হয়েছে, তাদের নেতৃত্বকে স্বীকৃতি দিয়েছে। ধর্মপ্রাণ *Santri* সমাজ লক্ষ্মীমন্ত ও প্রতিষ্ঠাশালী। ধর্মাশ্রয়ী রাজনৈতিক সংগঠনগুলিকে আর্থিক সাহায্য দিয়ে বাঁচিয়ে রাখার মত সদিচ্ছা ও সামর্থ্য তাদের ছিল।

ইসলাম সম্পর্কে মানুষের আগ্রহ বেড়েছিল, ঠিক তেমনি ইসলামকে নানা সংস্কারের মধ্য দিয়ে যুগোপযোগী ও গতিশীল করে তোলার চেষ্টাও চলছিল। কারণ ইসলাম ধর্মকে তারা মনে করেছিল সংহতি ও নিরাপত্তার রক্ষাকবচ। তাই ইসলামী শিক্ষায়তনের সংখ্যা বেড়েছিল, এবং হজ্ব যাত্রীর সংখ্যাও বেড়েছিল। শাসক শাসিতের মধ্যে দুস্তর ব্যবধানের স্মারক হল ইসলাম। শাসকশ্রেণী ইসলাম ধর্মীয় নন, শুধু এই সত্যই অগণিত ইন্দো-নেশীয় মানুষকে ঐক্যবন্ধ করেছে। সাদা চামড়ার শাসকশ্রেণী হল বিধর্মী খ্রীস্টান এবং বাদামী চামড়ার স্বদেশবাসী হল মুসলমান, এই বর্ণাভিমান থেকেই জন্ম নিয়েছিল জাতীয়তাবোধ। এমনকি চীনা বণিকদের যখন তারা বাণিজ্য ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবছে, তখন সঙ্গে সঙ্গে তারা এও ভেবেছে যে চীনারা শুধু বিজাতীয় নয়, বিধর্মীও বটে। জাতীয়তার অন্যান্য উপকরণ-গুলি যখন হয় অনুপস্থিত, না হয় অকেজো, ইসলাম ধর্ম তখন ইন্দোনেশিয়াতে জাতীয়তাবোধ সঞ্জীবিত রেখেছে। ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে তাই ইসলাম ধর্মের আকর্ষণ ছিল প্রবল ও গভীর।

ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সাংগঠনিক প্রচেষ্টার প্রতি এবার দৃষ্টিপাত করা যাক।

1916 সালে Volksraad নামে একটি গণসভা সৃষ্টি করা হল। এই গণসভা ছিল ডচ সরকারের উপদেষ্টা সমিতি। এই সভা প্রকৃত অর্থে প্রতিনিধিমূলক ছিলনা। এই সভার আইন প্রণয়নেরও ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু রাজনৈতিক মতামত ও অভাব অভিযোগ প্রকাশ করা হত এই সভাতে। এই প্রতিষ্ঠান চালু হবার পর *Priyayi* শ্রেণীর ক্ষমতা ও প্রভাব আর কিছুই থাকল না। আধুনিক রাজনৈতিক দলের প্রয়োজন সম্বন্ধে সাধারণ মানুষকে সচেতন করে তুলেছিল এই গণ সভা।

1908 সালে বাতাবিয়াতে Budi Utomo দলটি গঠিত হয়। জাভার কয়েকজন ডাক্তারী ছাত্রের উদ্যোগে এই দলটির গোড়াপত্তন হয়। জাভার নিজস্ব সংস্কৃতির উন্মেষ ও বিকাশ ছিল এই দলের আদর্শ। প্রথম দশকের এই দলের কোন রাজনৈতিক কর্মসূচী ছিল না। সমাজের উপরতলার সুশিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে দলটির আবেদন সীমাবদ্ধ ছিল। এই দল ছিল একান্তই আঞ্চলিক ও রক্ষণশীল। 1912 সালে জন্ম হয়েছিল ইন্ডিজ দলের (Indische Partij)। E. F. E. Douwes Dekker এই দলের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তিনি হলেন বিখ্যাত Multatuli-র বংশধর। তার লক্ষ্য ছিল ইন্দোনেশিয়াতে জন্মেছে এই ধরণের মানুষের জন্য ইন্দোনেশীয় নাগরিকতা সৃষ্টি করা। প্রকাশ্যেই তিনি স্বাধীনতার দাবি প্রচার করেছেন। এই দলের অনেক নেতাকে নেদারল্যান্ডে নির্বাসিত করা হয়েছিল। তাদের অনুগামীরা পরে জাতীয় ইন্ডিজ দল (National Indische Partij) সৃষ্টি করেন। এই দলের জাতীয়তাবাদী আদর্শ সাধারণ মানুষের মনে বিশেষ উদ্দীপনা সঞ্চার করতে পারেনি।

সারেকাৎ ইসলাম

1912 সালে সারেকাৎ ইসলাম নামে আর একটি প্রভাবশালী দলের জন্ম হয়। এর কয়েক বছর আগে Sarekat Dagang Islam (Islamic Trading Union) নামে একটি বণিক সমিতির সৃষ্টি হয়েছিল। এই সমিতির উদ্যোক্তারা ছিল পূর্ব ও মধ্য জাভার বাটিক শিল্পের বণিকরা। তাদের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল পুরোপুরি *Santri* সমাজের। তাদের সঙ্গে চীনা বণিক সমাজের তীব্র প্রতিযোগিতা চলছিল। শহরবাসী স্বাধীন স্বতন্ত্র মধ্যবিত্ত

শ্রেণীর অধিকাংশই ছিল চীনা। ধীরে ধীরে অধিক সংখ্যায় চীনারা জাভার অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে শুরু করে। তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতার দরুণ বস্ত্র ও বাটিক শিল্পের ক্ষেত্রে ইন্দোনেশীয়দের আধিপাত্য প্রায় বিনষ্ট হয়ে পড়েছিল। Sarekat Dagang Islam বণিক দলটির অনুগামীদের সংখ্যা বৃদ্ধি হলে, তারা সারেকাৎ ইসলাম নামে একটি নতুন দল সৃষ্টি করে।

ইসলাম ধর্মকে এই সময় আধুনিক যুগোপযোগী করে তোলার জন্য সংস্কার আন্দোলন শুরু হয়। উচ্চশ্রেণীভুক্ত মুসলমান বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় ও নগরকেন্দ্রিক বণিক শ্রেণী এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিল। সংস্কার-আন্দোলনের প্রভাবে সারেকাৎ ইসলামও বিপুল গণ সমর্থন লাভ করেছিল। ডচ শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে, খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারকদের বিরুদ্ধে এবং ইন্দোনেশিয়ার প্রবাসী চীনা বণিকদের বিরুদ্ধে যে বিক্ষোভ ও বিতৃষ্ণা পুঞ্জীভূত হচ্ছিল ইসলামী সংস্কার আন্দোলনের মধ্যে তা দানা বেঁধে ওঠে। ইসলাম ধর্মকে কেন্দ্র করে জাতীয় সংহতি স্পষ্ট আকার নেয়। এই ধর্মভিত্তিক জাতীয় সংহতি থেকেই সারেকাৎ ইসলাম শক্তি ও পুষ্টি অর্জন করেছিল। ইসলামী সংহতি সারেকাৎ ইসলামকে সাংগঠনিক প্রসারতা দিয়েছে, কিন্তু স্মর্তব্য যে ইসলাম সারেকাৎ ইসলামের মর্মবাণী নয়। সারেকাৎ ইসলামের নেতা, O. S. Tjokroaminoto ছিলেন পশ্চিমী শিক্ষায় শিক্ষিত। অগণিত গ্রামবাসীর কাছে তিনি ছিলেন রাতু আদিল, যার আবির্ভাব হয়েছে দুষ্কৃতকারীদের বিনাশের জন্য, সাধুদের পরিত্রাণের জন্য, ধর্ম রাজ্য সংস্থাপনের জন্য।

সারেকাৎ ইসলামের মূল কর্মক্ষেত্র ছিল জাভা, দেশের নানাস্থানে এই দলের শাখা ছড়িয়ে ছিল। অন্যান্য দল এবং বিশেষ করে মার্কসীয় দল ইণ্ডিজ্ সোস্যাল ডেমোক্রেটিক এসোসিয়েশন (ISDV, 1914) সারেকাৎ ইসলামের পক্ষপুটে এসে আশ্রয় নেয়। ক্রমে ক্রমে এই দলটি চরমপন্থী রাজনীতির দিক ঝুঁকে পড়ে। মূলত সারেকাৎ ইসলাম ছিল নবজাগ্রত বণিক শ্রেণীর মুখপত্র। কিন্তু রাজনীতির আমদানি যতই বাড়তে লাগল, কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনে যতই দলটি জড়িয়ে পড়তে লাগল, এই দলটিতে ততই বণিকশ্রেণীর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা হারিয়ে গেল।

কম্যুনিস্ট আন্দোলন

1920 সালের 23মে তারিখে ইন্দোনেশিয়ার কমুনিস্ট দলের জন্ম। প্রথমে এই দলটির নাম ছিল Perserikaten Kommunis di Indies অর্থাৎ

ইন্দোনেশিয়ার কম্যুনিস্ট এসোসিয়েশন। পরে এর নাম হল Partai Kommunis Indonesia (PKI) অর্থাৎ ইন্দোনেশিয়ার কম্যুনিস্ট পার্টি। ইন্দোনেশিয়ার কম্যুনিস্ট পার্টি এশিয়ার সর্বপ্রথম কম্যুনিস্ট পার্টি।। এই দলের জন্ম কাহিনীর প্রথম পর্ব চিত্তাকর্ষক। 1913 সালের 7মে তারিখে লেনিন 'প্রাভদা'য় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে ইন্দোনেশিয়ার বিপ্লবী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। ঐ বছরেই H. J. F. M. Sneevliet নামে একজন ডচ চরমপন্থী সোস্যালিস্ট জাভাতে আসেন। 1914 সালে তাঁরই উদ্যোগে ইন্দোনেশিয়ার সোস্যাল ডেমোক্রেটিক এসোসিয়েশন (ISDV) সৃষ্টি হয়। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ইতিহাসে এটাই হল প্রথম মার্কসবাদী সংগঠন।। 1915 সালের 10 অক্টোবর এই দলের মুখপত্র "ফ্রি ওয়ার্লড" প্রথম প্রকাশিত হয়। 1916 সালে সারেকাৎ ইসলামের কয়েকজন বিশিষ্ট সভ্য যুগপৎ সোস্যাল ডেমোক্রেটিক এসোসিয়েশনের (ISDV) সঙ্গে যুক্ত হন। Sneevliet এর উৎসাহে সারেকাৎ ইসলাম দলের Semarang শাখার প্রধান Semaun ইন্দোনেশীয় জনগণের মধ্যে মার্কসবাদ প্রচারে আত্ম-নিয়োগ করেছিলেন।। ডচ কর্তৃপক্ষের নির্দেশে কিছুদিন পর Sneevliet ইন্দোনেশিয়া থেকে বিতাড়িত হন।।

1919 সালে কমিনটার্ণের প্রথম কংগ্রেস অধিবেশনে লেনিন বিশ্ব বিপ্লবের প্রস্তুতির কথা বলেন। ইন্দোনেশিয়ার সোস্যাল ডেমোক্রেটিক এসোসিয়েশন এই আহ্বানে অনুপ্রাণিত হয়। 1920 সালের 23মে এই দলটি ইন্দোনেশিয়ার কম্যুনিস্ট পার্টিতে রূপান্তরিত হয়।। সারেকাৎ ইসলামের Semarang দপ্তরে এক সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। Semaun এই নতুন দলের সভাপতি হলেন। 1920 সালে কমিনটার্ণের দ্বিতীয় কংগ্রেসে Sneevliet ইন্দোনেশীয় কম্যুনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিত্ব করেন।। সারেকাৎ ইসলাম বিপ্লবের মধ্য দিয়ে নয়, সংস্কারের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা অর্জনের কথা বলেছিল। এই দলের সংগ্রাম ছিল বিদেশী ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে, ইন্দোনেশীয় ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে নয়। তাদের কাছে মার্কসবাদের আকর্ষণ জাতীয় সংগ্রামের হাতিয়ার হিসাবে, সমাজ বিপ্লবের আদর্শ হিসাবে নয়।। 1921 সালের অক্টোবর মাসে সারেকাৎ ইসলামের ষষ্ঠ জাতীয় কংগ্রেসে প্রস্তাব নেওয়া হয় যে এই দলের সদস্যরা অন্য কোনও দলের যুগপৎ সভ্য থাকতে পারবে না। কম্যুনিস্টরা তখন সারেকাৎ ইসলাম থেকে পদত্যাগ করে।

অইদিতের (Aidit) হিসেব মত তখন ইন্দোনেশীয় কম্যুনিস্ট পার্টি 38টি সেকশনে কাজ চালাত।) এর সংগ্রামী সদস্য সংখ্যা ছিল 1140 এবং

তখন চীনা কম্যুনিস্ট দলের সদস্য সংখ্যা মাত্র 900 ছিল। শহরে শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে তাদের প্রতিপত্তি বাড়তে থাকে। গ্রামের কৃষকদের মধ্যেও তারা ছড়িয়ে পড়ে। সরকারী নিপীড়ন তাদেরকে আরও সংহত সুসংগঠিত করে তোলে। পশ্চিম জাভায় (নভেম্বর, 1926) ও পশ্চিম সুমাত্রায় (জানুয়ারি, 1927) তাদের নেতৃত্বে কৃষক বিদ্রোহ শুরু হয়। ডচ সরকার খুব সহজেই এই বিদ্রোহ দমন করে। দীর্ঘকালের জন্য তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে।

Sneevliet এর নেতৃত্বে ইন্দোনেশিয়ায় কম্যুনিস্ট আন্দোলন ক্রমশই শক্তিশালী হতে থাকে এবং স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা আরো তীব্ররূপে আত্মপ্রকাশ করে। 1917 সালে ISDV প্রকাশ্যে ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা দাবি করে। সারেকাৎ ইসলামের মাধ্যমে এই দাবি উপস্থাপিত হয়। কিন্তু এই দাবি এত হৃদয়গ্রাহী হয়ে ওঠে যে মাত্র দুই বৎসরের মধ্যেই সারেকাৎ ইসলাম ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং এর সদস্য সংখ্যা 2·5 মিলিয়নে উপনীত হয়।

কিন্তু ইন্দোনেশিয়ায় সারেকাৎ ইসলামের মাধ্যমে কম্যুনিস্ট আন্দোলনের প্রসার ও ব্যাপক গণ আন্দোলনের মাধ্যমে স্বাধীনতার পরিকল্পনা নেওয়া হলেও, সারেকাৎ ইসলামের মূল নেতৃত্ব শান্তিপূর্ণ উপায়ে স্বাধীনতা লাভ ও জাতীয় মুক্তির আন্দোলনের পক্ষপাতী ছিলেন। তারা বিপ্লব ও গণ আন্দোলনের পথ বর্জন করেন এবং শান্তিপূর্ণনীতি গ্রহণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। দেশীয় ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে নয়, বিদেশী ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে সারেকাৎ ইসলামের নেতৃবৃন্দ সোচ্চার হয়েছিলেন। এই সময়ে মার্কসবাদী আন্দোলন ইন্দোনেশিয়ায় দ্রুত জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করে। কিন্তু, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে মার্কসবাদী তত্ত্ব ইন্দোনেশিয়ায় কম্যুনিস্ট আন্দোলনের জনপ্রিয়তার মূল কারণ নয়। কম্যুনিস্টরা বিদেশী শোষণ ও শাসনের বিরুদ্ধে যে জাতীয়তাবাদী মুক্তিকামনা সৃষ্টি করে তাই ইন্দোনেশিয়ার সাধারণ মানুষকে পরিতৃপ্ত করে এবং কম্যুনিস্ট আন্দোলন প্রাথমিক স্তরে আকর্ষণীয় হয়ে উঠে।

কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই সারেকাৎ ইসলাম ও কম্যুনিস্ট পার্টির মধ্যে বিরোধ দেখা দেয় এবং ইন্দোনেশীয় কম্যুনিস্ট পার্টি 1921 সালের অক্টোবর মাসে সারেকাৎ ইসলামের উপর প্রকাশ্য নিয়ন্ত্রণ দাবি করে। 1923 সালের মার্চ মাসে কম্যুনিস্ট পার্টির চতুর্থ কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। এই কংগ্রেসে সারেকাৎ ইসলামের বিরুদ্ধে নির্বাচনে একটি সম্পূর্ণ পৃথক রাজনৈতিক

সংস্থা হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই উদ্দেশ্যে জাভার বাইরে পাদং, সুমাত্রা, মাকাসার এবং সুলায়েশিতে কম্যুনিস্ট পার্টির শাখা স্থাপন করা হয়।

1920 সালে মস্কোতে কমিনটার্ণের দ্বিতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। এই কংগ্রেসে কমিনটার্ণের পরিচালকমণ্ডলী PKI এর নিকট ইন্দোনেশিয়ার বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী মুক্তি আন্দোলনকে সমর্থনের জন্য আবেদন জানান। যেহেতু ইন্দোনেশিয়ায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সারেকাৎ ইসলামকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে, তাই এই ইসলামী আন্দোলনকে সমর্থনের নির্দেশ ছিল ইন্দোনেশিয়ার কম্যুনিস্ট পার্টির উপরে। কিন্তু সেই সঙ্গেই বিশ্ব কম্যুনিস্ট আন্দোলনের পরিপন্থী বিশ্বব্যাপী ইসলামী আন্দোলনের (Pan-Islam) প্রচারকে বাধা দেবারও নির্দেশ দেওয়া হয়। কমিনটার্ণ নেতৃত্বের এই পরস্পর-বিরোধী নির্দেশ ইন্দোনেশীয় কম্যুনিস্ট পার্টিকে উভয় সংকটে ফেলে এবং এই দোটানা অবস্থায় পার্টির নেতৃত্ব দ্রুত চরমপন্থীদের হাতে যায়। এই চরমপন্থী নেতৃত্ব কমিনটার্ণের নির্দেশকে অগ্রাহ্য করে এবং উগ্র-বামপন্থী নীতি গ্রহণ করে। উগ্রপন্থী কার্যকলাপ ইন্দোনেশিয়ার ডচদের মনে আশংকার সৃষ্টি করে এবং কম্যুনিস্ট পার্টির মধ্যেই অপেক্ষাকৃত নরমপন্থী ও উগ্রপন্থীদের মধ্যে রাজনৈতিক আদর্শকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ হয়।

এই বিশৃংখল অবস্থায় কম্যুনিস্ট আন্দোলনের তীব্রতা হ্রাস পায় এবং কম্যুনিস্ট আন্দোলনকে সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য ডচেরা বহু কম্যুনিস্ট নেতাকে ইন্দোনেশিয়া থেকে বহিষ্কৃত করে। কম্যুনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্ত ব্যক্তিদের ব্যাপকহারে হত্যা ও গ্রেপ্তার করা হয়। এই চরমপন্থী নেতৃত্ব সোভিয়েত কম্যুনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক লড়াই শুরু করে। ইতিমধ্যে 1924 সালে লেনিনের মৃত্যু হলে স্তালিন সোভিয়েত কম্যুনিস্ট পার্টির কর্ণধার নিযুক্ত হন এবং সোভিয়েত কম্যুনিস্ট পার্টির মধ্যেই স্তালিন ত্রৎস্কি রাজনৈতিক সংঘর্ষ শুরু হয়।

1925 সালের মার্চ মাসে কমিনটার্ণের কার্য নির্বাহক কমিটি PKI-কে কয়েকটি নির্দেশ দেয়। এসব নির্দেশের মূল কথা হচ্ছে ইসলামী আন্দোলনকে বর্জন না করে, তাকে প্রকৃত গণ-আন্দোলনে রূপান্তরিত করা প্রয়োজন। কারণ, এই নির্দেশে বলা হয়, বিশ্বের কোন দেশেই কৃষকশ্রেণীর সর্বাত্মক সহযোগিতা ও সমর্থন ছাড়া সর্বহারা শ্রমিক বিপ্লব সফল হতে পারে না।

ইতিমধ্যে PKI এর বিপ্লবের বাসনা আরো তীব্র হয়ে উঠে। রাশিয়ার

বিপ্লব ইন্দোনেশিয়ার ছাত্রসমাজের কাছে একটা আদর্শ উপস্থিত করে। উইলসনের 14 দফা শর্ত তাদের মনে নতুন প্রত্যয় যোগায়। 1926 সালের 13ই নভেম্বর প্রায় দুইশত সশস্ত্র জনতা বাটাভিয়াতে টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ ভবন আক্রমণ করে এবং বহির্বিশ্বের সঙ্গে দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। কিন্তু এই আন্দোলনের পরিণতি আদৌ সন্তোষজনক ছিল না। ডচ সৈন্যরা অত্যন্ত সহজেই এই বিপ্লব দমন করে। মাত্র সাতদিনের মধ্যেই অর্থাৎ 19 নভেম্বর জাভার বিপ্লবী আন্দোলনকে সম্পূর্ণরূপে দমন করা হয়। এই আন্দোলন সম্পর্কে নিষ্ঠুর সত্য হলো এই যে ইন্দোনেশিয়ার প্রথম কম্যুনিস্ট বিপ্লব সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

কম্যুনিস্ট আন্দোলনের ব্যর্থতার পরে ডচ শাসক গোষ্ঠী ইন্দোনেশিয়ায় সন্ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করে। নয় জন ব্যক্তিকে ফাঁসী দেওয়া হয়। প্রায় 13 হাজার ব্যক্তিকে সাময়িক আটক করা হয় এবং 5 হাজার ব্যক্তিকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। 1308 জনকে স্বগৃহে অন্তরীণ রাখা হয় এবং প্রায় 823 জনকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হয়। ডচদের হিসাব অনুযায়ী এই নিষ্ফল সংঘর্ষে প্রায় আট হাজারের মতো মানুষ অংশ গ্রহণ করেন।

কম্যুনিস্টরা ইন্দোনেশিয়ার প্রকৃত রাজনৈতিক অবস্থা অনুধাবন ও বিশ্লেষণে ব্যর্থ হয়। তাঁদের এই ব্যর্থতা বিপ্লবের ব্যর্থতা নিয়ে আসে। তাঁরা সাময়িক সাফল্যের মরীচিকায় ভ্রান্তপথে পরিচালিত হন। এই সময় অধিকাংশ মানুষেরই বিপ্লবের কারণ, গতি প্রকৃতি ও পরিণতি সম্বন্ধে ধারণা ছিল অত্যন্ত সামান্য। দীর্ঘ দিন ধরে ঔপনিবেশিক শাসনে ক্ষুব্ধ ইন্দোনেশিয়ার সাধারণ মানুষ কম্যুনিস্টদের জাতীয়তাবাদী প্রচারে অনুপ্রাণিত হয়ে প্রায় কোন রকম প্রস্তুতি ছাড়াই এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে।

ইন্দোনেশিয়ার একজন প্রথম সারির রাজনৈতিক নেতা Sjahrir এব মতে বিপ্লবে যারা অংশ নিয়েছিল, তাদের অধিকাংশই কম্যুনিস্ট নন। ('They are simply and fundamentally Indonesians) 7 তিনি আরো বলেন যে ইন্দোনেশিয়ার সাম্যবাদী আন্দোলন হিন্দু ও মুসলিম সভ্যতার মিশ্র সংস্পর্শে অযৌক্তিক আধ্যাত্মিকতার দিকে মোড় নেয়। সাম্যবাদ বিরোধী এই নীতি ইন্দোনেশিয়ায় কম্যুনিস্ট আন্দোলনের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ।

কিন্তু, ব্যর্থতা সত্ত্বেও এই বিপ্লব ডচ ও ইন্দোনেশীয়দের রাজনৈতিক মানসিকতার উপর গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করে। কম্যুনিস্টরা বুঝতে

পারে তাদের পিছনে গণ সমর্থন নেই। ডচ শাসকরা বুঝতে পারে তাদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ বিক্ষুব্ধ। *Aidit* এর বক্তব্য অনুসারে এই ঘটনা ইন্দোনেশিয়ার রাজনৈতিক সচেতনতাকে আরো উচ্চ পর্যায়ে উন্নীত করে। দীর্ঘ 20 বৎসর পরে এই বিপ্লবের বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষ্যে সুমাত্রার একটি সংবাদ পত্রের প্রকাশিত মন্তব্য এই মতকেই সমর্থন করে, "These days saw the beginning of Indonesian battle for Independenoe." কিন্তু 1961 সালে PKI নেতৃবৃন্দ বলেছিলেন যে 1926 সালের আন্দোলনকেই ডচ শাসনের বিরুদ্ধে ইন্দোনেশিয়ার সাধারণ মানুষের প্রথম সশস্ত্র সংগ্রাম বলে বর্ণনা করলে ইতিহাসকে বিকৃত করা হবে।

(Aidit) ইন্দোনেশিয়ার এই কম্যুনিস্ট আন্দোলনের ব্যর্থতাকে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে এই বিপ্লব সম্বন্ধে পার্টি নেতৃত্বের মধ্যে মত পার্থক্য ছিল তীব্র। পার্টি ক্যাডার ও নেতৃত্বকে রক্ষার জন্যও বিশেষ কোন প্রস্তুতি নেওয়া হয়নি। ফলে ডচ সৈন্যরা আন্দোলন দমনে হস্তক্ষেপ করলে পার্টি ক্যাডারগন পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। গ্রামাঞ্চল ও শহরে সংগ্রামের সময় দ্রুত সংযোগ ও সহযোগিতার অভাবও এই বিপ্লবের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ।

ইন্দোনেশিয়ার সাম্যবাদী আন্দোলনের নানা পর্বের শোচনীয় অধোগতি বহু ক্ষেত্রেই ঐতিহাসিকদের কাছে বিশেষভাবে কৌতূহলোদ্দীপক মনে হয়েছে। 1965 সালে সেখানে কম্যুনিস্ট আন্দোলন সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে। তার মূলেও ছিল কম্যুনিস্ট নেতৃবৃন্দের তত্ত্বগত বিচ্যুতি ও পথভ্রান্তি। অনুরূপভাবে প্রথম সাম্যবাদী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতেও ইন্দোনেশিয়ার কম্যুনিস্ট নেতৃবৃন্দ অপারগ ছিল। সঠিক বৈপ্লবিক পরিস্থিতি অনুভব না করেই বিপ্লব করাকে লেনিন বলেছেন খোকামি রোগ। এই রোগে ইন্দোনেশিয়ার কম্যুনিস্ট পার্টি ব্যাধিগ্রস্ত ছিল। সংগঠনকে মজবুত না করে, তাকে জনগণের মর্মমূলের সঙ্গে যুক্ত না করে আন্দোলন করতে গেলে নেতৃত্ব বিফল হতে বাধ্য। ইন্দোনেশিয়ার কম্যুনিস্ট পার্টি এই ধরণের বিচ্যুতিতে পথভ্রান্ত হয়েছিল।

মুক্তি সংগ্রামের বিভিন্ন ধারা

1926 সালের কম্যুনিস্ট অভ্যুত্থানের ব্যর্থতার পর ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের ধর্ম নিরপেক্ষ ধারা চারটি খাতে প্রবাহিত হয়েছে : 1. আন্তর্জাতিক সাম্যবাদ (PKI), 2. জাতীয় সাম্যবাদ (PARI), 3. স্বৈরতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদ (Partindo), 4. গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র (PNI),

ধর্মীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রবাহ ছিল দ্বিমুখী 1. রক্ষণশীল ইসলামী আন্দোলন, 2. সংস্কারপন্থী ইসলামী আন্দোলন। এই সব রাজনৈতিক দলের মধ্যে নানাবিধ মত পার্থক্য সত্ত্বেও, ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতার লক্ষ্যে তারা সবাই ছিল এক জোট।

মোহম্মদীয়া (Muhammadijah) নামে একটি ধর্মীয় সংগঠন ছিল। 1912 সালে এই দলেরও জন্ম। ইসলামী সংস্থার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত এই দলটির চরিত্র ছিল মূলত অরাজনৈতিক। বিদ্যালয়, হাসপাতাল ও নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠান স্থাপনই ছিল এই দলটির আসল কাজ। শহরের প্রগতিপন্থী মুসলেমানরা এর সভ্য ছিল। সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, 'মোহম্মদীয়া প্রতিষ্ঠানটিকে যবদ্বীপে মুসলমান সংস্কৃতির কেন্দ্র আর মুসলমান মনোভাবের একটি প্রধান উৎস বলা যায়। কিন্তু এখানে যবদ্বীপীয় জাতীয়তা বেশ জোরের সঙ্গে বিদ্যমান।'8

1926 সালে নাদাতুল উলেমা (Nahdatul Ulama) নামে একটি রক্ষণশীল দলের জন্ম হয়। জাভায় গ্রামীণ *Santri* সমাজ ছিল এই দলের সমর্থক।

ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় আন্দোলনে ছাত্রদের ভূমিকাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 1908 সালে নেদারল্যাণ্ডের ডচ এবং ইসট ইনডিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্দোনেশীয় ছাত্ররা Perhimpunan Indonesia বা ইন্দোনেশীয় সোসাইটি নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। 1920 এর দশকে এই দলটি ইন্দোনেশিয়ার পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি ঘোষণা করেছিল এবং সমাজতান্ত্রিক আদর্শে আস্থা প্রকাশ করেছিল। হল্যাণ্ডের বামপন্থী দলগুলি ইন্দোনেশিয়ার মুক্তি আন্দোলনে সমর্থন জানিয়েছিল।

এই সময়েই ইউরোপীয় ধনতন্ত্রের স্পষ্ট অনুপ্রবেশ ঘটেছে ইন্দোনেশিয়ার অর্থনীতি ও সমাজব্যবস্থায়। তাই সেখানকার জাতীয় আন্দোলনে সমাজতন্ত্রের নীতি ও লক্ষ্য একাকার হয়ে মিশে গেছে। Perhimpunan Indonesia দলটি ও তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলি ভারতবর্ষের অসহযোগ আন্দোলনের দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছিল। হল্যাণ্ড ফেরত ইন্দোনেশীয় সমিতির ছাত্ররা দেশে ফিরে এসে অনেক পাঠচক্র গড়ে তুলল। তাদের সঙ্গে যোগ দিল আঞ্চলিক উচ্চ শিক্ষায়তনের ছাত্ররা। বান্দুং পাঠচক্রের সভাপতি ছিলেন সুকর্ণ। 1927 সালে তিনি ন্যাশানালিস্ট্ পার্টি অব ইন্দোনেশিয়া (PNI) গড়ে তোলেন। এই দলেরও উদ্দেশ্য ছিল ঐক্যবদ্ধ জাতীয় আন্দোলনের মধ্য দিয়ে দেশের মুক্তি অর্জন।

1926-27 সালের কম্যুনিস্ট অভ্যুত্থান ব্যর্থ হলে বহু ইন্দোনেশীয় কম্যুনিস্ট কর্মীকে হলান্ডে নির্বাসিত করা হয়। এই সময় হলান্ডে অনেক তরুণ জাতীয়তাবাদী ইন্দোনেশীয় ছাত্র পড়াশুনা করত। Perhimpunan Indonesia (PI) নামে সেখানে তাদের একটি নিজস্ব সংগঠন ছিল। এই দলের উপর মার্কসীয় দর্শনের, নির্বাসিত PKI নেতৃবৃন্দের এবং ডচ কম্যুনিস্টদের অসীম প্রভাব ছিল। অ-কম্যুনিস্ট PI নেতৃবৃন্দ এবং PKI প্রতিনিধিদের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। 1926 সালের 5 ডিসেম্বর তারিখে PI এর পক্ষে Mohammad Hatta এবং PKI এর পক্ষে Semaun একটি রাজনৈতিক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তিতে স্থির করা হয় যে ইন্দোনেশিয়ায় প্রত্যাগত PI সদস্যরা সেখানে একটি নতুন জাতীয়তাবাদী দল গঠন করবেন। জাতীয়তাবাদী আন্দোলন পরিচালনার পূর্ণ দায়িত্ব এবং নেতৃত্ব থাকবে PI দলের হাতে এবং PKI দল এই বিষয়ে কোন বাধা সৃষ্টি করবে না। কিন্তু পরের বছরেই নিজের ভুল স্বীকার করে Semaun চুক্তিটি বাতিল করেন। তা সত্ত্বেও হলান্ডের ইন্দোনেশীয় কম্যুনিস্ট, নেদারল্যান্ড কম্যুনিস্ট দল এবং তৃতীয় আন্তর্জাতিকের (Third International) সঙ্গে PI দলের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল।

তৃতীয় আন্তর্জাতিকের সঙ্গে PI দলের যোগাযোগ ঘটেছে League Against Imperialism (Liga) মারফৎ। 1926 সালে কমিনটার্ণের উদ্যোগে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। 1927 সালের ফেব্রুয়ারি মাসে League Against Imperialism এর ব্রাসেলস সম্মেলনে ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে সমর্থন ক'রে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। ঐ বছরেই হল্যান্ডে PI নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার হলে Liga এবং ডচ সমাজতন্ত্রীরা তীব্র প্রতিবাদ জানায়। অল্পদিনের মধ্যে Ligaর নেতৃত্ব দুটি শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে। প্রথম শিবিরে ছিল কম্যুনিস্টরা এবং বিপক্ষ শিবিরে ছিল ঔপনিবেশিক দেশের অ-কম্যুনিস্ট নেতৃবৃন্দ ও ইউরোপীয় সোস্যাল-ডেমোক্রাটরা। 1929 সালে PI দল Ligaর সঙ্গে সম্বন্ধ ছিন্ন করে।

Sjahrir এবং Hatta প্রমুখ স্বদেশে প্রত্যাগত PI নেতৃবৃন্দ বিশ্বাস করতেন যে 1926-27 সালের কম্যুনিস্ট অভ্যুত্থানের ব্যর্থতা প্রমাণ করেছে যে সাধারণ কর্মীদের মধ্যে রাজনৈতিক শিক্ষা ও সচেতনতা না বাড়লে স্বাধীনতা সংগ্রাম হয় পথভ্রষ্ট হবে না হয় দমিত হবে। এই সময় PKI বে-আইনী ঘোষিত হয়েছে। 1926 থেকে 1945 পর্যন্ত প্রকাশ্যে কম্যুনিস্ট আন্দোলন গড়ে তোলা ইন্দোনেশিয়ায় সম্ভব ছিল না। এ ধারণাও প্রচলিত ছিল

ইউরোপীয় সোস্যাল-ডেমোক্রাটরা হয়ত আন্তরিক ভাবে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বা ঔপনিবেশিকতা-বিরোধী নয়। তাই Partai Nasional Indonesia (PNI) আদর্শের দিক দিয়ে মস্কোর প্রভাব মেনে নেয়। এই প্রসঙ্গে Sjahrir এর বক্তব্য বিশেষ প্রণিধেয়, 'Hence, from its very beginning the Partai Nasional Indonesia was infused with revolutionary minded socialist tendencies, and in its prepaganda, this party freely borrowed from the concepts and terminology of official communism : the Comintern .it adopted almost entirely the theory on Imperialism of the Communist International'

(Sjahrir, *Indonesian Socialism*, pp. 29F quoted in J. S Mintz, 'Marxism in Indonesia' F. N. Trager, *Marxism in South East Asia.* Standford. 1959. p 194.)

1927 সালে PNI দল প্রতিষ্ঠিত হয়। দু'বছরের মধ্যে এই দলের সদস্য সংখ্যা 10,000 অতিক্রম করে। পূর্ণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার দাবিতে PNI সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতার কৌশল অবলম্বনে করে। এই সময় Sukarno ছিলেন PNI দলের অন্যতম প্রধান নেতা। শুধুমাত্র ইন্দোনেশিয়াতেই তিনি শিক্ষা লাভ করেন, এজন্য দেশের বাইরে তিনি যান নি। 1929 সালের ডিসেম্বর মাসে দেশদ্রোহিতার অভিযোগে তিনি গ্রেপ্তার হন। 1930 সালে বিচারের সময় আত্মপক্ষ সমর্থন করে তিনি যে ভাষণ দেন, তা *'Indonesie Klaagt Aan !'* (Indonesia Accuses !) শিরোনামে PNI দলের রাজনৈতিক আদর্শের সারমর্ম হিসাবে খ্যাতি লাভ করেছে। এই ভাষণে তিনি বলেছিলেন যে ধনতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ ডচ সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণ নয়। তাঁর যুক্তি হল,

' .Capitalism and imperialism are not synonymous with Dutch or Dutchmen or other foreigners. Capitalism and imperialism are systems. Capitalism and imperialism are not identical with a regime.'

দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনই হল PNI এর লক্ষ্য। PNI কম্যুনিস্ট দল নয়, এবং PKI দলের উত্তরসূরী নয়। PNI এর আদর্শ হিসাবে তিনি *Kromo*-ism এবং *marhaen*-ism এর কথা বলেন। *Kromo* এবং *marhaen* এর প্রকৃত

অর্থ হল কৃষক। কখনও কখনও শ্রমিক বোঝাতেও *marhaen* ব্যবহার করা হয়েছে। জাভার চাষী প্রসঙ্গে *Kromo* প্রচলিত ছিল। জাভার সুন্দা অঞ্চলের একজন কৃষকের নাম থেকে *marhaen* নেওয়া হয়েছে।9

1930 সালে গোটা পৃথিবীর অর্থনীতির বাজারে মন্দার কালো ছায়া ঘনিয়ে এল। ইন্দোনেশিয়া থেকে কৃষিপণ্যের রপ্তানি তখন আর লাভজনক নয়। বৃহৎ ধনিক গোষ্ঠী চালিত অর্থনীতির কাঠামোতে ভাঙ্গন দেখা দিল। সেখানে শিল্পপতিরা ছোট ছোট স্বল্পমূল্যের জিনিস উৎপাদনের দিকে নজর দিল। এই ছোট ধরণের উৎপাদন কাঠামো টিকিয়ে রাখতে ডচ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার প্রয়োজন দেখা দিল। 1935 সালে রক্ষণশীল দলগুলি একত্রে Parindra বা বৃহত্তর ইন্দোনেশিয়া দল (Greater Indonesia Party) গড়ে তুলল। নরম সুরের বামপন্থীরা 1937 সালে Gerindo বা ইন্দোনেশীয় গণ-আন্দোলন গড়ে তোলে। ঐ একই বছরে ইসলামী আইনের প্রচলনের দাবি জানিয়ে মোহম্মদীয়া ও নাদাতুল উলেমা (NU) একত্রে সংযুক্তভাবে একটি বৃহৎ ঐশ্লামিক সমিতি (Greater Islamic Council of Indonesia) প্রতিষ্ঠা করল। 1938 সালে এই সমিতি ইন্দোনেশীয় ইসলামী দল (Indonesia Islamic Party) নামে আত্মপ্রকাশ করেছিল। এই রাজনৈতিক দলগুলি ডচ সরকারকে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছিল। তা সত্ত্বেও ডচ সরকার এতটুকুও নমনীয়তা দেখায় নি এবং শাসন সংস্কারের প্রতিশ্রুতিও জানায়নি। কিছু রাজনৈতিক অধিকারের জন্য জাতীয়তাবাদী নেতারা 1939 সালে Gapi নামে একটি ইন্দোনেশীয় রাজনৈতিক জমায়েৎ গঠন করে। এই সমাবেশে রক্ষণশীল ও উগ্রপন্থী নেতারা সমবেতভাবে একটি ইন্দোনেশীয় পার্লামেন্টের দাবি জানিয়েছিল। 1941 সালে তৈরী হয় Madjelis Rakjat Indonesia বা ইন্দোনেশীয় গণ সমিতি। এই সমিতি জাতীয় পার্লামেন্ট, জাতীয় ভাষা, জাতীয় সঙ্গীত ও জাতীয় পতাকার দাবি জানিয়েছিল।

জাতীয়তাবাদের চরিত্র বিশ্লেষণ

ইতিহাসের আদি পর্বে বংশগত পরিচয় বা আঞ্চলিক গোষ্ঠী পরিচয় ছাড়া ইন্দোনেশীয়গণের মনে বৃহত্তর সমাজচেতনা ছিলনা বললেই চলে। কৃষ্টিগত মিল সত্ত্বেও অখন্ড ইন্দোনেশীয় ঐক্যচেতনা বা জাতীয়তাবোধ আদৌ গড়ে ওঠেনি। ইউরোপীয়দের আগমনের ফলে ইন্দোনেশিয়ার রাজন্য-বর্গের মধ্যে দু'ধরণের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গেল। পশ্চিমী অভিঘাতের বিরুদ্ধে একদিকে তারা জোটবন্ধ হয়েছে, আবার অন্যদিকে আভ্যন্তরীণ

গোলোযোগের ক্ষেত্রে পশ্চিমী শক্তির শরণাপন্নও হয়েছে। একসময় ইন্দোনেশীয়গণ ইসলাম ধর্মের পক্ষপুটে বিপুল সংখ্যায় আশ্রয় নেয়। Wertheim মনে করেন যে এই ধর্মাচরণের মধ্যে হয়ত আন্তঃএশীয় পরিচয় কামনার কিঞ্চিৎ প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়।

ঊনিশ শতকের প্রথম দিকেই বেগবান পাশ্চিমী সভ্যতার প্রভাব ইন্দোনেশীয়ার সমাজব্যবস্থার ভিত্তিকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছে। সামন্তপ্রভুদেব সামনে দুটি পথ উম্মুক্ত ছিল। ইসলাম ধর্মাবলম্বী কৃষককুলের সঙ্গে কাজী ও উলেমাদের নেতৃত্বে মিলিত হওয়া, অথবা, জনগণের প্রতি তাদেব চিরাচরিত প্রভুত্ব বজায় থাকবে, এই আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতিতে পশ্চিমী শক্তির সঙ্গে সহযোগিতা করা এবং পশ্চিমী শাসনযন্ত্রে অংশ গ্রহণ করা। ইসলামী যোগসূত্রে তাদের চিরাচরিত প্রভুত্ব পঙ্গু হয়ে যাবার সম্ভাবনা ছিল। *Adat* প্রধানদের সনাতন মৈত্রীবন্ধন ঔপনিবেশিক শাসনযন্ত্রকে পুষ্ট করেছিল। কারণ *Adat* প্রধানরা আঞ্চলিক অহমিকাবোধের পিছনে ইন্ধন জুগিয়েছিল। ইসলামী সংহতিবোধকে বিনষ্ট করতে আঞ্চলিক অহমিকাবোধ ছিল খুবই সক্রিয়। দেশের অভিজাত সম্প্রদায় তাদের স্বাতন্ত্র্য হারিয়েছিল। তার খেসারত হিসাবে গৌরবময় অতীতের কল্পলোকে তারা ফিরে যাবার চেষ্টা করল। সমসাময়িক সমস্যার চাপে শঙ্কাতুর হয়ে তারা জাভার প্রাচীন রাজদরবার পুষ্ট বিলীয়মান সংস্কৃতির আশ্রয়ে শরণাগত হল। ওয়েয়াঙ নাটকগুলিতে এই ধরণের মনোবৃত্তির প্রকাশ দেখান হয়েছে। প্রাথমিক বিপর্যয় সত্ত্বেও জাভার দুর্বল পেশী নায়করা পরাক্রান্ত বিদেশী নায়কদের পরাজিত করতে পেরেছিল অলৌকিক ক্ষমতাবলে, ওয়েয়াঙ নাটকগুলির এই হল বিষয়বস্তু।

গ্রামীণ মানুষেব মধ্যেও এই পলায়নী মনোবৃত্তির প্রকাশ দেখা গেছে। কৃষককুল পশ্চিমী সংস্কৃতির প্রবাহে নিজেদের যুক্ত না করে আপন গ্রামীণ সংস্কৃতির নিরাপদ কোটরে আশ্রয় নিয়েছিল। পশ্চিমী শাসনের চাপে গ্রামীণ অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। অর্থনৈতিক দুর্গতির দুর্বহ বোঝা থেকে মুক্তি পেতে কৃষকরা অলৌকিক অতীন্দ্রিয় শক্তির উপর নির্ভর করতে লাগল। পশ্চিমী দুষ্কৃতকারীদের বিনাশের উদ্দেশ্যে তারা রাতু আদিল নামে অভিহিত এক ঈশ্বর প্রেরিত দূতের আগমনের জন্য প্রতীক্ষা করেছে।

ঊনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের প্রথমার্ধে এই জাতীয় পলায়নী মনোবৃত্তির প্রথম প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় সামিন (Samin) আন্দোলনে। বহু ক্ষেত্রে কৃষকরা প্রবল পশ্চিমী অনুশাসনের বিরুদ্ধে অহিংস প্রতিরোধ গড়ে

তুলল। সামিন নামে মধ্যজাভার এক কৃষক এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিলেন। এই আন্দোলন ছিল ধনতন্ত্রবিরোধী। প্রাক-পুঁজিবাদী যুগের গ্রাম্য সহজ অনাড়ম্বর জীবনের জয়গান ধ্বনিত হয়েছিল এই আন্দোলনে। আগ্রাসী পশ্চিমী সংস্কৃতির বিরুদ্ধে এই আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল। উদ্দীপনাময় জাতীয়তাবাদের পথ প্রশস্ত করেছে এই আন্দোলন।

অর্থনৈতিক রূপান্তর, সামাজিক শ্রেণী বিন্যাসে রদবদল, নগরকেন্দ্রিক জীবনযাত্রার প্রবাহ, প্রাক জাতীয়তাবাদী পর্বে ঐক্যগ্রন্থি রূপে ইসলাম ধর্মের ভূমিকা, শ্রমিক আন্দোলনের সূচনা, সাংস্কৃতিক জাগরণের অন্বেষা—এই সব কিছুর ফলে ইন্দোনেশিয়ার সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। এই সব কারণের জন্য অহিংস প্রতিরোধ থেকে সক্রিয় জাতীয়তাবাদ জন্ম নিয়েছিল। জাতীয়তাবাদের এই ধারণা পশ্চিমেরই আমদানি; কিন্তু পশ্চিমী সভ্যতার বিরুদ্ধেই জাতীয়তাবোধ বাঙময় হয়ে উঠেছে। শ্রেণী চরিত্রের উপর ভিত্তি করেই জাতীয়তাবোধের গতিপ্রকৃতি নির্ণীত হয়েছে। বিশ শতকের প্রথম দিকের পশ্চিমী শিক্ষায় শিক্ষিত তরুণ *Priyayi* শ্রেণীর জাতীয় চেতনার সঙ্গে মধ্যবিত্ত বণিকশ্রেণীর ইসলামী জাতীয়তাবাদের কোন মিলই ছিলনা। সরকারী পেশায় ও বেসরকারি পশ্চিমী বাণিজ্যসংস্থায় নিযুক্ত বৃত্তিভোগী পরনির্ভর মধ্যবিত্তশ্রেণীর জাতীয় চেতনা এবং কৃষককুল বা শহরের অ-দক্ষ শ্রমিকশ্রেণীর জাতীয়তাবাদ—এই দুই প্রবণতার মধ্যে বিরাট পার্থক্য ছিল। বিভিন্ন শ্রেণীর জাতীয়তাবাদের মধ্যে নানা অমিল সত্ত্বেও একটা বড় জায়গায় তাদের মিলনক্ষেত্র ছিল। আঞ্চলিক বৈষম্যকে অতিক্রম করে ইন্দোনেশীয় ঐক্য ও সংহতির প্রচেষ্টার প্রারম্ভিক সূচনা প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই লক্ষণীয়। নানাক্ষেত্রে বিকশিত উগ্র আঞ্চলিক মনোভাবকে জাতীয়তাবোধ রূপে চিহ্নিত করা সঙ্গত হবেনা। উগ্র আঞ্চলিকতা ছিল *Adat* গোষ্ঠীর ঐতিহ্যে লালিত এবং প্রায়শই সরকারী সমর্থনপুষ্ট। ইন্দোনেশীয় দেশপ্রেমিকদের দৃষ্টিতে উগ্র আঞ্চলিকতা সামন্ততন্ত্র ও ঔপনিবেশিক বিভেদনীতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কিত। উগ্র আঞ্চলিকতাকে জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে সমার্থক মনে করাও উচিত হবেনা।

ইন্দোনেশিয়াবাসী ইউরোপীয়রা বিশেষ করে ওলন্দাজরা ইন্দোনেশিয়ার জন্য স্বাধীনতার দাবি জানিয়েছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের কিছু পরে স্থানীয় কিছু বুদ্ধিজীবীর সহায়তায় তারা ইন্দোনেশিয়ায় প্রথম রাজনৈতিক দল গঠন করে। এই দলের নাম ইনডিজ পারটি (Indische Party)। 1919 সালে সৃষ্টি হয়েছিল ইন্দো-ইউরোপীয় ইউনিয়ন। এই সংগঠনের মাধ্যমে ইন্দো-

নেশিয়াবাসী ওলন্দাজরা তাদের প্রচলিত সুযোগ সুবিধা সংরক্ষণের চেষ্টা করেছিল।

ইন্দোনেশিয়ার সামন্তশ্রেণীর অবস্থা ছিল উভয় সংকট। ডচ ঔপনিবেশিক শাসন ছিল তাদের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিবন্ধক। ডচ শাসনকর্তারা তাদের কিঞ্চিৎ ক্ষমতা দিয়েছিল নিঃসন্দেহে, কিন্তু ঔপনিবেশিক কাঠামোতে তাদেরকে ইন্দোনেশীয় হিসাবে সামাজিক মর্যাদায় হীন মনে করা হত। আবার তাদের অনেকেরই এই ধারণা ছিল যে জাতীয় আন্দোলন যদি দুর্বার হয়ে ওঠে তাহলে তার দাপটে সামন্তশ্রেণীর প্রচলিত ক্ষমতা নিশ্চয়ই খর্বিত হবে। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের শরিক হয়ে, নেতৃত্বলাভ করে স্বশ্রেণীর প্রচলিত ক্ষমতা বজায় রাখবে, না ঔপনিবেশিক শাসনের সংগে সুসম্পর্ক গড়ে তুলবে এবং তাদের প্রতি আনুগত্য দেখাবে—এ নিয়ে সামন্তশ্রেণী ছিল দ্বিধাদ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত।

মধ্যবিত্তশ্রেণীর জাতীয়তাবোধ ছিল দ্বিধাহীন। এই মধ্যবিত্তশ্রেণীর মধ্যে ছিল স্বল্পসংখ্যক বণিককুল, বুদ্ধিজীবী, সরকারী আমলাবাহিনী ও পশ্চিমী বাণিজ্য সংগঠনে নিযুক্ত বৃত্তিভোগীশ্রেণী। এরা ছিল মূলত নগরাশ্রয়ী শ্রেণী। ইউরোপীয় ও চীনা বণিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে তাদেরকে বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে হয়েছিল। প্রতিযোগিতামূলক দ্বন্দ্ব তাদের সামাজিক আচার আচরণ এবং জাতীয়তাবোধকে প্রভাবিত করেছিল। অন্যভাবে বলা যায় প্রতিযোগিতামূলক দ্বন্দ্ব থেকেই তাদের জাতীয়তাবোধ জন্ম নিয়েছিল। সামাজিক শ্রেণী বিন্যাসে অগ্রগণ্য স্থান দখল করার স্পৃহা এই শ্রেণীর চেতনায় অদম্য হয়ে উঠেছিল। একথা সত্য জাতীয়তাবোধে অনুপ্রাণিত হয়ে গণআন্দোলনের সঙ্গে এই শ্রেণী যুক্ত হতে চেয়েছে। এ কথা সত্য এই শ্রেণীর জনকল্যাণ চেতনা ছিল নিঃসন্দেহে আন্তরিক। কিন্তু সমাজকাঠামোর মৌলিক পরিবর্তন এই শ্রেণীর আদৌ লক্ষ্য ছিলনা। তাদের অনেকেই প্রগতিশীল সংস্কারের দাবি জানাতে আতঙ্কিত বোধ করত। বিদেশীরা অর্থাৎ ইউরোপীয় ও চীনারা ইন্দোনেশিয়ার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাঠামোতে যে অগ্রগণ্য স্থান দখল করেছিল, সেই স্থান গুলির নেতৃত্ব অধিকার করাই ছিল মধ্যবিত্তশ্রেণীর জাতীয় আন্দোলনের মূল লক্ষ্য। 1926 সালের কমিউনিস্ট বিদ্রোহ পর্যন্ত সারেকাৎ ইসলাম দলটি এই শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করেছে।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর দেশব্যাপী নৈরাশ্য বিরাজ করছিল। সে সময় থেকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বামপন্থী অংশ সোচ্চার হয়ে ওঠে। মধ্যবিত্তশ্রেণীর সামনে তখন কোনরকম অর্থনৈতিক ক্রমোন্নতির

প্রতিশ্রুতি নেই। তাই গোটা সমাজব্যবস্থার উপরে তারা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। শুধুমাত্র সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন নয়, শুধুমাত্র স্বাধীনতা লাভ নয়, গোটা সমাজবিন্যাসের রূপান্তর ছিল তাদের অভীপ্সিত লক্ষ্য। গণ আন্দোলন সৃষ্টির জন্য তারা সজাগ হয়ে উঠল। তাদের প্রেরণাতেই গ্রামের কৃষক ও নগরের শ্রমিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে আকৃষ্ট হল। তাদের দৃষ্টিতে জাতীয়তাবোধ ছিল এক ধরণের শ্রেণীসংগ্রাম। চীনা দালাল ও ইউরোপীয় মালিকশ্রেণীর বিরোধিতা করার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে তাদের বিদেশী বৈরিতা। পশ্চিমী পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রাম এ যুগের ইন্দোনেশীয় ইতিহাসের একটি স্মরণীয় অধ্যায়।

পাদটীকা

1. Fred R. von Dtr Mehden, *Religion and Nationalism in South East Asia.* (Wisconsin 1963) p. 4.

2. Netherland East Indies Pilgrims Registered at Jeddah.

Year	Indies Pilgrims	Total Pilgrims
1900-01	7,421	
1900-02	6,092	
1902-03	5,679	
1903-04	9,481	74,344
1904-05	4,964	66,451
1905-06	6,863	68,735
1906-07	8,694	108,305
1907-08	9,319	91,142
1908-09	10,300	69,067
1909-10	10,994	71,421
1910-11	14,234	90,051
1911-11	24,025	83,749
1911-12	18,353	83,294
1912-13	26,321	96,924
1913-14	28,427	56,855
1914-15	——	——

Year	Indies Pilgrims	Total Pilgrims
1915-16	——	——
1916-17	72	8,585
1917-18	48	7,020
1918-19	1,123	22,101
1919-20	14,805	59,370
1920-21	28,795	60,786
1921-22	22,412	——
1922-23	22,022	86,353
1923-24	39,800	91,786
1924-25	74	——
1925-26	3,474	57,957
1926-27	52,412	123,052
1927-28	43,082	98,635
1928-29	31,405	86,021
1929-30	33,000	84,810

Source : Netherlands East Indies, *Indisch Verslag*, 1931, 11 (Batavia : Landsdrukkerij, 1931). 130 প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য 1914 থেকে 1918 সাল পর্যন্ত হজযাত্রা হয়নি। 1924-25 সালে মক্কায় রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল অশান্ত।

3. Fred R. Von Der Mehden, *op. cit.* p. 30.

4. Ibid., p. 30.

5. J. M. van Der Kroef, *Indonesia in the Modern World*, Part I (Bandung : Masa Baru 1954) pp 74-75.

6. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্র সংগমে দ্বীপময় ভারত ও শ্যামদেশ, কলকাতা 1980, পৃ. 233

7. 1926 সালের সশস্ত্র অভ্যুত্থানে কোন্ কোন্ শ্রেণীর মানুষ অংশ নিয়েছিল ? অভ্যুত্থান ব্যর্থ হলে 13,000 ইন্দোনেশীয়কে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, তাদের মধ্যে 4,500 জনকে কারাগারে বন্দী করা হয় এবং 1,000 জনকে অন্তরীন করা হয়। New Guinear Boven Digoel ক্যাম্পে যাদের অন্তরীন করে রাখা হয়, সরকারী বিবরণমত তারা কম্যুনিস্ট ছিলেন। কিন্তু বহু পর্যবেক্ষকের মতে তারা ছিলেন মূলত জাতীয়তাবাদী। 1926-27 সালের কম্যুনিস্ট অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারীদের সম্পর্কে Sjahrir এর মন্তব্য বিশেষ প্রণিধেয়,

'[The majority were men] who followed the command of the PKI at that time. with the same sort of disposition that they would have followed any prince or venal quack or lunatic. The largest number of them were undeveloped villagers, and percentage of illiterate was high .[E] ven if a large majority of them were not Communists, they were still in favour of rebellion. However, I think that they did not even quite know what they wanted to represent thereby. They are, simply and fundamentally, Indonesians. If one wishes to understand them, one must regard them in this light first of all, and only then can one really evaluate the so-called Communism that many of them profess. One finds that it is a strange sort of Communism indeed, a mystical Hinduistic Javanese, Islamic-Menangkabau, or Islamic-Bantem sort of Communism, with definite animistic tendencies. There are not many European Communists who could recognize anything of their Communism in this Indonesian variety.'

Sjahrir, *Out of Exile*, pp 73F quoted in Frank N. Trager (ed.) *Marxism in Southeast Asia*, (Standford, California 1959.)

8. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্র সংগমে দ্বীপময় ভারত ও শ্যাম দেশ। পৃ. 544.

ঐ ভাষণে Sukarno বলেছিলেন,

'[the PNI] is a revolutionary nationalistic party and her

mass-character, her *kromo*-ism, her *marhaen*-ism are not the result of any communistic principles but exist because the Indonesian community makes it necessary for the PNI to subscribe to such a *marhenism*. It is necessary, just as European society makes it necessary for European socialists to adhere to proletarianism. The Indonesian community is a *Kromo-istic* community, a community which consists of small peasants, small wage-earners, small seamen, in short. in all fields, a *kromo* or a *marhaen*. A national bourgeoisie strong enough to take up arms against imperialism does not exist as yet. The Indonesian movement must be oriented toward the *kromo* the *marhaen*. In their hands lies Indonesia's fate, and from the organisation of the *kromo* and *marhaen* must we draw our strength. The movement which keeps apart from the common people, which merely carries on "Salon" politics etc., cannot conduct politics seriously.

Sukarnoর এই ভাষণ ছিল জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বাইবেল। এই বক্তৃতায় শুধুমাত্র Sukarnoর জীবনদর্শন নয়, সমগ্র জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের রাজনৈতিক আদর্শ প্রতিফলিত হয়েছে। S.I. কে যদি গণ আন্দোলনের প্রথম তরঙ্গ মনে করা হয়, তাহলে PNI ছিল তার দ্বিতীয় তরঙ্গ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত জাতীয়তাবাদ ও মার্কসবাদ বিষয়ে PNI দলের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ইন্দোনেশিয়ায় রাজনৈতিক কার্যকলাপের আদর্শগত মানদণ্ড হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে। অবশ্য কিছু ছোটখাটো বিষয়কে কেন্দ্র করে PNI বহির্ভূত জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে পড়ে।

॥ 13 ॥

জাপানী শাসনের ফলাফল

জাপানের অধীনে মালয়

1941 সালের 7 ডিসেম্বর হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে পার্ল হারবার বন্দরে মার্কিন রণতরীর উপর জাপান বোমাবর্ষণ করে। পরের দিন অর্থাৎ 8 ডিসেম্বর কোটা ভারুর (Kota Bharu) কাছে কেলানতন উপকূলে জাপানী সৈন্য অবতরণ করে। জাপানের মালয় অভিযান শুরু হয়। একটা যুগের সমাপ্তি ঘটে।

জাপানের মালয় আক্রমণ ছিল প্রকৃত পক্ষে ব্রিটেনের বিরুদ্ধে আক্রমণ। নৌবাহিনীর ক্ষেত্রে এবং অর্থনৈতিক ব্যাপারে দীর্ঘকাল ধরে জাপান ও ইংলন্ড ছিল পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। মালয় ছিল ইংলন্ডের রাজনৈতিক প্রভাবাধীন অঞ্চল এবং ব্রিটিশ মূলধন বিনিয়োগের একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। ইংলন্ডের সমরায়োজনে টিন ও রবারের প্রধান সরবরাহ কেন্দ্র ছিল মালয়। সুতরাং মালয় আক্রমণে জাপান প্রলুব্ধ হবে, এতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

জাপানী আক্রমণের বিরুদ্ধে মালয়ে কোন প্রস্তুতি গড়ে ওঠে নি। মালয় উপদ্বীপে জাপান যে ভাবে ক্ষিপ্রগতিতে এগিয়েছে, তা ব্রিটিশ রণবিশারদগণ কল্পনা করতে পারেন নি। প্রতিরক্ষার আয়োজন হিসাবে সিঙ্গাপুরে ব্রিটিশ রণতরী মোতায়েন করা হয়েছিল, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এখানে প্রয়োজনমত বিভিন্ন ধরণের রণতরী রাখা হয় নি, বা নৌবাহিনীর সাহায্যের জন্য যথোপযুক্ত বিমান বাহিনী সরবরাহ করা হয় নি। মালয়ে যখন জাপানী অভিযান শুরু হয়েছে, তখন ব্রিটিশ শক্তির মহা দুর্দিন চলছে। উত্তর আফ্রিকায় তাদের সামরিক দায় দায়িত্ব বেড়েছে এবং রাশিয়ার কাছেও তাদের সাহায্য পাঠাতে হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মহাযুদ্ধে সদ্য যোগদান করেছে এবং প্রশান্ত মহাসাগরে মার্কিন রণতরী তখন বিধ্বস্ত।

ব্রিটিশ বাহিনীর উপর বেশী মাত্রায় নির্ভর করে থাকাটা হয়ত সঙ্গত হয় নি। মাতৃভূমি রক্ষার স্বার্থে সেনাবাহিনীতে হয়ত মালাইদের নিযুক্ত করা উচিত ছিল। একটি মালয় রেজিমেন্ট অবশ্য ছিল। ইউরোপে মহাযুদ্ধ

শুরু হলে মালয়ে ছোট আকারে একটি নৌ-বাহিনীও গঠন করা হয়েছিল। 1940 সালে একটি আঞ্চলিক প্রতিরক্ষা বাহিনী গঠন করা হয়। কিন্তু এ সব প্রচেষ্টা ছিল প্রয়োজনের তুলনায় যৎসামান্য। আসল কথা হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে মালয়ে একটি সেনাবাহিনী গড়ে তোলা সহজসাধ্য ছিল না। সেনাবাহিনী গঠনের গণ দাবি ধ্বনিত হয় নি, এর প্রয়োজনও অনুভূত হয় নি। বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ছাড়া এ ধরণের বাহিনী গড়ে তোলা সম্ভব ছিল না।

এ ক্ষেত্রে খরচের প্রশ্নও উপেক্ষণীয় নয়। ব্রিটিশ উদ্যোগে মালয়ের নিজস্ব সেনা বাহিনী গঠিত হলে, মালয়ের বাইরে তা নিয়ে সমালোচনার ঝড় উঠত। এমন কি ইংলণ্ড ও আমেরিকার বিভিন্ন মহলে নানা ধরণের বাক বিতণ্ডার সৃষ্টি হত। এ সব মেনে নিয়েও একথা বলা চলে যে মালয়ের প্রতিরক্ষার ব্যাপারে ব্রিটিশ পরিকল্পনা ও প্রস্তুতির যথেষ্ট অভাব ছিল।

1941 সালের 8 ডিসেম্বর মালয়ে জাপানী অভিযান শুরু হয়। 1942 সালের 15 ফেব্রুয়ারি সিংগাপুরের পতন হয়। 1942 সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে শুরু করে 1945 সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত মালয় ছিল জাপানের শাসনাধীন। জাপানের শাসননীতি ছিল মূলত সামরিক। বিভিন্ন রাজ্যের শাসন বিভাগে যে সমস্ত ইউরোপীয় কর্মচারী কর্মরত ছিল, তাদের বন্দী দশায় অন্তরীন করে রাখা হয়। স্ট্রেটস সেটেলমেন্টসে জাপানের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হল। মালয় রাজ্যগুলির শাসন কাঠামোতে রদবদল করা হয় নি। কিন্তু জাপানী সামরিক কর্মচারীদের নানা ধরণের নির্দেশে রাজ্যগুলির শাসনযন্ত্র পরিচালিত হতে লাগল। মালয়ের পুলিশ বাহিনীর উপর জাপানী *Kempeitai* এর পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। বন্দর, সামরিক ঘাঁটি এবং বর্মা-থাইল্যান্ড রেলে কাজ করার জন্য বাধ্যতামূলক ভাবে শ্রমিক সংগ্রহ করা হয়েছিল। মালয়ের চীনা শ্রমিকদের প্রতি জাপানীরা অকথ্য নির্যাতন চালাত। তুলনামূলকভাবে মালাই শ্রমিকদের প্রতি তাদের আচরণ ততটা নিষ্ঠুর ছিল না। কিন্তু নানা ধরণের অর্থনৈতিক দুর্দশা মালাই শ্রমিকদের সহ্য করতে হয়েছিল। ভারতীয় শ্রমিকদের দুর্গতি ছিল অবর্ণনীয়। মৌলমিন থেকে ব্যাংকক পর্যন্ত বার্মা-থাইল্যান্ড রেলপথ নির্মাণ করতে প্রায় 60,000 ভারতীয় শ্রমিক নিয়োগ করা হয়েছিল। তাদের মধ্যে 40,000 মৃত্যুবরণ করে এবং যুদ্ধান্তে প্রায় 20,000 ফিরে আসে। একারণে বর্মা-থাইল্যান্ড রেলপথ মৃত্যু রেলপথ (Death Railway) নামে পরিচিত হয়েছিল। ইউরোপীয়দের নানাভাবে অবমাননা করা এবং পাশ্চিমী প্রভাব মালয় থেকে একেবারে নির্মূল করা জাপানী নীতির অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য

ছিল। তাই বিভিন্ন স্থান থেকে অতীত গৌরবের সাক্ষী ঐতিহাসিক স্মৃতি-সৌধ অপসারিত করা হয়। বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীতে ইংরেজির স্থান দখল করল জাপানী ভাষা।

জাপানী শাসনের ফলে মালয় নিদারুণ অর্থনৈতিক সংকটের সম্মুখীন হয়েছিল। রবার ও টিনের উৎপাদন ও রপ্তানির উপর মালয়ের জীবন-যাত্রার মান ছিল নির্ভরশীল। জাপানী আক্রমণের দরুণ টিনখনি ও রবার শিল্পের যন্ত্রপাতির বিস্তর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। যান্ত্রিক ক্ষয়ক্ষতি হয়ত সামাল দেওয়া অসম্ভব নয়। সব চেয়ে বড় কথা হল বিশ্বের রপ্তানি বাজার থেকে মালয় একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। কারণ তখন রবার ও টিন উৎপাদন হত শুধুমাত্র জাপানের প্রয়োজন মত, তার অতিরিক্ত নয়। ইতি-পূর্বে মালয়কে যাবতীয় ভোগ্যপণ্য আমদানি করতে হত। টিন ও রবারের রপ্তানি বাজার সঙ্কুচিত হয়ে পড়লে সেখানে সব রকমের ভোগ্য পণ্য আমদানি যথেষ্ট হ্রাস পেল। খাদ্যদ্রব্য বিশেষ করে চাউলের আমদানিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। জাপানী নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকায় চাউল সুলভ ছিল, কিন্তু যুদ্ধ-কালীন অবস্থায় যান বাহনের অভাব ঘটেছিল। উপযুক্ত বিপণন ব্যবস্থা গড়ে তোলাও সম্ভব ছিল না। এ কারণে সর্বত্র চাউল সরবরাহ করা সম্ভব হয় নি। শহরবাসী, বিশেষ করে শহরের চীনা অধিবাসী, চাউলের অভাবে প্রায়ই দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হয়েছিল। শহর ছেড়ে দূর অরণ্যে বহু চীনা আশ্রয় নেয় এবং সেখানে চাষের কাজে আত্মনিয়োগ করে। বাজারে প্রচুর অনিয়ন্ত্রিত কাগজের নোট ছাড়া হয়। ফলে মুদ্রাস্ফীতি ঘটে এবং সাধারণ অর্থনৈতিক পরিস্থিতি আরও সংকটাপন্ন হয়ে পড়ে। অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের ফলে মালয়ের জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থাও ভেঙে পড়ে। খাদ্যাভাব থেকে দেখা দেয় অপুষ্টি এবং অপুষ্টি থেকে নানা ধরনের দুরারোগ্য ব্যাধি মহামারী আকারে দেখা দেয়।

জাপানীদের সদর দপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সিঙ্গাপুরে। সিঙ্গাপুরকে ভিত্তি করে তারা মালয় ও সুমাত্রার শাসন ব্যবস্থা কেন্দ্রীভূত করার চেষ্টা করেছিল। তাদের এই প্রচেষ্টা অবশ্য সফল হয় নি। 1944 সালে এই পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়। কিন্তু অন্যভাবে পরিকল্পনাটি ফলপ্রসূ হয়েছিল। ইন্দোনেশিয়া ও মালয়কে সংযুক্ত করে একটি বৃহত্তর সমগ্র মালয় (Pan-Malay) আন্দোলনের পথ প্রশস্ত হয়েছিল। 1943 সালে জাপানী কর্তৃপক্ষ মালয়ে আঞ্চলিক সমিতি গঠন করে। আঞ্চলিক সমিতির কিছু সদস্য ছিল জাপানী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনোনীত এবং কিছু গ্রাম প্রধানদের দ্বারা নির্বাচিত। এগুলি ছিল নিছক উপদেষ্টামূলক সমিতি। মালয়ে এমন কোন

রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠী ছিল না, যাকে জাপান সে সময় আপন তাবেদার কিন্তু 'স্বাধীন' রাষ্ট্ররূপে ব্যবহার করতে পারত। এটা বিশেষ তাৎপর্য-পূর্ণ।

জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন মালয়ে নানাভাবে প্রকাশ পেয়েছিল। জঙ্গলে লুক্কায়িত সশস্ত্র বাহিনী জাপানের সমরোপকরণ ধ্বংস করেছে। সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলনের নেতৃত্ব করেছে মালাই জনগণের জাপান-বিরোধী সেনাবাহিনী (Malayan People's Anti-Japanese Army—MPAJA)। এই সংগঠনটি পরিচালনা করত মালয়ের কম্যুনিস্ট পার্টি (MCP)। 1927 সালে মালয় কম্যুনিস্ট পার্টির জন্ম হয়েছিল। এই দলের অধিকাংশ সদস্য ছিল চীনা। গোপন সমিতি (Secret Society) হিসাবে মালয় কম্যুনিস্ট পার্টি কাজ চালাত। সাধারণভাবে খেত খামার, কলকারখানা, ও বন্দরের শ্রমিকদের মধ্যে কম্যুনিস্ট দলের কাজকর্ম সীমাবদ্ধ ছিল। 1941 সালের জুন মাসে জারমান সেনাবাহিনী সোভিয়েট রাশিয়ায় অভিযান চালায়। তখন অর্থাৎ যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে ব্রিটেন ও রাশিয়া ছিল পরস্পরের মিত্র। সোভিয়েট রাশিয়া আক্রান্ত হলে মালয়ের কম্যুনিস্ট পার্টি সর্বশক্তি দিয়ে মিত্রশক্তির পক্ষে জাপান-বিরোধী প্রতিরোধ আন্দোলনে অনন্য ভূমিকা গ্রহণ করে। এই সময় ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষও মালয় কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃবৃন্দের সঙ্গে একটি চুক্তি বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এই চুক্তির শর্তানুযায়ী MPAJA এর সাহায্যে ব্রিটিশ কর্মচারী ও সমরোপকরণ পাঠান হয়। এটা স্থির হয়েছিল যে যুদ্ধের শেষে MPAJA যাবতীয় অস্ত্র ফিরিয়ে দেবে এবং তারা স্বাভাবিক বেসামরিক জীবনে ফিরে যাবে। বলা বাহুল্য MPAJA লোকবলের সাহায্য পেয়েছে এবং বাইরে থেকে খাদ্য বস্ত্র এবং সমরোপকরণের যথোপযুক্ত সরবরাহ পেয়েছে। জাপানী আক্রমণের প্রথম দিকে মালয়ের বনে জঙ্গলে 3000 ছিল যোদ্ধার সংখ্যা। 1950 সালে তা বেড়ে 7,000 হয়েছে।

1945 সালের আগস্ট মাসে অভিশপ্ত আণবিক বোমায় বিধ্বস্ত জাপান আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়। ঐ বছরের সেপ্টেম্বর মাসে মালয়ে ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীর প্রত্যাবর্তন ঘটে। সেখানে পুনরায় ব্রিটিশ সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। একটি আনুষ্ঠানিক সামরিক কুচকাওয়াজ উৎসবে MPAJA ব্রিটিশ সামরিক শাসনের হাতে অস্ত্র সমর্পণ করে। MPAJAকে ভেঙে দেওয়া হল এবং এই সেনাবাহিনীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে সেবার স্বীকৃতি স্বরূপ প্রত্যেকে 350 ডলার করে উপহার পেল। MPAJA এর নেতৃত্ব ও প্রভাব প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ ছিল। বনে জঙ্গলে

ভবিষ্যৎ আন্দোলনে ব্যবহারের জন্য অস্ত্রশস্ত্র তারা লুকিয়ে রেখেছিল। ইতিমধ্যে মালয়ের কম্যুনিস্ট পার্টি আইনগত স্বীকৃতি পেয়েছিল। যুদ্ধের মধ্য দিয়ে সব চেয়ে বেশী শক্তি, মর্যাদা ও গৌরব অর্জন করেছিল কম্যুনিস্ট পার্টি। 1945 সালের নভেম্বর মাসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মালয় জাতীয়তাবাদী দল বা Malay Nationalist Party (MNP)। মালাইদের মুখপত্র হিসাবে ইন্দোনেশীয়গণের উদ্যোগে এই দলের জন্ম হয়েছিল। পরের বছর জন্ম নেয় মালয় গণতান্ত্রিক ইউনিয়ন বা Malay Democratic Union (MDU)। অ-মালাইদের মুখপত্র হিসাবে মালয়বাসী বৃত্তিভোগী চীনাদের উদ্যোগে এই দল প্রতিষ্ঠিত হয়। জাপানী শাসনের অবসানে মালয়ে রাজনৈতিক চেতনা ও আশা আকাঙ্ক্ষা যে খুব তীব্র হয়েছিল, এই দলগুলির জন্ম থেকে তা স্পষ্ট।

জাপানের অধীনে ইন্দোনেশিয়া

1940 সালে জারমানি হল্যান্ডকে যুদ্ধে পরাজিত করে। 1942 সালের 9 মারচ ইন্দোনেশিয়া জাপানের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল। সাম্প্রতিক ইন্দোনেশিয়ার ইতিহাসে জাপানী শাসন নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। এতদিন ধরে ডচ রাজশক্তি ইন্দোনেশিয়ার সনাতন সমাজ ব্যবস্থা বাঁচিয়ে রেখেছিল। ডচ রাজত্বে সেখানে পশ্চিমী সভ্যতার অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। কিন্তু তার ফ'ল ইন্দোনেশিয়ার সমাজ কাঠামো ও সমাজশ্রেণীবিন্যাস বিপর্যস্ত হয় নি। কিন্তু জাপানী শাসনের ফলে সেখানে সমাজ ও অর্থনীতি বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে। জাপানী শাসন ব্যবস্থায় লাগাম ও চাবুক ছিল সামরিক শ্রেণীর হাতে। ইন্দোনেশিয়ায় স্বৈরাচারী সামরিক শাসনের প্রতি কোন ধরণের গণ সমর্থন ছিল না। সমর্থনের প্রত্যাশায় জাপান সেখানে স্থানীয় নেতৃবর্গের দিকে তাকাল। কিন্তু এই নেতৃবর্গ *Priyayi* শ্রেণীভুক্ত নয়। যারা ওলন্দাজ শাসনের বিরোধী অর্থাৎ *Santri* সম্প্রদায় ও জাতীয়তাবাদী দলগুলি, জাপান তাদের দিকেই তাকাল সমর্থনের আশায়। জাপান তাদের স্বায়ত্ত শাসনের প্রতিশ্রুতিও জানাল।

1943 সালের মারচ মাসে জাপান ইন্দোনেশিয়ায় Putera গড়ে তুলেছিল। Putera মানে গণ শক্তি কেন্দ্র। প্রাক্তন জাতীয়তাবাদী সংগঠনগুলি নিয়ে Putera গঠিত হয়েছিল। একই বছরে তারা *Masjumi* গড়ে তোলে। *Masjumi*র অর্থ হচ্ছে ইন্দোনেশিয়ায় মুসলিম সংগঠনগুলির সমিতি।
কর্তৃপ
ছিল জাপ নেশিয়ায় ডচ সরকারের পতনের পর অনেক জাতীয়তাবাদী নেতা জেল
নির্বাচিত। ক্ত পায় এবং অনেকে নির্বাসন থেকে ফিরে আসে। তাদের হাতেই

Puteraর নেতৃত্ব এল। তাদের মধ্যে প্রধান হলেন Sukarno এবং Hatta প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। এত দিন তারা ছিলেন ডচ-বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ। এখন তাদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব জাপানের সামরিক কর্তৃপক্ষের সমর্থনপুষ্ট। রেডিও ও লাউড স্পীকারের মাধ্যমে তাঁদের জাতীয় মুক্তির আহবান এবং রাজনৈতিক মতবাদ দূরদূরান্তর গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছিল। Sukarno এবং Hatta প্রমুখ নেতা এই সব সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়লেন।

Peta নামে একটি ইন্দোনেশীয় স্বেচ্ছাসেবক সেনাবাহিনী জাপানী অফিসারদের তত্ত্বাবধানে সামরিক শিক্ষা লাভ করেছিল। 1945 সালের মাঝামাঝি এই সেনাবাহিনীর সৈন্য সংখ্যা 120,000 ছিল। এই স্বেচ্ছাসেবক সেনাবাহিনীই ভবিষ্যৎ ইন্দোনেশীয় প্রজাতন্ত্রের জাতীয় সেনাবাহিনীর পূর্বসূরী। নিছক যুদ্ধের প্রয়োজনেই জাপান এই সব সংগঠন গড়ে তুলেছিল। কিন্তু Putera ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা অর্জনের দিকেই বেশী করে নজর দিল। বেগতিক দেখে জাপান 1944 সালের মারচ মাসে *Djawa Hokokai* নামে একটি সুনিয়ন্ত্রিত সংগঠন গড়ে তুলল। বিশের দশকের পর জনগণের সঙ্গে ইন্দোনেশীয় রাজনৈতিক নেতাদের সংযোগ একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। এসব সংগঠনের মধ্য দিয়ে পুনরায় তাদের গণ সংযোগ স্থাপিত হল। এই প্রসঙ্গে আর একটি পরিবর্তনও লক্ষণীয়। Putera ও সহযোগী সংগঠনগুলিতে জাপানের সামরিক মানসিকতা সংক্রামিত হয়েছিল। ইন্দোনেশিয়ার পরবর্তী ইতিহাসের ঘটনাবলী এই রণবাদী ঐতিহ্যের সাক্ষ্য বহন করছে।

ইন্দোনেশিয়াকে খুশি করার জন্য জাপান কিছু সুযোগ সুবিধা দেবার চেষ্টা করে। 1945 সালের 7 আগস্ট Sukarnoকে স্বাধীনতা প্রস্তুতি কমিটির চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হয়। ঠিক এক সপ্তাহ পরে জাপান আত্মসমর্পন করে। এই সময় ইন্দোনেশিয়ার জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দের মধ্যে মত বিরোধ দেখা দেয়। Sukarno ও Hatta আশু স্বাধীনতার পক্ষে ছিলেন না। জাপান আত্মসমর্পণ করলেও তখনও ইন্দোনেশিয়াতে জাপানী সেনাবাহিনী ছিল। তাঁদের আশঙ্কা ছিল স্বাধীনতা ঘোষণা করলেই জাপানী সৈন্যদের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধবেই। আপাতত কোন সংঘর্ষে লিপ্ত হতে তাঁরা অনিচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু তরুণ নেতবর্গ তাঁদের সঙ্গে একমত হতে পারেন নি। জাভার প্রধান শহরগুলিতে অনেক গুপ্ত সমিতির ঘাঁটি ও যুদ্ধের নানা আয়োজন তাঁরা কয়েক বছর ধরে গড়ে তুলেছিলেন। জাপানী প্রভাব মুক্ত স্বাধীন ইন্দোনেশিয়া তাঁদের লক্ষ্য ছিল। এই তরুণ দেশপ্রেমিকদের চাপে 1945 সালের 17 আগস্ট Sukarno ও Hatta ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

শাসন ব্যবস্থায় ইন্দোনেশীয় অংশগ্রহণ

ইতিপূর্বে বলেছি 1942 সালের 9 মারচ ইন্দোনেশিয়া জাপানীদের কাছে আত্মসমর্পণ করে। সঙ্গে সঙ্গে ডচ ও অন্যান্য ইউরোপীয়দের অন্তরীন করে রাখা হয়। ইন্দোনেশিয়ায় জাপানী সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। সুমাত্রা এবং জাভা ছিল দুটি পৃথক সামরিক কর্তৃত্বের অধীন। দ্বীপপুঞ্জের অন্যান্য অঞ্চল ছিল জাপানী নৌবিভাগের অধীন।

দক্ষিণাঞ্চল সম্পর্কে জাপানের মূল নীতি ছিল রাজনৈতিক বিচার বিবেচনার চেয়ে অর্থনৈতিক ও সামরিক প্রয়োজনকে বেশী গুরুত্ব দেওয়া। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সমরায়োজনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক বর্জিত অর্থনৈতিক কার্যকলাপ অবহেলিত হল। প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে ও রণনীতির স্বার্থে রাজনৈতিক বিচার বিবেচনা অবশ্য পরে প্রাধান্য পেয়েছিল।

1942 সালের আগস্ট মাসে জাভায় স্থাপিত জাপানী সামরিক প্রশাসন ডচ শাসন পদ্ধতিতে বিশেষ কোন পরিবর্তন সাধন করে নি। শুধুমাত্র উচ্চ-পদের ক্ষেত্রে কিছু কিছু রদবদল করা হয়েছিল। গভর্ণর জেনারেল, সরকারী সচিবালয়, মন্ত্রিপরিষদ, কাউন্সিল অব স্টেট ফর ইনডিজ, *Volksraad* —এই সমস্ত বাতিল করা হল। নতুন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কার্যাদি-করণ, আইন বিভাগ, বিচার বিভাগ এবং প্রশাসনিক কার্যাবলীর যাবতীয় দায়িত্ব গ্রহণ করল সমর প্রশাসনের প্রধান এবং জাভার জাপানী সেনাধ্যক্ষ। তাঁরা ছিলেন টোকিওর সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ যোগসূত্র। সামরিক প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে General Affairs Bureau (***Somubu***) ছিল একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ নীতি নির্ধারক এবং তত্ত্বাবধায়ক সংস্থা। এই সংস্থা এবং প্রচার বিভাগ (***Sendenbu***) ছিল সম্পূর্ণ নতুন সংস্থা। একটি ধর্মীয় সংস্থাও (***Shumubu***) পরে নতুন ভাবে গঠিত হয়।

আঞ্চলিক প্রশাসনের ক্ষেত্রেও কোন বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে নি। পশ্চিম-মধ্য ও পূর্ব জাভার প্রদেশগুলি বাতিল করা হয়। পূর্বের রেসিডেন্সির সমতুল্য নতুন করে 17টি প্রদেশ (***Shu***) গঠন করা হল। মধ্য জাভার চার জন সুলতান বহাল থাকলেন। বটাভিয়ার পুনরায় জার্কাতা নামকরণ হয় এবং এখানে একটি বিশেষ মিউনিসিপ্যালিটি গঠন করা হয়। প্রদেশ-প্রধানের হাতে চাকুরিতে নিয়োগ ও বরখাস্তের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। তাছাড়া স্বতন্ত্রভাবে তিনি আইন চালু করার অধিকারও পেয়েছিলেন। এ দিক দিয়ে

তিনি রেসিডেন্টের চেয়ে বেশী ক্ষমতা পেয়েছিলেন। কিন্তু অন্যান্য ব্যাপারে তাঁকে কেন্দ্রীয় প্রশাসনের উপর নির্ভরশীল করে রাখা হয়েছিল। জাপানী অধিকার-পর্বে এই ছিল ইন্দোনেশিয়ায় মূল শাসন কাঠামো।

1942 সালের 20 মারচ তারিখের একটি আদেশ মত রাজনৈতিক দল এবং রাজনৈতিক সভা সমিতি ও প্রচার কার্য নিষিদ্ধ করা হয়। ইন্দোনেশিয়ার রাজনৈতিক অগ্রগতি নয়, জাভার জাপানীকরণই ছিল জাপানী প্রশাসনের মূল নীতি। 1942 সালের এপ্রিল মাসে, AAA আন্দোলন নামে এক নতুন সাংস্কৃতিক আন্দোলন শুরু করা হয়। জাপান এশিয়ার (A) মুক্তিদাতা, এশিয়ার (A) নেতা এবং এশিয়ার (A) আলোক বর্তিকা, সাংস্কৃতিক আন্দোলনের এটাই ছিল মূল মন্ত্র। প্রতীচ্য সভ্যতার প্রভাবে কলুষিত এশিয়ার আত্মার মুক্তিদাতা রূপে জাপানের ভূমিকা প্রোজ্জ্বল করে দেখান হয়েছিল। এই আন্দোলন ছিল ক্ষণস্থায়ী। ইন্দোনেশিয়ার সাধারণ মানুষ এই আন্দোলনে উৎসাহ বোধ করে নি এবং বুদ্ধিজীবী শ্রেণীও আকৃষ্ট হয় নি।

সরকারী চাকুরিতে ইন্দোনেশীয়গণের অবস্থার বিশেষ হেরফের হয় নি। জাপানীরা প্রথমেই ঘোষণা করেছিল যে অনুগত কর্মচারীদের মান্য করা হবে এবং শাসন কার্যে লিপ্ত জাভার মানুষদের স্ব স্ব পদে রাখা হবে। ডচ কর্মচারীদের অপসারণের ফলে ইন্দোনেশীয়গণের তাৎক্ষণিক লাভ হয় নি, কারণ প্রায় সমস্ত শূন্যপদ জাপানীদের দ্বারা পূরণ করা হয়েছিল। সুপ্রিম কোরটের মাত্র একজন বিচারপতি ছিলেন ইন্দোনেশীয়। জাকার্তা প্রাদেশিক আদালতে 60 জন ও প্রাদেশিক স্তরে অন্যান্য সরকারী পদে আরও 100 জনকে 1942 সালের মে মাসে নিযুক্ত করা হয়েছিল।

1943 সালের জুন মাসে Tojo জাপানের Diet এ ঘোষণা করেন যে মালয়, সুমাত্রা, জাভা, বোর্ণিও ও সেলেবেস এবং বিশেষ করে জাভাতে স্থানীয় অধিবাসীকে বেশী মাত্রায় শাসন কার্যে অংশ নেবার সুযোগ দেওয়া হবে।

1943 সালের 5 সেপ্টেম্বর এই উদ্দেশে কিছু প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ঘোষণা করা হয়। এক ধরণের উপদেষ্টা পদ্ধতি চালু হয়েছিল। বিভিন্ন সরকারী বিভাগে উপদেষ্টা হিসাবে নিযুক্ত হয়েছিল ইন্দোনেশীয় কর্মচারী। ৪টি প্রদেশের প্রত্যেকটিতে উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হয়েছিল এবং সেগুলিতে ভাইস-গভর্ণর নিয়োগ করা হয়। তাছাড়া প্রত্যেকটি প্রদেশের জন্য একটি আঞ্চলিক পরিষদ, জাকার্তার বিশেষ পৌর-প্রতিষ্ঠানের একটি অনুরূপ

পরিষদ এবং সমস্ত জাভার জন্য একটি কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হয়েছিল। 10 থেকে 30 জন সদস্য বিশিষ্ট আঞ্চলিক পরিষদের সভ্যদের অর্ধেক মনোনীত করতেন গভর্ণর এবং বাকী অর্ধেককে গ্রামপতিরা নির্বাচিত করতেন। সাধারণত তাদের কাজ ছিল গভর্ণরের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া এবং তাদের কাছে প্রেরিত বিষয়গুলির উপর মতামত জানানো। প্রায় একই সময়ে অনুরূপ আঞ্চলিক পরিষদ সুমাত্রা, বোর্ণিও, মালয় এবং সেলেবেসে গঠিত হয়েছিল। জাভা ছিল জাপানীদের মতে অগ্রসর অঞ্চল। একারণে কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পরিষদ শুধুমাত্র জাভার জন্যই গঠন করা হয়।

5 সেপ্টেম্বরের আদেশ অনুসারে জাভায় 43 জন্য সদস্য বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হয়। তাদের মধ্যে 23 জন ছিলেন প্রধান সেনাধ্যক্ষ কর্তৃক নিযুক্ত, 18 জন আঞ্চলিক পরিষদগুলির দ্বারা নির্বাচিত এবং 2 জন সুলতানদের দ্বারা নিযুক্ত। প্রধান সেনাধ্যক্ষের হাতে এত বেশী ক্ষমতা দেবার অর্থই হল শুধুমাত্র জাপানী সমর্থকদের সংখ্যা গরিষ্ঠতাই নয়, চীনা এবং অন্যান্য ধর্মীয় সংগঠনের উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব বজায় রাখা। কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা সমিতিতে যারা নিযুক্ত হয়েছিলেন, তাদের মধ্যে ছিলেন 3 জন চীনা, Agus Salim এবং Mansur এর মত মুসলমান নেতা এবং Hatta, Dewantara এবং Subardjo প্রমুখ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ। Sukarno ছিলেন কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পরিষদের চেয়ারম্যান। সামরিক প্রশাসন বিভাগে 7 জন ইন্দোনেশীয়কে নিযুক্ত করা হয়েছিল। General Affairs Department এ Sukarno, শিক্ষাবিভাগে Dewantara, বিচার বিভাগে Raden Supomo এবং প্রচার দপ্তরে Dr Yamin নিযুক্ত হয়েছিলেন। তাছাড়া ধর্ম সংক্রান্ত দপ্তর এবং শিল্প ও পূর্তবিভাগেও ইন্দোনেশীয়দের নিয়োগ করা হয়। দু'জন প্রাদেশিক গভর্ণর ছিলেন জাভার মানুষ।

একথা সত্য প্রকৃত ক্ষমতা সম্পন্ন কোন পদই ইন্দোনেশীয়দের দেওয়া হয় নি। দেশীয় দু'জন গভর্ণরের সঙ্গে দু'জন জাপানী সহকারী-গভর্ণর নিযুক্ত করা হয়েছিল। ইতিমধ্যে Putera ভেঙ্গে দেবার ফলে জাতীয়তাবাদী ইন্দোনেশীয়রা হতাশ হয়ে পড়ে। কারণ Puteraই ছিল তাদের কাজ কর্মের মূল হাতিয়ার। জাপানীদের যুক্তি ছিল গ্রাম স্তর পর্যন্ত Puteraর সংগঠন বিস্তৃত হয় নি। তাই তা ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে। Puteraর পরিবর্তে তারা গড়ে তুলেছে *Hokokai* অর্থাৎ দেশপ্রেমিক সেবা সমিতি। আসল কথা হল Puteraকে জাপানীরা বেশী মাত্রায় জাতীয়তাবাদী মনে করত। বর্তমান পরিস্থিতিতে 'বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ' ব্যাপারে কোন ঝুঁকি নিতে তারা প্রস্তুত ছিল না।

নভেম্বর মাসে প্রধান সেনাধ্যক্ষ প্রাদেশিক সহকারী-গভর্ণরের নতুন পদ সৃষ্টি করেন এবং এই সব পদে 11টি নিয়োগের কথা বলা হয়। 1944 সালের শেষের দিকে জাভার জাপানী সামরিক প্রশাসন বহু উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীকে নিষ্ঠাহীন আখ্যা দিয়ে অপসারিত করে। প্রবীন এই সব কর্মচারীদের স্থান দখল করে নতুন প্রজন্মের মানুষ, যারা *Hokokai* এর মত যুদ্ধকালীন সংগঠনের মধ্য দিয়ে নেতৃত্ব অর্জন করেছিল। ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁদের উজ্জ্বল ভূমিকা ছিল।

1945 সালের 6 মার্চ জাভার প্রধান সেনাধ্যক্ষ ঘোষণা করেন যে ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা অর্জনের পথে আরও তিনটি পদক্ষেপ নেওয়া হবে। প্রথমত, স্বাধীনতার প্রস্তুতির জন্য একটি অনুসন্ধান সমিতি গঠন করা হবে। দ্বিতীয়ত, একটি জাতীয় শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানও গঠন করা হবে। তৃতীয়ত, স্বাধীনতার অনুকূলে জনমত উৎসাহিত করা হবে। স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুতির সমস্যা পর্যালোচনা করা এবং এই উদ্দেশ্যে জাভার জনগণ ও সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে সহযোগিতা গড়ে তোলাই হবে অনুসন্ধান সমিতির মূল কাজ।

7 আগস্ট সাইগনের জাপানী সেনাধিপতি Marshal Terauchi স্বাধীনতার প্রস্তুতি সমিতি (*Dokuritsu Jumbi Lin*) গঠন সংক্রান্ত একটি নির্দেশ জারী করেন। এই নির্দেশের মূল বক্তব্য নিচে দেওয়া হল।

1. স্বাধীনতার প্রস্তুতির জন্য একটি কমিটি গঠন করা হবে। 2. নতুন স্বাধীন রাষ্ট্রে পূর্বের নেদারল্যান্ড ইসট ইনডিজের সমস্ত অঞ্চল অন্তর্ভুক্ত করা হবে। 3. প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হওয়া মাত্র স্বাধীনতার দিন জাপান সরকারের ইচ্ছানুসারে ঘোষণা করা হবে। 4. প্রথমে যে দ্বীপে প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হবে, সেই দ্বীপেই নতুন সরকার স্থাপিত হবে এবং অন্যান্য দ্বীপে প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হলে সেখানে ক্রমে স্বাধীনতা প্রসারিত হবে। 5. জাপানের যাবতীয় সামরিক দাবি মেটান হবে। 6. Sukarno কমিটির চেয়ারম্যান নিযুক্ত হলেন। স্থির করা হল যে এই কমিটি জাভার বাইরের অঞ্চলের প্রতিনিধি বৃন্দকে অন্তর্ভুক্ত করবে। কমিটির সদস্যগণ আঞ্চলিক জাপানী সামরিক সেনাপতিদের দ্বারা নিযুক্ত হবেন।

14 আগস্ট জাপান মিত্রপক্ষের কাছে আত্ম-সমর্পণ করে। এর পর ঘটনা দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলে। যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে শাসন দপ্তরে ইন্দোনেশীয়দের সংখ্যা বিপুল বৃদ্ধি পায়। কেন্দ্রীয় এবং আঞ্চলিক শাসন কাঠামোতে কার্যাধিকরণের পদগুলি তাদের দেওয়া হয়। যুদ্ধের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত নয়, এমন সব পদই তারা পেয়েছিল।

এখন প্রশ্ন তোলা যেতে পারে, জাপানী অধিকার পর্বে শাসন ব্যবস্থায় ইন্দোনেশীয়গণের অংশ গ্রহণ কি ফলপ্রসূ হয়েছিল ? আপাত দৃষ্টিতে উত্তর হচ্ছে, ফলপ্রসূ হয় নি। কারণ ইন্দোনেশীয়গণ ছিলেন মূলত উপ-দেষ্টা। তাদের ক্ষমতা ছিল নামমাত্র। এমন কি যে সব ক্ষেত্রে তাদের সামান্য ক্ষমতা ছিল, সেখানেও ক্ষমতা প্রয়োগ সম্ভব হয় নি। কারণ জাপানী সহযোগীরা তাদের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করত। ইন্দোনেশীয় জাতীয়তাবাদীদের সহযোগিতার পথ ছিল মন্থর, সর্পিল ও অসম্পূর্ণ, কিন্তু তা বলে একেবারে নিষ্ফল নয়। স্বয়ং Hatta স্বীকার করেছেন, 'জাপানীদের অধীনেই আমরা আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের পরিকল্পনা স্থির করেছিলাম। 17 আগস্ট যখন শেষ জাপানী আত্মসমর্পণ করল, আমরা আমাদের স্বাধীনতা ঘোষণা করলাম।.. দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় জাপানী শাসনের প্রভাব ছিল গুরুত্বপূর্ণ। ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা অর্জন তরান্বিত করার কাজে জাপানীরা পশ্চিমীদের চেয়ে অনেক বেশী অগ্রণী ছিল।'

ইন্দোনেশিয়ায় শাসনকার্যের জটিলতা বিদেশী জাপানীদের বোধগম্য ছিল না। ফলে ইন্দোনেশীয় কর্মচারীর উপর তাদের নির্ভর করতে হত। এই সুযোগে ইন্দোনেশীয় কর্মচারীরা প্রশাসনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করে। কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা হল তারা পেয়েছিল নতুন আত্মপ্রত্যয় ও ক্ষমতা লিপ্সা।

রাজনৈতিক নেতাদের উপযুক্ত শিক্ষণের জন্য জাপানীরা বিশেষ বিদ্যালয় স্থাপন করেছিল। জাভার জেলা প্রধানদের জাকার্তায় এনে তিন সপ্তাহের শিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। এখানে শেখান হত জাপানের ইতিহাস, জাপানী ভাষা, প্রাচ্যের ইতিহাস এবং বৃহত্তর পূর্ব এশিয়া যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি। জাকার্তার আর একটি বিশেষ শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে শুধুমাত্র ভাষা আর ইতিহাস নয়, কৃষি ব্যবস্থা, রণনীতি ও প্রতিরক্ষার আয়োজনও শেখান হত। কাজী ও উলেমাদের শিক্ষণের জন্যও জাকার্তায় একটি বিশেষ সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ইন্দোনেশীয় সমাজে কাজী ও উলেমাদের পরম্পরাগত নেতৃত্বের ভূমিকা সম্পর্কে জাপানী শাসক গোষ্ঠী সচেতন ছিল।

যুদ্ধের সময় বিদেশী ছাত্রদের সুশিক্ষিত করে গড়ে তোলার জন্য জাপানে আমন্ত্রণ জানান হত। তাদের নানা ধরণের শিক্ষা দেবার জন্য সেখানে গড়ে উঠেছিল আন্তর্জাতিক ছাত্র প্রতিষ্ঠান। জাপানের বিদেশ দপ্তরের যুদ্ধকালীন প্রতিবেদন থেকে জানা যায় জাপানে শিক্ষাপ্রাপ্ত বিদেশী ছাত্রসংখ্যা ছিল এই রকম :

বর্মা	47	সেলেবেসে	11
ফিলিপাইন	51	বোর্ণিও	9
জাভা	44	সেরাম	3
সুমাত্রা	16	শ্যাম	12
মালয়	12	ফরাসী ইন্দোচীন	7

বিদেশী ছাত্রবা কিন্তু জাপানে গিয়ে হতাশ হয়েছিল। তারা বিজ্ঞান-চর্চার পরীক্ষাগারে প্রবেশের অনুমতি পায় নি। কলকারখানা দেখার কোন সুযোগ তাদের মেলে নি। আধুনিক প্রযুক্তি বিদ্যায় তারা জ্ঞান লাভ করতে পারে নি। এমন কি জাপানের যে ইতিহাস তাদের পড়ান হত, তার অধিকাংশই হল জাপানের গৌরব গাঁথা ও অতিকথনদুষ্ট পৌরাণিক কাহিনী। তাদের উপর সর্বদা জাপানী পুলিশ সতর্ক নজর রাখত। তাদের চিঠিপত্র খোলা হত, ঘরে তল্লাসী চালান হত- এবং পারস্পরিক সৌজন্যমূলক দেখা সাক্ষাতের উপরও নানা বিধিনিষেধ ছিল। জাপানী সামরিক প্রশাসনের এই নীতি ব্যর্থ হয়। জাপানের মানুষের সঙ্গে অবাধ মেলামেশার সুযোগ পেলে বিদেশী ছাত্ররা জাপানকে ভালবাসতে পারত। অন্তহীন বক্তৃতা দিয়ে মানুষের মনে ভালবাসা সৃষ্টি করা যায় না। শিল্প, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যায় জাপানের অগ্রগতির চাক্ষুষ পরিচয় পেলে জাপানের প্রাধান্য সম্পর্কে তারা দৃঢ়নিশ্চয় হতে পারত। কাল্পনিক ইতিহাস পাঠ প্রত্যক্ষ পরিচয়ের বিকল্প নয়।

জাতীয় ঐক্য

জাভা ও ইন্দোনেশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলের মধ্যে বিপুল পার্থক্য জাপানী শাসকদের দৃষ্টিগোচর হয়েছিল। তাদের মতে জাভার সমাজ ছিল সম প্রকৃতি বিশিষ্ট। কিন্তু অন্যান্য অঞ্চলের বিকাশ ছিল অসম। ইন্দোনেশীয় জনগণ, ইন্দোনেশীয় জাতীয়তাবোধ বা ঐক্যবদ্ধ ইন্দোনেশিয়া, এসব কথা ছিল একান্তই নিরর্থক। জাপানী সামরিক শাসক গোষ্ঠী এই সব ধারণা পোষণ করত বলে তারা সেখানে প্রকৃত ঐক্যবদ্ধ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের গতি প্রতিহত করতে চেয়েছিল। এই উদ্দেশ্য নিয়েই তারা ইন্দোনেশিয়ার শাসনতান্ত্রিক বিভাজন রচনা করেছিল। এসব সত্ত্বেও জাতীয় সংহতি সৃষ্টিতে ও ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণে জাপানী প্রশাসনের সুনির্দিষ্ট অবদান ছিল।

প্রশাসনিক সুবিধার জন্য ইন্দোনেশিয়াকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়।

জাভা ও মাদুরা ছিল 16th Armyর শাসনাধীনে। তাদের সদর দপ্তর ছিল জাকার্তা। সুমাত্রা ও মালয় ছিল 25th Armyর শাসনাধীনে। তাদের সদর দপ্তব ছিল সিঙ্গাপুর। উভয় সেনা বিভাগ ছিল 7th Area Armyর অধীনে। এক্ষেত্রেও সদর দপ্তর সিঙ্গাপুর। 7th Area Army ছিল Southern Area Army Command এর সেনাধ্যক্ষ Marshal Terauchiর অধীনে। শেষোক্ত সংগঠনের সদর দপ্তর ছিল ইন্দোচীনের সাইগনে।

সেলেবেস, বোর্ণিও, এবং বলিদ্বীপ থেকে মাকাসার প্রণালী পর্যন্ত অন্যান্য দ্বীপপুঞ্জ ছিল নৌবাহিনীর অধীনে। নৌবাহিনীর সদর দপ্তর ছিল মাকাসার। সহজেই অনুমেয় শাসন কাঠামোর দিক দিয়ে এই ধরণের ব্যবস্থায় ঐক্যবদ্ধ ইন্দোনেশিয়া গড়ে ওঠা সম্ভব ছিল না। সুমাত্রা ও মালয়ের যুগ্ম শাসনব্যবস্থা ইন্দোনেশিয়াকে বিভক্ত করার অভিপ্রায়ে সৃষ্টি হয়েছিল। মালয়-সুমাত্রার যোগাযোগ আশানুরূপ গড়ে ওঠে নি। তাই 1944 সালে সুমাত্রায় স্বতন্ত্র সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠা করা হয়।

7th Area Armyর 1944 সালের 7 সেপ্টেম্বরের একটি নির্দেশে বলা হয় যে জাতীয় চেতনা জাগ্রত করতে হবে, জাতীয় পতাকা এবং জাতীয় সঙ্গীতের ব্যবহার এবং জাতীয়তাবাদী বক্তৃতা ও কার্যকলাপ উৎসাহিত করতে হবে। শুধুমাত্র জাভা বা সুমাত্রার স্বাধীনতা নয়, অখণ্ড ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা প্রচার করতে হবে। জাভার সংবাদপত্রগুলিতে Hattaব—'এক দেশ, এক জাতি, এক ভাষা' এই বক্তব্য প্রচার শুরু হল। জাতীয় সংহতির সহায়ক রূপে ইন্দোনেশিয়ার ভাষা সমাদৃত হল।

জাপানের রণনায়কগণ জাপানী ভাষাকে সমগ্র এশিয়ার যোগসূত্ররূপে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। তারা ভেবেছিলেন যে জাপানী ভষার মাধ্যমে জাপানী সভ্যতার আশীর্বাদ এশিয়ার অনগ্রসর অঞ্চলের মানুষকে আলোকিত করবে। এই উদ্দেশ্যে প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে তারা ডচ ও অন্যান্য পশ্চিমী ভাষার সরকারী ব্যবহার নিষিদ্ধ করেন। সরকারী ভাষা হিসাবে ডচ ভাষার স্থান দখল করে জাপানী ও ইন্দোনেশীয় ভাষা। কিন্তু জাপানী ভাষা ইন্দোনেশিয়ার মানুষ জানত না। সুতরাং স্বাভাবিক ভাবেই ইন্দোনেশীয় ভাষা গুরুত্ব পায়।

প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্তরে জাপানী ভাষাকে অবশ্যপাঠ্য করা হয়। জাপানী ভাষা শিক্ষণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হল। গণ সংযোগ মাধ্যমগুলি জাপানী ভাষা প্রচারে উদ্যোগ নিল। এসব সত্ত্বেও জাপানী ভাষার প্রচার আশানুরূপ হয় নি। এর কারণ হল শিক্ষণ কাল ছিল দু-

সপ্তাহ বা এক মাস। ভাষা শিক্ষা নিতেন শিক্ষক ও সরকারী কর্মচারীরা। কিন্তু জাতীয় ভাষা হিসাবে ইন্দোনেশীয় ভাষার বিকাশে তারা ছিলেন উৎসাহী।

ইন্দোনেশীয় ভাষার বিকাশ ও প্রসার ছিল অব্যাহত। জাতীয় বিদ্যালয় ছাড়াও এই ভাষার প্রসারের জন্য বিশেষ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হল। সামরিক সংগঠন ও বিদ্যালয়ের উদ্যোগে ইন্দোনেশীয় ভাষা উৎসাহিত হল। 1944 সালের অকটোবর মাসে ইন্দোনেশীয় ভাষা কমিশন গঠিত হয়। এই কমিশনে Sukarno ও Hattaর মত রাজনৈতিক নেতা এবং অনেক সাহিত্যিক সদস্য ছিলেন। এই কমিশন বেশ কয়েক হাজার পরিভাষা সৃষ্টি করে। এগুলির মধ্যে অনেকগুলি ছিল বৈজ্ঞানিক পরিভাষা।

জাপানী উদ্যোগে গণসংযোগ মাধ্যমগুলিও ইন্দোনেশীয় ভাষার প্রচলন উৎসাহিত করে। ডচ পত্রিকাগুলি বন্ধ হয়ে যায়। ইন্দোনেশীয় সংবাদ-পত্রের প্রচার 40,000 থেকে 68,000 এ পৌঁছায়। যে দেশে 90 শতাংশ লোক অশিক্ষিত, সেখানে সংবাদপত্রের চেয়ে রেডিওর ভূমিকা অনেক বেশী কার্যকরী। 1944 সালে সুমাত্রার সামরিক প্রশাসন প্রতি শহরে ও গ্রামে রেডিও সরবরাহ করেছে। প্রতি তিন হাজার অধিবাসীর জন্য অন্তত একটি রেডিও এই ছিল তাদের বিঘোষিত লক্ষ্য। তাছাড়া স্কুলে, পার্কে এবং শহরে রাস্তার মোড়ে মোড়ে তারা রেডিও স্থাপন করেছিল। প্রতিদিন সুরবায়া রেডিও স্টেসনে মাদুরিজ ভাষাতে প্রচারকার্য চালান হয়েছে। রেডিও ও সংবাদপত্র মাধ্যমে শুধুমাত্র ইন্দোনেশীয় ভাষা উৎসাহিত হয়েছে, তা নয়। Sukarno, Hatta, Dewantara প্রমুখ নেতৃবৃন্দের দেশাত্মবোধক বক্তৃতা সমস্ত ইন্দোনেশিয়া জুড়ে দূর দূরান্তরে পৌঁছে গেছে।

গ্রামে গ্রামান্তরে মুখে মুখে প্রচারকার্য চালাবার জন্য জাকার্তায় তরুণ ইন্দোনেশীয়দের শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল। ভ্রাম্যমান যাত্রা নাটক গোষ্ঠীও গ্রামে গ্রামে প্রচার চালিয়েছে।

ইতিপূর্বে পশ্চিমীকরণের জন্য ইন্দোনেশিয়ায় পরম্পরাগত জীবনে রূপান্তর শুরু হয়েছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে নতুন কর্মোদ্যোগ, ভিন্ন দেশের মানুষের সঙ্গে নতুন পরিচয় এবং জ্ঞানচর্চার নতুন প্রাঙ্গন উন্মুক্ত হবার ফলে সেখানে ঐতিহ্যাশ্রয়ী সমাজ ভেঙ্গে পড়ে। ডচদের পরাজয়ের অর্থই হল সনাতন ব্যবস্থার অবসান। যুদ্ধের ফলে বাণিজ্য ব্যাহত হয়েছে। পশ্চিমীদেরকে অন্তরীন করে রাখা হয়েছে। তাই রোপণ অর্থনীতি তখন ধ্বংসের মুখে। যুদ্ধের জন্য জাহাজ পরিবহন ব্যবস্থায় অচলাবস্থা দেখা

দেয়। তেল, রবার এবং চিনি প্রভৃতির রপ্তানি এবং বস্ত্রের মত নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের আমদানি আর সম্ভব হচ্ছিল না। বেকার সমস্যা এবং দারিদ্র্য ছিল ক্রমবর্ধমান। মানুষ গ্রাম ছেড়ে শরণার্থী হয়ে শহরে আসে। অদের চিরাচরিত জীবনযাত্রায় রূপান্তর ঘটে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অধিকৃত অঞ্চলে জাপান নানা ধরণের সংগঠন গড়ে তোলে। এগুলির মধ্যে অন্যতম প্রধান হল প্রতিবেশী সংস্থা (*Tonari Gumi*) এবং দেশপ্রেমী সেবা প্রতিষ্ঠান (*Hokokai*)। প্রতিবেশী সংস্থায় প্রতি 20টি বাড়ি নিয়ে গঠিত হয়েছিল একটি দল (*Kumi*)। দলের নেতা ছিলেন ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা নিযুক্ত। অন্যান্য কাজের মধ্যে তাঁর অতিরিক্ত দায়িত্ব ছিল জাপানের মূল লক্ষ্য ও কার্যাবলীর সঙ্গে তাঁর নিজস্ব দলের পরিচয় করিয়ে দেওয়া। সামরিক প্রশাসন ও সাধারণ মানুষের মধ্যে তিনি ছিলেন যোগসূত্র। তাছাড়া আগুন লাগলে তা নেবানো, বিমান আক্রমণের সময় প্রতিরক্ষা এবং আইন শৃঙ্খলার তত্ত্বাবধানও তাকে করতে হত। গ্রামাঞ্চলে খাদ্য উৎপাদন ও বন্টনেও তার দায়িত্ব ছিল।

দেশপ্রেমী সেবা প্রতিষ্ঠানও অনুরূপে দায়িত্ব পেয়েছিল। জনস্বাস্থ্য, চরিত্র গঠন, পশ্চিমী প্রভাব নির্মূল করা, মিতব্যয়িতা অভ্যাস করা ইত্যাদি নানা ধরণের কাজ এই সংগঠনের উপর অর্পিত হয়েছিল। কলকারখানায় শ্রমিকের কাজ এবং খেতখামারে নতুন শস্য চাষ তাদের করতে হয়েছে। প্রতিবেশী সংস্থা এবং দেশপ্রেমী সেবা প্রতিষ্ঠান জনপ্রিয় হতে পারে নি। জাপানের আত্মসমর্পণের সঙ্গে সঙ্গেই এই দুটি বিলুপ্ত হয়ে যায়। একটি বিষয়ে এই দুটি সংস্থার অবদান ছিল অবিস্মরণীয়। বরাবরই ইন্দোনেশিয়ায় শহরের কেন্দ্রীয় সরকার ও গ্রামের আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষের মধ্যে ব্যবধান ছিল দুস্তর। প্রতিবেশী সংস্থা এবং দেশপ্রেমী সেবা প্রতিষ্ঠান এই ব্যবধান হ্রাস করতে পেরেছিল।

দেশপ্রেমী সেবা প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য 'Shock Brigades' গঠন করা হয়। Sukarno ছিলেন Shock Brigades এর অধিনেতা। এক জাতি ও এক ভাষার মন্ত্রে স্বাধীন সার্বভৌম ইন্দোনেশিয়ার প্রতিষ্ঠা ছিল এই সব প্রতিষ্ঠানের মূল আদর্শ। এগুলির কাজ কর্মের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চল ও নানা ধরণের সামাজিক পরিবেশ থেকে আগত মানুষ পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের সুযোগ পেয়েছিল।

1943 সালে গঠিত হয়েছিল যুব বাহিনী (*Seinen dan*)। 14 থেকে 25 বছর বয়স্ক তরুণরা এখানে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে যোগ দিয়েছিল।

জাকার্তায় তাদের জন্য একটি কেন্দ্রীয় শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান এবং প্রতি প্রদেশে একটি করে শিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল। সামরিক কুচকাওয়াজ, শরীর-চর্চা, জাপানী ভাষা ও সংগীত শিক্ষা ছাড়াও যুববাহিনীর সদস্যরা কৃষিখেতে ও শিল্পকারখানায় কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা লাভ করেছিল।

ইন্দোনেশিয়ায় জাতীয় শিক্ষা প্রসারের পরিকল্পনা জাপানী সামরিক কর্তৃপক্ষ ভেবেছিল। অধিকৃত অঞ্চল পশ্চিমী প্রভাব দূর করার জন্য তারা প্রথমেই সমস্ত বিদ্যালয় বন্ধ করে দেয়। ডচ শিক্ষকদেরও বিতাড়িত করা হয়। 1942 সালের শেষের দিকে মাত্র কয়েকটি বিদ্যালয় খোলা হয়। সেখানে ইন্দোনেশীয় ভাষায় সংশোধিত পাঠ্য পুস্তক পড়ান হত। জাপানীরা অবৈতনিক জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে। সর্বত্র পাঠসূচী ছিল একই রকম। জাপানী বিষয়সূচী ও শরীর চর্চা বিশেষ গুরুত্ব পায়। 1943 সালে শিক্ষার সর্বস্তরে সামরিক শিক্ষা চালু করা হয়। অধিকাংশ প্রাইভেট স্কুল বন্ধ হয়ে যায়। অনেক সম্পন্ন পরিবার আর্থিক দুর্গতির সম্মুখীন হয়েছিল। ফলে তারা অবৈতনিক জাতীয় বিদ্যালয়ে তাঁদের সন্তানদের পাঠাতে শুরু করে। নিরক্ষরতা দূরীকরণে জাপানীদের আগ্রহ ছিল। এ সব কারণে যুদ্ধকালীন ইন্দোনেশিয়ায় বিশেষ করে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার অভাবনীয় প্রসার ঘটেছে।

॥ 14 ॥

স্বাধীন মালয়েশিয়া ফেডারেশন

জাতীয় মুক্তি আন্দোলন

দুটি বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী কালপর্বে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন রাজ্যে জাতীয়তাবাদের সর্বাত্মক উন্মেষ ঘটেছিল। কিন্তু মালয়ে এ সময় রাজনৈতিক দাবি হিসাবে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন বিকশিত হয় নি। পশ্চিমী শিক্ষায় শিক্ষিত মুষ্টিমেয় কয়েকজন মালয়বাসী পশ্চিমী ধ্যানধারণামত গণতন্ত্র, স্বাধীনতা ও উদারনৈতিক ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু নানা কারণে বিচ্ছিন্ন মুষ্টিমেয় মানুষের আদর্শ চেতনা ব্যাপক ও সংগঠিত গণআন্দোলনে রূপায়িত হয় নি।

মালয় ছিল অনেকগুলি রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক ভাগে বিভক্ত। সেখানে কমপক্ষে এগারটি রাজ্য ছিল। এই এগারটি রাজ্যের মধ্যে সর্বসম্মত ঐকমত গড়ে তোলা সহজ ছিল না স্ট্রেটস সেটেলমেন্টস বাদে মালয়ের অন্যান্য অংশ প্রত্যক্ষভাবে ব্রিটিশ শাসনাধীন ছিল না। বিভিন্ন রাজ্য বা রাজ্যগোষ্ঠী ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে নানা স্তরের সম্বন্ধে চুক্তিবদ্ধ ছিল। অ-যুক্তরাষ্ট্রীয় রাজ্যগুলি ফেডারেটেড মালয় স্টেটসের যুক্তরাষ্ট্রীয় বন্ধন সম্বন্ধে সন্দিহান ছিল। ভারতবর্ষ, ইন্দোনেশিয়া, বর্মা ও ইন্দোচীনে বিদেশী শাসন ছিল দীর্ঘস্থায়ী। স্ট্রেটস সেটেলমেন্টসের কথা বাদ দিলে, মালয়ের অন্যান্য অঞ্চলে ব্রিটিশ শাসনের ইতিহাস তুলনামূলক বিচারে সাম্প্রতিক বললেই চলে। 1874 সালে তা শুরু হয়েছে। 1890 সালের পূর্বে মধ্য মালয়ের চার রাজ্যে তা প্রসারিত হয় নি। 1909 সালের পর বিভিন্ন তারিখে উত্তর মালয়ের চার রাজ্য ইংরেজদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। 1914 সালে জোহোরের সুলতান সর্বপ্রথম একজন ব্রিটিশ সাধারণ উপদেষ্টা (General Adviser) গ্রহণ করেন।

অন্যান্য কারণেও জাতীয়তাবাদের উন্মেষে বিলম্ব ঘটেছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর এবং 1930 এর দশকে বাণিজ্যিক মন্দার কথা বাদ দিলে আলোচ্য কালপর্বে মালয়ে অভাবনীয় আর্থিক সমৃদ্ধি ঘটেছে। 1931 সাল পর্যন্ত

ব্যাপক হারে মালয়ের জনসংখ্যা বেড়েছে। কিন্তু বর্ধিত জনসংখ্যার অধিকাংশই মালয়ে অস্থায়ী ভাবে বসবাস করেছে। ফলে মালয়ের প্রতি তাদের মমতা, সহানুভূতি ও আনুগত্য গড়ে ওঠে নি। রাজনীতি সচেতন প্রবাসী চীনারা ছিল চীনমুখী, মনে মনে ও কাজের মধ্য দিয়ে তারা চীনের কুয়োমিনটাং দলকে সমর্থন ও সাহায্য করেছে। মুষ্টিমেয় চীনারা অবশ্য বে-আইনী মালয় কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য হয়েছে। মালয়ের প্রবাসী ভারতবাসীও মালয়কে স্বদেশ ভাবতে পারে নি। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতি তাদের আকর্ষণ ছিল দুর্বার, আনুগত্য ছিল প্রশ্নাতীত। শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান মালাইদের জন্য উচ্চপদের সরকারী চাকুরীর সুযোগ ছিল অবাধ। সমর্থ ও যোগ্য মালাইরা শাসন কাজে অংশ গ্রহণের সুযোগ পেয়েছিল বলেই তাদের মধ্যে অসন্তোষ দানা বেঁধে উঠতে পারে নি। সাধারণভাবে সেখানে জীবনযাত্রার মান ছিল উন্নত, সরকারী শাসন ছিল দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ও সুসংহত। আমূল পরিবর্তন ও সংস্কারের জন্য আকাঙ্ক্ষা ধ্বনিত হয় নি এবং ব্যাপক রাজনৈতিক চাপও সৃষ্টি হয় নি।

এ কথা বিস্ময়কর হলেও সত্য যে মালয় জাতীয়তাবাদের উৎস সন্ধানে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে চীনের মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাসে। সান ইয়াৎ-সেন পরিচালিত মুক্তি আন্দোলনে বিপুল অর্থ সাহায্য জুগিয়েছে মালয়ে প্রবাসী চীনা সম্প্রদায়। 1911 সালের পর চীনা প্রজাতান্ত্রিক সরকারও প্রবাসী চীনাদের আর্থিক অনুদানের উপর অনেকখানি নির্ভর করেছে। মালয়ে চীনা কুয়োমিনটাং দলের শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। চীনা জাতীয়তাবাদের প্রতীক ব্যক্তিত্ব হিসাবে সান ইয়াৎ সেনকে নিয়ে মালয়ে প্রবাসী চীনাদের গর্বের অন্ত ছিল না।

সব চীন সরকারের দৃষ্টিতেই সমস্ত প্রবাসী চীনা চীনের নাগরিক। এমন কি বিদেশে যাদের জন্ম হয়েছে তারাও। মালয়ে চীনা পরিবারে যাদের জন্ম হয়েছে, তাদেরকেও চীনা সরকার চীনা নাগরিকই মনে করত। স্ট্রেটস সেটেলমেন্টসে এবং মালয় রাজ্যগুলিতে এই নীতির প্রতিক্রিয়া ছিল ভয়বহ।

1920র দশকে মালয়ে কুয়োমিনটাং দল প্রকাশ্যেই ব্রিটিশ বিরোধী ভূমিকা নিয়েছে। চীনা বিদ্যালয়গুলি ছিল তাদের প্রধান প্রচার কেন্দ্র। 1927 সালে চীনে কমিউনিস্ট দল ও কুয়োমিনটাং দলের মধ্যে কলহ শুরু হলে মালয়ে চীনা জাতীয়তাবাদী প্রচার কার্যে ভাটা পড়ে। 1931 সালের পর চীনের বিরুদ্ধে জাপানী আগ্রাসী নীতি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। তার ফলে মালয়ে

চীনা সম্প্রদায়ের ভূমিকা নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে। ব্রিটিশ-বিরোধী জাতীয়তাবাদের বাণী তখন প্রচার করা সম্ভব হচ্ছিল না। চীনে 1930 এর দশকে এবং বিশেষ করে 1937 সালে চীন-জাপান যুদ্ধ শুরু হলে জাপান-বিরোধী জাতীয় আন্দোলন উত্তাল হয়ে ওঠে। তখন জাপানের সঙ্গে বাণিজ্য ছিন্ন হয়েছে এবং জাপানী জিনিস চীন বয়কট করেছে। চীনের আভ্যন্তরীণ সঙ্কটের জন্যই মালয়ে চীনাদের রাজনৈতিক কার্যকলাপ প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। নাশকতামূলক কাজের অভিযোগে 1930 সালে মালয়ে কুয়োমিনটাং দল অবৈধ ঘোষিত হয়। চীনা বিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যায়। চীন থেকে পাঠ্য পুস্তক আমদানি নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

1929 সালের বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার ফলে মালয়ে বেকার সমস্যা বৃদ্ধি পায়। মালয় আইনের দ্বারা স্ট্রেটস সেটেলমেন্টসে বসবাসের উদ্দেশ্যে চীনাদের আগমন সীমিত করা হয়েছিল এবং মালয় রাজ্যগুলিতে চীনা অনুপ্রবেশ প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। ইতিপূর্বে অনেক দিন ধরে যে সমস্ত চীনা মালয়ে ছিল, ত্রিশের দশকে শুধুমাত্র তাদের পরিবারবর্গ চীন থেকে মালয়ে এসেছে। জাপানী আক্রমণে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে তারা সে সময় দেশ ছেড়েছে। নবাগত চীনারা মালয়ে এসে গ্রামের দিকে চলে গেছে, সেখানে জমিজমা দখল করে চাষের কাজে তৎপর হয়েছে। তাদের বেআইনী জমি দখলের ফলে নতুন ধরণের সমস্যার উদ্ভব হয়েছে।

এ সব কারণে মালাইরা সব সময় ভাবত যে বর্তমান পরিস্থিতিতে তাদের স্বার্থ একেবারেই সুরক্ষিত নয় এবং ব্রিটিশ শাসক গোষ্ঠী তাদের স্বার্থ সংরক্ষণে উদ্যোগী হয় নি। একথা অবশ্য সত্য যে 1931 সালের Malay Reservation Enactment অনুযায়ী বিদেশীদের কাছে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে জমি হস্তান্তর নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। কিন্তু মহাজনের কাছে দেনার দায়ে অনেক জমি মালাইদের হাতছাড়া হয়ে গেছে। 1933 সালের একটি আইনের দ্বারা অবশ্য এই অবস্থার প্রতিকার করা হয়েছিল। 3 : 1 আনুপাতিক হারে মালাইদের জন্য সরকারী চাকুরির প্রতিশ্রুতি ছিল। কিন্তু এই সুবিধাজনক অনুপাতের সুযোগ তারা নিতে পারে নি। কারণ উচ্চ শিক্ষার বিদ্যাভবনগুলি শহরে অবস্থিত ছিল। গ্রামের মানুষের পক্ষে সেখানে লেখাপড়া ছিল ব্যয়সাধ্য। সেখানে দু'টি কারণে জাতীয়তাবোধ জন্ম নিয়েছে। প্রথমত, মালাইদের স্বার্থ রক্ষায় বৃটিশরা ব্যর্থ হয়েছিল বলে মালাইদের অভিযোগ ছিল। দ্বিতীয়ত, চীনা জাতীয়তাবাদ, চীনা গোপন সমিতি এবং চীনা রাজনৈতিক আন্দোলন মালাইদের রাজনৈতিক চেতনাকে প্রভাবিত করেছিল।

মালয় জাতীয়তাবাদ প্রসঙ্গে ইসলাম ধর্মের ভূমিকা লঘু করে দেখা সংগত হবে না। ইসলাম ধর্মের সংস্কার আন্দোলন এবং কামাল আতাতুর্কের (1880-1938) নেতৃত্বে তরুণ তুর্কী আন্দোলনের সঙ্গে মালয় জাতীয়তাবাদ নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ। ইসলাম ধর্মে সংস্কার আন্দোলন শুরু হয় Mohammad Abduh (1859-1905) এবং কায়রোর Al-Manar গোষ্ঠীর নেতৃত্বে। 1904 সালে Mohammad Abduh মিশর থেকে মালয়ে আসেন। 1906 সালে তিনি *Al-Imam* নামে একটি সংবাদপত্র প্রকাশ শুরু করেন। এটি ছিল প্রথম মালয় সংবাদপত্র। এই সংবাদপত্রের মাধ্যমেই মালাইরা ইসলামী সংস্কার আন্দোলনের সঙ্গে পরিচয় লাভ করে।

1906 থেকে 1926 সাল পর্যন্ত তাদের রাজনৈতিক ধ্যানধারণা ধর্মীয় চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। তুর্কীদের জাতীয়তাবাদী গৌরবে মালাইরা গৌরবান্বিত বোধ করেছে, কারণ উভয়েই ইসলাম ধর্মাবলম্বী। নবজাগ্রত ধর্মীয় প্রেরণাকে আশ্রয় করে মালয় জুড়ে অগণিত সংগঠন গড়ে উঠেছে, ধর্মীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে এবং পত্রপত্রিকায় ধর্মালোচনা প্রকাশিত হয়েছে। *Seruan Azhar* এবং *Pilihan Timur* প্রভৃতি পত্রিকাতে রাজনৈতিক বিষয়বস্তু আলোচিত হয়েছে। এই দুটি পত্রিকা কায়রো থেকে মালাই এবং ইন্দোনেশীয় ছাত্রদের যৌথ উদ্যোগে প্রকাশিত হত। মধ্য প্রাচ্যে পাঠরত মালাই ছাত্ররা, অটোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর যে আরব জাতীয়তাবাদের উদ্ভব হয়েছিল, সে সম্পর্কে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পেরেছিল এবং পত্রপত্রিকার মাধ্যমে তা স্বদেশে পৌঁছে দেবার চেষ্টা করেছিল। মধ্যপ্রাচ্যে প্রবাসী মালাই ছাত্ররা মালয় ও ইন্দোনেশিয়ার একীকরণেরও স্বপ্ন দেখত।

1926 সালে *Kesatuan Melayu Singapura* নামে মালয়ের প্রথম রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠিত হয়। Embok Suloh, এবং Tengku Abdul Kadir এর সহযোগিতায় Enuos bin Abdullah এই দল প্রতিষ্ঠা করেন। মালাইদের অর্থনৈতিক উদ্যোগ উৎসাহিত করা, রাজনীতি ও প্রশাসনে মালাইদের স্বার্থ সুরক্ষিত করা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের আত্মপ্রতিষ্ঠ হতে সাহায্য করা, সরকারের কাছে মালাই দৃষ্টিভঙ্গী উপস্থাপিত করা, মালাই ছাত্রদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষার আগ্রহ ও সঙ্গীত গড়ে তোলা—এই সব ছিল *Kesatuan* দলের মূল লক্ষ্য।

1934 সালের মার্চ মাসে *Saundara* নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা Sheikh Taher Jalaluddin এর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। জাতীয়তাবাদ

উৎসাহিত করার ব্রতে এই পত্রিকার অভিনব ভূমিকা ছিল। শিশুদের জন্য নির্দিষ্ট পাতা বয়স্কদের আলাপ আলোচনা ও তর্কবিতর্কের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। এই তর্কবিতর্কের মধ্য দিয়ে পত্রমিতালী আন্দোলন শুরু হয়। *Sababat Pena* নামে এই পত্রমিতালী আন্দোলন পরিচিত ছিল। 1934 সালের 11 নভেম্বর পেরাকের তাইপিঙ অঞ্চলে *Sababat Pena* সংগঠনের প্রথম জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলন ছিল সমগ্র মালয়ের মালাইদের প্রথম বেসরকারী সমাবেশ। 1935 সালের 4 আগস্ট দ্বিতীয় সম্মেলন কুআলালুম্পুরে অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় 100 ছিল এই সম্মেলনের সদস্য সংখ্যা। 1937 সালে সদস্য সংখ্যা বেড়ে 10,000 হয়েছে। মনে রাখা দরকার *Sababat Pena* রাজনৈতিক দল নয়, গোপন সমিতিও নয়। একটি পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত এই সংগঠন অতি দ্রুত জাতীয় আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য অর্জন করে।

1937 থেকে 1939 সালের মধ্যে সমগ্র মালয় উপদ্বীপ জুড়ে বেশ কয়েকটি সংস্থা গড়ে ওঠে। 1937 সালে *Kesatuan Melayu Singapura* শাখা মালাক্কা এবং পেনাঙে প্রতিষ্ঠিত হয়। দু'বছর পরে পাহাঙ, সেলাংগোর, নেগ্রি সেম্বিলান এবং প্রভিনস ওয়েলেসলিতে আরও মালাই সংগঠন সৃষ্টি হয়। 1938 সালে *Kesatuan Melayu Muda* (KMM) নামে অন্য একটি চরমপন্থী রাজনৈতিক দল গঠিত হয়।

1939 সালের 6 আগস্ট কুআলালুম্পুরে Pan-Malayan Malay Association এর প্রথম সম্মেলন বসে। দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় 1940 সালে সিঙ্গাপুরে। জাতীয় সংহতি অর্জনের পথে এই সংস্থা সুদৃঢ় পদক্ষেপ নিয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হলে সংস্থাটির প্রয়াস ও প্রচেষ্টা নিষ্ফল হয়ে পড়ে।

ইতিমধ্যে মালাইরা দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী, এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। Pan-Malayan Malay Association এর সংগঠকরা ছিলেন দক্ষিণপন্থী। 'মালয় মালাইদের জন্য' নীতি ছিল তাঁদের আন্দোলনের মূল কথা। এই দল ছিল ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত উচ্চবর্গের মালাই গোষ্ঠী। মালয় কলেজ গোষ্ঠী রূপেও তাঁরা পরিচিত ছিলেন।

বামপন্থীদের মূলনীতি ছিল মালয়ের নির্যাতিত নাগরিকদের রাজনৈতিক মুক্তি। তাঁরা ছিলেন মালাই শিক্ষায় শিক্ষিত। সুলতান ইদ্রিস ট্রেনিং কলেজের স্নাতক গোষ্ঠী নামেও তাঁরা পরিচিত ছিলেন। Ibrahim bin Haji Yaakob ছিলেন এই বামপন্থী গোষ্ঠীর নেতা। 1938

সালে Ishak Haji Mohammad এর সহযোগিতায় তিনি *Kesatuan Melayu Muda* (KMM) দল গঠন করেন। ব্রিটিশের সংগে অসহযোগিতার নীতিতে তারা বিশ্বাসী ছিলেন। 1940 সালে এই দলের নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার হন। KMMও অবৈধ ঘোষিত হয়। KMM দলের একটি প্রধান লক্ষ্য ছিল মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার যুগ্ম স্বাধীনতার পরিকল্পনা। অবৈধ ঘোষিত হলে দলটি নতুন নামে, *Kesatuan Rakyat Indonesia Semenanjung* (KRIS) পরিচিত হয়। জাপান আত্মসমর্পণ করলে যুগ্ম স্বাধীনতার পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি পর্বে Malay Nationalist Party (MNP) ছিল KRIS এর উত্তরসূরী। Mokhtaruddin, Dr. Burhanuddin এবং Ishak Haji Mohammad ছিলেন MNP এর নেতৃবৃন্দ। এই দলের যুব শাখা *Angkatan Pemuda Insaf* (API) এব নেতা ছিলেন Ahmad Boestanam এবং মহিলা শাখা *Angkatan Wanita Sedar* (AWAS), Samsiah Sutan Faker এর নেতৃত্বে পরিচালিত হয়েছিল। API অবৈধ ঘোষিত হলে তার স্থান দখল করে *Peybela Tanah Ain* (PETA) নামে একটি নতুন সংগঠন।

Gerakan Angkatan Muda (GERAM) সহ এই সমস্ত বামপন্থী সংগঠন *Pusat Tenaga Rakyat* (PUTERA) দলে যোগ দেয়। কিন্তু 1948 সালে মালয়ে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হলে সমস্ত বামপন্থী সংগঠন অবৈধ গণ্য হয়। বামপন্থী আন্দোলনও ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ে। তখন জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ মধ্যপন্থার আশ্রয় নেন এবং শাসনতান্ত্রিক পথে মালয়ের স্বাধীনতার জন্য সচেষ্ট হন। 1957 সালে United Malays National Organisation (UMNO), Malayan Chinese Association (MCA) এবং Malayan Indian Congress (MIC) এর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় মালয় স্বাধীনতা অর্জন করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মালয়ের ক্ষয়ক্ষতি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মালয়ের জনস্বাস্থ্য, খাদ্য, শিক্ষা এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। ব্যাপক এলাকা জুড়ে টিন ও রবারের উৎপাদন ব্যাহত হয়। 1941 সালে অধিকাংশ ড্রেজার ধ্বংস করা হয়েছিল। জাপানীরা যাতে তাদের নিজস্ব কাজে লাগাতে না পারে, এই ভেবে রবার উৎপাদনের যন্ত্রপাতিও বিনষ্ট করা হয়। টিন ও রবার শিল্প

করায়ত্ত করার জন্যই জাপান মালয় আক্রমণ করেছিল, কিন্তু এই দুটি শিল্পের পুনর্গঠনে জাপান সরকার এতটুকুও তৎপর হয় নি। 1945 সালে যুদ্ধ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই টিন ও রবারের উৎপাদন শুরু করা সম্ভব হয় নি এবং ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার কর্মসংস্থানেরও সুযোগ হয় নি।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনায় মালয়ে প্রাণহানির সংখ্যা ছিল কম। সাবা ছাড়া অন্য কোথাও ঘর বাড়ি সম্পত্তি ধ্বংস করা হয় নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও মালয়বাসীকে অনেক দুঃখ দুর্দশা সহ্য করতে হয়েছে, অদের মধ্যে অনেকের মৃত্যু ঘটেছে। জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে অনেকেই প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। শ্যাম দেশের সঙ্গে বর্মাকে যুক্ত করার জন্য জাপানী তত্ত্বাবধানে যে রাস্তা তৈরি হচ্ছিল, প্রচুর ভারতীয় শ্রমিককে সে কাজে নিযুক্ত করা হয়েছিল। দুঃসহ পরিবেশে কাজ করতে গিয়ে সহস্র সহস্র ভারতীয় শ্রমিকের মৃত্যু ঘটেছে। জাপানী শাসক চাউল আমদানি বন্ধ করেছিল বলে বহু লোককে অনাহারে দিন কাটাতে হয়েছে। বনে জঙ্গলে জাপানীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টি করতে গিয়ে প্রচুর মালয়বাসী চীনা প্রাণ হারিয়েছে। চীনদেশে জাপানী সাম্রাজ্যবাদের ভূমিকা ছিল নির্মম ও বর্বর। জাপান তাই জানত যে মালয়বাসী চীনাদের সাহায্য, সমর্থন ও সহযোগিতা তারা কখনই পাবে না। এই কারণে মালয়ে মালাই জাতি ও চীনাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করাই ছিল জাপানের প্রধান লক্ষ্য। এই উদ্দেশ্যে তারা চীনাদের বিরুদ্ধে উৎপীড়ন চালিয়েছে এবং মালাইদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছে। জাপান ভেবেছিল যে এইভাবেই তারা জাপ-বিরোধী চীনা মালাই সম্মিলিত সংগ্রাম প্রতিহত করতে সমর্থ হবে। চীনা গেরিলাবাহিনী প্রতিশোধ কামনায় উন্মত্ত হয়ে পড়লে নানা জায়গায় সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ শুরু হয়। এই সব ঘটনার ফলে শাসনতান্ত্রিক সংকট জটিল আকার ধারণ করে।

মালয় ইউনিয়ন পরিকল্পনা

শাসনতান্ত্রিক সংকটের অবসানের উদ্দেশ্যে ব্রিটেনের শাসকবর্গ একটি নতুন পরিকল্পনা রচনা করেন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী মালয় রাজ্যগুলিকে নিয়ে একটি ইউনিয়ন গঠিত হবে। এই ইউনিয়নের মধ্যে থাকবে পেরাক, সেলাংগোর, নেগ্রি সেম্বিলান এবং পাহাঙ নিয়ে গঠিত ফেডারেটেড মালয় স্টেটস; জোহোর, কেদা, কেলানতান, ত্রেঙ্গানু এবং পারলিস নিয়ে গঠিত আন-ফেডারেটেড স্টেটস এবং মালাক্কা ও পেনাঙ নিয়ে গঠিত স্ট্রেটস সেটেলমেন্টস। সিঙ্গাপুরকে ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি। সামরিক

গুরুত্বের কথা ভেবে সিঙ্গাপুরকে স্বতন্ত্র মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল।। তাছাড়া এও ভাবা হয়েছিল যে সিঙ্গাপুরে চীনাদের সংখ্যাধিক্য থাকায় সিঙ্গাপুর মালয় ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত হলে, মালয়ে চীনারাই হবে সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতি। ফলে রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক সংকট হবে তীব্রতর।

মালয় ইউনিয়ন কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় সমবায় নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে মালয়ে ব্রিটিশ নীতির মূল কথা ছিল শাসনতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ। মালয় ইউনিয়নের পরিকল্পনায় কিন্তু শাসনতান্ত্রিক কেন্দ্রীকরণের কথা ভাবা হয়েছে। সুলতানদের হাতে প্রকৃত ক্ষমতা থাকবে না। রাজ্য সরকার হবে সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন। আইন প্রণয়ণ করবে কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ। এজন্য রাজ্যের শাসকবর্গের সম্মতির প্রয়োজন হবে না। শাসকরা হবেন নিছক উপদেষ্টা মাত্র। শাসকদের বিশেষ ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি থাকবে না। মালয় ইউনিয়ন নাগরিকত্ব সৃষ্টির নতুন প্রস্তাব দেওয়া হল। গত পনেরো বছরের মধ্যে মালয়ে বসবাস করেছে অন্তত দশ বছর অথবা মালয়ে জন্ম গ্রহণ করেছে, এমন লোককে জাতিধর্মনির্বিশেষে মালয় ইউনিয়নের নাগরিক বলে গণ্য করা হবে এবং তারা সবাই সমানভাবে নাগরিকের সুযোগ সুবিধা ভোগ করবে। ফলে মালাইদের যে বিশেষ রাজনৈতিক মর্যাদা ছিল, তা অনেকাংশে ক্ষুন্ন হল। 1946 সালে মালয় ইউনিয়ন গঠনের এই প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট রাজন্যবর্গের সঙ্গে কোনো পরামর্শ না করেই গৃহীত হয়েছিল। সার হ্যারল্ড ম্যাকমাইকেলকে এই উদ্দেশ্যে মালয়ে পাঠান হয়।

সারাবাক ও সাবা রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন

1946 সালে অনুরূপ আমূল শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন বোর্ণিওব সারাবাক ও সাবা রাজ্যে চালু করা হয়েছিল। সারাবাক ছিল ব্রুক পাবিবারের শাসনাধীন (Brookc Administration) এবং সাবা শাসন করত নর্থ বোর্ণিও কোমপানি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে এ দুটি রাজ্যে যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। প্রাক্-যুদ্ধ কালীন সমৃদ্ধি ফিরিয়ে আনার মত আর্থিক ও সাংগঠনিক সঙ্গতি ব্রুক পরিবার ও নর্থ বোর্ণিও কোমপানির ছিল না। তা ছাড়া একথাও ঠিক যে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পারিবারিক ও কোমপানি শাসন ব্যবস্থা ছিল একান্তই অসঙ্গত ও অচল। তাই রাজা ব্রুক ও নর্থ বোর্ণিও কোমপানির পরিচালকগণ প্রস্তাব করলেন যে এই দুটি রাজ্য ব্রিটেনের উপনিবেশ (Crown Colony) হিসাবে শাসিত হোক। সাবার ক্ষেত্রে এই পরিবর্তনে কোন বাধা আসে নি। কিন্তু সারাবাকের

ক্ষেত্রে কিছু বিরোধ দেখা দিয়েছিল। তা সত্ত্বেও 1946 সালের 1 জুলাই সারাবাক ব্রিটিশ উপনিবেশে পরিণত হয়।

মালয় ইউনিয়ন গঠনের প্রতিক্রিয়া

মালয় ইউনিয়নের বিশদ বিবরণ প্রকাশিত হলে মালাই জাতি বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। তাদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠেন সার ফ্রাঙ্ক সুইটেনহাম প্রমুখ বেশ কয়েকজন প্রভাবশালী ব্রিটিশ রাজকর্মচারী। মালয় ইউনিয়নের প্রথম গভর্ণর হিসাবে যখন সার এডওয়ার্ড গেন্ট (Sir Edward Gent) কাজে যোগ দেন, সেই উৎসব সভায় মালাই সম্প্রদায়ভুক্ত কোন মানুষ যোগদান করেনি। আনুষ্ঠানিকভাবে তারা প্রতীক শোক দিবস পালন করে। এই প্রথম মালাই সম্প্রদায়ের প্রত্যেকে প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে। দেশের সর্বত্র প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। কুআলা-কাংসারের বিরাট জনসভায় বিভিন্ন রাজ্যের দেশীয় শাসকগণ যোগদান করেন। 1946 সালের মার্চ মাসে জোহোরের মেনত্রি বেসার দাতো ওন বিন জাফর (Dato' onn bin Jaa'far') United Malay National Organisation (UMNO) প্রতিষ্ঠা করেন। এই সংগঠনও ছিল মালয় ইউনিয়ন প্রস্তাবের বিরোধী। মালয় দেশে এবং ব্রিটিশ পার্লামেন্টে বিরোধিতা প্রবল আকার ধারণ করলে ব্রিটিশ সরকার সমগ্র পরিস্থিতির পুনর্বিবেচনার জন্য একটি সমিতি গঠন করে। সুলতানদের এবং সংযুক্ত মালয় জাতীয় সংগঠনের (UMNO) প্রতিনিধি ছিল এই সমিতির সদস্য। সমিতির সভাপতি ছিলেন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কমিশনার জেনারেল ম্যালকম ম্যাকডোনাল্ড। এই সমিতি একটি শাসনতন্ত্রের খসড়া প্রণয়ন করে। এই শাসনতন্ত্র 1948 সালের মালয় ফেডারেশন চুক্তি (Federation of Malaya Agreement of 1948) নামে খ্যাত।

মালয় ফেডারেশন চুক্তি

1948 সালের শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনায় মালয় ইউনিয়নের পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়। মালয়কে একটি যুক্তরাষ্ট্র রূপে (Federation) গণ্য করা হয়। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী রাজ্য ও রাজ্যের শাসকবৃন্দের হাতে বেশ কিছু নির্দিষ্ট ক্ষমতা ও অধিকার ন্যস্ত করা হয়েছিল। নয়টি রাজ্য ও দুটি সেটেলমেন্টের জন্য একটি সরকারী শাসনব্যবস্থার কথাও ভাবা হয়। সিঙ্গাপুরকে রাখা হয় যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে। মালাই সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য বিশেষ বিশেষ সুযোগ সুবিধা ও অধিকার স্বীকৃত

হয়। একই ধরণের নাগরিকতার বিধান ছিল, কিন্তু নাগরিকতা অর্জনের নিয়মকানুন আরও কঠোর করা হয়েছিল। যেমন, স্থির হয়েছিল যে নাগরিকত্ব অর্জন করতে হলে আবেদনকারীকে গত পঁচিশ বছরের মধ্যে অন্তত পনেরো বছর মালয়ে বসবাস করতে হবে। তাকে ঘোষণা করতে হবে যে সে স্থায়ী ভাবে বসবাস করতে ইচ্ছুক এবং সে মালাই ভাষা বা ইংরেজি ভাষায় কথা বলতে সক্ষম। তাছাড়া, অভীপ্সিত লক্ষ্য হিসাবে স্বায়ত্ত-শাসনের প্রতিশ্রুতি 1948 সালের শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনায় স্থান পেয়েছিল। এই প্রতিশ্রুতি ছিল মালয়ের পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের পথে একটি শুভ, সুকল্পিত নির্দিষ্ট পদক্ষেপ। 1948 সালের মালয় ফেডারেশনের চুক্তিতে সম্প্রসারিত আইন পরিষদের প্রস্তাব করা হয়েছিল। এই আইন সভায় বেসরকারী সদস্যরা হবে সংখ্যা গরিষ্ঠ। 7 জন বেসরকারী সদস্য বিশিষ্ট যুক্তরাষ্ট্রীয় কার্যনির্বাহক সমিতির (Federal Executive Council) বিধানও ছিল। বেসরকারী সদস্যরা কিন্তু নির্বাচিত ছিলেন না, তারা ছিলেন সরকার কর্তৃক মনোনীত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর নির্বাচিত যুক্তরাষ্ট্রীয় কার্যনির্বাহক সমিতি গঠনের পথে এটা ছিল প্রথম পদক্ষেপ।

নতুন রাজনৈতিক দলের আবির্ভাব

ইতিমধ্যে সংযুক্ত মালয় জাতীয় সংগঠন (UMNO) থেকে 1951 সালের আগষ্ট মাসে দাতো ওন (Dato Onn) পদত্যাগ করেন। তিনি এই রাজনৈতিক দলের দ্বার সমস্ত জাতির ও সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য উন্মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দলের কর্মকর্তারা তাঁর প্রস্তাবে রাজী হন নি। তাই তিনি দলত্যাগ করেন। তারপর তিনি মালয়ের স্বাধীনতা দল (Independence of Malay Party) নামে একটি নতুন দল প্রতিষ্ঠা করেন। সংযুক্ত মালয় জাতীয় সংগঠনের নেতৃত্ব ভার গ্রহণ করেন টেংকু আবদুল রহমান। তিনি ছিলেন কেদার সুলতানের ভ্রাতা এবং পেশায় আইনজীবী। তাঁরই উদ্যোগে তিনটি দলের সম্মিলনে তৈরি হয় আলায়েন্স পার্টি (Alliance Party) নামে একটি নতুন রাজনৈতিক দল। তিনটি দল হল সংযুক্ত মালয় জাতীয় সংগঠন (UMNO), মালাই চীনা সংঘ [Malayan Chinese Association (MCA)] এবং মালাই ভারতীয় কংগ্রেস [Malayan Indian Congress (MIC) ।] কম্যুনিস্ট বিরোধী সংগঠন হিসাবে 1949 সালে মালাই চীনা সংঘের জন্ম হয়েছিল। 1951 সালের ডিসেম্বর মাসে কুআলালুম্পুর-এ মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচনের সময় জন্ম হয়েছিল অ্যালায়েন্স পার্টির। এই নির্বাচনে মালয়ের

স্বাধীনতা দলকে (Independence of Malay Party) হারিয়ে অ্যালায়েন্স পার্টি জয়ী হয়। 1955 ও 1959 সালের সাধারণ নির্বাচনেও অ্যালায়েন্স পার্টি জয়লাভ করে।

মালয়ে জরুরী অবস্থা

1948 থেকে 1955 সাল পর্যন্ত কালপর্ব মালয়ের ইতিহাসে জরুরী অবস্থা (Emergency) নামে পরিচিত। মালয়ে এ সময় কম্যুনিস্ট সন্ত্রাসবাদ দমনের জন্য মালয় সরকার সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল। তাই এ সময় স্বায়ত্তশাসনের প্রতিশ্রুতি খুব বেশী কার্যকর হতে পারে নি। কিন্তু স্বাধীনতার চূড়ান্ত লক্ষ্য সরকারী নীতি নির্দেশে বারবার বিঘোষিত হয়েছে। 1952 সালে জেনারেল টেমপ্লার (General Templer) মালয়ে ব্রিটিশ হাই কমিশনার পদে নিযুক্ত হন। তাঁর নিয়োগপত্রে ব্রিটিশ সরকারের নীতি স্পষ্ট ভাষায় ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছিল যে মালয় যথাসময়ে সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন অর্জন করবে। ব্রিটিশ সরকার আশা করেন যে মালয় কমনওয়েলথের মধ্যেই থাকবে। কম্যুনিস্ট সন্ত্রাসবাদের জন্য রাজনৈতিক অগ্রগতি ও অর্থনৈতিক বিকাশ এবং জনকল্যানমূলক কাজ ব্যাহত হয়েছে। সুতরাং যাতে প্রগতির অন্তরায় দূর হতে পারে, এজন্য প্রাথমিক কাজ হবে আইন শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা। (The Policy of His Majesty's Government in the United Kingdom is that Malay should in due course become a fully self-governing nation. His Majesty's Government confidently hopes that nation will be within the Commonwealth.

Communist Terrorism is retarding the political advancement and economic development of the Country and the welfare of its peoples. Your primary task in Malay must, there fore, be the restoration of law and order, so that this barrier to progress may be removed)

নব নিযুক্ত হাই কমিশনারও একথা নিজেই অনুভব করতে পেরেছিলেন যে সন্ত্রাসবাদকে পরাভূত করতে হলে মালাই জাতীয়তাবাদ উৎসাহিত করা প্রয়োজন।

1953 সালে অ্যালায়েন্স পার্টি যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন পরিষদে (Federal Legislative Council) নির্বাচনের দাবি জানায়। ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে এ নিয়ে আলাপ আলোচনা চলে। আলোচনান্তে স্থির হয় যে 98

জন সদস্যের মধ্যে 52 জন হবেন নির্বাচিত। 1955 সালের জুলাই মাসে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ভোটদাতার সংখ্যা মোট 1,280,000 ছিল। অ্যালায়েন্স পার্টি'র প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল দাতো ওন পরিচালিত নেগারা পার্টি (Party Negara) এবং সমগ্র মালাই ঐশ্লামিক দল (Pan-Malayan Islamic Party)। প্রথম সাধারণ নির্বাচনে জয়ী হয় টেংকু আবদুল রহমান পরিচালিত অ্যালায়েন্স পার্টি। 52 আসনের মধ্যে এই দল 51 আসনে জয়লাভ করে। প্রদত্ত ভোটের আনুমানিক 80 শতাংশ ভোট তারা পেয়েছিল। টেংকু আবদুল রহমান হলেন মালয়ের প্রথম প্রধান মন্ত্রী। প্রধান মন্ত্রী হয়েই তিনি কারাগার থেকে সন্ত্রাসবাদীদের নিঃশর্ত মুক্তি ঘোষণা করলেন। জরুরী অবস্থার অবসান কল্পে তিনি কেদার বালিং (Baling) অঞ্চলে কম্যুনিস্ট নেতা চিন পেঙ-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এ সাক্ষাৎ ফলপ্রসূ হয় নি। 1957 সালে স্বাধীনতা লাভের পরও জরুরী অবস্থার অবসান ঘোষণা করা হয় নি। বলা যেতে পারে যে সরকারীভাবে জরুরী অবস্থার অবসান হয়েছিল 1960 সালে। জরুরী অবস্থার আমলে স্বাধীনতার দাবি আরও স্পষ্ট রূপ নেয়। 1955 সালে অ্যালায়েন্স পার্টি দু'বছরের মধ্যে স্বায়ত্তশাসন ও চার বছরের মধ্যে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি জানিয়েছিল। 1956 সালে মালয় রাজ্যগুলির শাসক ও অ্যালায়েন্স পার্টির প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত একটি দল এই উদ্দেশ্যে লনডন গিয়েছিল। এই প্রতিনিধি দল 1957 সালেই মালয়ের স্বাধীনতা দাবি করে। স্বাধীনতার দাবি ব্রিটিশ সরকার মেনে নেয়। এ নিয়ে কোন বাক বিতণ্ডা হয় নি, আপত্তিকর প্রশ্নও ওঠে নি। স্বাধীন মালয়ের জন্য কোন জাতীয় শাসনতন্ত্র গ্রহণ করা হবে, তা নিয়ে অবশ্য আলাপ আলোচনা হয়েছিল। মালয়ের শাসকবৃন্দের শাসনতান্ত্রিক মর্যাদা এবং নাগরিকতার প্রশ্ন নিয়ে নানা ধরণের জটিলতা সৃষ্টি হয়েছিল। শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য একটি কমিশন গঠিত হয়। লর্ড রীড ছিলেন কমিশনের সভাপতি। ইংলণ্ড, ভারতবর্ষ, অস্ট্রেলিয়া ও প্যাকিস্তানের দক্ষ আইন বিশারদ প্রতিনিধিরা ছিলেন কমিশনের সদস্য।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র

মালয়ের জন্য একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র গৃহীত হয়েছিল। 1948 সালের মালয় ফেডারেশন চুক্তির শর্তাবলী ছিল এই শাসনতন্ত্রের ভিত্তি। রাজ্য ও তার শাসকবৃন্দের হাতে কিছু কিছু অধিকার ও ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়েছিল। যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ছিল চূড়ান্ত ক্ষমতা। রাজ্যগুলির ক্ষমতা ছিল সীমাবদ্ধ এবং রাজস্ব আয়ের

উৎসও ছিল সীমিত। তা সত্ত্বেও, প্রতি রাজ্য নিজস্ব অধিকার বজায় রাখতে পেরেছিল। কেলানতান রাজ্যের নিজস্ব আমলাতন্ত্র ছিল। জোহোর রাজ্যের ছিল নিজস্ব সেনাবাহিনী। আনফেডারেটেড রাজ্যগুলিতে বৃহস্পতি-শুক্রবার ছিল ছুটির দিন। মালয়ের শাসন কাঠামো ছিল শাসনতান্ত্রিক রাজতন্ত্র। পার্লামেন্টের সাহায্যে রাজা দেশ শাসন করেছেন। নয়টি রাজ-পরিবারের মধ্য থেকে একজন স্থায়ী রাজা বেছে নেওয়া ছিল প্রায় অসম্ভব। এজন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে নয়জন রাজা তাঁদের মধ্য থেকে পাঁচ বছরের জন্য একজন সার্বভৌম শাসক বেছে নেবেন। স্বাধীন মালয়ের প্রথম সার্ব-ভৌম রাজচক্রবর্তী ছিলেন নেগ্রি সেম্বিলানের ইয়াং দি-পারতুয়ান বেসর (Yang di Pertuan Besar) টুংকু আবদুল রহমান ইবনি অল-মারহুম টুংকু মুহম্মদ।

মালয়ের আইনসভা ছিল দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইন পরিষদ। প্রতিনিধি সভা (House of Representative) ছিল প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত 104 জন সদস্যবিশিষ্ট পরিষদ। সিনেটের 48 জন সভ্যসংখ্যা ছিল। প্রতি রাজ্যের আইন পরিষদ থেকে পরোক্ষ ভোটে নির্বাচিত 2 জন সদস্য এখানে পাঠান হত। সিনেটের 16 জন সভ্য ছিলেন মনোনীত। কেন্দ্রীয় আসন পরিষদের আয়ু ছিল পাঁচ বছর, আর রাজ্য আইন পরিষদের চার বছর। পেনাঙ ও মালাক্কা সেটেলমেন্টসের উপর ইংলন্ডের মহারাণী তাঁর সার্বভৌমত্ব বর্জন করলেন। এই দুই রাজ্যে রাজ্যের প্রধান হিসাবে নিযুক্ত হলেন কোন সুলতান নয়, দুইজন গভর্ণর।

মালয়ের স্বাধীনতা লাভ

বিনা রক্তপাতে, বিনা যুদ্ধে, শুধুমাত্র আলাপ আলোচনা ও সহযোগিতার মধ্য দিয়ে মালয় স্বাধীনতা (Merdeka) লাভ করেছে। 1957 সালের 5 আগস্ট টেংকু আবদুল রহমান ও ব্রিটিশ হাইকমিশনার একটি দলিলে স্বাক্ষর করেন। মালয় ফেডারেশন চুক্তি (5 আগস্ট, 1957) নামে পরিচিত এই দলিলে ঘোষণা করা হয় যে মালয়ে ব্রিটিশ আধিপত্যের অবসান হবে 31 আগস্ট, 1957 সাল। (all power and jurisdiction of Her Majesty or of the Parliament of the United Kingdom in or in respect of the settlements or the Malay States or the Federation as a whole shall come to an end.)

1957 সালের 31 আগস্ট ব্রিটিশ মহারাণীর প্রতিনিধি হিসাবে ডিউক অব

গেন্দ্যাশেশচার মালয়ের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করেন। ক্ষমতা হস্তান্তর অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী টেংকু আবদুল রহমান ঘোষণা করেন যে নতুন রাষ্ট্রের নাম হবে পারসেকুতুয়ান তন মেলয়ু (Persekutuan Tanah Melayu)। ইংরেজিতে মালয় রাষ্ট্রের নামকরণ হল ফেডারেশন অব মালয়। এই রাষ্ট্র হচ্ছে সার্বভৌম স্বাধীন এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র (Sovereign demoeratic and independent state)। এই রাষ্ট্র স্বাধীনতা ও ন্যায়নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং জনগণের কল্যান ও সুখ ও সমস্ত জাতির মধ্যে ন্যায্য শান্তি প্রতিষ্ঠা এই রাষ্ট্রের সতত লক্ষ্য। (...founded upon the principles of liberty and justice and ever seeking the welfare and happiness of its people and the maintenance of a just peace among all nations.)

1957 সালের 17 সেপ্টেম্বর মালয় ফেডারেশন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সভ্যরূপে স্বীকৃতি লাভ করে। ঐ বছরের 12 অক্টোবর মালয় ফেডারেশন ও ইংলণ্ডের মধ্যে প্রতিরক্ষা ও পারস্পরিক সাহায্যের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। মালয়ের সেনাবাহিনীকে সুশিক্ষিত করে তোলার দায়িত্ব নেয় ইংলণ্ড। আর সেখানে ইংলণ্ডকে সামরিক ঘাঁটি গড়ে তোলার সুযোগ সুবিধা দানের প্রতিশ্রুতি দেয় মালয় ফেডারেশন।

মালয় ফেডারেশন সরকারের কার্যাবলী (1957-1963)

বলা বাহুল্য, নতুন সরকার মালাইদের প্রতি রাজনৈতিক সুযোগ সুবিধার ব্যাপারে পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছিল। সরকারী চাকুরি, ছাত্রবৃত্তি, জমির স্বত্বাধিকার সংরক্ষণ, ব্যবসাবাণিজ্যের পারমিট ও লাইসেনস দান ইত্যাদি বিষয়ে মালাইরা অগ্রাধিকার পেয়েছিল। মালাই ভাষা রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদা পেল, যদিও 1967 সাল পর্যন্ত বিকল্প ভাষা হিসাবে ইংরেজি ও চীনা ভাষাকে স্বীকৃত দেওয়া হয়েছিল। অ-মালাই সম্প্রদায় প্রত্যেক নাগরিকের জন্য সমান সুযোগ সুবিধা ও আইনগত অধিকারের দাবি উচ্চকণ্ঠে জানিয়েছিল। চীনাদের অভিযোগ ছিল যে 40 শতাংশ চীনা নাগরিকত্ব ও ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে চীনাদেরও আস্থা ছিল না। তাদের আশঙ্কা ছিল যে নতুন সরকার চীনা সংস্কৃতির প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন নয়। মালয় সরকারের আশঙ্কা ছিল যে চীনা বিদ্যালয়গুলি হয়ত কমিউনিস্টরা নাশকতামূলক কাজে ব্যবহার করবে। বহু চীনার দাবি সত্ত্বেও নতুন

সরকার মালয় কমিউনিস্ট পার্টিকে বৈধ ঘোষণা করতে চায় না। 1959 সালের পর মালয়েশিয়ার আইন পরিষদের জন্য যথারীতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে মালাই, চীনা ও ভারতীয়দের অ্যালায়েনস পার্টি নির্বাচনে বিজয়ী হয়েছে। এই দলের প্রধান নেতা টেংকু আবদুল রহমান ও তাঁর সুযোগ্য সহকারী তুন আবদুল রাজাক সমগ্র মালয়ের সংহতি রক্ষায় সদা সচেষ্ট ছিলেন।

সিংগাপুরের সঙ্গে সম্পর্ক (1957-63)

সিংগাপুরের সঙ্গে মালয়ের সম্পর্ক ছিল সমস্যাপীড়িত। এই দুই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্তি অবধারিত মনে হলেও মালয়ের আশঙ্কা ছিল যে সিংগাপুরের চীনারা হয়ত মালয় ফেডারেশনে প্রাধান্য ভোগ করবে। সিংগাপুরেব চীনাদেরও যথেষ্ট নিজস্ব সমস্যা ছিল। জাতীয়তাবাদী চেতনা এবং কমিউনিস্ট কার্যসূচীর মধ্যে তারা ছিল দোদুল্যচিত্ত। চীনা সাংস্কৃতিক পরম্পরা এবং সিংগাপুরের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বিবদমান প্রবণতায় তারা ক্ষতবিক্ষত বোধ করেছে। ব্যবসায় এবং মুনাফা ছিল তাদের জীবনের প্রধান আকর্ষণ, কিন্তু তা সত্ত্বেও রাজনীতির হাতছানি তারা অগ্রাহ্য করতে পারে নি। তাদের অনেকের কাছেই অবিচ্ছিন্ন ব্রিটিশ শাসনের নিরাপত্তা ছিল কাম্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও স্বায়ত্ত শাসনের দায়িত্ব তারা অগ্রাহ্য করে নি।

মালয় ফেডারেশনের নির্বাচনে পরাজিত হয়ে কমিউনিস্টরা সিংগাপুরের দিকে দৃষ্টি দেয়। বিদ্যালয়, ট্রেড ইউনিয়ন ও রাজনৈতিক সংগঠনে তারা অনুপ্রবেশ করে। 1955 সালে সিংগাপুরে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনের পর Labour Front এর নেতা David Marshall এর নেতৃত্বে একটি কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়। United Malay National Organization (UMNO), Malay Chinese Asscoiation (MCA) এবং Singapore Malay Union নিয়ে গঠিত Alliance Party ছিল কোয়ালিশন সবকারেব অন্য শরিক। Liberal Socialists, People's Action Party (PAP) এবং Independentsরা ছিলেন বিরোধী দলে। অধিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি অগ্রাহ্য হলে David Marshall পদত্যাগ করেন।

Lim Yew-hock তারপর প্রধান মন্ত্রী হন। সিংগাপুরকে একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি দেবার দাবি তিনি উত্থাপন করেন 1957 সালে সিংগাপুরের জন্য একটি নতুন শাসনতন্ত্র চালু করা হয়। আভ্যন্তরীণ বিষয়ে সিংগাপুরকে স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হল। বিদেশ দপ্তর ও প্রতি

রক্ষার দায়িত্ব ব্রিটিশ সরকারের হাতেই থাকল। শাসন কাঠামোতে একজন নামে মাত্র রাষ্ট্র প্রধান, একজন প্রধান মন্ত্রী এবং 51 জন নির্বাচিত সদস্য বিশিষ্ট আইন পরিষদের প্রতি দায়িত্বশীল মন্ত্রিপরিষদের বিধান ছিল। 1959 সালে এই শাসনতন্ত্র অনুযায়ী সিঙ্গাপুর স্বায়ত্তশাসন লাভ করে। স্বাধীন সিঙ্গাপুরে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় 1959 সালের 30মে তারিখে। PAP বিপুল সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করে। Lee Kuan Yew হলেন স্বাধীন সিঙ্গাপুরের প্রথম প্রধান মন্ত্রী।

মালয়েশিয়া ফেডারেশন (1963—)

1961 সালে Lee Kuan Yew এবং Tengku Abdul Rahaman সিঙ্গাপুর ও মালয় ফেডারেশনের একত্রীকরণ পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন। তাঁদের পরিকল্পনা মত মালয়েশিয়া ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত হবে মালয়, সিঙ্গাপুর, উত্তর বোর্ণিও (সাবা), সারাবাক এবং ব্রুণি। ব্রুণি শেষ মুহূর্তে মালয়েশিয়া ফেডারেশনে যোগ দিতে অস্বীকার করে। মালয় ও সিঙ্গাপুরের বিপুল সংখ্যক মানুষ মালয়েশিয়া ফেডারেশন পরিকল্পনা সমর্থন করেছিল, কিন্তু সারাবাক, সাবা এবং ব্রুণিতে আশানুরূপ উৎসাহ দেখা যায় নি।

যা হোক, ইন্দোনেশিয়া এবং ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের প্রতিবাদ সত্ত্বেও 1963 সালের 16 সেপ্টেম্বর মালয়েশিয়া গঠিত হয়। কিন্তু 1965 সালের 9 আগস্ট ফেডারেশন থেকে সিঙ্গাপুরকে বহিষ্কৃত করা হয়। Lee Kuan Yew এবং Tengku Abdul Rahaman এর মধ্যে শুরু হয় ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষ। Leeর অদম্য ব্যক্তিত্ব ও কর্মোদ্যোগ দেখে Tengku ঈর্ষাকাতর হয়েছিলেন। Leeর নেতৃত্বের কাছে ম্লান হয়ে থাকার চেয়ে সিঙ্গাপুর বিহীন মালয়েশিয়া ফেডারেশনের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতৃত্বে আসীন থাকা Tengku অনেক বেশী কাম্য মনে করেছিলেন। যা হোক 9 আগস্টের পর সিঙ্গাপুরকে বাদ দিয়ে মালয়েশিয়া ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকল পশ্চিম মালয় (মালয় উপদ্বীপ), এবং পূর্ব মালয়েশিয়া (বোর্ণিওর সাবা ও সারাবাক অঞ্চল)।

ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মালয়েশিয়া ছিল সুস্থিতি ও সমৃদ্ধির মরূদ্যান। আমলাতন্ত্র ছিল সুশৃঙ্খল। সংসদীয় ব্যবস্থা ছিল সুচালিত। দেশে সাম্প্রদায়িক মৈত্রী বিরাজিত ছিল। এসব সত্ত্বেও Tengkuর অ্যালায়েন্স পার্টি 1969 সালের সাধারণ নির্বাচনে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে শুরু হয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা ও তিক্ততা। সহকারী প্রধান মন্ত্রী Tun Abdul Razak এর নেতৃত্বে Emergency

National Operations Council এর হাতে অর্পিত হয় দেশ শাসনের দায়িত্ব। সাময়িকভাবে পার্লামেন্টের অধিবেশন মূলতবী রাখা হয়।

1969 সাল নাগাদ মালয়েশিয়ার জনসংখ্যা ছিল 10 মিলিয়নের বেশী। তাদের মধ্যে 50 শতাংশ ছিল মালাই। আমলাবাহিনীর উচ্চপদের প্রতি 5টির মধ্যে অন্তত 4টি তাদের জন্য সংরক্ষিত ছিল। জনসংখ্যার 37 শতাংশ ছিল চীনা, 11 শতাংশ ছিল ভারতীয়, পাকিস্তানী এবং সিংহলী এবং 2 শতাংশ ছিল ইউরোপীয়, ইউরেশীয় ও অন্যান্য। শিক্ষা সম্পূর্ণ অবৈতনিক করা হয়েছিল। মালাই, ইংরেজি, চীনা এবং তামিল ভাষায় শিক্ষাদানের সুযোগও দেওয়া হয়েছে। টেলিভিশনেও এই চারটি ভাষায় প্রচার কার্য চালান হয়েছে। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে মালয়েশিয়াতে জীবন যাত্রার মান সর্বোন্নত এবং সমাজকল্যানমূলক কাজ সর্বোত্তম। আবাসন, বিদ্যালয়, হাসপাতাল, জনস্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয়ে বিগত পঞ্চাশ বছরে ব্রিটিশ সরকার যা করেছে, তার অনেক বেশী *1957-67* এর দশকে সম্পন্ন করেছে স্বাধীন মালয়েশিয়ার সুযোগ্য সরকার।

॥ 15 ॥
স্বাধীন ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্র

স্বাধীন ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্র

1945 সালের 17 আগস্ট জাপানী দাক্ষিণ্যে ইন্দোনেশিয়া স্বাধীন হয়। কিন্তু এ স্বাধীনতা তারা মাত্র দেড়মাস ভোগ করেছিল। ঐ বছরেই 29 সেপ্টেম্বর ডচ স্বার্থ রক্ষার্থে ব্রিটিশ সেনাবাহিনী ইন্দোনেশিয়ায় প্রবেশ করে। মুক্তিকামী ইন্দোনেশীয় এবং সাম্রাজ্যবাদী ডচদের মধ্যে শুরু হয় রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম। পরবর্তী এক বছর ধরে ইন্দোনেশিয়ায় ভয়ংকর অরাজকতা চলে।

1947 সালের 25 মার্চ ডচ এবং ইন্দোনেশিয়রা Linggadjati চুক্তি স্বাক্ষর করে। এই চুক্তির ধারামত জাভা ও সুমাত্রার উপর ইন্দোনেশীয় প্রজাতন্ত্রের প্রভুত্ব স্বীকৃত হয়। বাইরের দ্বীপপুঞ্জের জন্য স্বতন্ত্র শাসন ব্যবস্থা স্থির করা হয়েছিল। একথা বলা হয় যে কালক্রমে এসব নিয়ে গঠিত হবে ইউনাইটেড স্টেটস অব ইন্দোনেশিয়া এবং এই ইন্দোনেশিয়া যুক্তরাষ্ট্র ডচ কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত হবে। কিন্তু এই ব্যবস্থা তিনমাস পর অচল হয়ে পড়ে। নির্মম পুলিশী অভিযান চালিয়ে ডচ শাসক গোষ্ঠী ইন্দোনেশিয়ায় শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা চেষ্টা করেছিল।

শাসনকর্যে শান্তি এবং বাণিজ্য মুনাফা, ডচেরা হারিয়েছিল। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের চাপে পড়ে মার্কিন রণপোত *Renville* এ তারা একটি নতুন যুদ্ধ বিরতি চুক্তি স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়। কিন্তু তাতে কিছু লাভ হয় নি। ইন্দোনেশিয়ায় তাদের বাণিজ্য কুঠি বন্ধ থেকেছে। তাদের পরিবারবর্গ সুখ শান্তি নিরাপত্তা হারিয়েছে। ঘরবাড়ি ভস্মীকৃত, খেতখামার বিধ্বস্ত, রপ্তানি বাণিজ্য বন্ধ। 1948 সালের সেপ্টেম্বর মাসে Madiun এ কমিউনিস্টরা সন্ত্রাসবাদী পথে ক্ষমতা দখলের ব্যর্থ চেষ্টা করে। এই ডচেরা পুনরায় পুলিশী অভিযান চালায়। কিন্তু সন্ত্রাসবাদ বন্ধ হয় না। নিরুপায় হয়ে তারা পুনরায় আলাপ আলোচনা শুরু করে। 1949 সালের নভেম্বর মাসে উভয় পক্ষ গোল টেবিল হেগ চুক্তি মেনে নেয়। এই চুক্তিতেই ইন্দোনেশিয়ায় ডচ সাম্রাজ্যের অবসান ঘটে এবং পশ্চিম নিউগিনি (পশ্চিম ইরিয়ান) ছাড়া

সমগ্র ইন্দোনেশিয়ার উপর সর্বভৌমত্ব নতুন ইন্দোনেশীয় প্রজাতন্ত্রের হাতে হস্তান্তরিত হয়। 1950 সালের জুন মাসে ইন্দোনেশিয়া সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্য পদ লাভ করে। ঐ বছরেই আগস্ট মাসে ইন্দোনেশিয়া যুক্তরাষ্ট্র প্রজাতন্ত্র (Republic of the United States of Indonesia—RUSI) ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্রে (Republic of Indonesia) রূপান্তরিত

সংসদীয় গণতন্ত্রের ব্যর্থতা

এরপর থেকেই ইন্দোনেশিয়ায় সংসদীয় গণতন্ত্রের নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু হয়। 1950 সাল থেকে 1956 সালের মধ্যে অন্তত 7 বার মন্ত্রি পরিষদের রদবদল হয়েছে। 1955 সালে অন্তত 30টি রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশ নিয়েছে।

দ্বিতীয় Ali Sastroamidjoja মন্ত্রিসভায় (1956) PNI *Masjumi Nahdatul Ulema* (NU) এবং অন্যান্য দলের সদস্য ছিল। এই সমস্ত দলের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ ভাল ছিল না। মন্ত্রিপরিষদের যৌথ দায়িত্বের কথা ভুলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ দলীয় স্বার্থের দিকেই বেশী মনোযোগ দিয়েছিলেন। একটি সাক্ষাৎকারে Hatta মন্তব্য করেছিলেন যে রাজনৈতিক দলগুলিতে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কোন স্থান নেই। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ফড়িয়ারা এসব দলে প্রভুত্ব বিস্তার করেছে।

[Indonesian observer (Djakarta), 8 February, 1957. Quoted in Vishal Singh, 'The Political situation in Indonesia. *Indonesia's Struggle* 1957-1958-A Report prepared under the direction of B. H. M. Vlekke. The Hague. 1959. p 6]

1951, 1956 ও 1960 সালের সংসদীয় নির্বাচন থেকে এটুকু স্পষ্ট যে পশ্চিমী ধাঁচের গণতন্ত্র ইন্দোনেশিয়ায় ফলপ্রসূ নয়। (তফসিল--1) 1956 সালের অক্টোবর মাসে স্বয়ং Sukarnoও চলতি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে গণ অসন্তোষ লক্ষ্য করে দলীয় রাজনীতির তীব্র নিন্দা করেছিলেন।

1956 সালের ডিসেম্বর মাসে মধ্য সুমাত্রার সামরিক অধিনায়ক Lt. Col. Ahmad Husein ঐ অঞ্চলে *Dewan Banteng* নামক এক গোষ্ঠী-সংস্থার পক্ষে ক্ষমতা দখল করেন। প্রধান সামরিক অধিনায়ক Sukarnoর আদেশ তিনি অগ্রাহ্য করেন। কেন্দ্রীয় সরকার ও আঞ্চলিক সরকারী কর্মচারীদের

মধ্যে যোগসূত্র ছিন্ন হয়। পরে গভর্ণরের যাবতীয় ক্ষমতা তিনি করায়ত্ত করেন। প্রায় এক বছরেরও বেশী সময় ধরে Padang ছিল রাজনৈতিক শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বী কেন্দ্র।

দুদিন পরে উত্তর সুমাত্রার রাজধানী Medan এ First Military District এর অধিনায়ক Col. Simbolon ঘোষণা করেন যে তিনিও কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন। কিন্তু অনতিবিলম্বে তাঁর বাহিনীর 27 জন অফিসার তাঁর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান এবং তিনি Medan ছেড়ে পালাতে বাধ্য হন। 27 ডিসেম্বর Lt. Col. Djamin Gintings তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন এবং Gintings এর প্রচেষ্টায় কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে সম্বন্ধ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

দক্ষিণ সুমাত্রায় গভর্ণর Winarno Danuatmodjo ছিলেন জাভার অধিবাসী। এখানে সামরিক অভ্যুত্থান যাতে না ঘটে, তার জন্য তিনি আগে থেকেই স্থানীয় রাজস্ব জাকার্তায় না পাঠানর সিদ্ধান্ত নেন। তাঁর যুক্তি ছিল এই অর্থ তিনি আঞ্চলিক উন্নয়ন খাতে ব্যয় করবেন। কিন্তু পালেমবাঙ Adat Congress এ দাবি তোলা হয় যে গভর্ণর, রেসিডেন্ট, রিজেন্ট ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পদ দক্ষিণ সুমাত্রার মানুষের জন্য সংরক্ষিত রাখা হোক। এই দাবি কার্যকর করার জন্য *Dewan Garuda* নামে একটি সংস্থাও গড়ে তোলা হয়। সঙ্গে সঙ্গে গভর্ণর Winarno Danuatmodjoর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং Lt. Col. Barlian তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। রাজ্যের সংহতির স্বার্থে তিনি যাবতীয় ক্ষমতা অধিগ্রহণ করেন।

সুমাত্রার এই সব ঘটনার ফলে স্বাভাবিকভাবেই কেন্দ্রীয় সরকার উদ্বিগ্ন হয়েছে। মন্ত্রিসভার মধ্যেও সংকট দেখা দিয়েছে। প্রথমে একটি ছোট দল মন্ত্রিসভা থেকে বেরিয়ে আসে। এই দলের নাম Upholders of Indonesian Independence বা IPKI দল। 1957 সালের 9 জানুয়ারি *Masjumi*র পাঁচজন মন্ত্রী পদত্যাগ করেন। এ কথা সত্য যে *Masjumi* কম্যুনিস্ট দল ও জাতীয়তাবাদী দলের মধ্যে যে সহযোগিতা গড়ে উঠেছিল, তা ভাল চোখে দেখে নি। এই দল রণনায়কদের বিদ্রোহে প্রকাশ্য সমর্থন বা উৎসাহ জাতীয় নীতি হিসাবে জানায় নি। কিন্তু দলের প্রাদেশিক শাখাগুলি কেন্দ্রীয় সরকার বিরোধী রণনায়কদের সমর্থন জানাতে কুণ্ঠিত হয় নি। বিদ্রোহী সেনাপতিরা ব্যাপক আকারে রবার ও নারিকেলের শুষ্ক শাঁসের চোরাই চালানে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। জাকার্তার রাজকোষকে বিদেশী মুদ্রা অর্জনে বঞ্চিত করাই তাদের উদ্দেশ্য ছিল।

আঞ্চলিক সেনাপতিদের অবাধ্য আচরণ এবং *Masjumi* দলের মন্ত্রিসভা

থেকে পদত্যাগের ফলে দেশে এক সঙ্কটাপন্ন অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল। এই অবস্থায় রাষ্ট্রপতি সুকর্ণ এক সক্রিয় ও কার্যকরী রাজনৈতিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন।

1957 সালের 21 ফেব্রুয়ারি Istana Negara তে তাঁর দলের নেতৃবৃন্দের সমাবেশে রাষ্ট্রপতি সুকর্ণ তাঁর রাজনৈতিক কার্যসূচী ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন যে গত 11 বছর ধরে ইন্দোনেশিয়াতে যে গণতন্ত্র প্রচলিত ছিল, তা ইন্দোনেশীয় গণতন্ত্র নয়, তা হল আমদানি করা গণতন্ত্র (import democracy)। তাছাড়া পারস্পরিক সাহায্যের (*Gotong rojong*) ভিত্তিতে কম্যুনিস্ট দল সহ সমস্ত রাজনৈতিক দল নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠনের প্রস্তাব তিনি উত্থাপন করেন। ইন্দোনেশিয়ার যাবতীয় পেশা বা বৃত্তি গোষ্ঠীর প্রতিনিধি নিয়ে জাতীয় পরিষদ গঠনের পরিকল্পনা তিনি পেশ করেন। শ্রমিক, কৃষক, বুদ্ধিজীবী, শিল্প-মালিক, প্রোটেস্ট্যান্ট, ক্যাথলিক, মহিলা, ও যুব সমাজের প্রতিনিধি সেনাবাহিনী নৌ-বাহিনী, বিমান-বাহিনীর প্রধান অধিনায়ক, পুলিশ বাহিনীর সর্বোচ্চ কর্মচারী, এটর্নী জেনারেল ও কয়েকজন মন্ত্রী নিয়ে জাতীয় পরিষদ গঠনের কথা তিনি বলেন। তিনি স্বয়ং এই জাতীয় পরিষদের নেতৃত্ব দেবেন, একথাও তিনি ঘোষণা করেন।

রাষ্ট্রপতি সুকর্ণর এই প্রস্তাব কম্যুনিস্টরা সানন্দে গ্রহণ করে এবং PNIও মেনে নেয়। কিন্তু NU দল ছিল দ্বিধাগ্রস্ত এবং *Masjumi* দল তা অগ্রাহ্য করে।

1957 সালের 13 মার্চ আলী মন্ত্রিসভায় শেষ বৈঠক বসে। পরের দিন মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করে। রাষ্ট্রপতি সমস্ত ইন্দোনেশিয়া জুড়ে যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন। ঐ বছরের 12 জুলাই রাষ্ট্রপতি সুকর্ণ জাতীয় পরিষদ (*Dewan Nasional*) গঠন করেন। 17 আগস্ট স্বাধীনতার দ্বাদশ বার্ষিকী উপলক্ষে তিনি অধিক নিয়ন্ত্রণাধীন গণতন্ত্রের প্রয়োজনীয়তার ('the need of a democracy under more guidance) কথা উল্লেখ করেন। এই সময় পশ্চিম ইরিয়ান (West Irian) ডচদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেবার দাবি ইন্দোনেশিয়াতে প্রবল হয়ে ওঠে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে ঐ বিষয়ে ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে আলাপ আলোচনার জন্য ওলন্দাজ সরকারকে অনুরোধ জানিয়ে 29 নভেম্বর একটি প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থন না পাওয়ার প্রস্তাবটি গৃহীত হয় নি। ফলে দেশব্যাপী ডচ-বিরোধী আন্দোলন

শুরু হয়। 30 নভেম্বর তারিখে কয়েকজন চরমপন্থী মুসলমান যুবক সুকর্ণর প্রাণনাশের চেষ্টা করেন।

1958 সালের জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে ইন্দোনেশিয়ার পরিস্থিতি ছিল অগ্নিগর্ভ। অন্যান্য দেশের কাছ থেকে সমর্থন লাভের প্রত্যাশায় সুকর্ণ 6 জানুয়ারি বিদেশ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন। তিনি ভারতবর্ষ, ইজিপ্ট, সিরিয়া, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা বর্মা, থাইল্যান্ড, জাপান এবং যুগোশ্লাভিয়া পরিভ্রমণ করেন। 21 জানুয়ারি কেন্দ্রীয় সরকার উচ্ছেদের ষড়যন্ত্র সংক্রান্ত একটি দলিল সেনাবাহিনীর হস্তগত হয়েছে, একথা তারা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন। 10 ফেব্রুয়ারি তারিখে যোদ্ধা পরিষদের (*Dewan Perdjoangan*) পক্ষ থেকে Lt. Col. Ahmed Husein একটি চরমপত্র কেন্দ্রীয় সরকারকে দেন। এই চরমপত্রে পাঁচ দিনের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের পদত্যাগ দাবি করা হয়েছিল। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপরিষদ এই চরমপত্র অগ্রাহ্য করে। বিদ্রোহীরা 15 ফেব্রুয়ারি ইন্দোনেশিয়ার বিপ্লবী সরকার নামে একটি নতুন সরকার গঠন করেন। এই সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে Sjafruddin Prawiranegarar নাম ঘোষণা করা হয়।

16 ফেব্রুয়ারি সুকর্ণ দেশে ফিরে আসেন। এই দুর্যোগের দিনে সেনাবাহিনীর প্রধান অধ্যক্ষ Maj. General Nasution ছিলেন ইন্দোনেশীয় সরকারের শক্তিস্তম্ভ। তাঁরই প্রচেষ্টায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্রোহ দমিত হয়। এটা অনস্বীকার্য যে বিদ্রোহের ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক অবস্থা প্রায় ভেঙ্গে পড়ে। ইন্দোনেশিয়ার রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে কয়েকটি বিষয় এখন স্পষ্ট ঃ

1. প্রতিকূলতা সত্ত্বেও রাষ্ট্রপতি সুকর্ণ তাঁর রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছেন।

2. ইন্দোনেশীয় সেনাবাহিনী সংগঠিত সশস্ত্র বিদ্রোহ দমন করতে সক্ষম হয়েছে।

3. জাভাতে *Masjumi* দলের অবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছে। জাতীয়তাবাদী দলের মধ্যে প্রাণসঞ্চার না ঘটলে কম্যুনিস্ট দল ও NU দলের অগ্রগতি অব্যাহত থাকবে।

অর্থনৈতিক পরিস্থিতি

1951 সালের পর থেকে মূলধন গঠনের জন্য সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ

ছিল গড়পড়তা বার্ষিক Rp 2 মিলিয়ন। মোট সরকারী ব্যয়ের গড়পড়তা হিসাব ছিল বার্ষিক Rp 13 মিলিয়ন। কিন্তু পরোক্ষভাবে অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল অনেক বেশী। উচ্চ বর্গের সরকারী কর্মচারী শ্রেণী ইন্দোনেশিয়ার দ্রুত অর্থনৈতিক বিকাশের সমস্যা নিয়ে বিশেষ উদ্বিগ্ন বোধ করছিলেন। তাদের ধারণা ছিল যে ঔপনিবেশিক পর্বে মূলধন ও ঋণের (credit) স্বল্পতার জন্যই ইন্দোনেশীয় উদ্যোক্তাগণ (entrepreneurs) বিপন্ন বোধ করেছে। সুতরাং ইন্দোনেশীয় সরকার স্বাধীনতার পর প্রচুর মূলধন ও ঋণ সরবরাহ করেছে। কিন্তু অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে উন্নয়নের ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয় নি। বিনিয়োগের জন্য কমবেশী গুরুত্বপূর্ণ বিকল্পগুলি নির্দেশিত হয় নি। ফলে প্রচুর অপচয় ঘটেছে এবং একারণে হতাশাও বেড়েছে।

ইন্দোনেশিয়ার অর্থনীতিবিদগণ অর্থনৈতিক বিকাশে সমতার কথা বলেছেন বটে, কিন্তু সুসংহত পরিকল্পনা তারা গ্রহণ করতে পারেন নি। শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষিতে যখন যেমন সমস্যা উদ্ভূত হয়েছে, খাপছাড়া ভাবে তারা সে সব সমস্যার সমাধানে ব্রতী হয়েছেন। কৃষির দিকে দৃষ্টি দিলেই ব্যাপারটা সহজে বোঝা যাবে।

1952 থেকে 1956 সালের মধ্যে সেখানে জাতীয় আয়ের প্রায় শতকরা 60 ভাগ এসেছে কৃষি পণ্য থেকে। রপ্তানি বাণিজ্য থেকে ইন্দোনেশিয়ায় যা আয় হয়, তার দুই-তৃতীয়াংশ আসে অর্থকরী ফসল বিক্রয় করে। চাউলের ব্যবসার সঙ্গে ইন্দোনেশিয়ার রাজনীতি ও অর্থনীতি যুগপৎ জড়িত। সুতরাং চাউল উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে সরকারী দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছিল। সরকারী কৃষিনীতির মূলে এই প্রত্যয় কাজ করছিল যে, যে সমস্ত জমি ইতিপূর্বে কর্ষিত হয়েছে, সেগুলিতে কিছু মূলধন প্রয়োগ করলেই খাদ্যোৎপাদন বেড়ে যাবে। সীমান্ত অঞ্চলের চাষযোগ্য জমিকে চাষের জন্য উন্মুক্ত করে তারা অধিক ফসল উৎপাদন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এসব কাজের জন্য প্রয়োজনীয় রসদ সরকারের ছিল না। তাই শুধুমাত্র যেখানে নিবিড় চাষ হয়েছে, সেখানেই সরকারের প্রচেষ্টা নিবদ্ধ হয়েছিল। সরকারী অর্থ শুধুমাত্র সার, বীজ ও অন্যান্য জৈব-প্রযুক্তিগত পরীক্ষা নিরীক্ষায় ব্যয়িত হয়েছে। যা হোক, এসব কারণে 1950 থেকে 1954 সালের মধ্যে ইন্দোনেশিয়ায় চাউলের উৎপাদন অভাবনীয় বৃদ্ধি পেয়েছিল। 1955 সালের পর কিন্তু খাদ্যোৎপাদন উর্ধ্বমুখী হয় নি।

রপ্তানি যোগ্য কৃষি পণ্যের সংখ্যা বৃদ্ধির সচেতন চেষ্টা হয় নি। কৃষি-

পণ্যের গুণগত মান উন্নত করার কোন পরিকল্পনা তাদের ছিল না। জাভা ব্যাঙ্কের 1952-1953 সালের বিবরণ থেকে জানা গেছে যে উৎপন্ন রবার বিক্রয়ের জন্য তারা যতটা তৎপর হয়েছিল, রবারের গুণগত মান উন্নত করার জন্য ততটা হয় নি।

ইন্দোনেশিয়ায় উপযুক্ত শিল্প বিকাশ ঘটে নি বলে সেখানকার অর্থনীতি ছিল ভারসাম্যবিহীন। 1951 সালে ইন্দোনেশীয় সরকার The Urgency Industrialization Program নামে একটি শিল্পোন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ইন্দোনেশীয় অর্থনীতিকে বিদেশী রাহুগ্রাস থেকে মুক্ত করার ছিল এই পরিকল্পনার প্রাথমিক উদ্দেশ্য। একারণে তারা সম্পূর্ণ ইন্দোনেশীয়দের উদ্যোগে বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্প গড়ে তুলতে চেয়েছিল। কিন্তু এখানেও তারা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার নির্ণয় করতে পারে নি।

স্বভাবতই ক্ষুদ্রশিল্প বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছিল। প্রয়োজনীয় মূলধন সরবরাহের জন্য The Loan and Mechanization Program নামে আর একটি পরিকল্পনা গৃহীত হয়। সদ্যোক্ত পরিকল্পনায় জাভা ও মাদুরাতে 72 রকমের শিল্পে দান বা ঋণ হিসাবে প্রচুর মূলধন বিনিয়োগ করা হয়।

কাগজপত্রে পরিকল্পনার ছক আঁকা কঠিন নয়, কিন্তু সেগুলি বাস্তবে রূপায়িত করা সত্যই কঠিন। অধিকাংশ প্রকল্পগুলি আদৌ শুরু করা হয় নি। যেগুলি শুরু করা হয়েছিল, তার অধিকাংশই অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত রাখা হয়। স্থান নির্বাচন, বিপণন আয়োজন, কাঁচামাল সরবরাহ, শ্রমিক সংগ্রহ কোন কিছুই সতর্কভাবে করা হয় নি। প্রচুর মূলধন বিনিয়োগ সত্ত্বেও এ সব ত্রুটি তারা আদৌ দূর করতে পারেন নি। যে সব শিল্প প্রতিষ্ঠানে কাজ শুরু হয়, এমন কি সেগুলিতেও উপযুক্ত উদ্যোগ ও প্রশাসনিক নৈপুণ্যের অভাবে উৎপাদন ব্যাহত হয়। যুগপৎ অনেকগুলি প্রকল্পের কাজ শুরু করা হয়েছিল বলে প্রাশাসনিক কাঠামোর উপর অত্যধিক চাপ পড়ে। ফলে কোন শিল্প-প্রতিষ্ঠানেই দ্রুত ও অবিরাম উৎপাদন সম্ভব হয় নি।

বাণিজ্য-ক্ষেত্রেও আশানুরূপ অগ্রগতি ঘটে নি। ইন্দোনেশিয়ার এই পর্বের বাণিজ্য নীতি *Benteng* নামে পরিচিত। বাণিজ্য সংস্থার স্বত্ব বিদেশী মালিকানা থেকে ইন্দোনেশীয়গণের হাতে হস্তান্তরিত করাই ছিল *Benteng* নীতির মূল কথা। একারণে ইন্দোনেশীয়দেরকে বিশেষ সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়েছিল। এই নীতির অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ছিল মহৎ। কিন্তু বাস্তব পরিণতি ছিল অন্যরূপ। সুযোগ সুবিধাগুলি অপব্যবহার করা হয়। সরকারী অর্থের অপচয় ঘটে। দুর্নীতি প্রশ্রয় পায়।

1957-58 সালের রাজনৈতিক অস্থিরতার দরুণ অর্থনৈতিক অগ্রগতি ব্যাহত হয়। বিভিন্ন দ্বীপের মধ্যে জলপথে জাহাজে যোগাযোগ ব্যবস্থা একেবারে ভেঙ্গে পড়ে। জমি ও খনির উৎপাদন হ্রাস পায়। রপ্তানির হার হয় নিম্নমুখী। (তফসিল-2) 1957 সালের ডিসেম্বর থেকে 1958 সালের মার্চ পর্যন্ত খনিজ ধাতু বাদে ইন্দোনেশিয়ার অন্যান্য জিনিসের রপ্তানি শতকরা 50 ভাগ হ্রাস পায়। 1958 সালের প্রথম তিন মাসে বিভিন্ন দ্বীপের মধ্যে বাণিজ্য একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। ফলে পণ্য দ্রব্য গুদামে পচতে শুরু করে।

1957 সালে মার্কিন ডলারের কালোবাজারে rupiah মূল্য শতকরা 58 ভাগ বেড়ে যায়, খোলা বাজারে পাউন্ড স্টারলিং এর মূল্য বাড়ে শতকরা 56 ভাগ এবং ডচ গিলডার বাড়ে শতকরা 88 ভাগ। 1957 সালে ইন্দোনেশিয়ায় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির হার ছিল কমপক্ষে 50 শতাংশ। (তফসিল-3) অন্যান্য দেশের মত ইন্দোনেশিয়াতেও গগনচুম্বী দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য সব চেয়ে বেশী দুর্দশা ভোগ করেছে নির্দিষ্ট সীমিত আয়ের সরকারী কর্মচারী এবং শ্রমিক গোষ্ঠী। 1957 সালের তৃতীয় পাদে বেতন বৃদ্ধির দাবিতে শ্রমিক ধর্মঘট প্রায় 30 শতাংশ বেড়েছে।

ঐ বছরে জাভা ও মাদুরার গ্রামাঞ্চলে খাদ্য দ্রব্যের দাম বেড়েছে 55 শতাংশ, পালেমবাঙে 48 শতাংশ এবং মাকাসারে 30 শতাংশ।

নানা ধরণের সামরিক অভিযানের জন্য সরকারী ব্যয়ের পরিমাণও বেড়েছে। 1956 সালে সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ ছিল Rp 18 বিলিয়ণ, 1958 সালে তা বেড়ে হয়েছে Rp 30 বিলিয়ণ। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির হার বেড়েই চলেছে। 1958 সালে আগস্ট মাসের পূর্ব পর্যন্ত দ্রব্যমূল্য বেড়েছে 50 শতাংশ, কিন্তু বেতন বৃদ্ধির হার ছিল মাত্র 10 বা 15 শতাংশ।

1958 সালের আগস্ট মাস নাগাদ 1957 সালের তুলনায় পেট্রোলিয়ম রপ্তানি কমেছে 25 শতাংশ এবং টিন রপ্তানি 40 শতাংশ। রবার, চা, কফি ও নারিকেলের শুষ্ক শাঁসের খেত এ বছরে প্রায় অনাবাদী থেকে গেছে।

1957 সালের ব্যাঙ্ক ইন্দোনেশিয়ার বুলেটিনে আমদানি পণ্যের 50 শতাংশ মূল্যবৃদ্ধি উল্লেখ করা হয়েছে। (তফসিল-4) কাপড় বোনার সুতা ও কার্পাস আমদানির ক্ষেত্রে মূল্য বেড়েছে 33 শতাংশ। শিশু খাদ্য, মোটরগাড়ীর টায়ার, নিউজপ্রিন্ট, বই ও পত্রিকার ক্ষেত্রে মূল্য বেড়েছে 20 থেকে 33 শতাংশ। এ সব কারণে খাদ্যদ্রব্য ও দেশে উৎপন্ন জিনিসের মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে অস্বাভাবিক মাত্রায়। অর্থনীতিবিদরা মনে করেন যে ইন্দোনেশীয়

সরকারের বৈদেশিক বিনিময় ও মুদ্রানীতি অর্থনৈতিক ভারসাম্যহীনতার উপসর্গ দূর করার চেষ্টা করেছে, কিন্তু তার কারণগুলি নির্মূল করার চেষ্টা হয়নি।

পরিচালিত গণতন্ত্র

1959 সালের 5 জুলাই ইন্দোনেশিয়ায় বিধান সভা ভেঙে দেওয়া হয়। সুকর্ণ সর্বোচ্চ ক্ষমতা দখল করেন। 1963 সালের 18 মে তিনি নিজেকে যাবজ্জীবন রাষ্ট্রপতিরূপে ঘোষণা করেন। তাঁর মাত্রাতিরিক্ত কমিউনিস্ট প্রীতির প্রতিক্রিয়ারূপে ও অন্যান্য কারণে 1965 সালের 1 অক্টোবর থেকে শুরু হয় নির্মম কমিউনিস্ট নিধন যজ্ঞ। 1958 সালেই সেখানে সংসদীয় গণতন্ত্রের ভিত্তি ধূলিসাৎ হয়ে পড়ে। 1956 সালের অক্টোবর মাসে এবং 1957 সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সুকর্ণ প্রধান রাজনৈতিক দল ও অন্যান্য সংগঠনের মিলিত সরকার গঠনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। মূল নীতি বিশ্লেষণ করে তিনি বলেন পাশ্চমী গণতন্ত্রের মত সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোট (50+) নয়, ঐক্যমতই (Consensus) হবে তাঁর পরিকল্পিত পরিচালিত গণতন্ত্রের (Guided Democracy) মর্মবাণী। 1959 সালে স্বাধীনতা দিবসের (17 August) বক্তৃতায় তিনি পরিচালিত গণতন্ত্রের রাজনৈতিক দর্শন ব্যাখ্যা করে বলেন যে বর্তমান পরিস্থিতিতে একমাত্র প্রয়োজন বিপ্লবের পুনরাবিষ্কার (Rediscovery of our Revolution)। এর অর্থ হচ্ছে 1945 সালের শাসনতন্ত্রের বিধান মত প্রবল পরাক্রান্ত রাষ্ট্রপতি শাসন প্রবর্তন।

1962—65 সালে পরিচালিত গণতন্ত্রের অধীনে সুকর্ণ সরকারের ক্ষমতা ছিল সর্বগ্রাসী। সংবাদপত্র ও গ্রন্থ প্রকাশ, পুস্তক আমদানি, বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় সব কিছুর উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ছিল নিরঙ্কুশ। ছোটবড় যাবতীয় স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলীর উপর নানাবিধ নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সেগুলির শাখা-প্রশাখা, রোটারি ও স্কাউটের মত আন্তর্জাতিক সংগঠন ও অন্যান্য সংস্থা সরকারী বাধা নিষেধের বেড়াজালে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ছিল না। 1960 সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রধান বিচারপতিকে মন্ত্রিপরিষদের সদস্য করা হয়। এর ছয় মাস পরে রাষ্ট্রপতি সুকর্ণ ক্ষমতা বিভাজন নীতির নিন্দা করলেন প্রকাশ্য জনসভায়। বিচার বিভাগ আর নিরপেক্ষ থাকল না, সরকারের তাঁবেদার দপ্তরে পরিণত

হল। এখানে সেখানে আইনের শাসনের কথা মৃদু কণ্ঠে বলা হচ্ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু সাধারণ মানুষ অবিচারের প্রতিকারের জন্য আদালতের শরণাপন্ন না হয়ে ধুরন্ধর রাজনৈতিক নেতাদের দ্বারস্থ হচ্ছিল।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ছিল সম্পূর্ণভাবে সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন। 1958 সালের ডিসেম্বর মাসে ওলন্দাজ বাণিজ্যের ছিটেফোটা যা কিছু টিকে ছিল, অর্থাৎ জমিজমা, ব্যাঙ্ক, সদাগরী প্রতিষ্ঠান, জাহাজ চলাচলের ব্যবসা, এ সব কিছুই সুকর্ণ সরকার বাজেপ্রাপ্ত করে। কৃষকও রেহাই পায় নি। চাউল, চিনি, তামাক প্রভৃতির উৎপাদকরা নানা বিধিনিষেধের জন্য অশান্তি ভোগ করছিল। খুবই কম দামে সরকারী প্রতিষ্ঠানের কাছে উৎপন্ন জিনিস বিক্রয় করতে তাদের বাধ্য করা হচ্ছিল। ক্রমবর্ধমান বিধিনিষেধের জন্য দেশী বিদেশী বণিককুল নিরুৎসাহী হয়ে পড়েছিল। আকাশ ছোঁয়া মুদ্রাস্ফীতির জন্য সর্বস্তরে দেখা দিয়েছিল নৈরাশ্য। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দুর্নীতির মধ্যে নিমগ্ন হয়েছিল সরকারী কর্মচারী শ্রেণী। সর্বনাশা উৎকোচ প্রথা সমাজকে গ্রাস করল খুব সহজভাবেই। অধিকাংশ মানুষ অনায়াসে এটা মেনেও নিল।

পরিচালিত গণতন্ত্রাধীন ইন্দোনেশিয়াতে নীতি ও নীতির বাস্তব রূপায়ণে দুস্তর অমিল ধরা পড়েছে। নীতিগভাবে রাষ্ট্রপতি পিপল্‌স্ কনসালটেটিভ এসেমব্লির কাছে দায়িত্বশীল। কিন্তু এই নীতি নিরর্থক হয়ে পড়েছিল, কারণ শাসনতন্ত্র অনুযায়ী পাঁচ বছরের মধ্যে এই এসেমব্লির অধিবেশন না ডাকলেও চলে। সরকারী নীতি নির্ণয়ে রাষ্ট্রপতির অবাধ ক্ষমতা ছিল। কিন্তু নীতির বাস্তব রূপায়ণে অনেক সময় তিনি ছিলেন অসহায়। কারণ, সেনাবাহিনীর মেজাজ, ক্ষমতা ও চক্রান্ত রাষ্ট্রপতির পক্ষে অগ্রাহ্য করা একান্তই অসম্ভব ছিল।

সরকারের হাতে প্রচুর ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হলে যেমন সুযোগ বাড়ে, তেমনি বোঝাও বাড়ে। ইন্দোনেশিয়ায় সেনাবাহিনী এবং মুষ্টিমেয় রাজনৈতিক নেতাদের হাতে এসেছিল নানা ধরণের সুযোগ সুবিধা। কিন্তু অন্যান্য শ্রেণী, বিশেষ করে শ্রমিক, কৃষক ও সাধারণ মানুষ পেয়েছিল নানা বোঝা, অসংখ্য বিধিনিষেধের বোঝা, ধর্মঘট নিষেধের বোঝা, কৃষিজাত পণ্যের কৃত্রিম মূল্যে হ্রাসের বোঝা। পরিচালিত গণতন্ত্রের বাস্তব চেহারা দেখে প্রশ্ন জাগে, অর্থনৈতিক দুর্গতির অবসান রাজনীতির পালা বদলে সম্ভব হয় নি কেন?

1966 সালের মার্চ মাসে ইন্দোনেশিয়ার সামরিক বাহিনী রাজনৈতিক

ক্ষমতা দখল করে। 1967 সালের 11 মার্চ সামরিক বাহিনীর সমর্থনপুষ্ট হয়ে Suharto রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত হন। তাঁর সামনেও সমস্যা ছিল প্রচুর। 1955 থেকে 1966 সালের মধ্যে মূল্যের হিসাবে রপ্তানি বাণিজ্য 26 শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। শতকরা 2.8 হারে এই সময় জনসংখ্যা বেড়েছে, কিন্তু শতকরা 2.2 হারে চাউলের উৎপাদন কমেছে। 1966 সালে মুদ্রাস্ফীতি ঘটেছে 860 শতাংশ হারে। সরকারী স্তরে দুর্নীতি ছিল একটি দুরপনেয় কলঙ্ক। 1942 সালে মোট 50,000 সরকারী কর্মচারী ছিল। 1969 সালের মাঝামাঝি এই সংখ্যা বেড়ে 840,000 দাঁড়িয়েছে। দুর্নীতিগ্রস্ত এই বিরাট সরকারী কর্মচারী বাহিনী ছিল যাবতীয় প্রগতির অন্তরায়।

এই দুর্যোগ পর্বে শাসক গোষ্ঠী পশ্চিমী শক্তিবর্গের শরণাপন্ন হয়েছেন। তাদের কাছ থেকে ইন্দোনেশিয়া 1967 সালে 200 মিলিয়ন, 1968 সালে 325 মিলিয়ন, 1969 সালে 500 মিলিয়ন এবং 1970 সালে 600 মিলিয়ন ডলার বিনা সুদে ঋণ পেয়েছে। ইন্দোনেশিয়ার সামনে তিনটি প্রধান সমস্যা হল রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা, অর্থনৈতিক দুর্গতি এবং সমাজের সর্বস্তরে দুর্নীতি। এই সমস্যাগুলি সমাধানের পথ প্রসঙ্গে দুটি মৌলিক জিজ্ঞাসা আমাদের চিন্তাকে আলোড়িত করে। পশ্চিমী গণতন্ত্রের রীতিনীতি ইন্দোনেশিয়ার ক্ষেত্রে কি একান্তই অকেজো ? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে অদ্যাবধি সামরিক বাহিনী সেখানে যে বিপুল রাজনৈতিক ক্ষমতা ভোগ করেছে, তার আশু অবসান কি সম্ভব ?

তফসিল—1

PARTIES AND PARLIAMENTARY REPRESENTATION MARCH 1951, AUGUST 1956, JULY 1980

Parties, Associations, Functional Groups

	March 1951 (a)	August 1956 b)	July 1 60(c)
Masjumi (Consultative Council of Indonesian Moslems)	49	57	...
PNI (Indonesian National Party)	36	57	44
PSI (Indonesian Socialist Party)	17	5	...
PIR (Greater Indonesia Association Party)	17	2	...
PKI (Indonesian Communist Party)	13	32	30
Fraksi Demokrat (Democratic Faction)	13	...	...
PRN (National People s Party)	10	2	...
Partai Katholik (Catholic Party)	9	7	5
Parindra (Greater Indonesia Party)	8	...	...
Partai Buruh (Labor Party)	7	2	...
PSD (Islamic Association Party of Indonesia)	5	8	5
Parkindo (Indonesian Christian Party)	5	8	6
Partai Murba (Proletariat Party)	4	2	1
Nahdatul Ulama (Association of Islamic Scholars)		45	36
Perti (Islamic Educational Movement Party)		4	2
IPKI. (League of Upholders of Indonesian Independence)		4	...

Army (functional group)			15
Navy (")			7
Air Force (")			7
Police (")			5
Workers (")			20
Peasants (")			25
Islamic authorities („)			24
Youth (")			9
Women (")			8
Intellectuals and educators (")			5
Not classified (")	26	...	...
Others („)	13	25	23
Total	232	260	283

(a) Adapted from Miriam S. Budiardjo, "Evolution toward Parliamentary Government in Indonesia : Parties and Parliament" (M.A. thesis, Georgetown University, 1955).

(b) Adapted from Parlaungan, *Hasil Rakjat Memilih Tokoh-Parlemen* [Parliamentary Figures Elected by the People] (Djakarta, Gita, 1956), p. 34.

(c) Adapted from Biro Pusat Statistik, *Statistical Pocketbook of Indonesia* 1960 (Djakarta, 1960), p. 38.

তফসিল—2

Volume of Indonesian Exports 1938 and 1950-57

	Thousands tons	Index number (1938-100)
1938	4927	100
1950	2420	50

1951	3009	62
1952	2421	50
1953	2594	53
1954	2857	57
1955	2716	55
1956	2508	51
1957	2315	47

Excluding petroleum and petroleum products.
Source : Reports of the Bank Indonesia.

তফসিল—3

Index Number of Food Prices 1951-1956
1953=100, except for Makassar and Pontianak.

	Twelve Foodstuffs Country side of java	Nineteen Djaka-rta	Maka-ssar	Foodstuffs Medan	Pontianak
1951	92	89	86	103	113
1952	117	94	87	96	117
1953	100	100	87	100	114
1954	97	106	94	111	120
1955	127	141	135	167	171
1956	153	161	161	168	186

Source : Report of the Bank of Indonesia, 1955-1957, Table 88, p 179,

All index number are annual averages.

তফসিল—4

Wholesale Prices of Imported goods, 1951-1956 (1953=100)

44 Import

	Commod-ities	Food-stuffs	Textiles	Chemicals
1951	90	67	109	99
1952	94	84	89	90
1953	100	100	100	100
1954	109	110	110	109
1955	145	144	169 .	151
1956	136	146	118	137

Source : Report of the Bank Indonesia, 1956-57. Table 89 p. 181.

All index numbers are annual averages.

।। 16 ।।

সাম্প্রতিক ইন্দোনেশিয়া

জাভা বনাম অন্যান্য দ্বীপ

13 হাজারেরও অধিক দ্বীপ সমষ্টি নিয়ে ইন্দোনেশিয়া গঠিত। এর মধ্যে মাত্র 6 হাজার দ্বীপে মানুষ বাস করে। জাভা হচ্ছে পঞ্চম বৃহত্তম দ্বীপ।

1980 সালের জনগণনা অনুযায়ী 147,490, 298 হল ইন্দোনেশিয়ার মোট জনসংখ্যা। এই জনসংখ্যার মোট 61·9 শতাংশ লোক বাস করে জাভায় এবং জাভার আয়তন হল সমগ্র ইন্দোনেশিয়ার 7 শতাংশ ভূ-খণ্ড।

উচ্চতম সরকারী চকরি ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুযোগ সুবিধা জাভাতেই কেন্দ্রীভূত। সমগ্র ইন্দোনেশিয়ায় জীবনযাত্রার প্রতি স্তরে অই জাভার আধিপত্য অনস্বীকার্য। কিন্তু এর ফলে প্রায় তিন হাজার মাইল ব্যাপ্ত পশ্চিমে সুমাত্রা থেকে পূর্বে ইরিয়ান জয় (Irian Jaya) অর্থাৎ আগেকার ডচ নিউ গিনি পর্যন্ত অসংখ্য দ্বীপের জীবনযাত্রার সঙ্গে জাভার সমাজ জীবনের দুস্তর ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে। এই সব ছোটখাটো দ্বীপ তাদের স্বতন্ত্র জাতিগত আত্মপরিচয় ধীরে ধীরে খুঁজে পাচ্ছে। আর্থিক ও রাজনৈতিক দিক দিয়ে তারা যে অবহেলিত হয়েছে, এই অপমানবোধ তাদের চঞ্চল করে তুলেছে।

সনাতন সমাজ ও আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়া

সনাতন সমাজের সঙ্গে উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়ার বিরোধ প্রায় সব ক্ষেত্রেই অনিবার্য। কিন্তু ইন্দোনেশিয়াতে আধুনিকী করণ নীতি রূপায়ণের মধ্যেই স্ববিরোধ থেকে গেছে। 160 মিলিয়ন ডলার খরচ করে সেখানে স্যাটেলাইট যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। এর ফলে দ্বীপে দ্বীপে দ্রুত ও স্পষ্ট টেলিফোন যোগাযোগ সম্ভব হয়েছে এবং প্রায় সব প্রদেশেই টেলিভিশনও পৌঁছে গিয়েছে। এ সব নিয়ে তাদের গর্বের সীমা নেই। পাশাপাশি অন্য একটা চিত্রের

কথা ভাবা যাক্। জাকার্তা বাদে ইন্দোনেশিয়ার সর্বত্র বিদ্যুতের ব্যবহার হচ্ছে মাথা পিছু বছরে মাত্র 10 কিলোওয়াট ঘণ্টা। (ফিলিপাইনে 300 ঘণ্টা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 7 হাজার ঘণ্টা) অধিকাংশ গ্রামাঞ্চলে এবং জাকার্তা ও অন্যান্য শহরের দরিদ্র মানুষের মধ্যে বিদ্যুৎ ও টেলিফোনের ব্যবহার নেই বললেই চলে। তৈল উৎপাদনের ক্ষেত্রে ইন্দোনেশিয়ায় বিস্ময়কর অগ্রগতি ঘটেছে। সেখানে প্রতিদিন 1 7 মিলিয়ণ ব্যারেল তৈল উৎপাদন করা হচ্ছে। ইন্দোনেশিয়ায় তৈল, প্রাকৃতিক গ্যাস, নিকেল, দস্তা, তামা, টিন, বকসাইট, অন্যান্য ধাতু ইত্যাদি অপরিমেয় প্রাকৃতিক সম্পদ আছে। তরল প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদন এবং বিপুল ধাতব সম্পদ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে অনেক বড় বড় প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। কোন কোন প্রকল্পে 1 বিলিয়ণ ডলার বিদেশী মূলধন বিনিয়োগ করা হয়েছে। সুমাত্রা দ্বীপেও ধাতব ঐশ্বর্য ব্যবহারের উদ্যোগ শুরু হয়েছে।

পাশাপাশি অনগ্রসরতার চিত্রও আছে। ডচরা চলে যাবার পর রেল ও জাহাজ পরিবহন ব্যবস্থা একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে। তারপর এগুলি বিশেষ মেরামত করা হয় নি। 1978 সালের হিসেব থেকে জানা গেছে যে জাভাতে প্রতি বর্গ কিলোমিটার জমি পিছু পথ নির্মাণ মাত্র 1 কিলোমিটারের এক চতুর্থাংশ। ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় বিমান সংস্থার নাম গরুড়। গরুড় এবং অন্য কয়েকটি ছোট বিমান সংস্থা প্রদেশে প্রদেশে শাখা বিস্তার করেছে। প্রায় তিন শত কাবুপাটেন (Kabupaten) বা রিজেন্সি (Regeney) এখন বায়ুপথে পরস্পর সংযুক্ত। বেশ কয়েকটি বড় বিদেশী কোমপানির নিজস্ব হেলিকপটার আছে। এসব সত্ত্বেও অনেকগুলি দ্বীপে, বিশেষ করে শুলা-বেসী (Sulawesi) ও কালিমানতান (Kalimantan) দ্বীপে অনুন্নত গ্রামাঞ্চলে ও পাহাড়ী এলাকায় ঘোড়া বা খচ্চরে চেপে 40 মাইল যেতে এখনও সময় লাগে পুরো দু'দিন। এই ধরণের অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থায় আর্থিক সমৃদ্ধির প্রসার কখনই সম্ভব নয়।

1983 সালের একটি প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে যে তৈল বিক্রয় ও তৈল শিল্পের উপর ধার্য কর হল ইন্দোনেশিয়ায় জাতীয় বাজেটে 65 শতাংশ রাজস্ব আয়ের মূল উৎস। সেখানে বিদেশী মুদ্রার 80 শতাংশ পাওয়া যায় তৈল বিক্রয়ের আয় থেকে। তৈলের জন্যই বিপুল আমলাবাহিনী ও উদ্যোগী বণিককুল সচ্ছল সমৃদ্ধ জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। কিন্তু বিশ্ব অর্থনীতিতে সাম্প্রতিক মন্দার জন্য তৈল রপ্তানি নির্ভর অর্থনীতি এখন বিপর্যয়ের সম্মুখীন।

অন্যান্য উন্নতিকামী দেশের মতই ইন্দোনেশিয়াতেও সামাজিক প্রতিষ্ঠায়

প্রতীক হচ্ছে মোটর সাইকেল, ট্রানজিসটার ও টেলিভিশন। কিন্তু ইন্দোনেশিয়ার চল্লিশ শতাংশ মানুষ হচ্ছেন নিম্নবিত্ত। অদের অধিকাংশেরই কর্মসংস্থান নেই, জমিজমা নেই। 1977 সালের মাঝামাঝি সুহারতো সদম্ভে ঘোষণা করেছিলেন যে তখন প্রতি দশজনের মধ্যে মাত্র তিনজন ছিলেন দারিদ্র্য সীমার নিচে। দশ বছর আগে প্রতি দশজনের মধ্যে নয় জনই ছিলেন দারিদ্র্য সীমার নিচে। সুহারতো বিশ্বব্যাঙ্ক নির্ধারিত মানদণ্ড অনুসারে হিসেব করেছিলেন। অর্থাৎ শহরাঞ্চলে বাৎসরিক আয় 75 ডলার এবং গ্রামাঞ্চলে 50 ডলারের কম হলে, তাকে দারিদ্র্য সীমার নিচে বলে ধরা হবে। কিন্তু নিরপেক্ষ অর্থনীতিবিদগণ এই হিসেবকে অবাস্তব বলে মনে করেন। 1976 সালে ভোগ্য পণ্যের দাম অনুযায়ী, তাঁদের বক্তব্য হল, 273 ডলার বাৎসরিক আয়কে দারিদ্র্যের সীমারেখা হিসাবে গণ্য করা উচিত। এই হিসাব মত ইন্দোনেশিয়ায় মাথাপিছু বাৎসরিক আয় 200 ডলারের কম। অর্থাৎ গ্রামীণ জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ এবং নগর ও শহরের প্রায় অর্ধাংশ বাস করে দারিদ্র্যসীমার নিচে। সম্প্রতি সুহারতো নিজেই স্বীকার করেছেন 11 মিলিয়ণ গ্রামবাসী দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করছে।

মার্কিন বিশেষজ্ঞদের সংগৃহীত পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে ইন্দোনেশিয়ায় চাষযোগ্য জমির পরিমাণ হচ্ছে 150 মিলিয়ণ একর। এর মধ্যে 10 মিলিয়ণ একরের সামান্য বেশী জমি সেচের আঁওতায় আনা হয়েছে। একারণে বছরে 1.5 মিলিয়ণ টন চাউল ইন্দোনেশিয়া আমদানি করত। বৈজ্ঞানিক সার প্রয়োগের গুণে 1982 সালেই সর্বপ্রথম ইন্দোনেশিয়া চাউল উৎপাদনে স্বয়ম্ভর হয়েছে। জনসংখ্যার মাত্র 6 শতাংশ মানুষ বিশুদ্ধ পানীয় জল পায়। শিশুদের মধ্যে মৃত্যুহার খুবই বেশী। অদের অধিকাংশই মারা যায় অপুষ্টির জন্য বা সংক্রামক রোগের আক্রমণে। বাইসাইকেল, মোটরস্কুটার, অটোরিক্সা, এবং টেলিভিশনের বিপুল প্রচলন দেখে আশান্বিত হবার কারণ নেই। সাধারণ মানুষের দিকে তাকালেই মনে হবে সব কিছু যেন নিঃসীম শূন্যতায় আচ্ছন্ন।

ব্যাপক দুর্নীতি

ইন্দোনেশিয়ার একটি বহুল প্রচলিত শব্দ হচ্ছে 'পুঙলি' (*Pungli*)। পুঙ্গুতান লিয়ার (*Pungutan liar*) এর সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে 'পুঙ্গলি'। ট্রাক ড্রাইভার পথের মোড়ে পুলিশের হাতে যে বে-আইনী পয়সা গুজে দেয়, তাকে বলা হয় 'পুঙ্গলি'। ছোট বড় ও সব রকমের দুর্নীতি বোঝাবার জন্য ইন্দোনেশিয়াতে এখন এই শব্দটি প্রয়োগ করা হয়। অভিজ্ঞ ব্যবসায়ীদের

মতে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় ইন্দোনেশিয়া সব চেয়ে বেশী দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ। দুর্নীতির প্রকোপ থেকে সাধারণ নিঃস্ব দরিদ্র মানুষেরও কোন রেহাই নেই। একটা উদাহরণ দিচ্ছি। 18 শতাংশ সুদে সরকারের কাছ থেকে ঋণ পেতে হলে চাষীকে ভূমি রেজিস্ট্রেশন দপ্তর থেকে রেজিস-ট্রেশন সারটিফিকেট জোগাড় করতে হত। সহজে এই রেজিসট্রেসন জোগাড় করা যেত না। এর জন্য ভূমি দপ্তরের আঞ্চলিক প্রধানকে ঘুষ দিতে হত। সারটিফিকেট জোগাড় করতে না পারলে সে মহাজনের কাছ থেকে 30 শতঅংশ সুদে ঋণ সংগ্রহ করে। এমন কি সরকারী ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিতে হলেও, ঋণের পুরো টাকা সে পায় না। ব্যাঙ্কের আমলা তা থেকে কিছু অর্থ আত্মসাৎ করে। 1977 সালের শীতকালে ইন্দোনেশিয়ার কৃষক সমিতির (Indonesian Farmers Association) একজন প্রধান কর্তাব্যক্তি সুহারতোকে বলেছিলেন যে কৃষকের গড় আয়ের অর্ধাংশেরও বেশী নানা ধরণের বে-আইনী পাওনা মিটাতে খরচ হয়ে যায়। সমাজের নানা স্তরে দুর্নীতি ছেয়ে গেছে। মহকুমা স্তরে একটা ছোটখাট কাজের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মচারীকে এক প্যাকেট সিগারেট ঘুষ দিলেই চলে। আবার কোটি কোটি ডলারের চুক্তিতে অনুমোদন পেতে হলে জাকার্তায় বড় আমলাকে লক্ষ লক্ষ ডলার ঘুষ না দিলেই চলে না। সব চেয়ে করুণ ব্যাপার হল ঘুষ দেওয়া এবং নেওয়া দাতা এবং গ্রহীতা উভয়ের পক্ষেই বিশেষ সামাজিক মর্যাদার চিহ্ন হিসাবে স্বীকৃতি পাচ্ছে। সংবাদপত্র এবং ছাত্রদের প্রতিবাদের চাপে মাঝে মাঝে নানা ধরণের কমিশন বসান হয়েছে। কিন্তু তাতে অবস্থার হেরফের ঘটে নি। ইন্দোনেশিয়ায় দুর্নীতি দীর্ঘকাল ধরে প্রশ্রয় পেয়েছে। যব-দ্বীপের রাজা ও সামন্তবর্গ নানা ধরণের সুযোগ সুবিধা ভোগে অভ্যস্ত ছিলেন। ডচ ইসট ইনডিয়া কোমপানির স্বল্প বেতনের কর্মচারীরা মাঝে মাঝেই কোমপানির অর্থ আত্মসাৎ করত। তাছাড়া ঘুষ দিয়ে ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য তারা কিছু কিছু বাণিজ্যিক সুযোগ সুবিধা আদায় করত। ওলন্দাজ গভর্ণর-জেনারেলদের শাসনকালে যবদ্বীপে সামন্ত শ্রেণী (*Priyayi*) ডচ কর্মচারীদের ঘুষ দিয়েই নিজেদের মান মর্যাদা ও সম্পত্তি বজায় রাখতে পেরেছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ইন্দোনেশিয়া ছিল জাপানের শাসনা-ধীনে। জাপানীরাও এই ঘৃণ্য ব্যবস্থার উচ্ছেদ সাধনে সমর্থ হয় নি। বরঞ্চ তারা এই ব্যবস্থায় কিছু নতুন পদ্ধতি যোগ করে। স্বাধীন ইন্দোনেশিয়ায় পঞ্চাশের দশকে শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে আদর্শনিষ্ঠা, শৃঙ্খলাবোধ ও চারিত্রিক পরিচ্ছন্নতা দেখা গিয়েছিল। সুকর্ণর আমলে আমলা বাহিনীর সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটলে দুর্নীতিও শাখা প্রশাখা বিস্তার করে। সুকর্ণর পতনের পর, বিশেষ করে ষাটের দশকের শেষ দিকে, নানাসূত্রে বিপুল পরিমাণে

বিদেশী মূলধন, বিদেশী অর্থ ও প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্য ইন্দোনেশিয়া পায়। ফলে দুর্নীতি সর্বগ্রাসী রূপ ধারণ করে, চারিত্রিক অধোগতি সর্বনাশ সূচনা করে এবং ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধান আরও বেড়ে ওঠে।

সত্তরের দশকের মাঝামাঝি ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের থিয়োডর. এম. স্মিথ ইন্দোনেশিয়া সম্বন্ধে একটি প্রতিবেদন লেখেন। এই প্রতিবেদনে তিনি জানান যে শুধুমাত্র বিধিসঙ্গত আয় দিয়ে সংসার চালাচ্ছেন, ইন্দোনেশিয়াতে এমন একজনও সরকারী কর্মচারী নেই। অধিকাংশ সরকারী কর্মচারী যা বেতন পান, তার দু'তিন গুণ বেশী তাকে আয় করতে হয় সংসার চালানোর জন্য। সাধারণ কর্মচারীরা সাধারণ ভাবেই মানুষকে প্রবঞ্চনা করে; সরকার অনুমোদিত অসংখ্য উদ্যোগে সামরিক বিভাগ নানাভাবে যুক্ত। আবার স্থানীয় বিত্তবান চীনাদের সঙ্গে নেতৃস্থানীয় ইন্দোনেশীয়দের সন্দেহজনক যোগাযোগ আছে। এই তিনটি স্তরে দুর্নীতিচক্র দেশের সর্বত্রই জটিল সমস্যা সৃষ্টি করেছে। বিচার বিভাগ সেখানে দুর্বল, করব্যবস্থা পুরানো ও অকেজো। সত্তরের দশকের দ্বিতীয়ার্ধে বিদেশী বিনিয়োগের পরিমাণ প্রচুর বেড়ে গিয়েছে। ফলে লোভ হয়েছে গগনচুম্বী, দুর্নীতি দুরপনেয়।

দুর্নীতি দমন অভিযানে ব্যর্থতা

দুর্নীতি বিরোধী অভিযান পরিচালনার জন্য সুহারতো 1977 সালে যাবতীয় দায়িত্ব অর্পণ করেন Sudomo নামে একজন নৌ-সেনাপতির উপর। দায়িত্ব পেয়েই দুর্নীতির অভিযোগে তিনি কর পরিদর্শক, ইমিগ্রেশন কর্মচারী, পরিবহন কর্মচারী, পাবলিক প্রসিকিউটর, জমির ফাটকাবাজ, ভূপতি (রিজেন্সির প্রধান) এবং ব্যাঙ্ক কর্মচারী ইত্যাদি নানা শ্রেণীর আমলার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দেন। Sudomo মনে করেন আসল সমস্যা হল মানুষের মনে আস্থা ফিরিয়ে আনা। এজন্য পাঁচ বছর এমনকি দশ বছর সময় লাগতে পারে সমাধানের পথ খুঁজে পেতে। বর্তমান রাজনৈতিক পরিবেশে মানুষের মনে আস্থা ফিরিয়ে আনা সহজসাধ্য নয়। কারণ, বিপুল অর্থ চুরি করেও কারো শাস্তি হবে না, যদি শাসকদলের প্রতি তার রাজনৈতিক আনুগত্য থাকে। আনুগত্য না থাকলে, তাকে জেলে যেতে হবে। তাছাড়া, স্বয়ং সুহারতোর পরিবারের লোকজন, বিশেষ করে তার স্ত্রী, ভাই ও সৎভাই দুর্নীতিগ্রস্ত। জমিজমা, পশুপালন, সিমেন্ট ও বস্ত্র উৎপাদন, জুয়াখেলা, হোটেল ও নৈশ ক্লাব পরিচালনা প্রভৃতি নানা উদ্যোগের সঙ্গে তারা জড়িত। ধনী চীনাদের সঙ্গে একযোগে নানা আপত্তিজনক কারবারে

তারা লিপ্ত ছিলেন। একথা সর্বজনবিদিত যে সেনাবাহিনীর কাছ থেকে সবুজ সঙ্কেত না পেলে সুহারতো পরিবারের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে Sudomo সাহস করবেন না। ঠিক এই কারণেই যে কোন দুর্নীতি দমন ব্যবস্থায় সাধারণ মানুষের এতটুকুও আস্থা নেই।

সংকটের মৌলিক প্রকৃতি

ইন্দোনেশিয়ায় অদ্যাপি প্রকৃত অর্থে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ বা দায়িত্বের ব্যাপক পুনর্বিন্যাস ঘটে নি। সেখানে আমলাতন্ত্রই সর্বেসর্বা, সরকারের নিজস্ব রাজনৈতিক দল, Golkar এর হাতে যাবতীয় ক্ষমতা ন্যস্ত। প্রতি পাঁচ বছর অন্তর নির্বাচন হয় ঠিকই। নির্বাচনের আগে দু'মাস জোর প্রচার অভিযান চলে, তাও সত্যি। কিন্তু সরকারের বিরুদ্ধে সমালোচনা নির্দিষ্ট ক্ষেত্র ছাড়া নিষিদ্ধ। বিরোধী দলের ভূমিকা নিষ্ক্রিয়। সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিকাশের সঙ্গে নিজেদের সংযুক্ত করার সুযোগ দরিদ্র গ্রামবাসীর নেই। প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় আইন সভায় চাপ সৃষ্টি করার মত কোন সংস্থা বা গোষ্ঠী তাবা গড়ে তুলতে পারে নি। উচ্চপদের আমলারা দেশ শাসনের নীতি নির্ধারণ করে। কিন্তু এই ব্যাপারে তারা মধ্য স্তর ও নিম্ন পদের আমলাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে না। ফলে উচ্চ মান ও উচ্চ পদের আমলাদের সঙ্গে নিম্ন মান ও নিম্ন পদের আমলাদের ব্যবধান দুরতিক্রম্য হয়ে উঠেছে। এই আমলাতান্ত্রিক শাসন কাঠামো তাই আদর্শহীন, লক্ষ্যহীন যন্ত্রবিশেষ। অমানবিক যান্ত্রিক পরিবেশে সাধারণ মানুষও নিষ্প্রাণ ও ও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে। যাবতীয় সামাজিক ন্যায় বিচার থেকে সাধারণ মানুষ বঞ্চিত। বর্তমান শতাব্দীর অন্তিম পর্বে ইন্দোনেশিয়ার জনসংখ্যা আনুমানিক 200 মিলিয়ণ হবে। কিন্তু তাদের সামনে ভবিষ্যৎ এতটুকু উজ্জ্বল নয়। দুর্নীতি ও ধনগরিমার অতিলোলুপতা ছাড়া অন্য কোন মহৎ জীবনের চিত্র তাদের দৃষ্টিগোচর নয়। নৈতিক ও সাংস্কৃতিক সঙ্কটের সময় মানবিক মূল্যকে আশ্রয় করেই সমাজ গঠনে তৎপর হতে হয়। বেদনার কথা, মানবিক মূল্যবোধের আহবান ইন্দোনেশিয়ায় কোথাও হয়ত শ্রুতিগোচর নয়।

সুহারতোর একটি প্রিয় প্রকল্পের কথা এখানে উল্লেখ করছি। জাভার বেশ কয়েক লক্ষ মানুষকে তিনি অন্যত্র জনবিরল দ্বীপে স্থানান্তরিত করার কথা ভেবেছিলেন। *1976* থেকে *1978* সালের মধ্যে একাজে হাত দেওয়া হল। *1979* সালের এপ্রিল মাসে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শুরু হলে

সরকার ১ লক্ষ পরিবার স্থানান্তরিত করার কথা চিন্তা করেছে। কিন্তু একথা তারা চিন্তায় আমল দেন নি যে এমন কি ভূমিহীন মানুষও নিজের পূর্বপুরুষের ভিটা ছেড়ে অন্যত্র যেতে আগ্রহী নয়। অনেক দিন ধরে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রস্তুতি গড়ে না তুলে ও আলাপ আলোচনা না করে, এই ধরণের নীতি বা সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত নয়।

জোগজাকারতা গজমদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতিবিদরা মনে করেন যে এই ভাবে অর্থের অপচয় না করে সরকারের উচিত ছিল ভূমিহীন কর্মহীন মানুষকে ছোটখাট উদ্যোগ গড়ে তুলতে সাহায্য করা। গ্রামের মানুষ বাঁচার তাগিদে ধান বা বিকল্প শস্য চাষ করে, আঞ্চলিক উৎপন্ন জিনিস বাজারে বিক্রি করে, হস্ত শিল্প নিয়ে পরীক্ষা চালায়, ফল মূলের খেত করে বা পশুপালন করে। কিন্তু এই সব বিকল্প উপজীবিকা সরকারেব পক্ষ থেকে কোন উৎসাহই পায় নি।

যুব-অসন্তোষ

1978 সালের একটি পরিসংখ্যান থেকে জানা গেছে যে ইন্দোনেশিয়ার জনসংখ্যার অর্ধাংশ উনিশ বছরের নিচে, দুই-তৃতীয়াংশ পঁচিশ বছরের নিচে। সেখানে বেকারদের অধিকাংশই বিশ থেকে ত্রিশ বছরের মধ্যে। এই সংখ্যাগুলি মনে রাখলে ইন্দোনেশিয়াতে যুব অসন্তোষের পরিধি বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় না। 1977-78 সালে ইন্দোনেশিয়াতে ছাত্র আন্দোলন উত্তাল হয়ে উঠেছিল। পশ্চিম জাভায় বান্দুং বিশ্ববিদ্যালয়ে এই আন্দোলন শুরু হয়। পরে তা জাভময় ছড়িয়ে পড়ে। 40-50 টি ক্যামপাস গোষ্ঠীতে এই আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল। আগের মত বলিষ্ঠ আদর্শনিষ্ঠ নেতৃত্ব এই আন্দোলনে ছিল না। 1977 সালে বান্দুং-এর ছাত্ররা নানা দাবি সম্বলিত একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করে। মূল দাবি ছিল যে সুহারতো যেন রাষ্ট্রপতি পদের নির্বাচনে না দাঁড়ান। কয়েকজন ছাত্রনেতা গ্রেপ্তার হলে, এই আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে। ছাত্রদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা চালানোর জন্য বিভিন্ন শহরে সরকার 7 জন ক্যাবিনেট মন্ত্রী পাঠান। তাদের আলোচনা ফলপ্রসূ হয় নি। একথা অবশ্য সত্য যে রুদ্ধশ্বাস রাজনৈতিক পরিবেশে একমাত্র সজাগ ও সোচ্চার ছাত্র আন্দোলনের মধ্যেই সমস্ত দেশের প্রতিবাদ মূর্ত হয়ে উঠেছিল।

1920 এর প্রজন্মের ছাত্রসমাজ নানা মত ও পথ নিয়ে তর্কবিতর্ক করেছে। তাদের মধ্য থেকে বৈপ্লবিক নেতৃত্ব জন্ম নেয় নি। 1945 এর প্রজন্মের ছাত্রসমাজ জাপানী শাসনের অধীনে নিষ্ঠুর অভিজ্ঞতা লাভ করেছে। চার বছর

ধরে নিরন্তর সংগ্রাম করে ওলন্দাজ শক্তির হাত থেকে তারা স্বাধীনতা অর্জন করেছে। 1966-র প্রজন্মের ছাত্ররা ছিল সুকর্ণ ও কম্যুনিস্ট পার্টির মন্ত্রে দীক্ষিত। কিছুদিন পর তাদের অনেকেই সরকারী দপ্তরে কাজ নিয়েছে, সরকারী দল গোলকরের সভ্য হয়েছে, ব্যবসা বাণিজ্য করে স্ফীত হয়েছে: অনেকে গবেষণাগারের 'নিরাপদ কক্ষে আশ্রয় নিয়েছে এবং অনেকে অর্থ, সম্মান ও নিরাপত্তার লোভে বিদেশে পাড়ি দিয়েছে। কিন্তু 1980 প্রজন্মের ছাত্রসমাজের সামনে যে সমস্যা আছে, তা যেমন বিবিধ, তেমন জটিল। পূর্বসূরীদের মত প্রচণ্ড উন্মাদনা তাদের নেই। আন্দোলনের সুপরিকল্পিত লক্ষ্য ও কৌশলও তাদের অজানা। তাদের কাজের মধ্যে নির্দিষ্ট ধারাবাহিকতা নেই। তাদের পরিচালনা করার মত যোগ্য নেতৃত্বও নেই। বিগত প্রজন্মের ছাত্রনেতাদের করুণ পরিণতি দেখে তারা হতাশায় ম্রিয়মান। তারা এখন প্রত্যয়ের সংকটের মুখোমুখি।

মুসলমান সমাজে বিক্ষোভ

সত্তরের দশকে মুসলমান সম্প্রদায়ের পুঞ্জীভূত অসন্তোষ সংগঠিত রূপ নিয়েছে। অধিকাংশ মুসলমান ভেবেছে যে আর্থিক বিকাশ ও উদ্যোগের ক্ষেত্রে তাদের দাবি অবহেলিত হয়েছে। ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ না পাওয়ার জন্য অনেকেরই ব্যবসাবাণিজ্য হাতছাড়া হয়ে গেছে। আইনসভায় মুসলিম বিবাহ সংক্রান্ত আইন সংশোধনের প্রশ্ন উঠলে মুসলমানরা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। 1945 সালের শাসনতন্ত্র অনুসারে ইন্দোনেশিয়ায় চার ধরণের বিবাহ আইন প্রচলিত ছিল ঃ 1. ইসলামী আইন, যার দ্বারা বহু বিবাহ প্রথা স্বীকৃত ছিল; 2. পশ্চিমী ও চীনাদের জন্য সিবিল কোড; 3. খ্রীস্টানদের জন্য স্বতন্ত্র আইন; এবং 4. *Adat* অর্থাৎ প্রথাসিদ্ধ আইন, যা মূলত অ-ধর্মী-গণের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হত। সুহারতো এই চারটি আইন রদ করে ইন্দোনেশিয়ার উপযোগী এক নতুন বিবাহ আইন চালু করার কথা ভেবেছিলেন। তাঁর প্রস্তাবিত আইনে বহু বিবাহ প্রথা অনুমোদিত হয় নি। বিভিন্ন জাতি ও ধর্মাবলম্বী দম্পতির মধ্যে বিবাহে সরকারী অনুমোদনের প্রয়োজন হবে, প্রস্তাবিত আইনে এ ধরণের নির্দেশ ছিল। এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মুসলমান সমাজ প্রবল প্রতিবাদ জানায়। পাঁচশ' তরুণ তরুণী আইনসভা আক্রমণ করে। তাদের মধ্যে 13 জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তীব্র প্রতিবাদের ফলে সরকারী প্রস্তাবে কিছু রদবদল হয়েছিল। স্ত্রী বা স্ত্রীদের অমতে বহু বিবাহ সিদ্ধ নয়, ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে বিবাহে সরকারী অনুমোদনের

প্রয়োজন নেই, স্বতন্ত্র বিবাহ আদালত বজায় রাখা হবে—এই সব শর্ত যোগ করে নতুন বিবাহ আইন গৃহীত হয়েছিল।

1977 সালের নির্বাচনে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে ইসলামকেন্দ্রিক সংহতি সুদৃঢ় হয়। চারটি মুসলমান রাজনৈতিক দল সম্মিলিত হয়ে ইউনাইটেড ডেভালেপমেন্ট পার্টি গড়ে তোলে। নির্বাচনে তাদের প্রতীক চিহ্ন ছিল পবিত্র কাবা মসজিদ। দেশের অসংখ্য মসজিদে তাদের নির্বাচনী জমায়েৎ হত। বিতর্কমূলক রাজনৈতিক আলোচনার উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ থাকায় তারা নির্বাচনী প্রচারে ধর্মকেই বেশী গুরুত্ব দিয়েছে। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে পূর্ব জাভায় কিছু হিংসাত্মক ঘটনা ঘটেছে, এমন কি পি.পি.পি. দলও গণরোষকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে নি।

ইসলামী আন্দোলন দ্বিধা বিভক্ত : সনাতন পন্থা বনাম আধুনিক পন্থা। সনাতনপন্থীদের সঙ্গে আধুনিকতাপন্থীদের বিরোধ হচ্ছে আসলে দুই প্রজন্মের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীর বিরোধ। সনাতন পন্থা মুসলমান সম্প্রদায়ের বয়স্ক মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ইসলামের মূল বাণী এবং *Nahdatul, Ulema* নামক রক্ষণশীল রাজনৈতিক দলের কর্মপদ্ধতি তাদেব প্রধান আশ্রয়। উলেমা-নির্ভর এই দলটির শাখা প্রশাখা গ্রামে গ্রামান্তবে ছড়িয়ে আছে। ইসলামী রাষ্ট্রগঠনের স্বপ্নে তারা বিভোর।

আধুনিকতাপন্থীগণ বয়সে তরুণ। তারা সংস্কারবাদী। তারা ইসলামী রাষ্ট্রগঠনের বিরোধী। তারা ইসলামধর্মে বিশ্বাসী, কিন্তু রাজনৈতিক দৃষ্টি-ভঙ্গীতে জাতীয়তাবাদী। তারা চায় সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র। উলেমারা স্ত্রীপুরুষের সহ-শিক্ষার বিরোধী। কিন্তু আধুনিকতা-পন্থীগণ সহ-শিক্ষা প্রবর্তন করতে চায়। উলেমারা রমজানের সময় স্কুল কলেজ বন্ধ রাখতে চায় কিন্তু আধুনিকতাপন্থীরা খোলা রাখতে চায়। সুকর্ণ প্রচারিত পঞ্চশীল (ঈশ্বরে বিশ্বাস, জাতীয়তাবাদ- মানবতাবাদ, গণতন্ত্র ও সামাজিক ন্যায় বিচার) তারা এখনও অনুকরণীয় আদর্শ বলে মনে করেন। তারা বলেন অযোগ্য নেতৃত্বের জন্য এই আদর্শগুলির ধার কমে গেছে। আধুনিক যুগোপযোগী নতুন ভষ্য দিয়ে এই সব মহামূল্য আদর্শ সঞ্জীবিত করা দরকার। সনাতনপন্থীদের বিরুদ্ধে তারা প্রকাশ্য বিরোধে অবতীর্ন হতে রাজী নয়। তারা জানে, বিরোধের সুযোগ নিয়ে সেনাবাহিনী তাদের কাজে হস্তক্ষেপ করবে। তাই তারা এখন গ্রামীণ উন্নয়ন ও নতুন গুণচেতনা সৃষ্টির কাজে আত্মনিয়োগ করেছে। ইন্দোনেশিয়া নানা ধর্ম, নানা জাতি ও বহু ভাষার দেশ। সে কারণে তাদের রাষ্ট্র চিন্তায় ইসলামের আদর্শ আর প্রাধান্য

পাচ্ছে না। স্ক্যানডেনেভিয়ার দেশগুলির রাজনৈতিক দলসমষ্টি ও জারমানির স্যোসালিস্ট পার্টি ঘোষিত অগ্রসর সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা বর্তমান আধুনিকতাপন্থীদের প্রেরণার উৎস।

ইন্দোনেশিয়ায় সমস্যার অন্ত নেই। মুসলমান সমাজে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অসন্তোষ বেশ প্রকট হয়ে আছে। সুহারতোর পর কে ? এই প্রশ্ন নিয়ে সামরিক ও বেসামরিক দপ্তরের মধ্যে বিবাদ আছে এবং এই বিবাদ আরও তীব্র হবে। দেশে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভারসাম্যের অভাব আছে। দুর্নীতি, ধনবৈষম্য ও সামাজিক ন্যায় বিচারের অভাব সবকিছু বিষাক্ত করে তুলেছে। 1965 ও 1967 সালের মত সরকার বিরোধী ছাত্র-আন্দোলন উত্তাল হয়ে উঠতে পারে। আবাব এমন সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না যে বিবেকসম্পন্ন তরুণ সেনাপতিরা দুঃসহ পরিস্থিতির অবসানের জন্য প্রগতিশীল বৈপ্লবিক সরকার গঠনে অগ্রণী হবে। স্বস্তির কথা যে ইন্দোনেশিয়ার কোন শক্তিশালী বহিঃশত্রু নেই। কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বৃহৎ শক্তিবর্গের প্রতিযোগিতা, বিশেষ করে চীন ও সোভিয়েট রাশিয়ার শক্তিদ্বন্দ্ব, ইন্দোনেশিয়াব পক্ষে উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কমিউনিস্ট ভিয়েতনামের কাম্বোডিয়া আক্রমণ এবং চীনের ভিয়েতনাম আক্রমণে ইন্দোনেশিয়া দুশ্চিন্তা বোধ করেছে। 1965 সালের অভ্যুত্থানে, ইন্দোনেশিয়ার কমিউনিস্টদের চীন যে ভাবে সাহায্য করেছিল, সেই বেদনাময় স্মৃতি আজও সেখানে অম্লান।

॥ 17 ।

সাম্প্রতিক মালয়েশিয়া

নানা জাতি, নানা ভাষা

1978 সালের একটি হিসেব থেকে জানা গেছে যে পশ্চিম মালয়েশিয়া অর্থাৎ উপদ্বীপ মালয়েশিয়ার জনসংখ্যা হচ্ছে 10.25 মিলিয়ণ। তাদের মধ্যে 5.3 মিলিয়ণ মালাই এবং 3.5 মিলিয়ণ চীনা। তাছাড়া সেখানে ভারতীয়, পাকিস্তানী, শ্রীলঙ্কাবাসী, ইউরোপীয় ও স্থানীয় আদিবাসীদের মিলিত সংখ্যা হচ্ছে এক মিলিয়ণের কিছু বেশী। পশ্চিম মালয়েশিয়ার রাজ্য-সংখ্যা হচ্ছে এগারো। উত্তর বোর্ণিও এখন পূর্ব মালয়েশিয়া নামে পরিচিত। পশ্চিম মালয়েশিয়া থেকে চার শত মাইল দূরে অবস্থিত পূর্ব মালয়েশিয়ায় সারাবাক ও সাবা নামে দুটি রাজ্য আছে। সারাবাকের জনসংখ্যা 1.1 মিলিয়ণ এবং সাবা রাজ্যের নয় লক্ষ।

ট্রাইবাল সী (Tribal Sea) এবং ল্যান্ড ডায়াক্‌স্‌ (Land Dyaks) সারাবাকের প্রধান জাতিগোষ্ঠী। তাদের মধ্যে কেউ কেউ ইবান (Ibans) নামেও পরিচিত। তাছাড়া সেখানে চীনা ও মালাই গোষ্ঠীভুক্ত মানুষও আছে। সাবাতে একক বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর নাম হল কাদাজান্‌স্‌ (Kadazans)। এই আঞ্চলিক জনগোষ্ঠী দুসুন (Dusuns) নামেও পরিচিত। সেখানে দেড় লক্ষ চীনা এবং মাত্র ত্রিশ হাজার মালাই আছে। এছাড়া সেখানে আছে অর্ধডজন নানা জাতি ও উপজাতির আঞ্চলিক মানুষের সমাবেশ।

ভূখণ্ডে ও সমুদ্রে প্রায় তিন লক্ষ বর্গ মাইল পরিব্যাপ্ত মালয়েশিয়ায় ছড়িয়ে আছে নানা জাতি উপজাতির মানুষ। তাদের ধর্মীয়, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক বিরোধ ও বৈষম্য পরস্পরবিরোধী রাজনৈতিক স্বার্থের তৈলাক্ত ইন্ধনে উগ্র হয়েছে। তাই সেখানে সুশৃঙ্খল শাসনযন্ত্র গড়ে ওঠে নি। তৎকালীন মালয় অর্থাৎ বর্তমান পশ্চিম মালয়েশিয়া 1957 সালে ব্রিটেনের অধীনতা পাশ মুক্ত হয়ে স্বাধীনতা অর্জন করে।

রাজতন্ত্র, সংসদীয় ব্যবস্থা এবং সুলতানপুঞ্জের অধীনে তখন স্বাধীন

মালয়ের পরিবর্তিত নাম হল ফেডারেশন অব মালয়। 1963 সালে এই ফেডারেশনের সঙ্গে সাবা, সারাবাক এবং সিঙ্গাপুর সংযুক্ত হবার ফলে বর্তমান মালয়েশিয়ার জন্ম হয়েছিল। অন্তর্দ্বন্দ্বে বিক্ষত দুটি বছর অতিক্রান্ত হলে সিঙ্গাপুর এই ফেডারেশন থেকে বেরিয়ে আসে এবং সেখানে স্বতন্ত্র স্বাধীন প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

অর্থনৈতিক পরিকল্পনা

1956 সাল থেকে পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার প্রারম্ভিক পদক্ষেপ শুরু হয়েছিল। তখন থেকেই সমাজের প্রতিটি স্তরবিন্যাস প্রসঙ্গে প্রচুর তথ্য ও পরিসংখ্যান সংগৃহীত হয়েছে। পরিকল্পনাগুলিতে গ্রামীণ উন্নয়নের লক্ষ্য প্রাধান্য পেয়েছে। প্রথম মালয়েশিয়া পরিকল্পনাতে (1966-1970) উপদ্বীপ মালয়েশিয়া, সাবা এবং সারাবাক-এর অর্থনৈতিক বিকাশের মধ্যে সংহতি সাধন প্রচেষ্টাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।' দ্বিতীয় মালয়েশিয়া পরিকল্পনার (1971-1975) মূল লক্ষ্য হল জাতীয় ঐক্য। জাতি নির্বিশেষে সমগ্র মালয়েশীয়গণের মধ্যে থেকে দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য একটি বিশেষ নতুন অর্থনৈতিক নীতি ঘোষণা করা হয়েছিল। সমাজে নানা জাতির মধ্যে অর্থনৈতিক ভারসাম্যের যে অভাব আছে, তা দূর করে এবং মালাই 'ভূমিপুত্র'দের স্বার্থ বিশেষভাবে সংরক্ষণ করে সমাজের পুনর্গঠন কাম্য, এই আদর্শের কথা নতুন অর্থনৈতিক নীতিতে বিঘোষিত হয়েছিল।

তৃতীয় মালয়েশিয়া পরিকল্পনায় (1976-1980) সমাজ বিন্যাসের ক্ষেত্রকে আরও প্রসারিত করা হয়েছে। 1990 সাল নাগাদ সামগ্রিক জাতীয় সম্পদ ও আয়ের পুনর্বণ্টনের কথা তৃতীয় পরিকল্পনায় স্থান পেয়েছে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী 1970 সালে সেখানে লিমিটেড কোমপানিগুলিতে মালাইদের মূলধন স্বত্ব হচ্ছে মাত্র 2.4 শতাংশ, ইউরোপীয়, মার্কিন ও জাপানী 63.3 শতাংশ এবং চীনা ও স্বল্পসংখ্যক ভারতীয়দের 34.3 শতাংশ। ইনডাসট্রিয়াল কো-অর্ডিনেশন অ্যাক্ট-এ বর্ণিত নতুন অর্থনৈতিক নীতি অনুযায়ী 1990 সাল নাগাদ যাবতীয় নতুন কোমপানিতে এবং পুরাতন কোমপানির বর্ধিত বিনিয়োগে মালাইদের স্বত্ব হবে 30 শতাংশ, চীনা, ভারতীয় ও অন্যান্য এশীয়দের 40 শতাংশ এবং বিদেশীদের 30 শতাংশ। অনুমান করা হয়েছে যে 1990 সাল নাগাদ বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়বে 1970 সালের তুলনায় পাঁচ গুণ, উৎপাদনের ক্ষেত্র প্রসারিত হবে এবং জাতীয় উৎপাদনের মূল্য বাড়বে বার্ষিক 8 শতাংশ পরিকল্পিত হারে।

তৃতীয় পরিকল্পনার আমলে রবার, টিন, পাম তৈল, গোলমরিচ ও অন্যান্য

জিনিষ রপ্তানি করে মালয়েশিয়া প্রচুর অর্থ আয় করেছে। কিন্তু দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগ অপ্রত্যাশিতভাবে কমেছে।

আশা করা হয়েছিল বিনিয়োগ বাড়বে বার্ষিক 10 শতাংশ হারে। কিন্তু 1978 সাল পর্যন্ত বিনিয়োগ বেড়েছে মাত্র 3 বা 4 শতাংশ হারে। মালয়েশীয় অর্থনীতিবিদগণ মনে করেন, এর জন্য দায়ী বিশ্বব্যাপী মন্দা। কিন্তু সমালোচকরা বলেন যে ইনডাসট্রিয়াল কো-অরডিনেশন অ্যাক্ট-এর কঠোরতার জন্য বর্ধিত বিনিয়োগ সম্ভব হয় নি। তাছাড়া, পেট্রোলিয়ম এমেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট-এর বিধান মতে সরকারী তৈল কোমপানি পেট্রেনাস (Petronas), কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার লভ্যাংশ পাবে 83.5 শতাংশ হারে এবং শেল (Shell) ও এক্সন (Exxon) এর মত বেসরকারী কোমপানি লভ্যাংশ পাবে মাত্র 16.5 শতাংশ হারে। এই ধরণের শর্তের জন্যও বিনিয়োগ বাড়ে নি। কঠোর অর্থনৈতিক শর্ত সত্ত্বেও 1976 থেকে 1978 সালের মধ্যে এক্সন প্রভৃতি বিদেশী কোমপানি যথেষ্ট অশোধিত তৈল পেয়েছে এবং অর্থ আয় করেছে; তৈল ও প্রাকৃতিক গ্যাস শিল্পের প্রতি স্তরে বিনিয়োগ দ্বিগুণ হয়েছে। রবারের পরেই পেট্রোলিয়ম হয়েছে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের দ্বিতীয় প্রধান উপকরণ। নতুন অর্থনৈতিক নীতিতে বলা হয়েছিল যে মোট বিনিয়োগের লক্ষ্য মাত্রা হবে 18 বিলিয়ণ ডলার, এর 60 শতাংশ হবে বেসরকারী এবং 40 শতাংশ হবে সরকারী বিনিয়োগ। বাস্তব চিত্র হল, এই লক্ষ্যমাত্রা অপূর্ণ থেকে গেছে।

মালয়েশিয়ায় বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদ সত্ত্বেও, আয় বন্টনের মধ্যে প্রচুর বৈষম্য আছে। বিশ্বব্যাঙ্কের এক সমীক্ষা থেকে জানা গেছে যে সত্তরের দশকের মাঝামাঝি জনসংখ্যার চল্লিশ শতাংশের মাসিক পারিবারিক আয় ছিল 25 মালয়েশীয় ডলারের (10 মার্কিন ডলার) নিচে। এ সব পরিবারের 87 শতাংশ হল চাষী বা খেত মজুর শ্রেণীভুক্ত। তাদের অধিকাংশই নারকেল চাষ করে, এবং কেউ কেউ নিজস্ব কয়েক একর জমির উপর রবার গাছ রোপণ করেছে। অবশিষ্টাংশ হল ধানচাষে নিযুক্ত কৃষক, জেলে এবং ভূমিহীন মজুর। যে সব পরিবারের সমীক্ষা নেওয়া হয়েছে, তাদের 77 শতাংশ হল মালাই এবং 14 শতাংশ হল চীনা।

বিশ্বব্যাঙ্কের মতে পরিকল্পনার প্রাথমিক লক্ষ্য হবে গ্রামীণ উন্নয়ন। ব্যাপক গ্রামীণ দারিদ্র্যের নিরসনে আয়ের এবং চাকুরির জাতিভিত্তিক পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন। বিভিন্ন দরিদ্র শ্রেণীর মানুষের বিশেষ বিশেষ সমস্যাগুলিও চিহ্নিত করার কাজে আরও তৎপর হওয়া কাম্য। কেলানতান ও ত্রেঙ্গানুর মত কয়েকটি রাজ্য অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চাৎপদ। সমস্যা হিসাবে দারি-

দ্যেরও প্রকারভেদ আছে। তাই সমাধানের পন্থাও হচ্ছে বিচিত্রগামী। মালয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখিয়েছেন যে মালয়ে অর্থনৈতিক আধুনিকীকরণে মালাইরা দর্শক মাত্র, অংশীদার নয়। জাতি ও কৃষ্টিগত তারতম্য হেতু মালাইদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখানো প্রয়োজন, এই যুক্তিতে তারা বিশ্বাসী নন। এতে সাম্প্রদায়িকতা বৃদ্ধি পাবে এবং প্রতিপক্ষ শ্রেণী রাজনৈতিক বিক্ষোভে ইন্ধন জোগাবে।

মালাই নেতৃবৃন্দ মনে করেন যে নিজ দেশে মালাইরা নিরাপত্তার অভাবে আতঙ্কিত। তাদের মধ্যে নিরাপত্তা বোধ ফিরিয়ে আনার জন্যই ভূমিপুত্র সহায়কনীতি গৃহীত হয়েছে। এই নীতির ফলে শুধুমাত্র যে মালাইরা উপকৃত হবে, তা নয়। অন্যান্য জাতিও তাদের সমৃদ্ধির অংশীদার হবে। লক্ষীমন্ত মালাইরা শুধুমাত্র হজ্বযাত্রার জন্য বিত্ত সঞ্চয় করে। তা না হলে, তারা অর্জিত সম্পদ ব্যয় করে। ব্যয় করে বলেই, চীনা বণিক, ঠিকাদার, কারখানার মালিক সবাই উপকৃত হয়। মালাই নেতৃবৃন্দের এ আশ্বাস সত্ত্বেও সেখানকার ভারতীয় ও চীনাদের মনে এ ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে যে ভূমিপুত্র-নীতির ফলে মালয়ে তাদের কার্যকরী ভূমিকার অবসান হয়েছে। স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে চীনারাই সবচেয়ে বিত্তশালী। তা সত্ত্বেও, বৃত্তিভোগী চীনারা শঙ্কাতুর হয়ে আছে। বেশ কয়েক হাজার চীনা ডাক্তার ও আইনজীবী ইতিমধ্যে মালয়েশিয়া ছেড়ে তাইওয়ান ও অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে আশ্রয় নিয়েছেন।

অনেক নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষক মনে করেন যে নতুন অর্থনৈতিক নীতিতে বিঘোষিত ভূমিপুত্র সংরক্ষণ প্রচেষ্টার ফলে জাতিবিদ্বেষ বাড়বে। মালাই বনাম ভারতীয় বা মালাই বনাম চীনা দ্বন্দ্ব বাড়বে; শুধু তাই নয়, মালাইদের মধ্যেও অন্তর্দ্বন্দ্ব বাড়বে। কোন জাতিই সমসত্ত্ব (homogeneous) নয়। মালাই জাতিও নয়। অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধার ফলে তাদের মধ্যে উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী সৃষ্টি হয়েছে। নগরকেন্দ্রিত উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত মালাইরা সম্পৎশালী চীনাদের সঙ্গে সগোত্র আত্মীয়তা বোধ করেছে। একথা ঠিক জাতীয় ঐক্যের প্রশ্নটি নিছক ধনবন্টনের সমস্যা নয়। রাজনৈতিক অধিকার ও সাংস্কৃতিক সাঙ্গীকরণের জটিল সমস্যা মালয়েশিয়ার ক্ষেত্রে অধিক প্রাসঙ্গিক। জাতি নির্বিশেষে ব্যক্তির মানবিক স্বার্থরক্ষার জন্য কোন সংস্থা মালয়েশিয়াতে গড়ে ওঠে নি। সেখানে ধনোৎপাদন যতটা প্রাধান্য পেয়েছে, সামাজিক ন্যায় বিচার ও সমন্বয় প্রচেষ্টা ততটা গুরুত্ব পায় নি। তৃতীয় মালয়েশিয়া পরিকল্পনায় একথা স্বীকার করা হয়েছে। একারণে জন

স্বাস্থ্য, পুষ্টি, গ্রাম্য আবাসন, বস্তি উন্নয়ন, নারী মুক্তি ও ক্রেতা সমবায় প্রভৃতি বিভিন্নমুখী আন্দোলন তৃতীয় পরিকল্পনায় স্থান পেয়েছে। কিন্তু এগুলির প্রতিটি ক্ষেত্রে আশানুরূপ তথ্যভিত্তিক নীতি নির্ণয় সম্ভব হয় নি।

মালাইদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা সরকারী নীতির মূল লক্ষ্য হয়েছে। এতদিন যাবৎ রাজনৈতিক ক্ষমতার অগ্রাধিকার লাভে বঞ্চনা চীনাদের আহত করেনি। অতুল বৈভবে তারা আত্মপ্রসাদ বোধ করেছে। কিন্তু ভূমিপুত্র নীতির ফলে তাদের ধনগরিমা লুপ্ত হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এ জন্য তারা শঙ্কাতুর। মালয়ের আমলাতন্ত্রে মালাইদের আধিপত্য চীনা ও ভারতীয়রা অসহনীয় মনে করছে। ফলে এক নতুন ধরণের সঙ্কট উপস্থিত হয়েছে। মালাইরা এখন কঠোর পরিশ্রমে বিমুখ। কারণ তারা জানে বিনা পরিশ্রমেই তারা অগ্রাধিকার পাবে। চীনা এবং ভারতীয়রা আগের মত উদ্যোগী নয়। কারণ, তারা জানে কঠোর পরিশ্রম করলেও তারা অগ্রাধিকার পাবে না।

শিক্ষা ও সংস্কৃতি

শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও জাতিদ্বন্দ্বের প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে। 1957 সাল থেকে মালাই ছিল দেশের রাষ্ট্রভাষা। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রতিটি জাতির নিজস্ব ভাষায় শিক্ষালাভের অধিকার ছিল। দেশব্যাপী বেসরকারী প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে চীনা ভাষায় শিক্ষা দান চালু ছিল। 1970 সাল নাগাদ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একমাত্র মালাই ভাষাকেই শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। সত্তরের দশকের শেষ দিকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরেও মালাই ভাষায় যাবতীয় শিক্ষাদান শুরু হয়েছে। ছাত্র শিক্ষক সবাইকে তাই মালাই ভাষা শিখতে হয়েছে। চীনাদের জন্য বেসরকারী বিদ্যালয়ে চীনা ভাষায় শিক্ষাদান অব্যাহত থেকেছে। কিন্তু মালয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অথবা পশ্চিম মালয়েশিয়ার সাতটি উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশুনা করতে হলে চীনাদেরকেও মালাই ভাষা শিখতেই হবে। ইংরেজি অবশ্য দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে সম্মানিত। মালয় বিশ্ববিদ্যালয়ে একদা অধিকাংশ ছাত্র ছিল চীনা। 1978 সাল নাগাদ সেখানে আনুমানিক দশ হাজার ছাত্রের মধ্যে অর্ধাংশের বেশী হচ্ছে মালাই।

1974 সালে মালয় বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বিরাট ছাত্র আন্দোলন ঘটেছিল। সুখের কথা, আন্দোলনের হেতু জাতিবিদ্বেষ নয়, দারিদ্র্য। কুআলা লুম্পুর

থেকে দুশো মাইল দূরে বালিং (Baling) অবস্থিত। বালিং কেদা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। কেদা রাজ্য বরাবরই অভাবগ্রস্ত। রবারের বাজার দর নেমে গেলে, সেখানে দুর্গতির সীমা ছিল না। অনাহারে একটি বালকের মৃত্যু ঘটে। বিষাক্ত মূল খেয়ে আরও পাঁচ জন মারা যায়। দুর্গতি নিরসনে সরকারী ব্যর্থতায় মানুষের বিক্ষোভ বেড়ে যায়। 1974 সালে নভেম্বর মাসের শেষ দিকে বালিং থেকে দশ হাজার মানুষের এক শোভাযাত্রা প্রতিবাদে উত্তাল হয়ে ওঠে। পুলিশ কাঁদুনে গ্যাস ব্যবহার করে। ডিসেম্বর মাসে মালয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গন থেকে তিন চার হাজার ছাত্রের একটি শোভাযাত্রা পাদাং-এর প্রান্তরে এসে জমায়েৎ হয়। সহস্রাধিক ছাত্র গ্রেপ্তার বরণ করে।

ঘটনাটি চমকপ্রদ মনে নাও হতে পারে। কিন্তু ঘটনার পরিণতি বিশেষ অর্থবহ হয়ে উঠেছে। 1975 সালের এপ্রিল মাসে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ সংক্রান্ত আইন সংশোধন করা হয়। সংশোধিত আইনে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে পাঁচ জনের বেশী ছাত্রের সভা, সমিতি, সমাবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে, বিশেষ অনুমতি ছাড়া ছাত্রদের পাঠক্রম বহির্ভূত কাজকর্ম নিষিদ্ধ হয়েছে এবং নিষেধাজ্ঞা অমান্য করলে কঠোর শাস্তির বিধান ঘোষিত হয়েছে। মালয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গঠনতন্ত্র পালটিয়ে আচার্য ও তাঁর মনোনীত ব্যক্তির হাতে বিপুল দমনমূলক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। সরকারী নির্দেশে বিশ্ববিদ্যলয়ের ফ্যাকালটি সভ্যদের রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা খর্ব করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকালটিগুলি প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছে।

1974 সালের ছাত্রবিক্ষোভের ফলে ব্যাপক দারিদ্র্য সমস্যা নিয়ে দেশের মানুষ নতুন করে ভবনা চিন্তা শুরু করেছে। দারিদ্র্য যে মালয়েশিয়ার একটি বড় সমস্যা রাজধানী কুআলা লুম্পুরের স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় তার কোন প্রতিফলন নেই বললেই চলে। কুআলা লুম্পুরের লোকসংখ্যা প্রায় আট লক্ষ। গ্রামাঞ্চল থেকে অবিরাম এখানে মানুষ ভীড় করে আসে। শহরের শেষ প্রান্তে নোংরা বস্তি আর পর্ণ কুটিরে বাস করে রাজধানীর প্রায় এক তৃতীয়াংশ মানুষ। কুআলা-লুম্পুরের সাংস্কৃতিক জীবনে পশ্চিমী প্রভাব অতি প্রবল। বেশ ভূষা, আমোদ প্রমোদ, সিনেমা টেলিভিশন সব কিছুতেই মার্কিনী ছাপ প্রকট। এর কারণ অতি স্পষ্ট। মালয়েশিয়ার নিজস্ব কোন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নেই। সাহিত্য বলতে তাদের আছে পত্র .পত্রিকায় প্রকাশিত কিছু কবিতা ও ছোট গল্প। পশ্চিম মালয়েশিয়ার মালাইদের নিজস্ব কোন বীর গাথা নেই, যদিও মালাই জনগোষ্ঠীর ইন্দোনেশীয়দের

অনেক ঐতিহাসিক পুরাকাহিনী আছে, ধ্রুপদী ঐতিহ্য আছে। মালাক্কা প্রণালী মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়াকে শুধুমাত্র ভৌগোলিক অর্থে বিভক্ত করেছে, তা নয়; সাংস্কৃতিক আদান প্রদানের ক্ষেত্রেও দুটি দেশের মধ্যে দুস্তর বাধা সৃষ্টি করেছে। তাছাড়া ঔপনিবেশিক যুগে মালয় উপদ্বীপে ব্রিটিশ সংস্কৃতির প্রসার ও প্রভাব ছিল অতি ব্যাপক। এ সব ঐতিহাসিক কারণে অদ্যাপি সেখানে পশ্চিমী সংস্কৃতির আকর্ষণ দুর্নিবার্য।

পররাষ্ট্রনীতি ও কমিউনিস্ট সন্ত্রাসবাদ

আন্তরাষ্ট্রীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে সুস্থিতি মালয়েশিয়ার পররাষ্ট্রনীতির মূল লক্ষ্য। ASEAN ! গোষ্ঠীভুক্ত দেশ হিসাবে মালয়েশিয়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে স্বাধীন, জোট-নিরপেক্ষ শান্তিপূর্ণ অঞ্চলরূপে গড়ে তুলতে প্রয়াসী। ইন্দোচীনের রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ স্থাপনে মালয়েশিয়া অন্যান্য ASEAN• গোষ্ঠীর রাষ্ট্রগুলির চেয়ে অনেক বেশী তৎপর।

চীন ও সোভিয়েট রাশিয়ার মধ্যে দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে মালয়েশিয়া নিরপেক্ষ থেকেছে। চীন ও ভিয়েতনাম সুযোগ সুবিধা মত মালয় কমিউনিস্ট পার্টিকে নানাভাবে সাহায্য করেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ঐ দুই দেশের সঙ্গে মালয়েশিয়া দ্বিপাক্ষিক সদ্ভাব বজায় রেখেছে এবং বিশেষ করে ভিয়েতনামের সঙ্গে অর্থনৈতিক সহযোগিতা গড়ে তুলেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক সম্বন্ধ রচনায় মালয়েশিয়া তৎপর হয়েছে। কারণ রবার ও টিনের প্রধান ক্রেতা হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। জাপান ও বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশের সঙ্গেও মালয়েশিয়ার বাণিজ্য-সম্বন্ধ আছে। 1977 সালে তৃতীয় মালয়েশিয়া পরিকল্পনায় জাপান 158 মিলিয়ণ ডলার ঋণ দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। মধ্যপ্রাচ্যে মালয়েশিয়ার নীতি আরবদের অনুকূলে। বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলনের উদ্যোক্তা ছিল মালয়েশিয়া।

মালয়েশিয়ার একমাত্র ভূ-সীমান্ত থাইল্যান্ডের সঙ্গে। এই সীমান্ত মাত্র 320 মাইল দীর্ঘ। এই সীমান্তের উভয় পারে গোলযোগ নিত্যই দুই দেশের শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত করেছে। মালয়েশিয়ার বিদ্রোহী গোষ্ঠীর মানুষ দক্ষিণ থাইল্যান্ডের অরণ্যে নিরাপদ আশ্রয় খুঁজেছে। সীমান্তে চোরা কারবার দমনে উভয় দেশই সম্মিলিতভাবে প্রচেষ্টা চালিয়েছে। কিন্তু 1977 পর্যন্ত মালয়েশিয়ার পলাতক বিদ্রোহীদের বিতাড়িত করতে থাইল্যান্ডের সরকার প্রত্যাশিত তৎপরতা দেখায় নি। এর কারণ আছে। বেশ কিছু দিন ধরে দক্ষিণ থাইল্যান্ডে ডাকাত ও লুঠেরার দল দস্যুতা চালিয়েছে। অদের

দমন করতে থাই সরকার বিশেষ ভাবে মনোযোগী হয়েছিল। তাছাড়া দক্ষিণ থাইল্যান্ডের মুসলমানরা বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। মালয়েশিয়ার উত্তরের রাজ্যগুলির চরমপন্থী মুসলমানদের কাছ থেকে এ বিষয়ে প্রেরণা ও সাহায্য পেয়েছিল থাইল্যান্ডের মুসলমান বিচ্ছিন্নতাকামীরা। দক্ষিণ থাইল্যান্ডের দশভাগের নয়ভাগ মানুষ হল মুসলমান। তাদের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের শিকড় গভীর ইতিহাসগর্ভে নিহিত। তাদের বিরুদ্ধে থাই সরকার সর্ব শক্তি নিয়োগ করেছিল। তাছাড়া, উত্তর ও উত্তর-পূর্ব থাইল্যান্ডের বিদ্রোহী আন্দোলন জেগে উঠেছিল। এই সব নিজস্ব সমস্যায় থাই সরকার এত বিব্রত ছিল যে মালয়েশিয়ার পলাতক বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে, তারা কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে নি।

1977 সালে সীমান্ত সমস্যা সম্পর্কে বিশেষ করে বিদ্রোহীদের দমনের প্রশ্নে উভয়দেশের মধ্যে একটি সীমান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই চুক্তি অনুযায়ী দ্বিপাক্ষিক আলোচনা এবং সম্মিলিত সেনা ও পুলিশ বাহিনী কাজে লাগানোর আয়োজন করা হয়েছে। বিদ্রোহীদের খুঁজে বের করাব জন্য উভয় দেশের সেনা উভয় দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশের অধিকাব পেয়েছে। থাইল্যান্ডে সীমান্ত থেকে পাঁচ মাইলেরও বেশী দূরত্ব পর্যন্ত প্রবেশের অনুমতি পেয়েছিল মালয়েশিযার সেনাবাহিনী। তাছাড়া মালয়েশীয় সেনাবাহিনী নির্দিষ্ট কিছুদিনেব জন্য থাইল্যান্ডে অবস্থান করার অনুমতি পেয়েছিল। এমন সময়ও গেছে যখন তিন সপ্তাহ ধরে দু'হাজার মালয়েশীয় সেনা দেড় হাজার থাই সেনার সঙ্গে থাইল্যান্ডে যুগ্ম দায়িত্বে কাজ করেছে। ক্ষিপ্রগতি ও রণচাতুর্য সত্ত্বেও বিদ্রোহী সন্ত্রাসবাদীরা ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়েছে। কিন্তু উত্তর মালয়েশিয়ায়, পেরাক, কেদা, কেলানতান এবং পাহাঙ বাজ্যে মালয় কমিউনিস্ট পার্টি ও তার ফৌজি শাখা দি মালয়ান ন্যাশনাল লিবাবেশন আর্মি নানা সন্ত্রাসবাদী কাজকর্মে লিপ্ত আছে। ইসলামী সমাজতন্ত্রের যাদুমন্ত্রে কমিউনিস্টরা বহু মানুষকে বশীভূত করেছে। ঔষুধপত্রের চোরা চালানে লিপ্ত যে সব গোপন সংগঠন আছে, কমিউনিস্টরা তাদের দোসর হয়েছে। এ সব কারণে মালয়েশিয়ায় সন্ত্রাসবাদ নবজীবন লাভ করেছে।

তা সত্ত্বেও মালয়েশিয়ায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের কোন প্রতিশ্রুতি নেই।[2] 1940 এর দশকের মাঝামাঝি মালয় কমিউনিস্ট পার্টির (Communist Party of Malay-CPM) 14,000 গেরিলা সেনা ছিল। 1961 সালে এই সংখ্যা কমে 1500-2000 এ দাঁড়িয়েছে। 1981 সালে তাদের সংখ্যা 2000-3000 এর বেশী নয়। কমিউনিস্ট দলের নেতাদের বিশদ পরিচয় জানা যায় নি। কিন্তু একথা সত্য, তাদের মধ্যে লেনিন, মাও বা হো চি মিন নেই।

মালয়ের অধিকাংশ মানুষ মনে করে যে সেখানকার কমিউনিস্ট পার্টি আসলে চীনাদের দল। মালয়েশিয়ায় বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তোলার দিকে দৃষ্টি না দিয়ে চীনের জাতীয় স্বার্থের পরিপূরক হিসাবে তারা কাজ করেছে। CPM চীনপন্থী কিন্তু জাতীয়তাবাদী নয়।

সুলতানী ব্যবস্থার সঙ্গে মালাইদের পরিচয় এত গভীর যে বিকল্প হিসাবে কমিউনিস্ট রাষ্ট্র তাদের দৃষ্টিতে অকল্পনীয়। সুসংগঠিত গ্রাম দিয়ে শহর ঘিরে ফেলা বা বিচ্ছিন্ন করার সংগ্রাম এখানে অচল। আধুনিকী-করণ ও শিল্পায়ণের ফলে মালয়েশিয়ায় শ্রেণী সংগ্রাম তীব্র হয় নি। বরঞ্চ গোষ্ঠিভুক্ত আত্ম-পরিচিতি কামনায় সেখানকার অধিবাসী পরম্পরাগত ধর্মীয় বন্ধনকে নিবিড়ভাবে আঁকড়ে ধরেছে। এই কারণে কমিউনিজমের আদর্শ নয়, ইসলাম ধর্মের আবেদন সেখানে প্রবলতর হয়েছে।

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক (1981-85) পরিকল্পনায় শুধুমাত্র মালাই সম্প্রদায় নয়, যুগপৎ সমস্ত জাতি-গোষ্ঠীর মানুষের উন্নয়নের ব্যবস্থা আছে। কমিউনিস্ট সন্ত্রাসবাদকে প্রতিহত করার জন্য সরকারী উদ্যোগে গ্রামস্তরে গড়ে উঠেছে *Rukun Tetangga* নামে সেনাবাহিনী। 1981 সালে দেশের নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষার জন্য 9.2 বিলিয়ন মালয় ডলার বরাদ্দ ছিল। মালয়েশিয়ার প্রাকৃতিক সম্পদ অপরিমেয় এবং অর্থনৈতিক বনিয়াদ সুদৃঢ়। গত কয়েক বছর ধরে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গড় হার ছিল 8 শতাংশ।

অন্য দেশে বিপ্লবী আন্দোলনকে সমর্থন জানাতে চীন এখন বিশেষ আগ্রহী নয়। স্বদেশের আধুনিকীকরণই চীনের মূল সমস্যা। মালয়েশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে মৈত্রী বজায় রাখার চেয়ে ঐ দেশের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় কূটনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে চীন অধিক আগ্রহী। এ কারণে মালয়েশিয়ার কমিউনিস্ট আন্দোলন এখন চীনের দাক্ষিণ্য থেকে বঞ্চিত। ভিয়েতনামও প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছে যে হ্যানয় সরকার মালয়েশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টিকে সমর্থন করবে না বা ঐ অঞ্চলে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনকে সাহায্য দেবে না। এসব কারণে মালয়েশিয়ায় কমিউনিস্ট আন্দোলন সফল হবার সম্ভাবনা একটুকু উজ্জ্বল নয়।

পাদটীকা

1. ASEAN

1967 সালের আগস্ট মাসে ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন, মালয়েশিয়া এবং সিঙ্গাপুরকে নিয়ে Association of South East Asian Naions (ASEAN) গঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং নীতির প্রতি আস্থাশীল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্য যে কোন দেশের জন্য সভ্যপদ উন্মুক্ত রাখা হয়েছিল।

এই প্রতিষ্ঠানের ঘোষিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিচে উল্লেখ করা হল।

(a) এই অঞ্চলে যৌথ প্রচেষ্টায় অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক অগ্রগতি এবং সাংস্কৃতিক বিকাশ ত্বরান্বিত করা;

(b) আইনের শাসন (The Rule of Law) এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদের প্রতি আনুগত্যের মাধ্যমে আঞ্চলিক শান্তি ও সুস্থিতি বর্ধন;

(c) পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে সক্রিয় সহযোগিতা ও পারস্পরিক সাহায্য দান;

(d) বাণিজ্য, কৃষি, যানবাহন, শিল্প যোগাযোগ বিষয়ে সহযোগিতা;

(e) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া বিষয়ে বিদ্যাচর্চায় উৎসাহ দান;

(f) সমস্ত আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থায় ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা।

2. Shee Poon Kim, 'Insurgeney in Southeast Asia', *Problems of Communism*. May-June, 1983.

মালয়েশিয়ার ইতিহাসে নির্বাচিত ঘটনাপঞ্জী

আনুমানিক খ্রীস্টপূর্ব	2500	প্রোটো মালাইদের মালয়ে আগমন
” ”	300	দুতারো মালাইদের মালয়ে আগমন
” ”	100	উত্তর পশ্চিম মালয়ের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক যোগাযোগ
” খ্রীষ্টাব্দ	350	কেদায় ভারতীয় বসতি ও সংস্কৃতি বিস্তার
” ”	300-550	কেদায় বৌদ্ধ ধর্মের প্রবল প্রভাব
” ”	700-1000	শ্রীবিজয় সাম্রাজ্যের তুঙ্গতম পর্ব

1292	মালাক্কা প্রণালী দিয়ে মার্কো পোলোর সমুদ্র যাত্রা
1299	সিঙ্গাপুর দ্বীপে তুমাসিক দ্বীপের প্রতিষ্ঠা
1345-46	চীন যাতায়াতের পথে আরব পর্যটক ইবন বতুতার দু'বার উত্তর-পূর্ব সুমাত্রায় অবস্থান
1403	ইসকানদার শাহ (পরমেশ্বর) কর্তৃক মালাক্কা প্রতিষ্ঠিত
1405	চীনা নাবিক ইন-চিঙের মালাক্কায় আগমন
1411	মহানাবিক চেংহোর সঙ্গে পরমেশ্বরের চীনে আগমন
1414	পরমেশ্বরের ইসলাম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ
1424-1444	শ্রীমহারাজা (মুহম্মদ শাহ)
1444-1446	শ্রীপরমেশ্বর দেব শাহ
1445	ইসলাম মালাক্কার রাষ্ট্রীয় ধর্ম
1446-1459	মুজফফর শাহ
1459-1477	মনসুর শাহ
1477-1488	আলাউদ্দিন রিয়াইয়াৎ শাহ
1488-1511	মামুদ শাহ
1456-1498	বেনদাহারা তুন পেরাক
1500-1510	বেনদাহারা তুন মুতাহির
1500	কালিকটের দক্ষিণে কোচিন শহরে পর্তুগীজদের বাণিজ্য কুঠি স্থাপন

1509	পর্তুগীজদের (সিকুয়েরা) মালাক্কায় প্রথম আগমন
1510	পর্তুগীজদের গোয়া দখল
1511	আলবুকের্কের মালাক্কা জয়
1526	পর্তুগীজরা জোহোরের রাজধানী বিনটাঙ ধ্বংস করে; ব্রুণির সঙ্গে পর্তুগীজদের বাণিজ্য চুক্তি
1547	মালাক্কায় সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার
1641	পর্তুগীজ মালাক্কা ডচ শক্তির কবলিত
1771	কেদাতে ব্রিটিশ বাণিজ্য কেন্দ্র—ফ্রান্সিস লাইট ও কেদার সুলতানের মধ্যে আলোচনা
1772	কেদাতে মঙ্কটন মিশন
1784-85	কেদাতে ফ্রান্সিস লাইট, পুনরায় আলোচনা শুরু
1786	ইসট ইন্ডিয়া কোমপানির অধিকারে পেনাঙ, পেনাঙের নতুন নাম প্রিন্স অব ওয়েলস দ্বীপ, ফ্রান্সিস লাইট নতুন সুপারিটেনডেনট
1791	কেদার সুলতানের পেনাঙ অভিযানের চেষ্টা, লাইট কর্তৃক তাঁর নৌবাহিনী বিধ্বস্ত, কেদার সুলতানের জন্য চুক্তিমত বার্ষিক 6,000 স্পেনীয় ডলার ব্রিটিশ অনুদান
1795	ডচ কবল থেকে ইংরেজদের দখলে মালাক্কা
1800	ব্রিটিশ অধিকারে প্রভিন্স ওয়েলেসলি. প্রভিন্স ওয়েলেসলি পেনাঙের সঙ্গে যুক্ত, সুলতানের প্রাপ্য বার্ষিক ভাতা 10,000 ডলারে বর্ধিত
1805	পেনাঙ প্রেসিডেন্সিতে রূপান্তরিত, ফিলিপ ডানডাস প্রথম গভর্ণর, রাফেলস সহকারী সচিব
1811	জোহোরে ব্রিটিশ অভিযান, জোহোর দখল
1818	ডচদের হাতে মালাক্কা প্রত্যর্পণ
1819	ব্রিটিশ দখলে রাফেলস কর্তৃক সিঙ্গাপুরের প্রতিষ্ঠা, সুলতান হুসেনের সঙ্গে প্রাথমিক চুক্তি

1823	সুলতান হুসেন ও তেমেংগঙের সঙ্গে র‍্যাফেলসের দ্বিতীয় চুক্তি
1824	ইঙ্গ-ডচ লনডন চুক্তি, ডচ শাসন থেকে ইংরেজ শাসনে মালাক্কা হস্তান্তরিত, সুলতান হুসেন ও তেমেংগঙের সঙ্গে ক্রফোর্ডের চুক্তি
1825	বার্ণে ও লিগোরের রাজার মধ্যে প্রাথমিক চুক্তি, পেরাক ও সেলাংগোরের মধ্যে অ্যানডারসন চুক্তি
1826	ইঙ্গ-শ্যাম ব্যাংকক চুক্তি বা বার্ণে চুক্তি, পেরাকের সঙ্গে জেমস লো'র (James Low) চুক্তি
1832	স্ট্রেটস সেটেলমেন্টস কথাটির প্রচলন শুরু
1841	সারাবাকের রাজপদে জেমস ব্রুক
1847	ব্রিটিশদের হাতে ব্রুণি কর্তৃক লাবুয়ান (Labuan) দান
1867	ইনডিয়া অফিস থেকে কলোনিয়াল অফিসে স্ট্রেটস সেটেলমেন্টসের দায়িত্ব হস্তান্তরিত
1874	পাংকোর চুক্তি (The Pangkor Engagement), মালয় রাজ্যগুলিতে ব্রিটিশ হস্তক্ষেপ, রেসিডেন্ট প্রথা প্রবর্তন
1875	পেরাক, সেলাংগোর ও সুঙ্গি উজোং-এ ব্রিটিশ রেসিডেন্ট নিয়োগ
1881	ব্রিটিশ নর্থ বোর্ণিও কোমপানি গঠিত
1888	ব্রুণি, সারাবাক ও উত্তর বোর্ণিওকে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক প্রতিরক্ষার প্রতিশ্রুতি দান
1889	পাহাঙে ব্রিটিশ রেসিডেন্ট নিযুক্ত
1896	ফেডারেটেড মালয় স্টেটস (FMS) গঠন
1897	কুআলা কাংসারে মালয় রাজ্যগুলির শাসকদের (Rulers) প্রথম সম্মেলন
১৯০৯	ইঙ্গ-শ্যাম চুক্তি : কেলানতন, কেদা, ত্রেংগানু ও পারলিসের জন্য ব্রিটিশ পরামর্শদাতা নিযুক্ত, ফেডারেটেড মালয় স্টেটসে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ গঠিত

1914	জোহোরে ব্রিটিশ জেনারেল অ্যাডভাইসার নিয়োগ
1926	*Kesatuan Melayu Singaputra* নামে প্রথম রাজনৈতিক দল গঠিত
1927	মালয় কমিউনিস্ট পার্টির জন্ম
1937	জাপান কর্তৃক চীন আক্রমণ, *Kesatuan Melayu Muda* (KMM) নামে চরমপন্থী রাজনৈতিক দল গঠিত
1939	Pan-Malayan Malay Association গঠন মালয়ে জাপানী অভিযান শুরু
1941	সিংগাপুর জাপানের দখলে
1942-1945	জাপানী শাসনাধীনে মালয়
1946	অ-মালাইদের মুখপত্র মালয় ডেমোক্রেটিক ইউনিয়ন গঠিত, UMNO গঠিত, উত্তর বোর্ণিও ও সারাবাক ব্রিটিশ উপনিবেশে পরিণত
1948	মালয় ফেডারেশন গঠন, জরুরী অবস্থা ঘোষণা
1949	Malay Chinese Association (MCA) গঠিত
1951	Dato Onn কর্তৃক Indenendence of Malay Party গঠিত
1953	UMNO, MCA ও MIC নিয়ে Alliance Party গঠিত, MIC যোগ দেয় 1955 সালে
1955	প্রথম সাধারণ নির্বাচন, প্রধান মন্ত্রী পদে টেংকু আবদুল রহমান
1956	লনডন সম্মেলন, Merdeka মিশন
1957	মালয় ফেডারেশনের স্বাধীনতা লাভ
1959	সিঙ্গাপুরের আভ্যন্তরীন স্বায়ত্ত শাসন লাভ
1963	মালয়, সিঙ্গাপুর, সাবা, সারাবাক নিয়ে মালয়েশিয়া গঠিত
1965	সিঙ্গাপুর মালয়েশিয়া ফেডারেশন ত্যাগ করে।

1966-70	প্রথম অর্থনৈতিক পরিকল্পনা
1970-76	দ্বিতীয় ,, ,,
1976-80	তৃতীয় ,, ,,
1981-85	চতুর্থ ,, ,,

ইন্দোনেশিয়ার ইতিহাসে নির্বাচিত ঘটনাপঞ্জী

খ্রীস্টীয় প্রথম শতক	রামায়ণে যবদ্বীপের উল্লেখ
,, দ্বিতীয় শতক	পূর্ব জাভা, সুমাত্রা (পালেমাঙের কাছে) ও সেলেবেসে (সেম্পায়াতে) অমরাবতী আঙ্গিকের বৌদ্ধমূর্তি
দ্বিতীয় শতকের মধ্যভাগে	ভূগোলবিদ টলেমির বিবরণে Jabadieu এর উল্লেখ
132	Ye-Tiaoর (যবদ্বীপের) Tiao-Pien (দেববর্মণ) কর্তৃক চীনে দূত প্রেরণ
তৃতীয় শতক	চীনাদের বিবরণে সুমাত্রার দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে Ko-Ying বাণিজ্য কেন্দ্রের উল্লেখ; Ko-Ying এর সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক যোগাযোগ
পঞ্চম শতকের প্রথম দিকে	বোর্ণিওর রাজা মূলবর্মনের সংস্কৃত ভাষায় লেখমালা
413	সিংহল থেকে পশ্চিম জাভায় ফা-হিয়ানের আগমন
423	কাশ্মীরের রাজকুমার গুণবর্মনের জাভায় আগমন ও বৌদ্ধধর্ম প্রবর্তন; সম্ভবত তিনিই প্রথম এখানে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করেন।
পঞ্চম শতক	পশ্চিম জাভায় রাজা পূর্ণবর্মনের চারটি তারিখবিহীন লেখমালায় উত্তর ভারতের চন্দ্রভাগা ও গোমতী নদীর নামোল্লেখ
ষষ্ঠ শতকের প্রথম দিকে	চীনা বিবরণে সুমাত্রার দক্ষিণ-পূর্ব উপ-

	কুলে Kan-Toliর উল্লেখ, ভারত ও চীনের সঙ্গে Kan-Toliর যোগাযোগ, Ko-Ying ও Kan-Toli শ্রীবিজয় সাম্রাজ্যের পূর্বসূরী
সপ্তম শতক	মধ্য জাভায় Ho-Ling রাজ্য
আ 670	ইৎ সিঙের শ্রীবিজয় পরিক্রমা
683	প্রাচীন মালয় শিলালিপিতে শ্রীবিজয়ের সর্বপ্রথম পাথুরে উল্লেখ
683-686	প্রাচীন মালয় লেখমালায় শ্রীবিজয়ের রাজা জয়নাশ কর্তৃক জাম্বি, বঙ্ক ও জাভাতে অভিযান প্রেরণের উল্লেখ
732	রাজা সঞ্জয়ের চঙ্গল লিপিতে মধ্য জাভায় শৈব পীঠ পুনর্গঠনের উল্লেখ
760	পূর্ব জাভার দিনজ লিপিতে অগস্ত্যের কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর মূর্তির উল্লেখ, প্রাচীন যবদ্বীপীয় হস্তাক্ষরের সর্বপ্রথম নিদর্শন
775	লিগোর (দক্ষিণ মালয়) প্রস্তর লেখমালায় একজন শৈলেন্দ্র রাজার সর্বপ্রথম উল্লেখ, প্রস্তর খণ্ডের অপর দিকে শ্রীবিজয়ের একজন রাজার নামোল্লেখ
778	মধ্য জাভায় প্রাপ্ত কলসন লেখমালা
782	কেলুরক লিগোর, কলসন ও কেলুরক লেখ থেকে এটা স্পষ্ট যে অষ্টম শতকের শেষ তিন দশকে জাভা ও মালয় উপদ্বীপে শৈলেন্দ্র বংশের শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত। শৈলেন্দ্র যুগের এসব লেখমালা প্রাক-নাগরী হস্তাক্ষরে লিখিত।
নবম শতকের মাঝামাঝি	বরোবুদুর নির্মাণ সমাপ্ত, দেবপালের নালন্দা তাম্রফলকে (850) সুবর্ণদ্বীপের শাসক হিসাবে বালপুত্রের নামোল্লেখ
নবম শতকের শেষপর্ব	সঞ্জয়ের বংশধর শৈবরাজা বালিতুঙ্গের পূর্ব জাভা থেকে মধ্য জাভায় প্রত্যাবর্তন, মধ্য জাভা এই সময় মতরাম নামে পরিচিত,

	বলিদ্বীপের প্রথম সতারিখ (896) লেখমালা প্রাপ্ত
দশম শতক	বলিতুঙ্গের পর মধ্য জাভায় রাজা হলেন দক্ষ, প্রাম্বানান মন্দির গাত্রে রামায়ণ চিত্রাবলী অঙ্কিত
929-947	পূর্ব জাভায় সিণ্ডোক কর্তৃক নতুন রাজবংশ স্থাপন, মধ্য জাভা পরিত্যক্ত, পূর্ব জাভার রাজনৈতিক প্রাধান্য, প্রাচীন যবদ্বীপীয় ভাষায় রামায়ণ লিখিত, বৌদ্ধ তন্ত্রের গ্রন্থ সঙ্গ্ হ্যঙ্গ্ কমহাযানিকন প্রণীত
955-983	বলিদ্বীপে বর্মদের নামধারী রাজাদের রাজত্ব, রাজা ধর্মোদয়ণ বর্মদেবের সঙ্গে পূর্ব জাভার রাজকুমারী মহেন্দ্র দত্তার বিবাহ, বলিদ্বীপে হিন্দু ধর্ম, তান্ত্রিক মতবাদ ও যবদ্বীপীয় সংস্কৃতির বিস্তার
1019-49	ঐরলঙ্গের নেতৃত্বে পূর্ব জাভায় নতুন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা
1025	রাজেন্দ্র চোলের সঙ্গে যুদ্ধে শৈলেন্দ্র রাজা শ্রীসংগ্রামবিজয়োত্তুঙ্গ বর্মণের পরাজয়
1035	ঐরলঙ্গের রাজত্বকালে কবি কন্ব কর্তৃক 'অর্জুন-বিবাহ' মহাকাব্য লিখিত
1042	ঐরলঙ্গ অবসর নেন, সাম্রাজ্য দুই পুত্রের মধ্যে বণ্টিত, একটি রাজ্যের নাম কেদিরি, অন্য রাজ্যের নাম জঙ্গালে (পরে সিঙ্গসারি নামে পরিচিত)
1082	লেরান লিপিতে জাভায় প্রচলিত ইসলাম ধর্মের উল্লেখ
একাদশ শতকের মধ্যভাগ থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যভাগ	কেদিরি রাজ্যের স্বর্ণযুগ, প্রাচীন যবদ্বীপীয় ভাষায় কৃষ্ণায়ণ, ভারতযুদ্ধ, হরিবংশ প্রভৃতি লিখিত

1222	কেন আংগরোকের অভ্যুদয়, সিঙ্গসারির প্রতিষ্ঠাতা রূপে তিনি পূজিত, তিনি ছিলেন মজপাহিত রাজাদের পূর্বপুরুষ
1268-1292	সিঙ্গসারির রাজা কৃতনগরের সাম্রাজ্য বিস্তার নীতি; মলয়ু (সুমাত্রা), বলি, বোর্ণিওর বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ
1293-94	কৃতনগরের জামাতা রাদেন বিজয় মজপাহিতের প্রতিষ্ঠাতা
1326	ইতালীয় ধর্মযাজক Odoric Pordenone এর জাভায় আগমন
1329	মহারাণী জয়বিষ্ণুবর্ধণী মজপাহিতের শাসনকর্ত্রী, গজমদ তাঁর প্রধান মন্ত্রী
1350-1389	জয়বিষ্ণুবর্ধনীর পুত্র হয়ম ভুরুক মজপাহিতের শাসক, গৌরবশিখরে মজপাহিত সাম্রাজ্য, প্রপঞ্চের নাগরকৃতাগম গ্রন্থে রাজধানীর মহিমা বর্ণনা, এ যুগের একটি আকর-গ্রন্থ পররতন
1405-1433	চীনা মহানাবিক চেংহোর 7টি নৌ-অভিযান, সমুদ্রপথে মজপহিত সাম্রাজ্যের নয়, চীন সাম্রাজ্যের আধিপত্য, সুমাত্রায় (এয়োদশ শতক থেকে) ইসলামের আবির্ভাব, মজপহিতের পতনলগ্নে জাভা উপকূলে ইসলামের প্রসার
1478	কদিরির রাজকুমার রণবিজয় মজপহিতের বিরুদ্ধে অন্তিম অভিযান চালান, রাজধানীর প্রভাবশালী ব্যক্তিদের বলিদ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ
1522	পূর্ব জাভার শেষ হিন্দু রাজার বলিদ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ
1577	ব্রুণির উপর স্পেন আক্রমণ
1594	লিসবন থেকে ডচ বাণিজ্য নিষিদ্ধ

1595-96	দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় Cornelius Van Houtman এর নেতৃত্বে ডচ অভিযান
1599	মলুক্কাতে ওলন্দাজ বণিকদের প্রথম আগমন
1600	ইংরেজ ইসট ইনডিয়া কোমপানি গঠন
1602	ডচ ইউনাইটেড ইসট ইনডিয়া কোমপানি গঠন, বানতামে ইংরেজ কুঠি নির্মাণ
1607	টারনেটে ডচ শাসন প্রতিষ্ঠিত
1610	Pieter Both ডচ কোমপানির প্রথম গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত
1619	জাকার্তা ওলন্দাজ দখলে, বাটাভিয়ার পত্তন
1637	জোহোরের সঙ্গে ওলন্দাজ চুক্তি
1641	পর্তুগীজ মালাক্কা ডচ কবলিত
1660	মাকাসারের বিরুদ্ধে প্রথম ডচ অভিযান
1666	মলুক্কা থেকে স্পেনীয়রা বিতাড়িত, টিডোর ডচ প্রভুত্ব মেনে নেয়।
1684	বানতমে ডচ একচেটিয়া বাণিজ্য প্রসারিত
1705-8	প্রথম যবদ্বীপীয় যুদ্ধের অবসানে চুক্তি মত মতরামে ডচ একচেটিয়া বাণিজ্য প্রসারিত
1798-99	নেদারল্যান্ড ইউনাইটেড ইসট ইনডিয়া কোমপানি ডচ সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন, ইন্দোনেশিয়ায় সবাসরি ডচ শাসন শুরু
1811-16	জাভা ও অন্যান্য ডচ অধিকৃত অঞ্চল ইংরেজ শাসনাধীন
1816	ঐ সমস্ত অঞ্চল পুনরায় ডচদের হাতে ফিরে আসে।
1824	নেদারল্যান্ড ট্রেডিং সোসাইটির পত্তন, ইঙ্গ-ডচ চুক্তি অনুযায়ী পশ্চিম সুমাত্রার ব্রিটিশ অঞ্চল ডচদের দখলে

1825-30	ডচ সরকারের বিরুদ্ধে জাভার শাসকদের স্বাধীনতা যুদ্ধ
1830	কালচার সিসটেম প্রবর্তন
1870	কৃষি ও চিনি সম্পার্কিত আইন প্রচলন
1873-1903	আচের যুদ্ধ
1908	(অক্টোবর), Budi Utomo দলের জন্ম
1909	Sarekat Dagang Islam (Islamic Trading Association) দলের জন্ম
1912	Sarekat Islam (SI), Nationale Indische Party (National Indies Party) এবং Mohammadijah দলের প্রতিষ্ঠা
1914	Indies Social Democratic Association (ISDV) এর জন্ম, Hendrik Sneevliet এই দলের প্রতিষ্ঠাতা
1917-18	Volksraad গণপরিষদের জন্ম
1920	(মে 23), ইন্দোনেশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির (Perserikaten Kommunist di India—PKI) প্রতিষ্ঠা
1922	হল্যান্ডে পাঠরত ইন্দোনেশীয় ছাত্র সম্প্রদায় Perhimpoenan Indonesia (PI) বা Indonesian Union দল গঠন করেন।
1926	(জানুয়ারি 31) সুরবায়াতে Nahdatul Ulema (NU) দল প্রতিষ্ঠিত হয়।
1926-27	ব্যর্থ কমিউনিস্ট অভ্যুত্থান
1927	Tan Malaka, Tamin এবং Subakat এর নেতৃত্বে ব্যাঙ্ককে Indonesian Republican Party (Partai Repoeblik Indonesia—Pari) গঠিত হয়। Soekarnoর নেতৃত্বে Bandung Study Club এর সদস্যবৃন্দ Partai Nasional Indonesia (PNI)

	দল গঠন করে। এই দল ডচ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনের নীতি গ্রহণ করেছিল।
1929	Partai Sarekat Islam Indonesia (Indonesian Islamic Association Party) দলের জন্ম, ইন্দোনেশিয়া কথাটি যুক্ত হবার তাৎপর্য এই যে এই দল Pan-Islam আন্দোলন বর্জন করে।
1930	(সেপ্টেম্বর 14) Mohammad Tabranir নেতৃত্বে Partai Rakjat Indonesia (Indonesian People's Party) গঠিত হয়। ডচদের সঙ্গে সহযোগিতার ভিত্তিতে সংসদীয় পথে স্বায়ত্ত শাসন অর্জন ছিল এই দলের লক্ষ্য।
1931	(এপ্রিল) Sartonoর উদ্যোগে Partai Indonesia (Partindo) দলটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ডচদের সঙ্গে অসহযোগিতার ভিত্তিতে পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল এই দলের লক্ষ্য।
1935	Parindra (Partai Indonesia Raja, Greater Indonesian Party) দলেব জন্ম। Persatoean Bangsa Indonesia, Boedi Oetomo ও বিভিন্ন অ-যবদ্বীপীয় জাতীয়তাবাদী সংগঠনের সংযুক্ত দল হিসাবে এটি আত্মপ্রকাশ করে। কৃষি সমবায়, ব্যাঙ্কের কল্যানধর্মী ভূমিকা, নিরক্ষরতা দূরীকরণ ইত্যাদি সমাজ উন্নয়ন কাজে এই দল অগ্রণী ছিল। Dr. Sutomo ছিলেন এই দলের নেতা।
937	(এপ্রিল) Gerindo (Geraken Rakjat Indonesia, Indonesian Peoples' Movement) দলের আবির্ভাব। Dr. A.K. Gani ছিলেন এই দলের প্রতিষ্ঠাতা। এই দল ছিল উগ্র জাতীয়তাবাদী, বামপন্থী এবং

ফ্যাসী-বিরোধী। তা সত্ত্বেও ডচ সরকারের সঙ্গে তারা সহযোগিতা করেছে।

1939 (মে) GAPI (Gaboengan Politick Indonesia—Federation of Indonesian Political Parties) গঠিত। এই সংগঠনে Gerindo, Parindra, Pasoendan, Persatoean, Minahassa, Partai Katholiek Indonesia, Partai Islam Indonesia এবং Partai Arab Indonesia—এই আটটি দল যোগ দিয়েছিল। এই সংগঠনের সাধারণ কর্মসূচী হল : 1. আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধিকার, 2. রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক গণতন্ত্র নির্ভর জাতীয় ঐক্য, 3. গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত এবং জনগণের প্রতি দায়িত্বশীল ইন্দোনেশীয় পার্লামেন্ট গঠন এবং 4. ফ্যাসী-বিরোধী ফ্রন্ট গঠনের জন্য নেদারল্যাণ্ড সরকার ও ইন্দোনেশীয় রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে সহযোগিতা।

1941 (সেপ্টেম্বর 13-14) Madjelis Rakjat Indonesia (Indonesian People's Council) গঠিত। এই সংগঠনে GAPIর প্রতিনিধি, MIAI (a federation of non-political Moslem Organisation) এবং PVPN (a federation of trade Unions of Government employees) এর প্রতিনিধি ছিল। ইন্দোনেশীয় জাতীয় আন্দোলনের স্থায়ী প্রতিনিধিমূলক সংগঠন হিসাবে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। জাপানী আক্রমণের ফলে এই দলের কাজকর্ম ব্যাহত হয়।

1942 মহম্মদ হাট্টা ও সুকর্ণ Perhimpunan Mahasiswa Indonesia (Indonesian

	Students Association) প্রতিষ্ঠা করেন।
1942	(মার্চ 9) ইন্দোনেশিয়া জাপান অধিকৃত
1942	(এপ্রিল) AAA জাপানী সাংস্কৃতিক আন্দোলন শুরু
1943	জাপানী উদ্যোগে Putera এবং মুসলিম সংগঠনগুলির সমিতি Masjumi গঠিত
1944	জাপানী উদ্যোগে Djawa Hokokai গঠিত
1945	(আগস্ট) মিত্র পক্ষের কাছে জাপানের আত্ম-সমর্পণ
1945	(আগস্ট 17) ইন্দোনেশিয়ার জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। 18 আগস্ট প্রজাতান্ত্রিক ইন্দোনেশিয়ার শাসনতন্ত্র চালু হয়।
1947	(মার্চ 25) ডচ ও ইন্দোনেশীয় নেতৃবৃন্দ Linggadjati চুক্তি স্বাক্ষর করেন।
1948	(সেপ্টেম্বর) Madiun এ কমিউনিস্ট দলের ক্ষমতা দখলের ব্যর্থ চেষ্টা
1949	(ডিসেম্বর 27) ডচ কবল থেকে ইন্দো-নেশিয়ার মুক্তি, সার্বভৌম যুক্তরাষ্ট্রীয় ইন্দোনেশীয় প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা
1950	(সেপ্টেম্বর 28) ইন্দোনেশিয়া সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্য
1950	(আগস্ট 15) একরাষ্ট্রীয় ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্রের আবির্ভাব
1957	(জুলাই 12) সুকর্ণ Dewan Nasional গঠন করেন।
1959	(জুলাই 5) বিধানসভা ভেঙেগ দিয়ে সুকর্ণ সর্বোচ্চ ক্ষমতা দখল করেন।